বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

অষ্টমখণ্ড।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

৮ম খণ্ড, ১২৯৮ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭৫নং কটন ষ্ট্রীট্ বড়বাজার "নারায়ণ" যন্ত্রে
শ্রীরামনারায়ণ পাল দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২০৪।৮
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সন ১২৯৮ সাল, ৮ম, খণ্ড চিকিৎসা-সম্মিলনীর

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
গতবর্ষ ...	সম্পাদক ...	১
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মানবশত্র—স্ত্রী, শ্রী— ...		৩,১০১,২৯৫
বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্য (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম, বি,	৯,৭৮,১২১
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী (কবিরাজী)	কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	১৩,৮১,১৫৪
হোমিওপ্যাথিক ঔষধতত্ত্ব	ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল, এম, এস্	১৫
ক্লোরাফরম্ আঘ্রাণ	ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় এল, এম্, এস্	১৭,৫৯,
ধাতুব্যাখ্যা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় ...	২০,৬৪,২০১,৩৫৯,
রোগনিদান (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,	২২,১২৫
পিপাসার চিকিৎসা (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্,বি	২৫
জায়ফল	ঐ ঐ	২৬
মুষ্টিযোগ ঔষধ (দেশীয়)	ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার	২৮,৯৮,১৬০,২২২,
বিবিধ মুষ্টিযোগ (ঐ)	উদ্ধৃত ...	৩০
অবলবান্ধব (কবিরাজী)	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৩২,৭৫,১২৪,২১২,৩২৬,
আমাদের কথা (শোকসংবাদপ্রভৃতি)	সম্পাদক ...	৩৩,১৬৫,
হোপসম্পাদক ও হিন্দুম্যাগাজিন	সম্পাদক ...	৩৫
মূলেভুল (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,	৪১,১০৯,১৮৫
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশচিকিৎসা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৪৮,১৫০,২০৭,৩১১,
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা (কবিরাজী)	শরচ্চন্দ্র নিয়োগী	৫১,১৫৭,৩৮৪
পদ্য মেটিরিয়া-মেডিকা (হোমিওপ্যাথিক)	ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার	৩২,১৫৩
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজ্য ও ভোজন (ডাক্তারী)	ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি, ...	৭৫,১৩৩
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত	৮৫,১৫৫,৩৮২

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ঘৃতপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৮৫
শিশুগণের যকৃতের বিলিয়ারী সিরোসিস্ (এলোপ্যাথি)	ডাক্তার প্রাণধন বসু এম্, বি ...	৮৬,১৮৩
চিকিৎসাবলী (হোমিওপ্যাথি মতে)	ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল, এম্, এস্ ...	৯০
ওলাউঠা নিবারণের উপায়	ডাক্তার হরিদাস চক্রবর্ত্তী	৯২
গৃহচিকিৎসা	উদ্ধৃত ...	৯৫,৩৪০
হিক্কারোগে দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	সম্পাদক	৯৯
নিদারুণ শোকসংবাদ	ঐ	১০০
আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা	ঐ	১০৬
মূলে ভুল কি প্রকারে বলি?	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	১১৩,১৮৯,৩১৯
চিকিৎসিত-রোগীর বিবরণ (বহু মূত্ররোগে আফিংয়ের অসাধারণ ক্ষমতা)	সম্পাদক	১২৮,১৯৮
চিকিৎসিতরোগ বিবরণ (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি	১৩২
অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় আরোগ্য সংবাদ	বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এ, জমীদার ...	১৪১
চিকিৎসকের ভ্রম (ডাক্তারী)	ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্, এস্	১৪৪
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	উদ্ধৃত ...	১৬২
কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার	সম্পাদক	১৬৭
পুত্রশোকে	সম্পাদক ঐ	১৭২
রায় যতীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসা-সম্মিলনী	ঐ	১৭৭
মৃগনাভি মৃতশরীরে জীবনদান করে	ঐ	১৭৮
ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে	ঐ	১৯১,৩২৪
কবিরাজ-ডাক্তারসংবাদ	কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি	১৯৩
হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক	ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮৯
এজমা বা শ্বাসরোগ (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি	২০৩
চিকিৎসিত রোগবিবরণ (হোমিওপ্যাথি)	ডাক্তার ডি, এন্, রায় এম্, ডি	২০৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
নূতন ঔষধ (এলোপ্যাথি)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি	২১১,৩৫৭
চিকিৎসা-সম্বাদ (কবিরাজী)	কবিরাজ কিরণচন্দ্র গুপ্ত	২১৫
দেশীয় ঔষধ	ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার	২২১
উত্তাপহারক ঔষধ (এলোপ্যাথি)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি	২২৫
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	সম্পাদক ...	২২৮
প্রাপ্তি-স্বীকার	ঐ ...	২২৯
বদ্দিমতে কি জোলাপের ওষুধ আছে?	সম্পাদক	২৯৮
হিক্কারোগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধের সহিত দেশীয় শুঁঠ পিপুলের তুলনা	সম্পাদক	৩০২
বুঝিবার ভুল (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,	৩১৫
তোকমারী	ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ এম্, বি,	৩৩৩
চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ (ডাক্তারী)	ডাক্তার রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৩৩৭
ক্যাটালেপ্সি (ভাবলাগা)	... ...	৩৪৩
বৈদ্যক ঔষধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা	কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৩৫৩
চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ (হোমিওপ্যাথি)	ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি ...	৩৫৫
প্রতিবাদ	ডাক্তার শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৫৭
মৃতবৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জীবন-রক্ষার উপায় (উদ্ধৃত)		৩৬৪
প্রসবান্তে শোণিত-স্রাবের কারণ ও চিকিৎসা	ঐ	৩৬৪
হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধের গুণ	ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৬৭
চিকিৎসা-ব্যবসায় (ডাক্তারী)	ডাক্তার নীলরতন সরকার এম্,এ,এম্, ডি	৩৮০
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	সম্পাদক ...	৩৮৬
প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার	৩৮৭
পদ্যপাঁচন	ঐ	৩৯০

৮ম বৎসর। বৈশাখ। ১ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

৮ম খণ্ড, ১২৯৮ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্তরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল্. এম্, এস্। কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় এল্, এম্, এস্, এফ, সি, ইউ। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। বাবু নলিনীনাথ মজুমদার। শ্রী———এবং সম্পাদক।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্ ৫নং, জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্রালয়ে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১৯১৮।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

[৮ম খণ্ড, বৈশাখ ১ম সংখ্যা, ১২৯৮ সাল।]

সূচীপত্র।

বিষয়				পৃষ্ঠা
গতবর্ষ	...	...	...	১
দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মানবশত্রু—স্ত্রী			...	৩
বাঙ্গলাদেশে স্বাস্থ্য (ডাক্তারী)			...	৯
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী (কবিরাজী)				১৩
হোমিওপ্যাথি ঔষধতত্ত্ব	...	...		১৫
ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ	...	...		১৬
ধাতুব্যাখ্যা (কবিরাজী)	...	...		২০
রোগনিদান (ডাক্তারী)	...	...		২২
পিপাসার চিকিৎসা (ডাক্তারী)		...		২৫
মুষ্টিযোগ ঔষধ (কবিরাজী)		...		২৮
ঐ উদ্ধৃত ঐ	...	...		৩০
অবলাবান্ধব কবিরাজী	...	...		৩২
আমাদের কথা (সম্পাদকীয়)		...		অতিরিক্তপত্রে

গতবর্ষ।

গমনশীল জগতের কিছুই চিরকাল সমভাবে, সমতেজে, সমগর্ব্বে ও সমান আস্পর্দ্ধায় কখনই প্রবাহিত হয় না। অনন্তকালের অনন্তপ্রভাবে অনন্তজীব-পুঞ্জের গতি নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তনশীল। যিনি আজ্ মখমল-বিনির্ম্মিত-দুগ্ধফেন-নিভ-শয্যায় শয়ান ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান-বিরহিত হইয়া অহোরহ আহ্লাদে গদ্গদ থাকিয়া দিনযাপন করিতেছেন;—দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার নাম কি, যিনি কখন স্মৃতিপথে আনিতেও অবসর প্রাপ্ত হন্ নাই;—কিন্তু কালমাহাত্ম্যে অনতিবিলম্বেই দেখ, তিনিই আজ্ সামান্য গৃহস্থের ন্যায় অতি অকিঞ্চনভাবে পর্ণকুটীরে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া অতিকষ্টে যারপর নাই দুঃখে কালযাপন করিতেছেন! অবস্থায় পড়িয়া এখন তিনি আর সে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর ন্যায় আত্মজ্ঞান বিরহিত নহেন, এখন তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বতোমুখী, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা এখন তাঁহার চিরসহচরী। বস্তুতঃ এজগতে পার্থিব যে কোনও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য কর না কেন, সেই খানেই সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধভাব পরি-লক্ষিত হইবেই হইবে। কেননা যেখানে উন্নতি সেই খানেই অবনতি, যেখানে সংযোগ সেই খানেই বিয়োগ, যেখানে দিবা সেই খানেই রাত্রি, যেখানে বৃদ্ধি সেই খানেই ক্ষয়, যেখানে সুখ সেই খানেই দুঃখ, যেখানে জন্ম সেই খানেই মৃত্যু, যেখানে তীর্থ সেই খানেই পূর্ণমাত্রায় ভণ্ডতা, যেখানে ছায়া সেই খানেই আতপ, যেখানে উচ্চতা সেই খানেই পতন, যেখানে অমৃত সেই খানেই হলাহল, যেখানে ধন সেই খানেই দারিদ্র্য, যেখানে বিদ্যা সেই খানেই অবিনয়, যেখানে পাণ্ডিত্য সেই খানেই নাস্তিকতা, যেখানে সমাগম সেই খানেই অপগম, ফলতঃ যেখানেই পূর্ণমাত্রায় গর্ব্ব, পূর্ণমাত্রায় আস্পর্দ্ধা, সেই খানেই অচিরাৎ পূর্ণমাত্রায় অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবেই পড়িবে। বস্তুতঃ অতি শব্দটাই জগতের অনর্থের মূল। কবিগণও সেই জন্য ভূয়োভূয়ো বলিয়াছেন যে, অতিশয়ই সর্ব্বনাশের মূলভিত্তি।

অতিশয়ই যে সর্ব্বনাশের মূলভিত্তি, অতি গর্ব্বেই যে পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য আর অন্যত্র যাইতে হইবে না। কেননা ইহার জাজ্বল্যপ্রমাণ আমরাই প্রত্যক্ষ করিলাম, আমরাই প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল হইলাম। যেহেতু আমরা গত বৎসর চিকিৎসা-সম্মিলনীর বর্ষ সমালোচনাবিষয়ে যেরূপ অসীম গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম, যেরূপ আস্পর্দ্ধা দেখাইয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণ এখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বড়ই দম্ভের সহিত বড়ই দর্পপূর্ব্বক লিখিয়াছিলাম যে, "চিকিৎসা-সম্মিলনী সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা কেবল আনন্দের কথা নয়, বিশেষ সৌভাগ্যের এবং কতকটা আশ্চর্য্যের কথাও বটে। কেননা যে দেশে বঙ্গদর্শন অদর্শন হইল;—প্রচার যেখানে অপ্রচার হইয়া গেল;—নবজীবন যেখানে নবযৌবনেই মুশড়াইয়া পড়িল;—আর্য্যদর্শন যেখানে আর্য্যসন্তানের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না;—আর বান্ধব প্রকৃত বন্ধুর অভাবে যেখানে হাবুডুবু খাইল ইত্যাদি ইত্যাদি" সগর্ব্ব ও সদম্ভ-পূর্ণ বাক্য গুলি যেন এখনও পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণকূহরে অবস্থিতি করিয়া এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছে। এবং সেই জন্যই বুঝি বা দর্পহারী ভগবান্ এবর্ষে আমাদের সেই গর্ব্ব, সেই আস্পর্দ্ধা সেই পরিমাণেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন!

নচেৎ প্রকৃতপক্ষে যদি তাহাই না হইবে, তবে বৈশাখের সম্মিলনী এই নিতান্ত অসময় আশ্বিনে বাহির করিয়া আজ্ আমাদিগকে এতদূর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে কেন?

কিন্তু যেখানে অনুতাপ সেই খানেই প্রায়শ্চিত্ত, যেখানে পাপ সেই খানেই পুণ্য, যেখানে অভাব সেই খানেই সদ্ভাব, যেখানে নম্রতা সেই খানেই উচ্চতা; ইহাই জগতের সার্ব্বকালিক নিয়ম, কোন কালেও ইহার ব্যভিচার নাই। মানুষ যতক্ষণ আত্মহারা হইয়া আত্মদোষ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়, ততক্ষণই তাহার সকল দিকে বিশৃঙ্খলতা থাকে, কিন্তু যেমন সে আপনার দোষ বুঝিতে পারে, যেমন সে নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে আরম্ভ করে, অমনি দেখিবে, তাহার আর ধ্বংস নাই, আর কোন বিশৃঙ্খলতাই নাই, তখন তাহার চারিদিকেই আবার সুশৃঙ্খলতার নির্ম্মল জ্যোতি বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেইরূপ আমরাও যে আমাদের বুদ্ধিদোষেই আজ এত বিষম সঙ্কটে

পড়িয়াছি, নিজের ওজন ঠিক্ করিতে না পারিয়াই যে আজ্ এত হাবুডুবু খাইতেছি, সে কথা আর সুবিজ্ঞ পাঠককে অধিক করিয়া বুঝাইতে চাহি না, কিন্তু কেবল কি আমাদেরই আজ্ বুদ্ধিবিভ্রংশ ঘটিয়াছে, কেবল আমরাই কি নিজের ওজন ভুলিয়া গিয়া, অহরহ জর্জ্জরিত হইতেছি, তা ত নয়; এই বিশাল ভারতবর্ষের কোটী কোটী মনুষ্যের মধ্যে যাহার দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করি, যাহারই বিষয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখি, তা তিনি রাজাই হউন, আর মহারাজাই হউন, মাষ্টারই হউন, আর পণ্ডিত হউক, ধনীই হউন, আর নির্ধনই হউন, সকলকেই প্রায় আমাদেরই এই দলভুক্ত দেখিতে পাই। ফলতঃ যাহারই ভিতরের খবর লইবে, লইলেই বেশ বুঝিবে যে, বাহিরটা দিব্য চাকচক্যশালী হইলেও ভিতরে কিন্তু নিদারুণ অশান্তির আগুণ ধক্ ধক্ করিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে, আর গৃহস্থ সেই আগুণের তাপে ক্রমশঃ খাক্ হইয়া, পড়িতেছে। অথবা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণীর পক্ষে আর বিশাল ভারতের কোন কথা না তোলাই ভাল, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহিনা, তবে বলি সেই গতবর্ষের কথা।

কিন্তু তাহার সম্বন্ধেই বা আর কোন্ লজ্জায় কথা তুলিব? কেননা সে যে বৈশাখের কথা, বৈশাখের কথা আজ্ আশ্বিনে তুলিলে লোকে যে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। অতএব গতবর্ষ-কথাও আর কিছু তুলিব না। সুতরাং আর কোন কথাই না তুলিয়া সম্মিলনীর কল্যাণ-প্রিয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া এবং সম্মিলনীর সৃষ্টিকর্ত্তা রায় যতীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া আবার আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কেননা রায় যতীন্দ্রনাথের প্রসাদেই সম্মিলনীর জন্ম, তাঁহার আশ্বাসেই এখনও ইহার স্থিতি এবং তাঁহার একমাত্র ভরসাতেই আমরা এখনও সম্পূর্ণ আশান্বিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনীর গতবর্ষের কথাও এই খানেই সমাপ্ত। সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
মানবশত্রু—স্ত্রী।

ঘরের হউক, আর বাহিরের হউক, স্ত্রীই হউন, আর উপস্ত্রীই হউন, অল্প-বিস্তরভাবে স্ত্রীজাতি প্রকৃতপক্ষেই মনুষ্যজাতির যে কতদূর ঘোর শত্রু, ইতিপূর্ব্বে আমরা কেবল তাহার আভাসমাত্র দিয়াছি। পক্ষান্তরে এহেন পরম শত্রু

স্ত্রীজাতিও যে স্থল বা অবস্থাবিশেষে আবার কিরূপ অকৃত্রিম ও অসাধারণ মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছুমাত্রই বলি নাই এবং এখন বলিবও না। কেন না সুখের পর দুঃখ, মানের পর অপমান, ও স্বর্গের পর নরক যথার্থই অসহ্য। সুতরাং যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তবে দেবতা-রূপিণী স্ত্রীজাতিকে প্রথমে স্বর্গের সোপানে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ আবার রাক্ষসীরূপে নরকে লইয়া গেলে তাঁহারা ভাবিবেন কি এবং লোকেই বা বলিবে কি? তাই আমরা অগ্রে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে নরকের সেই বিভীষিকাময় অবস্থাগুলির যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া পরে স্বর্গীয় অতুলনীয় আনন্দোচ্ছ্বাসের বিষয়ও অবশ্যই যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব।

কবি হউন, গায়ক হউন, যাত্রাওয়ালা হউন, পাঁচালীওয়ালা হউন, ভাবুক হউন আর রসিক হউন, বিলাতের কবিই বল, আমেরিকার কবিই বল, যিনিই কবিত্ব লিখিতে কলম ধরিয়াছেন, যে ভাবুকই প্রাণে ভাব আনিয়াছেন, দেখিবে প্রায় তাহার অধিকাংশস্থলই এই স্ত্রীচরিত্র লইয়া। রসিকের নিকট খবর লও—তিনি বলিবেন স্ত্রীজাতিই মানবমণ্ডলীর নিকট একমাত্র শান্তি-দাতা। ভাবুককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন স্ত্রীচরিত্রের বিষয় যিনি ভাবিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন যে, ভগবান্ কি উপাদানে স্ত্রীচরিত্রের গঠন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন যে উঃ কামিনীকাঞ্চন! বড়ই ভয়ানক জিনিষ। এইরূপে যাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, যাঁহার নিকট খবর লও, তিনিই স্ত্রীজাতিকে হয় স্বর্গে তুলিয়া দিবেন, নয় ত গভীর নরকে ডুবাইবেন।

সুতরাং স্ত্রীজাতি-বিষয়ক এই স্বর্গনরক, এই আকাশপাতাল পার্থক্য-সম্বন্ধে একটা চিন্তা করিবার জিনিষ বটে, চিন্তা করিবার যোগ্য বলিয়াই লিখিবারও বিশেষরূপ যোগ্য। লিখিবার যোগ্য বলিয়াই ভাবুক রসিক কবি গায়ক সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লিখিয়া গাহিয়া গিয়াছেন। এবং সেই দেখাদেখি আমরাও গাহিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে কি করিব, আমাদের গলা নাই, আমাদের সুরবোধও নাই; নাই থাকুক, অপরের ত আছে, অতএব দেখি ভারতের কবি-কুল-শিরোমণী পরম সন্ন্যাসী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কি গান গাহিয়াছেন—

শিষ্য, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো!

দ্বারং কিমেতন্নরকস্য ?

অর্থাৎ মনুষ্যের সম্বন্ধে নরকে যাওয়ার পক্ষে কোন্ পথ অধিক প্রশস্ত? গুরুদেব, শিষ্যবাক্যে গভীর চিন্তা করিয়া এই পাপসঙ্কুল পৃথিবীর রাশি রাশি পাপপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আর কোনটীই বাছিয়া না পাইয়া দেখিলেন যে, নারীজাতিই নরকের যথার্থ পথ। অই উত্তর বলিলেন—

নারী।

শিষ্য বলিলেন বলুন দেখি গুরুদেব, মদ্যপানদ্বারা যেমন মনুষ্য শীঘ্রই মোহপ্রাপ্ত অর্থাৎ অজ্ঞান হয়, সেইরূপ জগতে এমন কোন্ দ্রব্যদ্বারা মনুষ্য মোহপ্রাপ্ত হইতে পারে?

সংমোহয়ত্যেক সুরেব কা ?

গুরুদেব দেখিলেন যে, ধন বল আর রত্নই বল, গাড়ী বল, যুড়ীই বল, সন্দেশ বল, আর রসগোল্লাই বল, পোলোয়াই হউক আর কালিয়াই হউক, স্ত্রী-জাতি লইয়া মানুষ যেমন অজ্ঞান হয়, এমনটী আর কিছুতেই নহে। তাই তিনি শিষ্যকে অতি ধীরভাবে বলিলেন—

স্ত্রী।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতিই মদ্যের ন্যায় মনুষ্যকে অচিরাৎ মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য কহিলেন গুরুদেব! বলুন দেখি, এ জগতে দুই চক্ষুহীন অন্ধ অপেক্ষা চক্ষু দ্বয় থাকিতেও কোন্ ব্যক্তি অন্ধ? অর্থাৎ চক্ষের মাথা একবারে খাইয়া বসেন?

কোঽন্ধাস্মহান্ধঃ ?

গুরুদেব বিনা বিচারে দিব্যচক্ষেই দেখিলেন যে, মস্তকে সহস্রবার বজ্র-পতনেও যদি মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকিতে পারে, কিন্তু মদনাতুর অর্থাৎ কামশর-পীড়িত ব্যক্তির কখনই দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত থাকিতেই পারে না। (কর্ণের শক্তিটীও যে কতদূর ঠিক্ থাকে, তাহাও গুরুদেবের একবার চিন্তা করা উচিত ছিল) তাই তিনি শিষ্যকে বলিলেন—

মদনাতুরো যঃ।

অর্থাৎ মদনাতুর ব্যক্তিই এ জগতে অন্ধের অপেক্ষাও মহান্ধ।

এত শুনিয়াও কিন্তু শিষ্য ক্ষান্ত হইলেন না, তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব! বলুন দেখি এ সংসারে কোন্ বস্তু হেয় (পরিত্যাগের যোগ্য) অর্থাৎ কোন্ বস্তু পরিত্যাগ করিলে আর কোনরূপ ক্লেশেরই আশঙ্কা থাকে না? অপিচ যথার্থই সুখী থাকা যাইতে পারে?

কিমত্র হেয়ং ?

গুরুদেব দেখিলেন যে, অবোধ মানুষ, উপবীতই (পৈতা) ছাড়ুক, আর পিতামাতাই পরিত্যাগ করুক, গ্রাম ছাড়ুক, আর সহরই ছাড়ুক, কিন্তু কামিনীকাঞ্চন আগে ছাড়িতে না পারিলে কোনমতেই সে স্বর্গীয় বিমল আনন্দভোগে সমর্থ হইতে পারে না। তাই তিনি শিষ্যকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন বৎস্য! কনক (অর্থাদি) ও কান্তাই (স্ত্রী, তা ঘরেরই হউক আর বাহিরের ত কথাই নাই) সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগের যোগ্য। যেহেতু ইহা অতি জলন্ত সত্য কথা, ইহা প্রকৃতই সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, সংসারে যতকিছু ঐহিক ও পারত্রিক কষ্ট, এই অর্থ ও স্ত্রীই প্রায় তৎসমুদায়ের মূলকারণ। (কেমন নয় কি ?) তাই শিষ্যকে বলিলেন—

কনকঞ্চ কান্তা।

নাছোড়বান্দা শিষ্য তথাপি ছাড়িবার নহেন। (আর এমন মজার অথচ সম্পূর্ণ সত্য কথা শুনিতে শুনিতে কেই বা ছাড়িতে পারে ?) তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব! বলুন দেখি, মহাপরাক্রান্ত বীর হইতেও এ জগতে শ্রেষ্ঠবলশালী বীর কে ?

শূরান্মহাশূরতমোঽস্তি কোবা ?

গুরু দেখিলেন যে, ভীমের ন্যায় বলশালীই হউন, আর অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্তই হউন, কিন্তু স্ত্রীজাতির নিকট সকলেই দুর্ব্বল ; কেবল দুর্ব্বল কেন, যেন জীর্ণ শীর্ণ কতকালের রোগীবিশেষ, তাই তিনি শিষ্যকে বুঝাইলেন যে—

মনোজবাণৈর্ব্যথিতো ন যস্তুঃ।

অর্থাৎ এ জগতে যিনি কখনই কামদেবের শরে ব্যথিত না হন্, তিনিই যথার্থ বীরাগ্র-গণ্য। (কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় কি ?)

আবার শিষ্য জিজ্ঞাসিলেন বলুন দেখি গুরুদেব, বলুন দেখি এ জগতে যথার্থই বুদ্ধিমান্, অতিশয় ধীর ও প্রকৃতশান্ত কোন্ ব্যক্তি ?

প্রাজ্ঞোঽতিধীরশ্চ শমোঽস্তি কো বা ?

গুরুদেব অতি সহজেই সহাস্যে উত্তর করিলেন যে, যে ব্যক্তি জীবনে কখনও ললনা-কটাক্ষদ্বারা মোহ প্রাপ্ত বা বিচলিত হন্ নাই, তিনিই জগতে যথার্থ বিজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত ধীর এবং তিনি সত্যসত্যই প্রকৃতশান্ত।

প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ।

শিষ্য বলিলেন গুরুদেব, এ সংসারে বিজ্ঞ অপেক্ষাও মহাবিজ্ঞতম কোন্ ব্যক্তি ? তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা ?

এবারে গুরুদেব ক্রোধভরে উত্তর করিলেন যে, বৎস্য! বলিব কি, যে ব্যক্তি কখনও রাক্ষসী নারী কর্ত্তৃক বঞ্চিত না হইয়াছেন, তিনিই এসংসারে প্রকৃত বিজ্ঞ, তিনিই এ জগতে যথার্থ বুদ্ধিমান্ মনুষ্য।

নার্য্যা পিশাচ্যা নহি বঞ্চিতো যঃ।

শিষ্য কহিলেন গুরুদেব, যদি এতই কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এত উপদেশ দিলেন, তবে দয়া করিয়া বলুন দেখি, এ জগতের কোন্ বিষয় লোকে সহস্রচেষ্টা করিয়া সহস্র যত্ন লইয়াও নানাবিধ উপায়ে কোন মতেই কোন প্রকারেই ঠিক্ বুঝিতে পারে না।

জ্ঞাতুং ন শক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈঃ ?

এবারে গুরুদেব, বড়ই গোলযোগে পড়িয়া অনেক ভাবনা চিন্তার পর বহু কষ্টে বুঝিলেন যে, ভারতে বসিয়া বুদ্ধিশক্তিতে ইংলণ্ডের রাজান্তঃপুরের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হওয়াও যত অধিক অসম্ভব না হয়, তুরুস্কের লোকের যদি জ্ঞানবলে সমগ্র চীনদেশের প্রত্যেক গৃহস্থের হাঁড়ীর খবর জানাও যদি অসঙ্গত না হয়, তথাপি স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ এবং তাহাদের চরিত্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে এমন সাধ্য কার আছে ? তাই তিনি অতি বিবেচনায় ধীরভাবে বলিলেন বৎস্য!

যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্।

অর্থাৎ নারীগণের অন্তঃকরণ ও চরিত্রই এ জগতে সম্যক্ দুর্জ্ঞেয় (সামান্য মনুষ্যের কথা কি বলিব, দেবতারাও জানেন না, তবে যিনি বলেন আমিই ঠিক্ নারী চরিত্র বুঝি, আমরা বলি যে, তিনি নিশ্চয়ই মূর্খাধম।)

শিষ্য বলিলেন গুরুদেব, এ সংসারে কাহাকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না ?

বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি ?

গুরু বলিলেন—

নারী।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতিকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না (তবে যিনি স্ত্রীজাতির যে সে কথায় বিশ্বাস করিয়া একবারেই নাচিয়া ওঠেন, তিনি মানুষ ত কখনই নন্, তবে অবশ্য পশুর অধম বটে!)

শিষ্য, বলুন দেখি প্রভু, এ জগতে কি পরিত্যাগ করিলে সম্যক্ সুখী হওয়া যায়?

ত্যক্ত্বা সুখং কিং?

গুরু—

স্ত্রীয়মেব সম্যক্।

অর্থাৎ সম্যক্প্রকারে স্ত্রী ত্যাগই প্রকৃত সুখের কারণ। (স্ত্রীখোর মহাত্মাদের নিকট এ কথাটা বড়ই বিষবোধ হইবে, কোনপ্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন, করিলেই বিশ্বাস করিতেই হইবে, বিষের বদলে অমৃত বলিয়া ধারণা করিতেই হইবে।)

শিষ্য বলিলেন গুরুদেব! প্রকৃতপক্ষে এ জগতে বিষ অথচ আপাততঃ অমৃতের ন্যায় কোন্ বস্তু প্রকাশ পায়?

কিং তদ্বিষং ভাতি সুধোপমং?

গুরু বলিলেন—

স্ত্রী।

অর্থাৎ স্ত্রীজাতিই আপাততঃ অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা হলাহল সদৃশ।

অবশেষে শিষ্য বলিলেন প্রভো! এ জগতে সর্ব্বপ্রাণীর নিকটেই দুর্জ্জয় কে? অর্থাৎ কাহাকে মনুষ্য কোনমতেই জয় করিতে পারে না?

কিং দুর্জ্জয়ং সর্ব্বজনৈঃ?

গুরু—

মনোজঃ।

অর্থাৎ মনোজ কামদেবই সকলের নিকট অজেয়। (সকলের নিকট না হউক, কিন্তু অনেকেরই নিকট যে অজেয়, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।)

জ্ঞানবান্ পাঠক, যোগবিৎ শঙ্করাচার্য্যের কথাগুলি শুনিলেন, এখন এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই ক্রমশঃ বলিব এবং দেখাইব যে, তাঁহার লিখিত বাক্যের একটীমাত্র অক্ষরও মিথ্যা নহে। ক্রমশঃ—

শ্রী——

বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্য।

(ডাক্তারীমতে।)

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম খণ্ডের পর।

প্রথম জেম্‌সের রাজত্বের সময়ে ইংলণ্ডে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ছিল। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে কেনট, ইসেক্‌স, নরফোক, ক্যাম্‌ব্রিজ সায়ার এবং নিকলন সায়ার জিলাতে অনেক জলাভূমি ও বিল ছিল। ঐ সকল জলাভূমি বৎসর বৎসর জলপ্লাবিত হইত। ঐ সকল নিম্ন ভূমির চতুর্দ্দিকে যে সকল জনপদ ছিল, ঐ সকল জনপদে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইত। তখন আমাদিগের দেশের ন্যায় ইংলণ্ডে পেটজোড়া প্লীহাগ্রস্ত অনেক রোগী দৃষ্টিগোচর হইত, তারপর ঐ সকল জলাভূমি ভরাট করিয়া ক্রমে আবাদ করাতে ইংলণ্ড হইতে একবারেই ম্যালেরিয়া জ্বর বিতাড়িত হইয়াছে। ডাক্তার ওয়াট্‌সনের সময় হইতে এক ১৮২৭ সাল ব্যতীত ইংলণ্ডে আর বড় একটা ম্যালেরিয়া জ্বর হয় নাই। এখন ঐ দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর অত্যন্ত বিরল; কেবল দুই একটী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রোগীরও আবার অনেকে বিদেশ হইতে ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া আইসে। এই এক ইংলণ্ডের পূর্ব্ব ও অধুনাতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই জলন্ত সত্যটী জানিতে পারি যে, নিম্ন ও জলাসক্ত ভূমিই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ; এবং ভূমি উচ্চ ও শুষ্ক করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নিবারণ করিতে পারা যায়।

কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশ হইতে এই জ্বর দূরীভূত করা যেমন সহজ হইয়াছে, এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়ান ততটা সহজ নহে। ইংলণ্ড ক্ষুদ্রদেশ ও উহার অধিকাংশই উচ্চভূমি; তথায় দুই দশটী ক্ষুদ্র আয়তনের জলাভূমি ছিল; সে গুলি ভরাট করাও সহজ হইয়াছিল। কিন্তু এই বাঙ্গালাদেশের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, এই দেশ আয়তনে অত্যন্ত বৃহৎ এবং ইহার অধিকাংশই নিম্নভূমি।

এদেশে জলা ও বিল অসংখ্য। বর্ষাকালে নিম্ন বঙ্গের প্রায় অধিকাংশই

জলপ্লাবিত হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরবর্ত্তী প্রায় শত মাইল ব্যাপিয়া ভূমি জলপ্লাবিত হয়। ঐ জল প্রায় চারিমাস কাল স্থায়ী থাকে। পরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমির জল নামিয়া গেলে নিম্নভূমিতেও বিলের ন্যায় প্রায় বারমাস জল আবদ্ধ থাকে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিতে জোয়ার-ভাটা খেলিয়া থাকে। যে সকল ভূমিতে জোয়ারের সময় জল উঠে এবং ভাটার সময় জল নামিয়া যায়, সে সকল স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। অতএব ভাবিয়া দেখিতে গেলে সমগ্র নিম্ন বঙ্গ একটী প্রকাণ্ড জলাভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে এদেশের যে দিকে দৃষ্টি করিবে, কেবল ধান ও পাটের আবাদযুক্ত জলাভূমি বই আর কিছুই নয়নগোচর হইবে না। এই সকল জলাভূমি বেষ্টিত অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে স্থাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গুলি বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মধ্যে জল ও কর্দ্দম যথেষ্ট। বর্ষাকালে পল্লিগ্রাম গুলি যেন নরকবিশেষ হইয়া উঠে। তারপর বর্ষার শেষ হইয়া শরতের প্রচণ্ড রৌদ্রে এই সকল ধান্যক্ষেত্র ও জলাভূমি শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, আর জ্বর ও তৎসহচর উদরাময় শোথবাত প্রভৃতি আসিয়া মহামারী বিস্তার করে। আবার বঙ্গের অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি ত্যাগ করিয়া বর্ষাকালে পদ্মার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে পল্লিগ্রাম গুলির যেরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সহরবাসী বিলাসী লোকের মনে ধারণাই হয় না। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলা গুলির গ্রাম সকল একবারে জলে জলময় হইয়া উঠে, ঐ জল নামিয়া ভূমি শুষ্ক হইবার সময় ভয়ানক মারী-ভয় উপস্থিত হয়। যাঁহারা সহর ছাড়িয়া পল্লিগ্রাম অঞ্চলে কখনও ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহারা সারডব্লিউ হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাষ্টিক্যাল্ একৌণ্ট অব্-বেঙ্গল নামক গ্রন্থে ফরিদপুর জিলার বিবরণ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, বঙ্গের প্রধান নদী পদ্মার ধারে বাস করিলে বর্ষাকালে লোকের কিরূপ দুর্গতি হইতে পারে; ঐ জেলার অধিকাংশই পদ্মার তীরস্থিত। উহার সমস্তই জলা ও নিম্নভূমি, বৎসর বৎসর পদ্মানদীর ভাঙ্গনে পুরাতন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং নূতন নূতন গ্রাম সকল সৃষ্ট হইতেছে। পদ্মা যেমন সরিয়া যাইতেছে, অমনি ছোট ছোট খাঁড়ি ও বিল রাখিয়া যাইতেছে। ফরিদপুর জেলায় এইরূপ অসংখ্য খাল ও বিল দেখা যায়। এই সকল খাল ও বিলের ধারে ধারে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গোলাকার ভাবে গ্রাম গুলি সাজান। বর্ষাকালে

এই সকল খাল ও বিল জলপূর্ণ হয় এবং গ্রাম সকল প্লাবিত করে। এই জল বহু দিন পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে থাকে। বর্ষাকালে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় নৌকা ও ডোঙ্গা ভিন্ন যাইবার উপায় নাই। ফরিদপুর জেলার কোতখালি পাড়া থানার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের সীমায় বৃহৎ নিম্নভূমিতে অনেক চণ্ডালজাতি ১০।১৫ হাত উচ্চ ঢিবি তৈয়ার করিয়া বাস করে। তাহারা বর্ষাকালে যেমন জলসুখ ভোগ করে; গ্রীষ্মকালে তেমনি জল অভাবে হাহাকার করে। অনেকে নাকি পিপাসায় প্রাণত্যাগ করে।

এই ত বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশই ভূমির অবস্থা। আবার ইহাতে বলা উচিত, যে এইরূপ বৎসর বৎসর জলপ্লাবনই বাঙ্গলাদেশের ভূমি এতদূর উচ্চ হইয়াছে। এই জলপ্লাবনেই বাঙ্গালাদেশের লক্ষ্মীর আবাসভূমি করিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ধান্য এই জলাভূমি ভিন্ন ভালরূপে জন্মায় না। যে পাটের ব্যাবসার এত উন্নতি হইয়া বাঙ্গলার ধনবৃদ্ধি হইতেছে, সেই পাট জলাভূমি ভিন্ন সমগ্র আবাদ হয় না। এইরূপ বৎসর বৎসর জলপ্লাবনই বঙ্গ-দেশকে ধনধান্য শস্যপূর্ণ করিয়াছে। একবৎসর বন্যা কম হইলে বা বৃষ্টি না হইলে সমস্ত বাঙ্গলাদেশে হাহাকার পড়িয়া যায়।

যদি জলসিক্ত নিম্নভূমিই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ হয়, তাহা হইলে এই জল জঙ্গল ও জলাপূর্ণ বাঙ্গালাদেশের সমগ্র স্থান হইতে জল নিকাসের ব্যবস্থা করিয়া মহামারী বিদূরিত করা একরূপ অসাধ্য। দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী প্রচুর ধন সম্পন্ন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টও পারেন কি না সন্দেহ। এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানকৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা বাঙ্গাদেশ ম্যালেরিয়াশূন্য করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত তাঁহার Oregein of ceveiizeshis in England. নামক গ্রন্থে এক স্থলে বলিয়াছেন যে, জলপ্লাবন ও ভূমির অত্যধিক উর্ব্বরতা সভ্যতাবিস্তারের ঘোর প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ঐরূপ স্থান স্বাস্থ্যকর ও মনুষ্যের বাসোপযোগী করা অতি দুরূহ। আমেরিকায় আমেজন নামক বৃহৎ নদীর উভয়কুলবর্ত্তী স্থান সকল কেবল জল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ সকল জঙ্গল কাটিয়া দিলে অল্পকালমধ্যে পুনরায় নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়। আমা-দিগের বাঙ্গালাদেশ যদিও সভ্য মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে; কিন্তু স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে ইহা এখনও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের বাসোপযোগী হয় নাই। অন্ততঃ বাঙ্গলার অনেক স্থানসম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে

পারে। বাঙ্গলায় সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে লোকালয় মাত্র নাই। তথায় নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি এই সুন্দরবন ভূমির ন্যায়। কোন স্থানে কিছুদিন পর্য্যন্ত অনাবাদি রাখিয়া দিলেই সেই স্থান কয়েক বৎসর মধ্যে বৃহৎ জঙ্গলে পরিণত হয়। এইরূপ দেশে মনুষ্যের আবাস ও কৃষিকার্য্যের বিস্তার হইলে ত জলা-ভূমিসম্ভূত জ্বরের হ্রাস হইতে পায় নাই, কলিকাতা অঞ্চলের ভূমি এই ধরণের; যদিও অনেক চেষ্টায় কলিকাতা মহানগরী পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি পূর্ব্বের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর রহিয়াছে। এহেন কলিকাতা রাজধানীতেও বর্ষাকালে নীচের ঘরে বাস করা অসাধ্য। মাটীর ঘরের বেড়াগুলি বর্ষাকালে অর্দ্ধেক দূর পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। মেজে কর্দ্দমময়। কলিকাতার যখন এই দশা তখন কলিকাতা অঞ্চলের অন্যান্য স্থান বর্ষাকালে কিরূপ অসাস্থ্যকর হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। উচ্চবঙ্গের লোক লোনা হিজ্‌লির নাম করিলেই চম্‌কিয়া উঠে। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,।

সম্পাদকের বক্তব্য।

জলসিক্ত নিম্নভূমিই যে ম্যালেরিয়াদি রোগের নিশ্চিত কারণ, এ কথা স্বীকার করিতে পারি কৈ? যেহেতু আমাদের এমন অনেকগুলি জলসিক্ত জলাভূমিময় গ্রামের বিষয় জানা এবং স্বচক্ষে দেখা আছে যে, সে সকল স্থানে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখি নাই এবং এখন ২।৩ বৎসর হইল বরং সে সকল গ্রাম কিছু উচ্চ হইয়াছে অথচ রোগ সকল কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা সুন্দরবন অঞ্চলের আবাদ অর্থাৎ জলাভূমি সকল স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই বিলক্ষণ জানেন যে, তাদৃশ জলাভূমিতে বারমাস বাস করিয়াও ম্যালেরিয়া কাহাকে বলে তাহার নামও তাহারা জানে না, হয়ত প্লীহারোগ স্বচক্ষেও কখন দেখে নাই, সুতরাং এমতস্থলে কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ জলাভূমিতে বাসই যে ম্যালেরিয়ার কারণ, তাহা দৃঢ়রূপে কখনই বলা যাইতে পারে না। এমন কি আংশিকরূপেও বলা যায় কি না সন্দেহ। তবে অবশ্য শুষ্কস্থানের অপেক্ষা যে জলাভূমি সর্ব্বাংশেই অধিক অস্বাস্থ্যকর, তাহা নিঃসন্দেহ।

সম্পাদক।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

পাণ্ডু-কামলা-হলীমক-শোথোদরে মণ্ডূর।

নবায়স লৌহ।

নিরস্থি সংবৎসরানতীত স্থূল হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলক; পুরাতন পিপুলের দানাচূর্ণ, পরিপুষ্ট অনধিক কালোদ্ভব শুণ্ঠী ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলক, পুরাতন বিড়ঙ্গের তণ্ডুল চূর্ণ, মুস্তকচূর্ণ, চূর্ণোদকে শোধিত রক্তচিতার মূল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, এই নয়খানি দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া তৎসমান নয় তোলা মণ্ডূরচূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে, ইহাকে নবায়সলৌহ বলে।

প্রকুপিত বায়ু হৃৎপিণ্ডকে দূষিত করিয়া পাণ্ডুরোগ জন্মাইলে নবায়সলৌহ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য পাণ্ডুরোগে, কামলা এবং জলোদর পীড়ায়ও ইহার ফল প্রশংসনীয়। হৃদ্রোগ কুষ্ঠ ও অর্শঃরোগেও ব্যবহারের উপদেশ আছে। প্রমেহরোগে নবায়স লৌহ উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম দিন ২ রতি পরিমিত নবায়স লৌহ অতুল্য পরিমাণে ঘৃত মধুযোগে লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মাড়িয়া লেহন করিবে। পরে প্রতিদিন ব্যাধি ও কোষ্ঠের বলাবল বুঝিয়া ২ কি ১ রতি বৃদ্ধি করিয়া, উক্ত প্রণালীতে লেহন করাইবে। ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে রোগের আরোগ্য দর্শন যাবৎ দশরক্তিক মাত্রা স্থির রাখিবে। তদন্তর প্রতিদিন ১ রতি করিয়া কমাইয়া ২ রতি পর্য্যন্ত নামিলে ঔষধ সেবন সমাপন করিবে।

"নবায়োরজসোভাগাঃ" গ্রন্থোক্ত এই বাক্যানুসারে অনেকেই মণ্ডূর না দিয়া নয় ভাগ জারিত লৌহ দিয়া নবায়সলৌহ প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। চক্রদত্তের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নয়ভাগ মণ্ডূর চূর্ণ দিতে বলেন। তদনুসারে আমরা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি। লৌহের পরিবর্ত্তে মণ্ডূর ব্যবহারে ফলের ন্যূনতা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। কথঞ্চিৎ ন্যূনতাসত্ত্বেও ইহার ব্যবহারে অনেক সুবিধা। মৃত লৌহ অপেক্ষা মৃতমণ্ডূর অনায়াস-সাধ্য

দ্রব্য, সুতরাং অতীব সুলভ, কাজেই চিকিৎসক এই ঔষধ ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেন, হীনাবস্থাপন্ন রোগীদিগের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা।

পাণ্ডু কামলা হলীমকাধিকারে যে সমস্ত মণ্ডুর-ঘটিত যোগের বিধি আছে, তন্মধ্যে কয়েকটীর প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী প্রদর্শিত হইল। বলিয়াছি যে, মণ্ডূর-ঘটীত যোগ সমূহের মধ্যে কতকগুলি সংযোগ-সাধ্য, আর কতকগুলি পাকসাধ্য; উভয় প্রকার ঔষধের প্রস্তুত ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশিষ্ট উভয় প্রকার মণ্ডূর ঘটিত যোগনিচয়ের প্রস্তুত-প্রণালী একইরূপ; ক্রিয়া এবং প্রয়োগ-প্রণালীও প্রায় কথিত যোগসমূহের অনুরূপ। তজ্জন্য তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী বিস্তার করিয়া না লিখিয়া অবশিষ্ট গুণসম্পন্ন দুই একটী যোগের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পঞ্চাননলৌহ মণ্ডূর নামক ঔষধ পাণ্ডুশোথে এবং ঔদরিক শোথে বিশেষতঃ জলোদরে অত্যন্ত সুফল প্রদান করে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কোকিলাক্ষ অর্থাৎ ঝুলিকাশাকের পাতার রস সহযোগে ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। বাল, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে মাত্রা ।০ এক সিকি। শিশুদিগের মাত্রা ৵০ দুই আনা। এই ঔষধ সেবনকালে মাত্র দুগ্ধান্ন সেবন করা বিধেয়। জলপান পরিত্যাগ করিবে। পিপাসা উপস্থিত হইলে দুগ্ধ পান করিবে, অসহ্য পিপাসা স্থানে অল্প পরিমাণে ডাব নারিকেলের জল পান করিতে দেওয়া যায়।

ত্রিকত্রয়াদি লৌহ।

ত্রিকটু—শুঁঠ পেঁপুল এবং মরিচ; ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া, ত্রিমদ—রক্তচিতার মূল, বিড়ঙ্গের তণ্ডুল এবং মুথা; ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিমদগণোক্ত নয় খানি দ্রব্যের সাধারণ নাম ত্রিকত্রয়, ত্রিকত্রয় ভাবিত-লৌহযোগে বক্ষ্যমাণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রিকত্রয়াদি লৌহ। ত্রিকত্রয় গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশ পৌনে এগার রতি পরিমাণে ওজন করিয়া লইয়া ছাঁচিয়া লইবে। এই তোলক পরিমিত কুট্টিত কল্ক ১৬ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথের দ্বারা তোলক পরিমিত লৌহভস্ম লৌহভাজনে লৌহদণ্ডদ্বারা ভাবনা দিবে। একবার ভাবনা দিয়া ভাব্যদ্রব্য শুষ্ক হইলে বেশ গুঁড়া করিয়া

আবার উক্ত প্রকার কাথ প্রস্তুত করিয়া লইয়া পুনরপি ভাবনা দিবে। এই প্রকারে সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। তদনন্তর সেই লৌহ ভাজনে মণ্ডূর ৮ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা এবং মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। দিবাভাগে রৌদ্রে ও রাত্রিকালে শিশিরে রাখিয়া দিবে। প্রতিদিন কিছু ক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। এইরূপে ৭ সাত দিন গত হইলে ঔষধ উঠাইয়া লইয়া উপযুক্ত ভাজনে রক্ষা করিবে। এই ঔষধ শিশির ঋতুতে প্রস্তুত করা বিধেয়। ভোজনের আদি মধ্য এবং অন্তে এই ঔষধ প্রযোজ্য। প্রত্যেক বারে ।০ এক সিকিমাত্রায় গ্রহণ করিবে। বয়ঃকোষ্ঠাদি পরীক্ষা করিয়া মাত্রার ন্যূনাতিরেক করিতে হয়। পাণ্ডু কামলা এবং হলীমকরোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

মাগুরা, বারুইপাড়া। } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যাঁহারা শীতলবাবুর প্রবন্ধ বড়ই অল্প মুদ্রিত হয় বলিয়া দুঃখিত হন, আশা করি, বোধহয় এখন হইতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথি-ঔষধতত্ত্ব।

হাইড্রোকটাইল।

হাইড্রোকটাইল এসিয়াটিকা নামক শুষ্ক লতা হইতে অমিশ্র আরক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে আমাদের দেশে থুলকুড়ি বা থানকুনি বলিয়া থাকে।

অনেক প্রকার চর্ম্মরোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। পেশী সমুদাদের উপরেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া আছে।

মাথাধরা, কখন ভারি বোধ এবং কখন বা কন্‌কন্ করা, স্নায়ুশূল, মাথার পশ্চাৎদিকে বেদনা, মাথাঘোরা ও দুর্ব্বলতা, আহারে অনিচ্ছা, ক্ষুধারাহিত্য, তামাকসেবনে ঘৃণা, সর্ব্বদা উদ্গার উঠা, অম্ল উদ্গার, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভূটভাট করে, পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়, যকৃতের

উপরিভাগে বেদনা, সিরোসিস্ অফ্ লিভারে এই ঔষধে উপকার পাওয়া গিয়াছে।

মূত্রযন্ত্রের উপরে ইহার ক্রিয়া আছে। মূত্রস্থলীর স্কন্ধে উত্তেজনা ও সঙ্কোচ বোধ, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলীর প্রদাহ ও গরমবোধ, যোনিমধ্যে এবং জরায়ুতে প্রদাহ, যোনিদেশে অত্যন্ত চুলকানি প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ ফলপ্রদ।

রেতোরজ্জুতে টানিয়া ধরার মত বেদনা, বামদিকেই অধিক, অণ্ডকোষ ফুলিয়া পড়া, ধ্বজভঙ্গ, যোনিচুল্কানি ও জ্বালা এবং গরম বোধ, শ্বেতপ্রদর।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জননেন্দ্রিয়ের উপরেই ইহার ক্রিয়া আছে। চুলকানি ও জ্বালা শীঘ্রই নিবারিত হইয়া যায়। বড় চর্ম্মের উপরে গোলাকার উচ্চ স্থান দেখা যায়, উহাতে চর্ম্ম উঠিয়া যায়। এরিসিপেলসের মত লাল ও ফুলা, এরিসিনা ও প্যাপিউল্, বক্ষঃস্থলে পশ্চলা, শরীরের নানাস্থানে কণ্টক-বিদ্ধবৎ বোধ।

পূঁয়যুক্ত লিউপস হইতে আরোগ্য হইয়াছে। লিম্ফটিক টিউমার, ও কুষ্ঠরোগে ইহা ফলপ্রদ, সময়ে ব্যবহার করিলে পচন নিবারিত হয়, এলি-ফ্যাণ্টিয়াসিসও উপশমিত হয়, লোরয়েসিস্ একজিমাও ভাল হইয়াছে। চর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন ও পুরু এবং খোলস উঠিয়া যাওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা স্কোটাল টিউমারে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন কুষ্ঠরোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা দেখা যায়। স্কোটাল টিউমারে আমরা ২য় ডাইলিউসন সেবন ও অমিশ্র আরক ১ ভাগ, স্পিরিট ৯ ভাগ ও জল দশভাগ মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল্, এম্, এস্,
হোমিওপ্যাথিক্ প্রাক্টীসনার।

ক্লোরোফরম আঘ্রাণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় এল্, এম্, এস্; এফ্, সি, ইউ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৯। যদ্যপি ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করিবার সময় রোগী একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে, আবার একবার ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস লয়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, ক্লোরোফরর্মের সহিত বায়ু মিশ্রিত হয় নাই এবং ইন্‌হেলার রোগীর মুখের উপর ধরা হইয়াছে; এরূপে ক্লোরোফর্ম দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নহে। ইহাতে রক্তসঞ্চাপন একবার বৃদ্ধি হয়, আবার পরক্ষণেই কমিয়া যায়; অবশেষে ভয়ানক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া শীঘ্র শ্বাসকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। যখন ক্লোরোফর্ম দিবার সময় রোগী ভয়ানক অস্থির হয়, সেই সময় সাবধানে ক্লোরোফর্ম করিলে রোগী অতি শীঘ্র অচেতন হইয়া পড়ে।

১০। ক্লোরোফর্ম দিবার সময় রোগী নিশ্বাস বন্ধ করিলে রক্ত সঞ্চাপন কমিয়া যায়, এমন কি ক্লোরোফর্ম বন্ধ করিবার পরেও অল্পক্ষণের জন্য রক্ত সঞ্চাপন কমই থাকে, কিন্তু দুই একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলেই উহা বৃদ্ধি পায়।

১১। যদ্যপি গলদেশে কিম্বা বক্ষঃস্থলে কোনরূপ চাপ পড়িয়া শ্বাসকার্য্যের বাধা হয়, সেরূপ অবস্থায় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিলে রক্তসঞ্চাপন শীঘ্র শীঘ্র পর্য্যায়ক্রমে একবার বৃদ্ধি একবার হ্রাস হইয়া যায় এবং তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডে বিষম কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রায়ই কষ্টের সহিত গভীর নিশ্বাস লইয়া থাকে এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত সঞ্চাপন অতি শীঘ্র কমাইয়া দেয়।

১২। গ্লাসগোর ক্লোরোফর্ম কমিটীতে স্থির হইয়াছিল যে, ক্লোরোফর্মের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু আমরা হাইদ্রাবাদে দেখিয়াছি যে, রোগীর নাক মুখ চাপিয়া ক্লোরফর্ম প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র রক্ত সঞ্চাপন কমিয়া যায়, এমন কি শূন্য পইণ্টে যায় এবং সেই সময় হৃৎ-পিণ্ডের কার্য্য ক্ষণকালের নিমিত্ত নিবৃত্ত থাকে; অতএব ক্লোরোফর্মের দোষ না দিয়া প্রকৃত কারণ য়্যাস্‌ফিক্‌সিয়াহেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্য নিবৃত্তি হয় বলিলে ঠিক্ হয়।

১৩। য়্যাস্‌ফিক্‌সিয়া হেতু এই যে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য নিবৃত্তি হয়, ইহার কারণ ভেগস্ নার্ভদ্বয়ের উত্তেজনা। ইহার প্রমাণ এই যে, ঐ নার্ভদ্বয়ের উত্তেজনা করিলে যে ফল হয়, দেখা গিয়াছে তাহার সহিত ইহার কোনও

প্রভেদ নাই, আরও দেখা গিয়াছে ঐ নার্ভদ্বয় ছেদন করিলে কিম্বা এট্রোপিন প্রয়োগ করিলে উহারা একেবারে অসাড় হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়।

১৪। ভেগসের উত্তেজনা করিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য যেরূপ স্থগিত হয়, এট্রোপিনদ্বারা য়্যাস্‌ফিক্‌সিয়া উপনীত হইলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের বিষম গতি হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার কার্য্য ক্ষীণ হয় না, কিন্তু এট্রোপিন প্রয়োগের পর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলে রক্ত সঞ্চাপন কমিয়া যায়, অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের বিকৃতির কারণ বোধ হয় শ্বাস কার্য্য বন্ধ হওয়ার নিমিত্ত পল্‌মোনারী শিরা সমূহে রক্তসঞ্চাপন বৃদ্ধি হওয়াতেই হইয়া থাকে, ভেগসের উত্তেজনার নিমিত্ত নহে।

১৫। যদি ভেগসের উত্তেজনাই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের একটী প্রধান বিপদের কারণ না হয়, তাহা হইলে কিসে ঐ বিপদ (অবসাদকদ্বারায় রক্তসঞ্চাপন কম হওয়া) উপস্থিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

১৬। ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগহেতু অসাড়তা উপস্থিত হইলে সেই সময়ে ভেগসদ্বয়ের উত্তেজনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে রোগীর বিপদ বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হয়, ভেগসের উত্তেজনা বন্ধ করিলে কিম্বা ভেগস নিষ্কাম হইলে রক্তসঞ্চাপন বৃদ্ধি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্য নিরস্ত থাকে না। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বিলম্বে হইলে এবং যে কোন কারণে হউক না কেন, ভেগসের উত্তেজনা হইলে তাহাতে যেরূপে রক্তসঞ্চালন হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ক্লোরোফর্ম্ম রক্তের সহিত অল্পপরিমাণে মিশ্রিত হয়; তন্নিমিত্ত স্নায়ুকেন্দ্র সমূহেও অল্পপরিমাণে উহা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগের সময় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বিলম্বে হওয়াতে বা ক্ষণেকের নিমিত্ত বন্ধ হওয়াতে কোন বিপদ নাই।

১৭। এইরূপ আস্তে আস্তে শ্বাসকার্য্য হইলে কিম্বা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বিলম্বে হইলে ক্লোরোফর্ম্ম অল্পপরিমাণে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি গভীর এবং ঘনশ্বাস লয় ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সজোরে চলিতে থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম্ম রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্তসঞ্চাপন শীঘ্র কমিয়া বিপদ উপস্থিত করে। ভেগসের উত্তেজনায় কোন বিপদ ঘটে না, কিন্তু তাহার নিষ্কাম উপস্থিত হইলে সম্পূর্ণ বিপদ ঘটে।

এই সকল ব্যতীত আরও অনেক কথা কমিসনদ্বারা স্থির হইয়াছে। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সঙ্কলিত হইলঃ—

১। পৃষ্ঠদেশে শায়িত হওয়া এবং শ্বাসকার্য্যে কোনরূপ বাধা না হওয়া অত্যাবশ্যক।

২। যদি কোন অস্ত্রোপচারের সময় কোন কারণে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার সময় রোগীকে শায়িত অবস্থায় না রাখা যায়, তাহা হইলে শ্বাসকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক; দেখিতে হইবে যে অধিক ক্লোরোফর্ম্ম একবারে প্রয়োগ করিয়া য়্যাস্‌ফিক্‌সিয়া উপস্থিত না হয়, যদি শ্বাসকার্য্য কিরূপে হইতেছে তাহার কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে তাহার পৃষ্ঠদেশে শায়িত রাখিতে হইবে।

৩। শ্বাসকার্য্যের কোন বাধা না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য তাহার গলদেশে, বক্ষঃস্থলে বা উদর-প্রদেশে কোনরূপ সঞ্চাপন না থাকিতে পায় তাহা দেখিতে হইবে। যদিও রোগী ভয়ানক অস্থির হয় ও সেই অস্থিরতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত কেহ যেন তাহার বক্ষঃস্থল বা উদরোপরি চাপ না দেয়। রোগী ভয়ানক অস্থির হইলেও তাহার স্কন্ধদেশ, বিটপীদেশ বা জানুদ্বয় চাপিলেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায় এবং তদ্দ্বারা তাহার শ্বাসকার্য্যের কোন বিঘ্ন ও বাধা ঘটে না।

৪। সমস্ত মুখমণ্ডল ঢাকিয়া পড়ে, এরূপ ইন্‌হেলার তত ভাল নহে, তদপেক্ষা একখানা রুমাল বা অন্য কাপড়ে টোপরের মত কোন্ প্রস্তুত করিয়া তাহার শিরোভাগে অল্প য়্যাব্‌সর্ব্বিঙ্গ্ কটন রাখিয়া ইন্‌হেলার প্রস্তুত করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

৫। ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগের আরম্ভে ইন্‌হেলার দ্বারা রোগীর নাসিকা এবং মুখ একেবারে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে রোগী ভয়ানক ছট্‌ফট্ করে। যদি কেহ ছট্‌ফট্ করে এবং নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে গভীর শ্বাসলওন কালে যেন কোনপ্রকারে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োজিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। ক্রমশঃ—

সম্পাদকের বক্তব্য।

যে কারণে ভিষক্‌দর্পণ হইতে উপরোক্ত প্রবন্ধ আমরা অতি আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্পাদক।

ধাতুব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম খণ্ডের পর।)

নিরীক্ষ্য দক্ষিণে পাদে তথাচৈষা বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততস্তু দিনতুর্য্যকং॥

পুরুষের দক্ষিণ কর-পদস্থিতা এবং স্ত্রীলোকের বাম কর-পদস্থিতা নাড়ী পরীক্ষা করিবার সময় যদি একমাত্র তর্জ্জনি-নিবেশস্থলেই নাড়ীর স্পন্দন উপলব্ধি হয়, তবে চারি দিনমাত্র রোগীর জীবন আছে জানিবে।

তির্য্যগ্‌যবপ্রমাণেন যা মুঞ্চতি নিজাস্পদম্।
পঞ্চাহাদ্‌ভাবিনং মৃত্যুং পাদনাড়ী নিদর্শয়েৎ॥

পদস্থিতা নাড়ী যবার্দ্ধপরিমাণেও স্থানভ্রষ্ট হইলে পঞ্চম দিনের পর রোগীর মৃত্যু হয়।

ক্ষণাদ্‌গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গং শোথবর্জ্জিতং॥

যাহার অঙ্গে শোথ নাই, তাহার নাড়ী যদি কিছুকাল চঞ্চলভাবে স্পন্দিত হইয়া আবার তন্মুহূর্ত্তেই শান্তিলাভ করে অর্থাৎ একবারে স্পন্দনহীন হয়, তবে সপ্তাহ পর অষ্টম দিনে সেই রোগী যমালয়ে গমন করিয়া থাকে।

ভূজলতা ভূজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ।
বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্॥

ভূলতা শব্দে কেঁচুয়া বুঝায়। কেঁচুয়া যে প্রকার ক্ষীণ দুর্ব্বল ও বক্রভাবে গমন করে, হস্তস্থিত পরীক্ষণীয় নাড়ীও যদি সময় সময় ঠিক্ সেইভাবে স্পন্দিত হয়, আবার কখনও বা সর্পের ন্যায় পরিপুষ্ট ও বক্র হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এবং সেই সময় শরীরের অবস্থানুযায়ী নাড়ীও যদি স্থূল বা সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইলে সেই সঙ্গে নাড়ীও যদি সূক্ষ্ম হয় এবং শোথাদিদ্বারা শরীর স্থূল হইলে যদি নাড়ীরও স্থূলতা উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে সেই রোগী নিশ্চয় এক মাস পরে লোকান্তর গমন করে। এস্থলে ভূলতা

ভূজগাদির গমনভাব মনোমধ্যে বিশেষরূপ ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাপমান যন্ত্রদ্বারা এই সকল অবস্থা কতদূরপর্য্যন্ত অভ্রান্তরূপে জানিতে পারা যায়, তাহা আমি কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু এই সকল উপায়দ্বারা এক সময় হিন্দুগণ মুহূর্ত্ত, প্রহর, দিন, পক্ষ, মাস এবং বৎসরাদি জীবিতকাল অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। এখনও কেহ কেহ না পারেন এমন নয়। কিন্তু যতই দেশমধ্যে বিলাতিশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই এই সকল বিষয় একে একে অন্তর্হিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে চিকিৎসকদিগের তাপমান যন্ত্রের প্রয়োজন হইত না। ঘটিকাযন্ত্রকে তাঁহারা আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিতেন না। করুণাময় পরমেশ্বর জীবসৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবকেই এক একটী আশ্চর্য্য ঘটিকা-যন্ত্র উপহার দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাহাকে অজপা কহে। এই অজপাই জীবের মৃত্যুকালনির্ণায়ক। এই অজপাই রোগের সাধ্যাসাধ্য-বিজ্ঞাপক। ইহাই দেহধারণের একমাত্র কারণ। সামান্য যন্ত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা কিছুতেই ভাঙ্গিবার নয়। হাজার বিঘ্ন বিপত্তি হউক, সহস্র রাষ্ট্রবিপ্লব হউক, পৃথিবীর একদিক্ খসিয়া পড়ুক, এই যন্ত্র যেমন তেমনই থাকিবে। সামান্য যন্ত্র শিকল বাঁধিয়া টানিয়া লইতে হয়, এই যন্ত্র আপনা আপনিই সকলের অনুগমন করে। এই মহোপকারী ঈশ্বরদত্ত যন্ত্রকে আজকাল কেহই চিনিতে পারিতেছে না। কুশিক্ষার কুটিলস্রোতে ইহা দিন দিন ভাসিয়া যাইতেছে। এই অজপা-যন্ত্র কি? কেমন করিয়া এতদ্দ্বারা রোগের বিষয় বুঝিতে পারা যায়? কিরূপেই বা এতদ্দ্বারা নাড়ীস্পন্দনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়? তাহা পরে কহিব। এক্ষণে নাড়ীপরীক্ষাদ্বারা জ্বর ভিন্ন অন্যান্য পীড়াই বা কতদূর পর্য্যন্ত কি জানিতে পারা যায়, তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী, দিনবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকের বক্তব্য।

সুবিজ্ঞ লেখক মহাশয় প্রকৃতপক্ষেই বড় কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং এপ্রশ্নের উত্তরে আমাদেরও যে কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে, তবে অগ্রে দেখা যাউক, তিনি এ সকল কথায় কিরূপ মীমাংসা করেন। তাঁহার মীমাংসা দেখিয়া অবশ্য আমরাও আমাদের বক্তব্য যথাসাধ্য বলিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক।

রোগনিদান।

(ডাক্তারীমতে।)

৭ম খণ্ডে প্রকাশিতের পর।

রোগের কারণ নানাবিধ। এই সকল কারণ আবার সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। জলে, স্থলে, আকাশে, বায়ুতে, জীবে, উদ্ভিদে, এমন স্থান নাই, এমন দ্রব্য নাই, যাহা কোন না কোনও সময় রোগজনন-ক্ষমতাযুক্ত না হইতে পারে। যাহাতে সুখোৎপত্তি হয়, অবস্থাবিশেষে তাহাতেই দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। যাহা নইলে জীবনরক্ষা হয় না, তাহাই সময় ও অবস্থাবিশেষে জীবননাশের কারণ হইতে পারে। যে বায়ুর অভাবে আমাদিগের একমুহূর্ত্ত জীবনধারণ করিবার উপায় নাই, সেই প্রাণসম বায়ুতে নানাবিধ রোগবীজ সকল ভাসমান রহিয়াছে। জলকে জীবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই জলপানেই শত শত নরনারী বিসূচিকা প্রভৃতি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া মানবনীলা সম্বরণ করিতেছে এবং এই জলে সিক্ত হইয়াই জ্বরকাশী প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ায় পীড়িত হইতেছে। যে সকল খাদ্যবস্তু উদরস্থ করিয়া মনুষ্য প্রাণধারণ করিতেছে, সেই খাদ্যই বিষমিশ্রিত রহিয়াছে। অখাদ্যভক্ষণে ও অতিভোজনে লোকে অহরহঃ পীড়াক্রান্ত হইতেছে। গমন, ধাবন, ভ্রমণ, সন্তরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম প্রভৃতি যেসকল কার্য্য আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণবিধান করিতেছে, সেই সকল কার্য্যই উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিলে রোগের কারণ হইয়া উঠে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য অতিরিক্ত চালিত হইলে পীড়াদায়ক হয়। কামক্রোধ লোভ হিংসা প্রভৃতি রিপুগণ প্রবল হইয়া অযথাপরিচালিত হইলে নানাবিধ উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধির সৃজন হয়। আমাদিগের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আমাদিগের বিনাশের বীজ অবস্থিতি করিতেছে। এইজন্যই বিজ্ঞলোকে বলিয়া থাকেন যে, এত শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়াও যে জীবগণ বাঁচিয়া থাকে, ইহাই আশ্চর্য্য, মরণ তত আশ্চর্য্য নহে।

ব্যাধির এই সকল নানাকারণ গুলিকে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে। কারণ গুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থের সহিত দৈহিক সংঘর্ষদ্বারা নানা-

প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অস্ত্রাদিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সে সকলের কারণ এইরূপ। অগ্নি, ক্ষার, মহাদ্রাবক, যবক্ষারদ্রাবক প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(২) যে বায়ুদ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা বাস করিতেছি এবং যে বায়ু নাসিকাপথে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে সেই বায়ুর নানাবিধ অবস্থা পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শীতল বা অত্যধিক উষ্ণ বায়ু রোগের কারণ। জলবায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ব্যাধি সৃষ্টি করে। বায়ুর অত্যধিক আর্দ্রতা বা শুষ্কতা, উহার গুরুত্ব বা লঘুত্ব এ সমস্তই রোগের কারণ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার হানিজনক পদার্থ বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া পীড়াদায়ক হয়। নানাবিধ রোগবীজসকল বায়ুতে বিচরণ করে। ঐ বীজ শ্বাসপথে গ্রহণ করিলেও পীড়িত হইতে হয়।

(৩) আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্যবস্তু উদরস্থ করি, তাহারা নানাপ্রকার পীড়াদায়ক হইতে পারে। অতিভোজনে অজীর্ণদোষ হয়, খাদ্যের অভাবে রোগোৎপত্তি হয়। খাদ্যদ্রব্য অপকৃষ্ট গুণযুক্ত হইলে বা উহাতে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইলে উহাদ্বারা জীবন নষ্ট হইতে পারে।

(৪) নানাপ্রকার জান্তব ধাতব ও উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত বিষসকল পীড়া ও মৃত্যুর কারণ।

(৫) আমরা সর্ব্বদা যে সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকি, তাহারাও সময়ে সময়ে রোগের কারণ হইতে পারে।

(৬) রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামদ্বারা শরীরে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কিন্তু এই পরিশ্রম ও ব্যায়াম অতিরিক্ত পরিমাণে করিলে নানাপ্রকার দৈহিক বিকৃতি ও পীড়া হইয়া থাকে, আবার পরিশ্রম না করিয়া অলস হইয়া থাকিলেও নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে।

অতিরিক্ত নিদ্রা বা একবারেই নিদ্রার অভাব পীড়ার কারণ।

বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিচালন দ্বারা স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম নানা পীড়ার হেতু। ইন্দ্রিয়গণের অতিরিক্ত পরিচালনদ্বারা শারীরিক মানসিক রোগোৎপত্তি হয়। কামক্রোধের বশীভূত হইলে পীড়া হইয়া থাকে। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, শোক প্রভৃতি দ্বারা লোকে কঠিন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

জন্মবিকৃতি এবং পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রক্তবিকৃতি পীড়ার কারণ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকের বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবু খাঁটী ডাক্তারীমতে উপরে রোগনিদান সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিলেন, বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ পাঠক, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সমস্ত কথা বৈদ্যক-শাস্ত্রেরই আসল প্রাণের কথা। যেহেতু এ জগতে যাহা কিছু রোগোৎপত্তির কারণ হইতে পারে, তাহা ঐ-সকল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ সহসা প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম বুঝিবা পুলিনবাবু কোন বৈদ্যকগ্রন্থ হইতেই কথাগুলি তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটু পরেই সে ভ্রম ঘুচিল, কেননা ডাক্তারীই বল, আর কবিরাজীই বল, আসল কথা সকল শাস্ত্রেরই এক, বিজ্ঞান বা সত্যে কখনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। পার্থক্য যে নাই, তাহা আমরা এই রোগনিদান সম্বন্ধীয় একটীমাত্র কথাদ্বারাতেই বেশ বুঝাইয়া দিতে পারি। কেন যে পারি তাহা অবশ্যই বলিব। এই ত উপরোক্ত প্রবন্ধে বিচক্ষণ ডাক্তার বাবু অতি দক্ষতার সহিত রোগোৎপত্তির নিদান বা কারণসম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, অবশ্য সে সকল কথা যে তিনি ডাক্তারীশাস্ত্র অবলম্বনেই লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় আর সন্দেহ নাই, কেহই বলিবেন না যে, চরকসুশ্রুত অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাবু এ সকল কথা লিখিয়াছেন। অতএব দেখুন আয়ুর্ব্বেদ এই রোগনিদান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন? আয়ুর্ব্বেদভাণ্ডারের সর্ব্বপ্রধান রত্ন সুবিস্তৃত চরকসংহিতা এহেন বিশাল-গ্রন্থের বর্ণনার প্রারম্ভেই দুই একটীমাত্র কথা বলিয়াই এই রোগনিদান সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন—

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥

মহাত্মা চরকের এই বেদবাক্যের সম্বন্ধেই আগামীবারে কিছু বলিব। তারপর পুলিন-বাবুর কথার সহিত চরকের কথার সম্পূর্ণ মিল দেখাইয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সম্পাদক।

পিপাসার চিকিৎসা।

এলোপ্যাথিমতে।

সকলেই অবগত আছেন কোন কোন জ্বরে রোগীর বিজাতীয় পিপাসা হয়। রোগী অনবরত জল জল করিতে থাকে। এই জল পিপাসা এমন একটী প্রধান উপসর্গ যে, ইহা নিবারণ করা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠে। পিপাসা নিবারণ জন্য কবিরাজ ও ডাক্তারদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মুষ্টিযোগ ও ঔষধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে কিন্তু কবিরাজ মহাশয়েরা স্নিগ্ধ ও শীতল পানীয় প্রদানে শঙ্কিত হন, কিন্তু ডাক্তারগণ তাঁহাদিগের রোগীকে বরফ, বরফ-জল প্রভৃতি অবাধে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাক্তারগণ পিপাসা নিবারণ জন্য সচরাচর যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রধান যথা :—

সাইট্রিক্ এসিড্—	৪০ গ্রেণ।
পটাসিয়ম্ ক্লোরেট—	৪০ গ্রেণ।
জল—	৮ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া আবশ্যকমত এক আউন্স মাত্রায় খাইবে। এই মিক্‌চারটী একটী সুশীতল স্নিগ্ধপানীয়। কিন্তু জ্বরের জলপিপাসায় সুশীতল জল, ডাবের জল প্রভৃতি পানীয় প্রদান, যদিও আশু রোগীর পিপাসার শান্তি হয়, কিন্তু তাহাতে প্রায়ই স্থায়ী ফল হয় না। যতই স্নিগ্ধপানীয় প্রদান করা যায়, ততই উহা পান করিবার লালসা বৃদ্ধি হয়। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাপি বর্দ্ধতে"। কবিরাজ মহাশয়েরা এই দারুণ পিপাসার সময় শীতলজলের পরিবর্ত্তে গরম গরম জল খাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। একে ত জ্বরে রোগী ছট্ ফট্ করিতেছে, তাহার উপর বিজাতীয় পিপাসা, কবিরাজ ব্যাটারা বলে কি?

কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, যে বিজাতীয় মুখশোষ ও জল-পিপাসায় একমাত্র ভাল ঔষধই উষ্ণ জলপান। যতটা মুখে সহ্য হয়, এইরূপ উষ্ণজল অল্প অল্প বারকতক খাইলে আর তত জলপিপাসা থাকে না। ইহা আমরা বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উষ্ণ জলপানে যে জ্বরে জল-

পিপাসার শান্তি হয়, তাহা এক্ষণে অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসকেরও ধারণা হইয়াছে।

জ্বরিতাবস্থায় কি কারণে যে শীতলজল অপেক্ষা উষ্ণজলে পিপাসার শান্তি হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার যো নাই। তবে আমাদিগের অনুমান হয়, যে জ্বরকালীন পাকস্থলীর অবস্থা এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, শীতলজলও শীতল পানীয় সহসা শোষিত হয় না। উষ্ণজল অতিশীঘ্রই পাকস্থলীতে শোষিত হইয়া পিপাসা নিবারণ করে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, অত্যন্ত শীতল খাদ্য দ্রব্য উদরস্থ করিলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। এই যুক্তি অনুসারে জ্বরিতাবস্থায় শীতল পানীয় প্রদান সমধিক শুভকর সন্দেহ নাই।

অনেকপ্রকার জ্বরে জলপিপাসার সহিত বমনোদ্বেগ প্রকাশ করে, কিন্তু যেমন জলপান করে, তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া তুলিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় শীতল জলপানে ত পিপাসার নিবৃত্তি হয়ই না, অপরন্তু বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে সমধিক যাতনা প্রদান করে। এইরূপ স্থলে আমরা রোগীকে সমধিক উষ্ণজল পান করিতে দিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। উষ্ণ জলপান করিলে বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ইহা সকলের ধারণা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উষ্ণ জলপান করিবামাত্র বমনোদ্বেগ ও পিপাসার শান্তি হইয়া রোগীর নিদ্রা আনয়ন করে।

আবার জ্বরের সহিত নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ) ব্রংকাইটিস্, সর্দ্দি কাশী বর্ত্তমান থাকিলে তদবস্থায় শীতল পানীয় প্রদানে সমধিক অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে, অনেক নিউমোনিয়া রোগগ্রস্ত রোগী যথেষ্ট পরিমাণে শীতলজল, সরবত ও ডাবের জল খাইয়া একবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জ্বরের সহিত এই সকল উপসর্গ বর্ত্তমান থাকাসত্তে যদি পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, তবে তদবস্থায় উষ্ণ জলপানই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা। জ্বরগ্রস্ত দুর্ব্বল রোগী পৌষ মাঘমাসের শীতকালের রাত্রি পিপাসা নিবারণার্থ ঘটী ঘটী জল খাইয়া কাশরোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় উষ্ণ জলপানই ব্যবস্থা।

জায়ফল।

জায়ফল কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। জায়ফল আমরা পানের মশলার সহিত ব্যবহার করি। ইহা নানাপ্রকার ঔষধে ব্যবহার হয়। সম্প্রতি

ইহার অনেক নূতন গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার জে, ও, সোমেকার বলেন যে জায়ফল গ্রীষ্মকালে যে সকল উদরাময়ের পীড়া হয় তাহাতে খুব উপকারী। অর্দ্ধড্রাম মাত্রায় দুগ্ধের সহিত জায়ফল খাইলে উদরাময় পীড়া অধিকাংশস্থলেই নাকি আরোগ্য হইয়া যায়। অনেক অনিদ্রারোগে জায়ফল উপকারী। অনেকস্থলে অহিফেণ অথবা ক্লোরাল সেবন করাইয়া নিদ্রা আনয়ন করা যায় নাই; কিন্তু সেই সেই স্থলে জায়ফল সেবনে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। ডেলিরিয়ম্ ট্রিমেন্স (মদাতঙ্ক) রোগে জায়ফল সেবনে উপকার হয়। অর্শের বলিতে নিম্নলিখিত জায়ফল ঘটিত মলম প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়।

জায়ফল—	২ ড্রাম।
ট্যানিক্‌এসিড্	১ ড্রাম।
লার্ড—	১ আং।

একত্র মিশ্রিত করিয়া মলম তৈয়ার করিয়া অর্শের বলিতে লাগাইতে হইবে। এই ঔষধ প্রয়োগে চুলকনারও নিবৃত্তি হয়। জায়ফলের গুঁড়ার মাত্রা বালকদিগের পক্ষে ২ হইতে ১০ গ্রেণ এবং অন্যান্য স্থলে ১০ গ্রেণ হইতে ২ ড্রাম। ইহাপেক্ষা বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলে রোগীর কোমা অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হয়। (নিউইয়র্কমেডিকেলটাইম্‌স্, আগষ্ট ১৮৮৯)। ক্রমশঃ—

আশ্বিন। } শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

রে অবোধ-ভারতবাসী তুই শোন্।

ডাক্তার পুলিনবাবু লিখিয়াছেন যে, "উষ্ণ জলপানদ্বারা যে জ্বরের পিপাসার শান্তি হয়, তাহা এক্ষণে অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসকেরও ধারণা হইয়াছে।" ইহারই উত্তরে আমরা জোর করিয়া বলিয়া রাখিতেছি যে, ভারতীয় মুনিঋষিগণ যোগবলেই হউক, আর বিজ্ঞানবলেই হউক, কিম্বা পরীক্ষা বলেই হউক, যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, নবীন উৎসাহে উৎসাহী বিদেশীয় মহাত্মাদের এখনও সে স্থানে পৌঁছিতে প্রকৃতপক্ষেই অনেক বিলম্ব আছে। বিলম্ব যে যথেষ্টই আছে, তাহা একমাত্র এই গরম জলের কাহিনীতেই সুবিজ্ঞ পাঠক স্থির করিয়া লইবেন। আমরা কিন্তু অনেক দিন হইতে অনেক কথাতেই স্থির করিয়া বসিয়া

আছি। যেহেতু গরম জলই বল, আর জ্বরে উপবাসই বল, জ্বরে টাইম্ লওয়াই বল, আর শীঘ্র শীঘ্র কিছু হইবে নাই বল, এই সকল বুলিই যে এই পোড়া ভারতেরই ওঁছা কথা, তাহা আমরা অনেক প্রকারেই দেখাইতে পারি। কিন্তু যথার্থপক্ষে আমাদের মুখ হইতে এ সব কথা বাহির হওয়ার অপেক্ষা ডাক্তার মহাশয়দিগের মুখ হইতে বাহির হইলেই যে কথাগুলি অধিক মূল্যবান্ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ দেশীয় এলোপ্যাথ কি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহাশয়গণ যখন সরলভাবে এইরূপ তুল্য তুলনা করিয়া এ সমস্ত কথার আন্দোলন আলোচনাদ্বারা সাধারণের ভ্রম দূর করিতে প্রস্তুত হইবেন, তখনই বুঝিব যে, ভারতের কপাল আবার ফিরিয়াছে। নচেৎ যে সমস্ত ভারতসন্তান ভারতে জন্মিয়া ভারতেরই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া সেই ভারতীয় ঔষধপত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অথচ বিদেশী প্যাথির নামেই একবারে গলিয়া যান্, আমরা সেই মুষলং কুলনাশনং অবোধগণকে আন্তরিকই ঘৃণা করি।

সম্পাদক।

মুষ্টিযোগ ঔষধ।

দন্তরোগ।

১। কর্পূর ও মরিচের চূর্ণ একত্রে দন্তে লাগাইলে লালা নিঃসরণ হইয়া দন্তশূলের উপকার হয়।

২। বকুলের পাতা চিবাইলে মাড়ি ফোলা ও দাঁতনড়া নিবারিত হয়।

৩। * কয়লা, ফুলখড়ি, ফিটকারী ও শুপারি এই কয়েকটির ভস্ম সমভাগে একত্র করিয়া তাহাতে সমুদয়ের সিকিভাগ কর্পূর মিশাইয়া লইবে। ইহাদ্বারা প্রাতে দন্ত পরিষ্কার করিলে দন্তরোগ সকল দূর হইবে এবং এ রোগের প্রতিষেধকও ইহাতে হয়। ইহাতে দাঁত কাল হয় না।

দন্তকৃমি।

(দাঁতে পোকা।)

৪। * জলে হিঙ্গু গুলিয়া গরমকরঃ দাঁতের উপর ও গালের উপর ব্যথিত স্থানে প্রলেপ দিবে।

৫। * জলের বড় থানার শিকড় চিবাইলে পোকা মরিয়া যায়।

চর্ম্মরোগ।

(চুলকানি ও পাঁচড়া)

১। * মাখন ও গন্ধক সমভাগে মলম করিয়া পীড়িত স্থানে মাখাইবে। (উভয় রোগে)

২। * গন্ধক এক তোলা, সোহাগার খৈ এক তোলা, একত্র মিশাইয়া তাহাতে ঘৃত এক তোলা দিয়া মলম করিবে। ইহাতে চুলকানি ও পাঁচড়া উভয়ই ভাল হইবে।

৩। সোহাগার খৈ, ভূষা সিন্দুর ও ঘৃত সমভাগে মলম করিয়া ব্যবহার করিবে; (উভয় রোগে)।

৪। * গন্ধক, গাঁদাপাতা, মোনছাল, সমভাগে সমষ্টির অর্দ্ধেক তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া মাখিবে। (উভয় রোগে)

(দদ্রুরোগ।)

(দাদ)

১। * শ্বেত ধূপ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, ভূষাসিন্দুর সমভাগে মিশাইয়া চুলকাইয়া লাগাইবে।

২। * ধূপ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, কিটকারি সমভাগে পেশিয়া পরিমাণ মত ঘৃত তাহাতে দিয়া মলম করিবে। ইহাতে কিছু চন্দন ঘসিয়া মিশাইবে। ইহা প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার দাদ নিশ্চয় আরাম হয়।

৩। হরিতাল এক তোলা নেবুররসে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরে পেশিয়া লইবে। দদ্রুস্থানে লাগাইতে হইবে।

৪। কাঁচা দুগ্ধের দধি, এলাইচের বিচি, শ্বেতধূপ একত্রে পেশিয়া লাগাইবে।

বিকাজ রোগ।

১। বাঁশের কয়লা আদা দিয়া পেশিয়া প্রলেপ দিলে বিকজ সারিয়া যায়।

ধনুরোগ।

(বাগি)

১। ভেলারকসে কাপড় ভিজাইয়া পটি দিলে বসিয়া যায়।

২। * সেওড়াগাছের রস মালিশ করিলেও বাগি বসে।

৩। * জগডুম্বরের কস ও ভাল সিন্দূর একত্রে লাগাইলে নিশ্চয় বসিয়া যায়।

৪। ভুঁইচাপা গাছের মূল পেশিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে পাকে।

৫। * মধু ও চুণ অথবা চিনি ও চূণ একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

৬। * গরম ঘৃতের পটি সর্ব্বদা লাগাইলে অতি সত্বর পাকিয়া যায়।

৭। গাঁদাফুলের পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাকিয়া যায়।

৮। কাঁঠালের মুশলা পোড়াইয়া পক্কাবস্থায় উপরে একটি উপযুক্ত স্থানে অল্প করিয়া লাগাইলে ফাটিয়া বাহির হয়।

৯। সন্ধ্যামালতীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ফাটিয়া যায়।

১০। * অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়ের ছাল, কাঁঠানটের পাকা পাতার সহিত বাটিয়া ঘায়ের চারিদিক প্রলেপ দিলে বদরস নির্গত হইয়া ঘা শীঘ্র আরাম হয়।

১১। চাউল, ভাঙ্গপাতা, ধূতুরায় বীজ সমভাগে পেশিয়া ক্ষতের চারিদিকে প্রলেপ দিলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়।

১২। * শালিকাট জল দিয়া ঘসিয়া বাগির উপরে ঘন ঘন প্রলেপ দিলে পাকিয়া বাহির হয়।

ক্রমশঃ—

পুঁটীয়া } শ্রীনলীনীনাথ মজুমদার।

বিবিধ মুষ্টিযোগ।

(উদ্ধৃত।)

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় সময়ে সময়ে জ্বর হইয়া থাকে। ঐ প্রকার জ্বরাবস্থায় দুগ্ধাগ্নিলতার কাঁচাপাতার রস (দুই আনা ওজন পরিমাণে) দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, তিন দিনে উক্ত জ্বর বিদূরিত হইয়া যাইবে। উক্ত শুষ্ক লতার পালো গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলেও, উপকার হইয়া থাকে।

* * *

হরিদ্রা বাটা কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করিলে, কুম্ভীর পলায়ন করে।

* * *

কুইনাইন্-সেবনকারী এক সপ্তাহ চিরতার জল } ক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কুইনাইনের দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

* * *

১। সাতবার পরিষ্কৃত জলে ধৌত মাখম একছটাক

২। হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধছটাক

৩। আফিং একরতি

এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ, মটর পরিমাণে লইয়া, দিনে দুইবার চক্ষের পাতার উপর মালিশ করিলে "চোক উঠা" শীঘ্র সারিয়া যায়। সাবধান! যেন মলম কোনও ক্রমে চক্ষের ভিতরে না লাগে। কারণ তাহাতে চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা॥

* * জ

শীতকালে ঠোঁট ফাটে। তাহাতে বটের আঠা দিলে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়।

* * *

দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রতিদিন দুই প্রহরের সময় সাতটী খুব কচি বটের পাতা দুধে বাতাসার মধ্যে পুরিয়া খাইলে তাহার দুর্ব্বলতা দূর হইয়া শরীরে বলবৃদ্ধি ও ধাতুর বৃদ্ধি হইবে।

* * *

ফোড়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহার মুখে বটের আঠা দিলে, ফোড়া আর উঠিতে পারে না এবং বেদনা সত্বর আরাম হয়।

* * *

একতোলা তুলসীপত্রের রস প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, "সশূল আমাশয়" "রক্তামশয়" এবং "অজীর্ণদোষ" আরোগ্য পাইবে।

* * *

একতোলা তুলসীপত্রের রসের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, এক দিবসেই রক্তস্রাব ও জ্বালা দুর হইয়া নির্দ্দোষ প্রস্রাব হইবে।

* * *

"রক্ত প্রদর" রোগে একতোলা তুলসীপত্রের রস চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উক্ত পীড়া নিশ্চিতই আরাম হইবে। দৈনিক।

অবলা-বান্ধব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিজয়া প্রিয় ভগ্নি! আমিও আজ তোমাকে সেই সকল কথাই বলিতে আসিয়াছি। মেয়েদের বাধকের কথাই আজ তোমাকে বিশেষ করিয়া কহিব। বায়ুর প্রকোপবশতঃ কোন কোন মেয়ের নিয়মিত সময়ে উপযুক্তরূপ রজঃ নিঃসরণ হইতে পারে না। কিন্তু তাই ভাবিয়া তাহাদের যে একবারেই রজঃ জন্মে না, এ কথা মনে করা কাহারও উচিত নহে। তিন চারি মাস বা ততোধিক কাল পরে সহসা অধিক পরিমাণে রজোস্রাব হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং তাহাতে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার কাহারও বা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অল্প অল্প রজোস্রাব হইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থায় মাজা, তলপেট, কুক্‌চি, নাভি এবং যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা হয়, তত্তৎস্থানে চাপ ধরিয়া থাকে, কিন্তু সেই চাপ সকল সময় একই স্থানে সমান ভাবে থাকে না। তাহা সময় সময় সঞ্চালিত বা অদৃশ্য হয়। রোগিনী কিছুতেই সুখানুভব করিতে করিতে পারে না এবং আহার ও করিতে পারে না। রাত্রিতে যন্ত্রণা আরও বেশী হয় সুতরাং নিদ্রা হয় না। সর্ব্বদা রোগিণী কেবল ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিস্কার হয় না। আবার কোন কোন মেয়ের একবারেই আর্ত্তব জন্মে না অথবা জন্মিলেও অতি অল্প পরিমাণে জন্মে সুতরাং তাদৃশ মেয়েমানুষ কখনও ঋতুমতী হয় না। এক্ষণে এই সকল রোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে।

অল্প অল্প রজোস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি অত্যন্ত বেদনা এবং চাপ ধরা থাকে, তাহা হইলে হীরাকস, হিঙ্গু, মুসব্বর প্রত্যেকে সমান এবং বিশুদ্ধ অহিফেণ অর্দ্ধেক একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় দিনে একবার এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে একবার শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ইহতে বেদনার অনেক লাঘব হয়। হীরাকস ।০ মুসব্বর ।০ দারুচিনি ॥০ তোলা একত্রে মধুর সহিত মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় দিনের মধ্যে দুইবার জলের সহিত সেবন করিলে শীঘ্রই উপযুক্তরূপ রজোস্রাব হইয়া পীড়ার উপশম হয়। বেদনার অবস্থায় কোষ্ঠ পরিস্কার থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কোন তীক্ষ্ণ

(সম্মিলনীর অতিরিক্ত পত্র।)

বিরেচক প্রয়োগ করা উচিত নহে। বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিপুল, বাসকছাল, সৈন্ধব লবণ, বনযমানী, যবক্ষার ও চিতামূল, এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও মদ্যাম্লের সহিত সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয়। সকল প্রকার বাধকের পক্ষে ওলটকম্বল অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই বৃক্ষ অধিক বড় হয় না। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রজাবতী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১০।১২ টী গোলমরীচের সহ ওলটকম্বলের মূল ।০ আনা পরিমাণে পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে শীঘ্রই রক্তস্রাব এবং তজ্জনিত বেদনা দূরীভূত হয়। কাহারও কাহারও একবার মাত্র ঔষধ সেবন করিলে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া পীড়ার উপশম হয়। বন্ধ্যানারী ঋতুর প্রথম তিন দিবস এই ঔষধ সেবন করিয়া স্বামী সহবাস করিলে তাহার গর্ভোৎপত্তি হয়।

ক্রমশঃ—

দিনবাজার,
জলপাইগুড়ি। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

আমাদের কথা।

শোকসংবাদ ;—পুত্রশোকাতুর কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় এহেন অতি বৃদ্ধাবস্থায় সহসা পত্নীবিয়োগজন্য সুদারুণ মর্ম্মভেদী গভীর শোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যে আমাদের মাতৃবিয়োগরূপ কিরূপ গভীর দুঃখ ও প্রবল শোকে দুঃখিত ও শোকাতুর হইয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম। কেননা, নানাকারণে তিনি যে আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আহা এই সে দিন তাঁহার মধ্যমপুত্র-রত্ন তাঁহার বক্ষে তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল! আজ আবার গৃহলক্ষ্মীও তাঁহাকে অসময়ে ছাড়িয়া গেলেন! সুতরাং এই উভয় দারুণ শোকে শোকাতুর হইয়া আর যে তিনি কত দিন জীবিত থাকিবেন, তাহা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। বস্তুতঃ ইহাকেই "বলে চিরদিন কখনও সমান না যায়"। নচেৎ যাঁহার হরির ন্যায় সোণারচাঁদ পুত্র, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় পত্নী ; তাহা ছাড়া ধন, মান, যশ প্রভৃতি মানবের প্রার্থিত কিছুরই অভাব নাই, অথচ তাঁহারই সহসা সেই প্রিয়তম পুত্র, সেই প্রাণাধিকা

পত্নীর অকালে বিয়োগ হইবে কেন? অথবা এ সংসারচক্রের ব্যাপারই এইরূপ।

সংবাদপত্রের সমালোচনা।—সংপ্রতি হোপ নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে এবং যাহা এডুকেশনগেজেট সম্পাদক অনুবাদ করিয়া নিজ পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা একবারেই স্তম্ভিত ও যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি! বিস্ময়ের কারণ এই যে, আমাদের দৃঢ়সংস্কার-দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা গোড়া হইতেই ইংরাজী কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন্, শেষটা তাঁহারা যতই হিন্দুয়ানী হিন্দুয়ানী করুন, যতই সংস্কৃতশাস্ত্র উদরসাৎ করুন, কিন্তু বাল্যসংস্কারের এমনই ভয়ানক কঠোর শাসন যে, তাঁহাদের হিন্দুয়ানী কিন্তু কোনমতেই ইংরাজীমিশ্রিত ছাড়ায়ই না। কাজেই অগত্যা তাঁহাদিগের দুতরফা বজায় রাখিয়া সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হোপসম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায় মহাশয় সেই গোড়া হইতেই ইংরাজী পড়িয়া কেবল ইংরাজীপড়া নহে বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এত দীর্ঘকালপর্য্যন্ত বাস করিয়াও আজ্ ভারতের অধঃপতনবিষয়ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক যে গভীরগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা যথার্থই স্তম্ভিত হইয়াছি। এমন কি আমরা আমাদের জন্মাবধি যে আর কখনও এরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ কোথাও পাঠ করিয়াছি, তাহা ত স্মরণই হয় না। কেবল তাহাই নহে, আমাদের মনে খাঁটী হিন্দুয়ানির যে অভিমান ছিল, অমৃত বাবু তাহা চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কেননা আমরা দেশের অবস্থা অবস্থা করিয়া যতই চীৎকার করি, কিন্তু ধর্ম্মতঃ বলিতেছি যে, অমৃত বাবু যেরূপ গভীর উদ্দেশ্যে যে সকল সার ও সম্পূর্ণ সত্য যুক্তির আশ্রয় লইয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, আমাদের এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি সত্য সত্যই এখনও এতদূর পৌঁছিতেই পারে নাই। দেশের প্রকৃত ভালমন্দ, যথার্থ উন্নতি অবনতি-বিষয়ক জ্ঞান তাদৃশ নাই বলিয়াই আজ অমৃত বাবুর লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছি।

বিজ্ঞাপনে ভ্রম—প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে চিকিৎসা-সম্মিলনীর যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহাতে ভ্রমক্রমে বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ ও গরিব বা ছাত্রের পক্ষে ২৷৵০ স্থলে ১৷৵০ টাকা ছাপা হয়, বলা বাহুল্য যে সম্মিলনীর বার্ষিক মূল্য ১৷৵০ টাকা লইয়া কোনক্রমেই দেওয়া হয় না এবং দেওয়া যাইতেও পারে না।

৮ম বৎসর। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

৭ম খণ্ড, ১২৯৭ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই দুই সংখ্যায় যাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ আছে।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল্, এম্, এস্। কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি। কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত। কবিরাজ প্যারীমোহন সেন গুপ্ত। ডাক্তার প্রাণধন বসু এম্, বি। ডাক্তার হরিদাস চক্রবর্ত্তী। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় এল্, এম্, এস্, এফ, সি, ইউ। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এম্, বি। বাবু নলিনীনাথ মজুমদার। বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী। এবং সম্পাদক।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্ ৫নং, জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৯ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
হোপ সম্পাদক ও হিন্দু ম্যাগাজিন		৩৫
মূলে ভুল	...	৪১
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশচিকিৎসা	...	৪৮
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা	...	৫১
ক্লোরোফরম্-আঘ্রাণ	...	৫৯
পদ্য মেটিরিয়া মেডিকা	...	৬২
ধাতুব্যাখা (কবিরাজী)	...	৬৪
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ভোজ্য ও ভোজন	...	৬৭
অধলাবান্ধব (কবিরাজী)	...	৭৫
বাঙ্গলা দেশে স্বাস্থ্য	...	৭৮
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী	...	৮১
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	৮৩
ঘৃতপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	৮৫
শিশুদিগের যকৃতের বিলিয়ারী সিরোসিস		৮৬
চিকিৎসাবলী (হোমিওপ্যাথি মতে)	...	৯০
ওলাউঠা নিবারণের উপায়	...	৯২
গৃহচিকিৎসা (মুষ্টিযোগ)	...	৯৫
মুষ্টিযোগ ঔষধ	...	৯৮
হিক্কারোগের দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ (সম্পাদকীয়)		৯৯
নিদারুণ শোক সংবাদ	...	১০০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
খ্রে
কলিকাতা

হোপ-সম্পাদক ও হিন্দুম্যাগাজিন।

হোপ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল রায় মহাশয়ের সম্পাদিত হিন্দু-ম্যাগাজিন নামক ইংরেজীভাষার মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা আমরা অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা ইংরেজী ভাষা বুঝি না বুঝি, এই ভাষায় আমাদের জ্ঞান থাকুক না থাকুক, তথাপি কিন্তু হিন্দুম্যাগাজিনের সম্যক্ অর্থ পরিগ্রহ করিতে ছাড়ি নাই। অতি আদরের সহিত গভীর মনঃসংযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া মহান্ আনন্দ পাইয়াছি বলিয়াই আজ্ সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে হিন্দুম্যাগাজিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আশা করি, আমাদের চিকিৎসক পাঠকগণ, এই অনধিকার চর্চ্চা জন্য দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, হোপ-সম্পাদক অমৃত বাবু বহুকালপর্য্যন্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন ও অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এক্ষণে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। এখন কথা এই যে, যিনি দীর্ঘকালপর্য্যন্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি নানা উন্নতিশীল দেশে অবস্থান করিয়াছেন, সেই অহিন্দু হাটকোট-পরিধানকারী ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব্যক্তি নিজে সকল অংশেই অহিন্দু হইয়াও আবার হিন্দুম্যাগাজিন লিখিতে আরম্ভ করিবেন কি? ইহা ত বড়ই বিস্ময়ের কথা!

হাঁ বিস্ময়ের কথাই বটে, কেবল বিস্ময় বলিয়া কেন, সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য ও অসাধারণ নূতনত্ত্বেরও কথা বটে; কেন এত বিস্ময়ের—কেন এতই নূতনত্ত্বের, তাহাও বলি;—বিধির বিড়ম্বনায় ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সহিত এদেশের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হওয়া অবধি এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যে কোন মহাত্মা ইয়ুরোপ বা আমেরিকায় গমন করিয়াছেন, প্রায়ই দেখিবে যে, তাঁহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আর একজনও স্ব-ধর্ম্ম বা স্ব-সমাজে সম্যক্ আস্থাবান্ থাকেন নাই। যাঁহারা বিলাতে গিয়া সিবিলিয়ান্ বা বারিষ্টার হইয়া আসিয়া অহোরহই ইংরাজ সহবাসে থাকিয়া স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া পূরা বা অর্দ্ধসাহেবীভাবে দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাদদিলেও কলঙ্কের কথা এই যে, যাঁহারা কেবল দেশভ্রমণ বা

তত্ত্বানুসন্ধান কিংবা ধর্ম্মোপার্জ্জন প্রভৃতি অন্যবিধ কারণেও বিলাতে একবার পদার্পণমাত্র করিয়াছেন, এমন কি বম্বে সহরপর্য্যন্ত দেখিয়াছেন—বিলাতি মাটীর এমনি গুণ যে, প্রকাশ্যে তাঁহাদের হাবভাবে কিছুমাত্র সাহেবীয়ানা প্রকাশ না পাইলেও ভিতরের মর্ম্মে মর্ম্মে শিরায় শিরায় ও অস্থিমজ্জাতে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ষোলকলাই সাহেবী আনাতে বোঝাই হইয়া থাকে। মৃত কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক মহাত্মাকেই আমরা এ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারি। ফলতঃ সিবিলিয়ানী, বারিষ্টারী বা কৃষিকার্য্য প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের জন্যই হউক, একবার সমুদ্র পার হইয়া ঘুরিয়া আসিলেই আর তাঁহারা এ ধুতি চাদর ও মুগমসুর ডাউল প্রভৃতি পুরাতন প্রথায় কোনমতেই কিছুতেই মন উঠে না।

বিলাতফেরত একজনকেও এপর্য্যন্ত খাঁটী হিন্দুধর্ম্মপালন করিতে অথবা একজনের দিকে তাকাইয়াও যথার্থ সত্ত্বগুণের আভা বাহির হইতে দেখি নাই বলিয়াই আজ্ বিলাত প্রত্যাগত অমৃত বাবুতে সেই যথার্থ সত্ত্বগুণের পরিচয় পাইয়া সম্যক্ হিন্দু রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের প্রতিপালন করিতেছেন জানিয়াই আজ্ এত আহ্লাদিত হইয়াছি।

অঙ্গে সে হ্যাটকোট নাই, মুখে সে চুরুটপাইপ নাই, ইংরেজীভাষায় অগাধ জ্ঞান থাকিলেও বচনে ভ্রমেও ইংরেজী বুলি নাই, খাদ্যে উইল্‌সনের সম্পর্ক নাই; অন্তরে অহংভাবের লেশমাত্রও নাই; কোন কার্য্যেই চতুরতা বা শঠতা নাই এবং নিজ সম্পাদকীয় ব্যবসায়ে ধড়িবাজী নাই; তবে আছে কি? আছে সেই পূর্ব্বকালের ঋষিভাব, সেই সাত্ত্বিক হিন্দুর যথার্থ প্রশান্তভাব, অঙ্গে সামান্য ধুতি ও চাদর; খাদ্যে পটোল ও বেগুণ এবং বল্‌কা দুগ্ধ। আর অন্তরে অহোরহই সেই স্বর্গীয় পরোপকার-প্রবৃত্তি ও স্বদেশ হিতৈষিতারূপ মহদিচ্ছা; কেবল তাহাই নহে, কেমন করিয়া এ অধঃপতিত জাতির দুর্দ্দশার মোচন হইতে পারে, কিরূপেই বা এ আত্ম-তত্ত্ব-বিস্মৃত ও পরধর্ম্মানুরাগী এবং পরপদলেহী জাতি পরতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া আবার স্বধর্ম্মে মনঃসংযোগ আনিতে পারে, ইহাই তাঁহার জপমালা। বলা বাহুল্য যে, এই সকল সাধুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রথমতঃ হোপনামক ইংরেজী সাপ্তাহিকপত্রিকার সম্পাদন আরম্ভ করেন; কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে লোকে চায় কেবল মজার খবর; সুতরাং কেবল সাপ্তাহিক সংবাদপত্রদ্বারা ধীরভাবে প্রাণের অন্তঃস্তল

হইতে সে আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব দেখিয়াই অমৃতবাবু হিন্দুম্যাগাজিনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহার লেখনীপ্রসূত হিন্দুম্যাগাজিনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এ অধঃপতিত দেশের—সম্পূর্ণ অধঃপতিত ও একবারেই জীবন্মৃত জাতির সম্বন্ধে কতদূর কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন; আর সত্যসত্যই তিনি যে এ প্রতিকূল ও প্রমত্তস্রোতের অগ্রভাগে স্থির থাকিয়া স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন কি না, তাহাও আমরা এখন বলিতে পারি না। অপরন্তু এই আটঘাট বঞ্চনাপূর্ণসমাজে এই শৃগালশকুনিসদৃশ মূর্ত্তিমান্ রজঃ-তমগুণের আধারস্বরূপ জনগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাত্ত্বিক ব্যক্তির হিন্দু-ম্যাগাজিন অবলম্বন করিয়া মানপ্রতিপত্তি ও অর্থাগম বৃদ্ধি পাইবে কি না, তাহাও আমরা জানি না,। না জানিলেও এ কথা আজ্ আমরা তার স্বরে ঘোষণা করিয়া রাখিতে পারি যে, আজি কালিকার এ একটানা-স্রোতে হিন্দু-ম্যাগাজিন সম্পূর্ণরূপেই নূতন জিনিষ, যথার্থই যে তিনি দেবভাব-প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতপক্ষেই যে তিনি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া কায়মনবাক্যে এ অভাগাজাতির মঙ্গলের জন্যই হিন্দুম্যাগাজিনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা একটীমাত্র কথাতেই বেশ প্রতিপন্ন করিতে পারি। স্বদেশ, স্বজন ও স্বাবলম্বন-প্রেমে প্রেমিক বলিয়াই তিনি প্রথমেই সুর ধরিয়াছেন যে।—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিগুণ (কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন) স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক, সুতরাং স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়স্কর।

ভগবদ্গীতার এই অমূল্যবাক্যের বিষয় যিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, এরূপ দৈববাণী হিন্দুশাস্ত্রের আর কোথায়ও আছে কি না, প্রকৃতপক্ষে এমন স্বর্গীয়বাণী, এমন অমূল্য বাক্য আর কোথায়ও কেহ শুনিয়াছেন কি না, আর এই শৃগাল শকুনীর অহোরহ ভয়ানক কোলাহলপূর্ণ ভারতে ঠিক্ এই সুর ভিন্ন যে অন্য কোন সুরের দ্বারাই এ কোলাহলের কোন কালেও শান্তি হইবে না, অন্য শতসহস্র

রাগরাগিণীপূর্ণ সুমধুর সুরেও যে ভারতকে নিস্তব্ধ করিয়া সে বিমল শান্তি সুধা ঢালিতে পারিবে না, তদ্বিষয়ে কি আর অনুমাত্র সন্দেহ আছে? সন্দেহ নাই বলিয়াই আজ্ অমৃতবাবুর গান না শুনিয়া তাঁহার রাগরাগিণী বিচার না করিয়াই কেবলমাত্র তাঁহার সুরেই আমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যাঁহার সুরেই প্রাণমন আনন্দরসে আপ্লুত হইল, না জানি তাঁহার রাগরাগিণীপূর্ণ ও তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে আমরা কত অপার আনন্দই উপভোগ করিতে পারিব।

তাঁহার হিন্দুম্যাগাজিনের ১ম সংখ্যায় অনেকগুলি প্রবন্ধ থাকিলেও হিন্দুসিষ্টেম (Hindu system) নামক প্রবন্ধে যেরূপ বিচক্ষণতা, বহুদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও বহুল শাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। বলিতে কি বর্ত্তমান সময়ের এই উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুসন্তান যদি মনোযোগের সহিত এই পরম উপাদেয় প্রবন্ধটীর আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি যে যথার্থই আমাদের ন্যায় অপার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

তবে কথা এই যে, পরধর্ম্মানুরাগী ও অহোরহ পরপদলেহন-প্রত্যাশী ভারতবাসীর নিকট তাঁহার লিখিত স্বদেশ ও স্বজন-প্রেমসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সন্তোষজনক হইবে কি না? সন্তোষজনক যে হইবে না, তাহা আমরাও বেশ জানি। কেন না আমরাও অহোরহই সে ভোগ ভুগিয়া আসিতেছি। তথাপি তাঁহার হিন্দু ম্যাগাজিন পাঠ করিয়া যদি এক জনেরও স্বজাতি বা স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুমাত্রও আস্থা আইসে, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অপার আনন্দ লাভ করিব।

অথবা এসম্বন্ধে তাঁহাকে আর কোন কথা না বলাই ভাল, কেন না তিনি জানিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া সুজিয়াই এ শুষ্ক নীরস ও অর্থহীন ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছেন। তিনি ইহা ঠিকই বুঝিয়াছেন যে, অবোধ ভারতবাসীর নিকট সত্য কথা বলিয়া কিংবা স্বজন বা স্বজাতি প্রেমের দোহাই দিয়া আর কোন ফলই ফলিবার সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা না থাকিলেও প্রকৃত সাধক, প্রকৃতদেশহিতৈষী ও প্রকৃত স্বধর্ম্মানুরাগী উন্নতচেতা মহাত্মা কি বাহ্যগৌরব ও বাহ্য প্রশংসার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন? কখনই নহে। তাঁহার সত্ত্ব-প্রধান আত্মা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার নহে। সুতরাং এ ভরসা আমাদের বিলক্ষণ

আছে যে, লোকে যাহাই বলুক, যেরূপ নেত্রেই তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করুক, তিনি কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিচলিত হইবেন না। কেন না ইহা অতি জ্বলন্ত কত্য কথা যে, এ বর্ত্তমান বঞ্চক ঘুঘু দলের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাত্বিক ব্যক্তির বিষয় বৈভব সম্বন্ধে বড় একটা কিছু না হইলেও কিন্তু ভারতের ভাগ্যে এমন এক দিন আবার আসিবেই আসিবে, যখন হয়ত অমৃত বাবুর ন্যায় ব্যক্তি জীবিত না থাকিলেও তাঁহার এই সকল বেদ বাক্যের ন্যায় সত্য বাক্য পাঠপূর্ব্বক সাধারণে তাঁহাকে প্রকৃত দেশ হিতৈষীর আসন প্রদান করিয়া তাঁহার বংশাবলীকে পর্য্যন্ত সসম্মানে ও সাদরে অভ্যর্থনা করিবে। যেহেতু শাস্ত্রেই ত আছে।'—

"রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক।"

অর্থাৎ হে ভোগবিলাস-রত, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-রহিত, চক্ষু থাকিতেও অন্ধকারে নিমজ্জিত, কর্ণ থাকিতেও বধিরভাব প্রাপ্ত, এক বারেই অপদার্থ রাজপুত্র! ত্বং চিরং জীব অর্থাৎ তুমি অমর হইয়া চিরকালই বাঁচিয়া থাক। যেহেতু তুমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিনই তোমার পক্ষে লাভ, ততদিনই তুমি এসংসারের মজা লুটিতে পাইবে। আর তোমার ন্যায় আত্মজ্ঞান-হীনের মৃত্যুর পর ভয়ানক নরক প্রস্তুত রহিয়াছে, মৃত্যু হইলেই তোমার আত্মা সেই দারুণ নরকে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবেই করিবে। অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিয়া এ ঐহিক সুখ সম্ভোগ কর। আর হে স্বধর্ম্ম-নিরত, স্বদেশও স্বজনপ্রেমী, সত্ত্বগুণপ্রধান ও বঞ্চনাশূন্য সুতরাংই এখনকার দিনে অন্নবস্ত্রহীন মুনিপুত্রক! ত্বং মা জীব; অর্থাৎ তুমি এই মুহূর্ত্তেই মর, যেহেতু তুমি যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিবে, ততক্ষণই এ পাপসংসারে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে, স্বদেশ ও স্বজনের ভাবনা ভাবিয়া তাহাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া তোমার প্রাণ মন অস্থির থাকিবেই থাকিবে। অতএব তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এখনই মৃত্যু হউক। যেহেতু অনন্ত স্বর্গসুখসম্ভোগের জন্য সুবিমল স্বর্গস্থান প্রস্তুত রহিয়াছে, মৃত্যু হইলেই তোমার আত্মা সেই অবিনাশী নির্ম্মল জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া এ দুর্দ্দিনে আমরা অমৃতবাবুর সম্বন্ধে "মা জীব" এ কথার ব্যবহার করিতেছি না। বরঞ্চ

কায়মনোবাক্যেই প্রার্থনা করি যে, তিনি জীবিত থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টান্তস্থানীয় হউন।

সে যাহা হউক, অমৃত বাবুর প্রাণ যে স্বদেশ ও স্বজন চিন্তাতেই অহোরহই ব্যাকুল থাকে, দেশের বর্ত্তমান গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত নামধারী অধিকাংশ ব্যক্তিগণের স্বদেশ ও স্বজন প্রেমে এরূপ বিসদৃশ বিতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া তাঁহার আত্মা যে প্রতি নিয়তই, ক্ষোভে দুঃখে তাপে রোষে ঘৃণায় ও লজ্জায় অভিভূত ও যারপর নাই ক্লিষ্ট থাকে, সে পরিচয় আমরা অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়েই প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। যেহেতু কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের প্রকাশিত ইংরাজী চরক ইয়ুরোপ ও আমেরিকাস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী খুব আদরের সহিত গুণগান করিতেছেন, অথচ দেশের অধিকাংশ লোক সেই চরকের সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না জানিয়া অতি আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহার হোপ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে;—

"It is curious that the treasures of ancient Hindu literature are generally appreciated in Europe far better and soon than by those who are their inheritors by birthright. They call him an unnatural son who does not know his own father."

অর্থাৎ ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে হিন্দুসন্তানগণ পৌরাণিক হিন্দু সাহিত্যধনে স্বত্বাধিকারী হইয়াও তাহার অসীম গুণের মহিমা অবগত হইতে অক্ষম এবং ইয়ুরোপবাসীগণ বিজাতীয় হইয়াও ইহার মহিমা অল্পকাল মধ্যে এবং সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছেন। এই জন্য বলিতে হয়,—যে ছেলে তাহার পিতাকে চিনে না, তাহাকে লোকে বিজন্মা বলে।

হোপ সম্পাদক বড় দুঃখেই অধীর হইয়া আজ সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতি কঠোর কটাক্ষ করিয়া প্রকারান্তরে বিজন্মা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছু মাত্রই দুঃখিত নহি, বরঞ্চ তাঁহার এই সম্পূর্ণ সত্য বাক্যে মহান্ আহ্লাদিত হইয়াছি। তবে গভীর দুঃখ ও দারুণ কলঙ্কের কথা এই যে, হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই বিজন্মাগণকে যথার্থ পিতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লালায়িত হন্, বিজন্মাগণ যে তাহাতে চটিয়া লাল হন্, আসল বাপের পরিচয় দিতে গেলে যে তাঁহাদের মস্তক অবনত হয়, ধর্ম্মতঃ বলিতেছি যে, এদুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই। বস্তুতঃ অমৃত বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সার কথা

ও সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ সত্য কথা, প্রকৃত ভারত-হিতৈষীরই যথার্থ প্রাণের অন্তঃস্থলের মর্ম্ম কথা। কেননা যে কারণেই হউক, ভারতবাসী পৃথিবীর মধ্যে যে একটা উচ্চ জাতি হইয়াও আপন ভুলিয়া গিয়া কেবল অহোরহই পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াই এরূপ দিশাহারা অন্নবস্ত্রহারা ও জীবন্মৃত জাতি হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে ভ্রমেও কি কেহ কোনরূপ সন্দেহ আনিতে পারেন?

চি, স, স।

মূলে ভুল।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদিগের দেশীয় সম্পত্তি। বহুকালের আলোচনার অভাবে এই চিকিৎসাশাস্ত্র একরূপ বিলোপপ্রায় হইয়াছে। এই আর্য্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমুদায়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রচার করা। দ্বিতীয়, স্বদেশ ও বিদেশ হইতে নূতন নূতন ঔষধ গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে দেহের উপর তাহার কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া ঐ সকল ভেষজ দ্রব্যকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে গ্রহণ করা। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে এই সকল কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নব্যসম্প্রদায়কে গালি পাড়িলে এবং হা হতোস্মি বলিয়া কপালে করাঘাত করিলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশীয় লোক দেশীয় দ্রব্যের উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ, দেশীয় লোক একবারেই অন্ধ হইয়া বিদেশীয়স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, ইহা আংশিক সত্য হইলেও আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, দেশের যাবতীয় লোক ভাল মন্দ বিচারে অক্ষম এবং নিতান্ত অনুকরণপ্রিয়। এই যে খৃষ্টান মিশনরিরা কয়েকশতাব্দী ধরিয়া আমাদিগের দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, তাহাতে ভারতবাসী কয়জন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক মুগ্ধ হইয়া সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইংরাজরাজের খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে? এই যে বিলাতি কাপড়ে এবং ডসনের জুতায় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে দেশের সাধারণ লোকের দোষ আছে না আমাদিগের দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী ও জুতানির্ম্মাতাদিগের দোষে এরূপ ঘটিয়াছে? আমি একজন বিলাসী বাবু, আমি স্বদেশভক্ত বটী, কিন্তু আমার মন এতদূর উন্নত ও শিক্ষিত নহে যে, আমি স্বদেশের মমতায় এক-

বারে বিভোর হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব যে, বিদেশীয় জিনিষমাত্রে স্পর্শ করিব না। বাস্তবিক যে কোন দেশের অধিকাংশ লোকেরই মতি গতি এইরূপ, আমি একজন এইরূপ সাধারণ ব্যক্তি আমার বিলাসের উপযুক্ত জিনিষ হইলেই হইল। আমি বাজারে জুতা ও বস্ত্র ক্রয় করিতে গিয়া দেখিলাম বিলাতি কাপড় ও বিলাতি জুতা পরিস্কারও বটে সস্তাও বটে। আমি দেশীয় ছাড়িয়া তাহাই সাদরে গ্রহণ করিলাম। আমার দেশীয় চর্ম্মকারেরা ঐরূপ ডসনের ন্যায় পরিস্কার জিনিষ দিতে পারিল কই? এই যে ট্রেটির বাজারে দেশীয় জুতা তৈয়ার হইতেছে এবং বোম্বাইকলে বিলাতিধরণের সস্তা কাপড় তৈয়ারি হইতেছে, তাহা কি দেশীয় লোক ক্রয় করিতেছে না? ঠনঠনিয়ার চটি ত দেশীয় জিনিষ। তবে উহার এত আদর কেন? দেশীয় লোকগুলা যে একবারেই অন্তঃসারশূন্য তাহা নহে। তবে কিনা সাধারণ লোকে অতদূর উন্নতমনা হইতে পারে না যে, নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও দেশী দ্রব্যেরই আদর করিবে।

যদি স্বীকার লওয়া যায় যে, আয়ুর্ব্বেদীয়চিকিৎসা আমাদিগের দেশে বাহুল্যরূপেই প্রচলিত আছে, উহার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিষ্প্রয়োজনীয়; তবেত আর কোন কথাই নাই। কিন্তু যদি সত্য সত্যই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি ক্রমেই লোকের আস্থা কমিয়া যাইতেছে এবং উহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, তবে সুশিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এইদুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদে যদি কোন অভাব থাকে, তবে সেই অভাবের পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ অভাব পূরণ করিতে হইলে বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা হইলেই অভাবজ্ঞান ও পূরণ হইবে। নচেৎ আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমার যাহা আছে তাহাই থাক, এইরূপ জ্ঞান করিলে পদে পদে চেষ্টা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা। দেখুন ইউরোপীয় জাতি আমাদিগের এই আয়ুর্ব্বেদ হইতেই চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল সূত্র গ্রহণ করিয়া কেমন সুবিস্তৃত নূতন ধরণের চিকিৎসাশাস্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। এবং এই দেশস্থ নানাপ্রকার ঔষধদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কেমন কৌশলে স্বদেশীয় করিয়া তুলিয়াছেন। অনেকেরই ধারণা রাজসাহায্য ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায় নাই। কিন্তু যদিও রাজসাহায্য পাইলে

কোন বিষয় সত্বর সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে রাজসাহায্য ব্যতীতও যে অনেকটা করিয়া তুলিতে পারেন, তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। রাজকীয় সাহায্য ব্যতীতও যে কোন চিকিৎসাশাস্ত্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে পারে, হোমিওপ্যাথিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সম্মিলনীর অন্যতর লেখক শ্রীযুক্ত কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় হোমিওপ্যাথিক মত এই আর্য্যমস্তিষ্ক হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং আমাদিগের দেশের জিনিষ লইয়া বিদেশীয় লোকে এক এক দোকান খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। অপরে আমার জিনিষ লইয়া পসার করিতেছে, আর আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি, এটি কাহার দোষ? এটি কি সাধারণ লোকের দোষ না বাবুগণের দোষ? না আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীদিগের দোষ? বাবুগণ ও সাধারণ লোক চিকিৎসাশাস্ত্রের কি বুঝিবে যে তাহার উন্নতি করিবে? যে যে ব্যবসায়ের লোক, তাহার সেই ব্যবসায়ের উন্নতিতে মনোনিবেশ যুক্তিসঙ্গত এবং চেষ্টা করিলে কেবল তিনিই অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দেখুন হানিমানের উপাসকেরা কেমন অধ্যবসায় সহকারে ঐ মত দেশ বিদেশে প্রচার করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা নব্যসম্প্রদায় আমার গুণ বুঝিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইলে কস্মিন্ কালেও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার হইবে না।

কবিরাজী ডাক্তারী যে কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রই হউক, ইহাদিগের মত বিভিন্ন হইলেও দুইটী বিষয়ে মতানৈক্য থাকা উচিত নহে। সে দুইটী শারীর বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসা। যে কোন চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারেই চিকিৎসা কর, কিন্তু শারীরবিদ্যায় অধিকার থাকা অতীব আবশ্যক। এই শারীরবিদ্যা অর্থাৎ নাড়ী, স্নায়ু ও মাংসাস্থি প্রভৃতির সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রেই এক হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে "এনাটমি" অর্থাৎ শারীরস্থান ভাল নাই, সুতরাং এক্ষণে উহা বিদেশীয় হইতে শিক্ষা করা দোষ নহে। সেইরূপ অস্ত্রচিকিৎসা কোন এক বিশেষ চিকিৎসা-শাস্ত্রের এক চেটিয়া সম্পত্তি নহে। উহাতে সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরই সমান অধিকার। সন্তানের মস্তক বড় হওয়ার জন্য প্রসব হইতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও কষ্ট হইতেছে, ফর্‌সেপ্ বা অঙ্কুশ দিয়া ছেলেটী কৌশলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া দিলাম। ইহার

আর এমত সেমত কি? এই অস্ত্র চিকিৎসা এলপ্যাথি ডাক্তারদিগের হাতে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, এমন আর কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতকগুলি নূতন মত সন্নিবেশিত করা এবং কবিরাজ মহাশয়দিগেরও অস্ত্র চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শারীর স্থান ও অস্ত্রবিদ্যার উন্নতি না হইলে আয়ুর্ব্বেদ কখনই অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। যত প্রকার পীড়া আছে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক এই অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয়। ধাত্রীবিদ্যাও অস্ত্রচিকিৎসার অঙ্গবিশেষ। সম্মিলনীতে প্রকাশিত কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় লিখিত আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা যদি আয়ুর্ব্বেদ মতে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয়, তবে উক্ত পুস্তক সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত পুস্তকের উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে আজিকার কালের ডাক্তারদিগের নিকটে পদে পদে অপ্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা। এবং রোগীরও বিলক্ষণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ আজিকার দিনের ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারগণ প্রসব করাইবার যে সকল অসংখ্য কৌশল শিক্ষা করেন, তাহার সিকি পরিমাণ উপদেশও উক্ত গ্রন্থে প্রাপ্ত হইবার যো নাই। যাঁহারা ইংরেজী প্লেফেয়ার, লিস্‌ম্যান প্রভৃতির ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কবিরাজ প্রসন্ন চন্দ্রের গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথার যাথার্থ্য অনুমান করিতে পারিবেন। এই সকল pratical science বিষয়ক গ্রন্থের উপদেশ অত্যন্ত বিশদ হওয়া প্রয়োজনীয়। প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে প্রসূতির উদর চাপিয়া ঝাকি দিলেই যদি প্রসব হয়, তার আর ভাবনা ছিল না। হয়ত অশিক্ষিত দায়ের হস্তে ঐ ঝাঁকিতেই সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। কেমন করিয়া কি কৌশলে ঝাঁকি মারিতে হইবে, সন্তানের মাথা ও পা কোন্ দিকে আছে, সে সকল জানিবার উপদেশ অতি বিশদ হওয়া প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের গৃহিণীরা নাকি টোট্‌কা মুষ্টিযোগ প্রভৃতি দ্বারা এবং অধ্যাপকগণ সুপ্রসব মন্ত্র ও ৩২ সের ঘর পূরণদ্বারা নাকি সহজে প্রসব করাইতেন। যে সকল স্থানে নাকি ডাক্তারগণ বলিয়াছেন ফরসেপদ্বারা প্রসব না করাইলে প্রসূতি মারা যাইবে, সে সকল স্থানেও নাকি মুষ্টিযোগ, ঔষধি দ্বারা প্রসূতি প্রসব করিয়াছে। এগুলি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভ্রমসংকুল কথা মাত্র। পরন্তু মন্ত্র ও টোট্‌কা ঔষধে নির্ভর করিয়া

পল্লীগ্রামে অদ্যাপিও যে অসংখ্য প্রসূতি ৪ দিন ৫ দিন কষ্ট পাইয়া মারা পড়িতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল স্থানে কত প্রসবমন্ত্র, কত জলপড়া ও কত টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরন্তু ডাক্তারদিগেরও ভাল ভাল টোট্‌কা ঔষধ আছে। কিন্তু এই সকল ঔষধ সেই সকল স্থানে কার্য্যকারী, যে সকল স্থলে অতি যৎসামান্য কারণে প্রসূতি প্রসব করিতে পারে না। পরন্তু ভাল ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডাক্তার যেখানে যেখানে বলিয়াছেন যে, ফর্‌সেপ দ্বারা বা সন্তানের মস্তক বিদীর্ণ করা ব্যতীত প্রসূতি প্রসব করিতে পারিবে না। সে স্থানে জলপড়া ও টোট্‌কা ঔষধি কেবল সময় নষ্ট করিয়া প্রসূতির জীবনের আশা কমাইয়া ফেলে মাত্র। কত সময় পর্য্যন্ত প্রসূতিকে আপনি প্রসব হইবার সময় দেওয়া যাইতে পারে, কত সময় গত হইলে প্রসবকার্য্যে আর বিলম্ব করিলে প্রসূতির জীবন শঙ্কটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সন্তানের মস্তক স্বাভাবিক অপেক্ষা, কতটুকু বড় হইলে স্বাভাবিক দ্বার দিয়া তাহা বহির্গত হইতে পারে না? প্রসূতির প্রসব দ্বার স্বাভাবিক অপেক্ষা কত ছোট হইলে সন্তানের মাথা বাহির হইতে পারে না। এবং সে দ্বার মাপিবার উপায় কি? সন্তানের হাত বাহির হইলে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা হাত কখনও ঘুরিয়া গিয়া মাথা আসিতে পারে না। এবং প্রসবদ্বার স্বাভাবিক সংকীর্ণ হইলে তখন টোট্‌কা ঔষধে ফল হইতে পারে না। পরন্তু এই সকল গুরুতর বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া কখনই টোট্‌কা ঔষধের ও মন্ত্রতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকের উচিত নহে। অজ্ঞ লোকও অজ্ঞ ধাত্রীর কথায় নির্ভর করিয়া কত প্রসূতি বিনষ্ট হইতেছে, তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কত সময় পর্য্যন্ত নিরাপদে প্রতীক্ষা করা যাইতে পারে, সেই সময়টী ঠিক করিয়া কেবল সেই সময় পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। অতি অল্পদিবস হইল, নদীয়া জেলার রাণাঘাট নগরে একটী স্ত্রীলোক প্রসব হইতে না পারিয়া ৩ দিবস পরে প্রাণ হারাইয়াছে। এই প্রসূতির প্রথম সন্তান হইবার সময় একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পরীক্ষান্তে স্থির করেন যে, প্রসূতির প্রসবদ্বার স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তিনি তদনুসারে সন্তানের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া প্রসব করান, তাহাতে সেবার প্রসূতির প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রসব করিবার সময় ডাক্তার না পাওয়াতে প্রসূতিটী অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়া মারা পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচারের সময় নিরপেক্ষ ভাবে সকল কথায় আলোচনা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বিশেষ কোন অসংলগ্ন কথা বা মত থাকিলে তাহার পরিহার করিতে হইবে। এমন কি, পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ ভাঙ্গিয়া এখনকার কালানুযায়ী নূতন নূতন গ্রন্থের সৃষ্টি করিতে হইবে। যাহাতে এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আয়ুর্ব্বেদের উপর ভক্তির উদয় হয় এবং আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তাহা করিতে হইবে।

কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় একজন আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত কবিরাজ। আয়ুর্ব্বেদ উন্নতি সম্বন্ধে দেশের লোক তাঁহার নিকট আশা করিতে পারে। কিন্তু তিনি আয়ুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যে দুই এক স্থলে ভ্রমে পড়িতেছেন, সেই গুলি দেখাইয়া দেওয়া আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র তাঁহার লিখিত গর্ভোৎপত্তি প্রবন্ধে এক স্থলে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক কামভাবে পরস্পর যোনি ঘর্ষন করিয়া শুক্রত্যাগ করিলে গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে। এবং তৎপরেই বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত কোন সাহেবের মুখ হইতে এই কথা নির্গত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেহই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। এই কথার উত্তরে আমরা—নব্য সম্প্রদায়েরা বলিতে পারি যে, যেমন কোন কোন নব্য সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি বিদেশী সাহেবী মতের উপর নিতান্ত অনুচিত ভাবে শ্রদ্ধাবান্, সেইরূপ কোন কোন সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্যক্তি এতই স্বশাস্ত্রের ভক্ত যে দেব সংস্কৃত ভাষায় ছাই পাঁশ যাহাই কেন লেখা থাকুক, বিচার না করিয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসেন। কিন্তু এই সকল অসংলগ্ন কিম্ভূত কিমাকার মত প্রচার করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করা উচিত "শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায় দেখিলেও না হয়।" পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ছিল। প্রায় সকল লোকেই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। সে কালে এখনকার বটতলার ন্যায় পুস্তকেরও অভাব ছিল না। আবার সে কালের ব্রাহ্মণমাত্রেই যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন এমনও প্রমাণ নাই। ভাল মন্দ, বেশী কম, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে কোন কথা ঋষিবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। "নেই তাই খাচ্চ, থাক্‌লে

কোথা পেতে, কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।" এইটী যদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত, তবে কি কবি কালিদাসের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইত? এই যে নূতন পঞ্জিকায় খোনার বচন দেখা যায়, তাহা কি খোনার লেখা, না প্রকৃত হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র! আর নব পঞ্জিকায় যে জ্যোতিষ বচনের মধ্যে থাকে দিবাভাগে কন্যার বিবাহ দিলে কন্যা পতিঘাতিনী হয়, তাহাও কি প্রামাণিক জ্যোতিষ শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে? পুরাণে ভগীরথের জন্ম কথা আছে, ঐ পুরাণ সৃষ্ট হইবার পর কি ঐ শ্লোকটীর রচনা হইয়াছে সম্ভব নয়? এই যে মহাভারতে দ্রোণের জন্ম কথা বর্ণিত আছে, তাহা কি বিজ্ঞানসম্মত? রমণীর স্বপ্ন দোষ হইলে যদি গর্ভের সঞ্চার হয়, তবে পৃথিবীর সৃষ্টি কার্য্য উল্টাইয়া যায়।

ক্রমশঃ—

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত "মূলে ভুল" বা বৈদ্যশাস্ত্রের অবনতির যথার্থ কারণ বিষয়ক প্রবন্ধের যে প্রতি অক্ষরে অক্ষরেই নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা ২।৪ জন অজ্ঞ বা গোঁড়া লোক ভিন্ন বোধ হয়, কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ তাঁহার লিখিত "সকলের অপেক্ষা দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরাই দেশীয় চিকিৎসার অবনতির প্রধান কারণ, তাঁহারা আন্তরিক যত্ন করিলে প্রকৃতই ইহার সবিশেষ উন্নতি করিতে পারেন, শারীর ও অস্ত্রবিদ্যাই চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বিদ্যা, সুতরাং শারীর ও অস্ত্রবিদ্যায় রীতিমত জ্ঞানব্যতীত কোন চিকিৎসকই প্রকৃত চিকিৎসক পদবাচ্য নহেন, এমন কি তাঁহারা যতবড়ই ব্যাকরণবাগীশ হউন, তথাপি তাঁহাদিগকে হাতুড়ের আসনে স্থান দিলেও অন্যায় হয় না" ইত্যাদি কথা সম্পূর্ণ সত্য ও নিতান্তই যুক্তিযুক্ত এবং পাকা কথা। আমরা কবিরাজ হইয়াও সর্ব্বাংশেই প্রাণের সহিত এ সকল সত্যবাক্যের সমর্থন করি। তবে অবশ্য তাঁহার লিখিত কোন কোন কথার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল নাই। যাহা হউক, পুলিন বাবুর আংশিক প্রবন্ধের উপর এবারে আমরা আর অধিক কিছুই বলিব না, দেখি তিনি আরও কি বলেন, পরে আমরাও সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিব।

চি, স, স,

আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।—অগ্নিমান্দ্যাধিকার।

বিষমেকবিধং হন্যাৎ বিষমন্যৎ তথাগুণম্।
অতো ভিষগ্‌ভিরুদ্দিষ্টং বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥*

অগ্নিমান্দ্য হইতে অজীর্ণ এবং তাঁহা হইতেই পরিশেষে সকল প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং আমরাও প্রথমে অগ্নিমান্দ্যের বিষয় বলিতেছি। অগ্নি কাহাকে বলে? যে অগ্নি সর্ব্বদা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, জ্বালানী কাষ্ঠ যোগে যদ্দ্বারা সকলে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করে, যাহার কণিকা যোগে সরস নীরস সকল বস্তুই ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাও কি ঠিক্ সেই প্রকার কোন পদার্থ? তদুত্তরে বলা যইতেছে যে, অত্যুচ্চ সূর্য্যমণ্ডল হইতে রসাতল পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্রই এক জাতীয় অগ্নি বিরাজ করিতেছে। কাষ্ঠে কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে যে অগ্ন্যুদ্গম হয়, সেই অগ্নি দ্বারা পরিশেষে সকল প্রকার কার্য্যই সংসাধন করা যায়। কিন্তু তাড়না না করিলে সেই অগ্নি কখনও উৎক্ষিপ্ত হয় না। কাষ্ঠের ন্যায় জীবদেহেও অগ্নি আছে। কাষ্ঠ খণ্ড নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে, সুতরাং তাড়না না করিলে তাহা হইতে অগ্ন্যুদ্গম হয় না। জীবদেহ তদ্রূপ নয়। দেহ মধ্যে এক এক নিমিষে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে রস রক্তাদি অবিরত সঞ্চালিত হইতেছে। যন্ত্র গুলিও নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে না। ইত্যাদি বিষম তাড়নায় কাষ্ঠখণ্ডাপেক্ষা শরীরাভ্যন্তরে অগ্নির উত্তাপ কিঞ্চিৎ অধিক। পাছে দাবানলের ন্যায় অত্যন্ত অধিক হইয়া শরীরের রস শোষণ করিয়া ফেলে এবং মাংস পরিপাক করিয়া দেয়, তদাশাঙ্কায় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পানাহার করিতে হয়। নতুবা শরীর নষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদগুরু ভগবান্ পুনর্ব্বসু এবং ভদ্রকাল্য প্রভৃতি ঋষি কহিয়াছেন "পিত্তই শরীরের অগ্নি।" পিত্তকে সাম্যভাবে রক্ষা করিতে পারিলেই শরীর সুস্থ থাকে। যে পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব, দুর্গন্ধ, নীল ও পীতবর্ণ, যাহা উষ্ণ এবং

---

* হানিমান যদি প্রত্যেক অধ্যায়েরই শিরোভাগে Similia Similibus এই সূত্রের উল্লেখ করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন উপরোক্ত শ্লোকটী উল্লেখ না করিব?

কটুরসবিশিষ্ট, তাহাই স্বাভাবিক। পিত্তে অম্লরস জন্মিলে তাহা দূষিত হইয়া কার্য্যভেদে এই পিত্তকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(১) পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া ভুক্তবস্তুর পরিপাকসাধন করে এবং মলমূত্রাদি নিঃসরণ করিয়া দেয়। আরও এতদ্দ্বারা অন্যান্য পিত্তের বলবৃদ্ধি হয়। (২) রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থিতি করে। এবং ভুক্তবস্তু প্রথমবার পরিপাক হইয়া যে রস জন্মে, তাহাই আবার এতদ্দ্বারা রক্তে পরিণত হয়। (৩) সাধকপিত্তদ্বারা বুদ্ধি, স্মৃতি এবং মেধা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। (৪) আলোচকপিত্তদ্বারা দর্শনক্রিয়া সাধিত হয়। নেত্রদ্বয় ইহার অবস্থিতি স্থান। (৫) ভ্রাজকপিত্ত সমস্ত দেহের ত্বকে অবস্থিতি করে। ইহা অভ্যঙ্গদ্রব্যের পরিপাচক এবং শরীরের কান্তিবর্দ্ধক। এই সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচপ্রকার পিত্তই অগ্নিশব্দে অভিহিত। লক্ষণে ইহার বিকৃতি ভাব বলা যাইতেছে। অগ্নি চারিপ্রকার অবস্থায় জঠরে অবস্থিতি করে। মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সমাগ্নি। শরীরে কফাধিক্য হইলে মন্দাগ্নি উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় যাহা কিছু আহার করা যায় তাহা সুন্দররূপ পরিপাক হয় না। ইহাতে মাথার কন্‌কনানি, উদ্গার বাহুল্য, উদর স্ফীত, উদরের গুরুত্ব, মলরোধ এবং মূত্রাধিক্য প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সামান্য সর্দ্দিতেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু জঠরে কফসঞ্চিত হইলেই এই অবস্থা হয়। ইহা একপ্রকার অজীর্ণ। জঠরে পিত্তের আধিক্য হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি জন্মে। তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট লোক যাহা যাহা আহার করে, তাহাই তখনি পরিপাক হইয়া যায় এবং শীঘ্র শীঘ্র আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। ইহাতে শরীরের শোষ আরম্ভ হইলে পীড়া সাংঘাতিক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। বাতাধিক্য জন্য বিষমাগ্নির উৎপত্তি হয়। বিষমাগ্নি হইলে উক্তবস্তু কখনও শীঘ্র শীঘ্র পরিপাক হয়, কখনও বা বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সমাগ্নিই শরীরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যসম্পাদক। সমাগ্নিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে সকলের কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার অবস্থাকেই অজীর্ণরোগ কহে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগ কফদোষ থাকিলে তাহাকে আমজীর্ণ, পিত্তদোষ থাকিলে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বাতাধিক্য হইলে বিষ্টব্ধাজীর্ণ কহে। প্রতি দিন যাহা কিছু আহার করা যায়, সেই সমস্ত আহারীয় রসের সমুদায় অংশ জীর্ণ না হইয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং

তদ্দ্বারাই সময়ান্তরে অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে রসশেষ জীর্ণ কহে।

এক্ষণে ইহাদের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। সমাগ্নির রক্ষা, বিষমাগ্নিতে বায়ু দমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত প্রশমন এবং মন্দাগ্নিতে কফ সংশোধন করা কর্ত্তব্য। আমাজীর্ণ হইলে প্রথমে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদ প্রদান এবং রস শেষাজীর্ণে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা একান্ত হিতজনক। আবার কেহ কেহ বলেন শেষোক্ত অজীর্ণে সকালবেলা শীতলজল পান করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলে উপকার হয়। অজীর্ণ রোগে হেতুসদৃশ মতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয় না। ব্যাধিসদৃশ বা হেতু ব্যাধি-সদৃশ মতে চিকিৎসা করিলে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ হয়। উদ্গার বাহুল্য, পেটফাঁপা এবং পেটের বেদনা বিদ্যমান থাকিলে কচি মূলার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ।০ তোলা বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ২।৩ বার সেবন করিলে উপকার হয়। অথবা অপক্ক মূলার রস এক ফোটা জলের সহিত সেবন করিবে। অধিক পরিমাণে মূলা খাইয়া অজীর্ণ হইলে যে প্রকার উদ্গার এবং পেট ফাঁপা উপস্থিত হয়, মূলা না খাইয়া যদি কাহারও ঠিক্ সেই প্রকার অবস্থা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার মূলার ক্বাথ বা রস প্রশস্ত। অন্যান্য ঔষধের কথা পরে বলা যাইবে। এক্ষণে সামান্য অজীর্ণ হইতে যে সকল যন্ত্রণাদায়ক এবং সদ্য প্রাণনাশক পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। অজীর্ণ নিতান্ত দুরূহ পীড়া। প্রথমতঃ কেহই ইহাকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা হইতেই মূর্চ্ছা, প্রলাপ, ভ্রম এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে, যাহারা অপরিমিতাহারী লোভপরায়ণ পশু, তাহারাই রোগ সমূহের মূলীভূত অজীর্ণ দ্বারা আক্রান্ত হয়, পরিমিতাহারী জিতাত্মাগণ কখনও এতদ্বারা আক্রান্ত হয় না। আম, বিষ্টব্ধ এবং বিদগ্ধ, এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের কথা ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার হইতেই বিসূচিকা, অলসিকা এবং বিলম্বিকা, এই তিন প্রকার সাংঘাতিক পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। এক্ষণে তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। ক্রমশঃ—

দীনাবাজার
জলপাইগুড়ি

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।—
চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

মহাশয়!

আমি একজন রীতিমত চিকিৎসাব্যবসায়ী অথবা কোন উপাধি-ধারী ডাক্তার বা কবিরাজ নহি, সুতরাং মহাশয়ের পত্রিকায় অভীষ্ট লিখিতব্য লিখিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া মহাশয়ের পত্রিকার পাঠকগণের নিকট পরিচিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় নিম্নে তাহা বর্ণন করিতেছি। আমাদের দেশে এরূপ অনেক লোক আছেন যে, তাঁহারা যে সমস্ত রোগের ঔষধ অবগত আছেন, তাহা প্রাণান্তেও কাহাকেই শিক্ষা দেন না, নানাবিধ ওজর আপত্তি দেখাইয়া থাকেন, আর সময়ে সময়ে ইহাও লক্ষিত হয় যে, অনেক কষ্টসাধ্যরোগ, ডাক্তার কবিরাজে আরাম করিতে পারে নাই, কিন্তু উহারা সামান্য মুষ্টিযোগ ঔষধে অনায়াসে আরাম করিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহাদের জানিত ঔষধের গুণাগুণ কাহাকেও শিক্ষা না দেওয়ায় আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। আর ঔষধ গুলিও আবার উহাদের সহিত লোপ পাইতেছে। লোকের উপকার করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, তবে কেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া ঐ পরোপকারজনিত পুণ্যসঞ্চয় করিতে বিরত থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যতদিন না তাঁহারা কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া সরল অন্তরে তাঁহাদের জানিত ঔষধের গুণাবলি লোককে না শিক্ষা দিবেন, ততদিন দেশের মঙ্গল নাই। আজ কাল অনেকে ওসংস্কার ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন ইহাও কম আহ্লাদের বিষয় নহে।

আমি সহর কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার জমীদার-বংশসম্ভূত মহয়সী ধীশক্তিসম্পন্ন, বিখ্যাতনাম্না, বহুভাষাবিৎ, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, দয়াশীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র। বহুদিন যাবৎ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক

গণের সহিত রোগীর শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাপ্রযুক্ত ও অনেকানেক চিকিৎসা গ্রন্থ আলোচনা হেতু চিকিৎসা সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি ও নানাবিধ তত্ত্বাবলীও অবগত আছি। প্রশংসিত পিতাঠাকুর মহাশয় স্বকীয় অধ্যবসায়িতা গুণে বহুতর চিকিৎসাশাস্ত্র সমালোচনা ও অনেকানেক সুবিজ্ঞ কবিরাজ, হাকিম, ডাক্তার প্রভৃতি চিকিৎসাব্যবসায়ী ও পরমহংস সন্ন্যাসীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ও সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যে সকল আশুফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রভৃতি মুষ্টিযোগ ঔষধাদি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে সাধারণের হিতার্থে তাহা প্রকাশ করণাভিলাষে মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম।

পিতাঠাকুর মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চিরদিনই প্রগাঢ় ভক্তি আছে ও তৎসম্মত কতকগুলি মুষ্টিযোগপালন ও ফলমূল আহারবিহারেই কেবল তিনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থগুলি (বহু পুরাতন, দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ সংস্করণ ও পুঁথি সহিত) আমাদের বহুমূল্য পুস্তকাগারে সংগৃহীত আছে ও উহার অধিকাংশ স্থলগুলি অদ্যাবধি পিতার মুখাগ্রে আছে। পূর্ব্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ১ জন করিয়া তাঁহার নিকট গৃহ চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল বিজাতীয় চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে ও আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিপ্রভাবে উক্ত নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন দুর্দ্দশার দিনেও আজ ৬৭ বৎসর অতীত হইল পিতাঠাকুর মহাশয় ভয়ানক গ্রহণীরোগগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার যাবতীয় ইংরাজ ও দেশীয় এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ নামজাদা ডাক্তারগণ দ্বারা বহুদিন চিকিৎসিত হইয়া নিষ্ফল হন। শেষে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় প্রায় ২ বৎসর যাবৎ রোগভোগের পর মুমূর্ষু অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের শরণাগত হন ও বহুদর্শী সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক মহাশয় কিছু কাল চিকিৎসার পর তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত করিয়া দেন। তাহার পর অদ্যাবধি তিনি বেশ সুস্থশরীরে আছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর ও অদ্যাবধি তিনি আয়ুর্ব্বেদ মতে আহার বিহার করিয়া থাকেন। নিশি জলপান, বেল, ওল, শুশুনি শাক প্রভৃতি আহার, প্রাতে গো বা ছাগীদুগ্ধ পান, সৈন্ধব

সংযুক্ত আর্দ্রক ও ঋতু হরিতকী ভক্ষণ, ব্যায়াম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি লঘু ভোজনাদি অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদে যে যে দ্রব্য খাইলে ও করিলে মনুষ্য দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, লিখিত আছে, তৎসমস্ত ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর হইতে অদ্যাবধি একাদিক্রমে পালন করিয়া আসিতেছেন ও ঐ সকলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া যথার্থই তার্ক্ষ্যতুল্য চক্ষুবিশিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়া রোগশূন্য দেহে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী ধন্বন্তরী কবিরাজ শ্রদ্ধাস্পদ ৺ পীতাম্বর সেন কবিরত্ন মহাশয় বহুকাল যাবৎ পিতাঠাকুরের নিকট গৃহ-চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও প্রতিদিন প্রাতে ২।১ ঘণ্টা করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিয়া যাইতেন। কালীঘাট নিবাসী পণ্ডিত ৺ গৌরী নাথ সেন কবিরঞ্জন কবিরাজ মহাশয়, চাঁনক নিবাসী বৈদ্যকুলতিলক ৺ ঠাকুরদাস রায়, বিক্রমপুর নিবাসী বৈদ্যরত্ন ৺ মদন মোহন সেন কবিরাজ, পাবনা নিবাসী বহুশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক ৺ কৃপানাথ সান্ন্যাল ও ধন্বন্তরী চিকিৎসক কুল-ভূষণ ৺ রমানাথ সেন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়েরা কেহ কেহ গৃহ চিকিৎসক কেহ বা বন্ধুত্ব ও চিকিৎসাসূত্রে আগমন করিয়া রোগ ব্যবস্থাদি ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোচনা করিতেন। তৎপরে অধুনা চিকিৎসক শিরোরত্ন শ্রীযুক্ত গঙ্গা-প্রসাদ সেন, বহুশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সেন, গোপীবল্লভ রায় প্রভৃতি কবিরাজ মহোদয়েরা সময়ে সময়ে চিকিৎসাসূত্রে আগমন করিতেন ও অদ্যাবধি আসিয়া থাকেন। ঐ সূত্রে পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর মহাশয় উপরোক্ত মহোদয়গণ দ্বারা যে সকল আশু ফলপ্রদ মুষ্টিযোগাদি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন বা স্বয়ং ঐ সকল মহোদয় কর্ত্তৃক সামঞ্জস্য করাইয়াছিলেন বা উহাদের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। ডাক্তারী হাকিমী প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ বহুবিধ সংগ্রহ আছে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। অতি আবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য কতকগুলি দ্রব্যের দ্রব্যগুণ তত্ত্ব ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কতকগুলি বিষয়ও লিখিত আছে, তাহাও প্রকাশিত হইবে। পিতাঠাকুর মহাশয় বার্দ্ধক্যহেতু স্বয়ং এবিষয়ে অক্ষম হওয়ায় আমাকে এগুলি প্রকাশের জন্য অনুমতি দিয়াছেন।

আমি কি লিখিতে বসিয়া কি লিখিতেছি। সম্পাদক ও পাঠক মহাশয়

গণ আমার এই বাহুল্য জনিত শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও আমার মুষ্টিযোগ গুলি যে নিতান্ত অসার বা বাজে লোক হইতে প্রাপ্ত নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন্ মুষ্টিযোগ ইত্যাদি কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অদ্য কএকটী ঔষধ সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করিলাম। অবশিষ্ট গুলিও ভবিষ্যতে আমি আরো যত অবগত হইব, সমস্তই ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। মৎপ্রেরিত ঔষধগুলির দ্বারা সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে যাবতীয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

যদি উপরোক্ত বিষয় গুলি অতি রঞ্জিত বা বাহুল্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে পরিত্যাগ করিতে পারেন। ঔষধ গুলির কোন কোন স্থলে পরিমাণাদিতে অসংলগ্ন ও অশুদ্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহাও পিতাঠাকুরের সময়াভাবে সংশোধন করাইবার আর সম্ভাবনা নাই। মহাশয় কৃপা করিয়া ঠিক্ করিয়া লইবেন। আর আমি ভাষার দিকে কিছুই দৃষ্টি রাখি নাই। মহাশয় কোন স্থান পরিত্যাগ, নূতন সংযোগ, অশুদ্ধি শোধন ইত্যাদি সমস্ত করিয়া লইবেন। আমার কেবল ঔষধ গুলি যাহাতে সাধারণে জানিতে পারে তাহাই আন্তরিক ইচ্ছা। এক্ষণে মহাশয় কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক মহাশয়ের পত্রিকায় স্থান দান করিলে চিরবাধিত হইব।

প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বসু নামা পিতাঠাকুর মহাশয়ের জনৈক বন্ধু ৺ বারাণসী ধাম পরিভ্রমণ কালীন এক পরমহংস সন্ন্যাসী হইতে উপরোক্ত অত্যাশ্চর্য্য পরমোপকারী মহৌষধ প্রাপ্ত হন ও প্রস্তুতীকরণ নিয়মাবলী লিখিয়া লয়েন। পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু কাল পরে উক্ত ঔষধ প্রস্তুত করণ অতি দুরূহ ব্যাপার বিবেচনায় পিতাঠাকুরকে উহার নিয়মাবলি ও পরিমাণাদি লিখিয়া দেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি উহা প্রস্তুত হইয়া লোক হিতার্থে আমাদের বাটীতে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্ব প্রথমে ধন্বন্তরী কবিরাজ শ্রীযুক্ত পিতাম্বর সেন কবিরত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা প্রস্তুত হয়। প্রায় ৯।১০ বৎসর হইতে উহার বিস্তার কিছু কমিয়া আসিতেছে, কারণ ডাক্তারীর প্রাদুর্ভাব ও উহার অত্যাশ্চর্য্য কুহকে পড়িয়া লোকে আর বড় একটা লইতে আইসে না। পূর্ব্বে আমরা স্বয়ং ঔষধ বিতরণ করিয়া দেখিয়াছি যে দিবারাত্রে ২৫।৩০ জন লোক ঔষধ লইয়া গিয়াছে, আবার অধিকাংশ লোকই ডাক্তার

কবিরাজ কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইত। উহা ওলাউঠা রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় প্রয়োগ করিলে কদাচ নিষ্ফল হয়। জ্বর বিকারেও ঐ অবস্থায় আশু ফলপ্রদ। এ ঔষধের গুণ আমরা এক মুখে বর্ণন করিতে পারি না। আমরা কত তীরস্থ রোগীকেও গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়াছি। উহা সেবনে ওলাউঠা রোগী কদাচিৎ মরিতে দেখা গিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺ পীতাম্বর সেন প্রভৃতি মহোদয়েরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন ও শতমুখে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ উহা সামান্য জ্বরেও ব্যবহার করিতেন।

কালকেতুরস।

প্রস্তুত প্রণালী।

ছোটবটী।		বড়বটী।	
কজ্জলি।	১ এক তোলা।	কজ্জলি।	১ এক তোলা
অমৃত।	১ এক তোলা।	তাম্র (জারিত)	১ এক তোলা।
দারমুচ।	১ এক তোলা	দারমুচ।	১ এক তোলা।
আফিং।	৩ তোলা	অমৃত।	১ এক তোলা।
	৬ তোলা।	শিমূলক্ষার।	১ এক তোলা।
		গোদন্ত হরিতাল।	১ এক তোলা।
		বাঁশপাতা ঐ।	১ এক তোলা।
		লৌহ (জারিত)।	১ এক তোলা।
		অভ্র (জারিত)	১ এক তোলা।
		তুঁতে।	১ এক তোলা।
		আফিং (অহিফেণ)	৩ তিন তোলা।

ভাবনা।

আদার রসে তিন দফা।

কাঁচা সিদ্ধি অভাবে শুকনা সিদ্ধি সিদ্ধ করিয়া ঐ জলে তিন দফা।

ভৃঙ্গরাজের রসে তিন দফা।

বটী সরিসা প্রমাণ।

পূর্ণমাত্রা ৫।৭।৯ টা পর্য্যন্ত।

বালকদিগের বয়সানুসারে ১।২।৩ টা পর্য্যন্ত।

ভাবনা।

নিসিন্দাপাতার রসে ৩ দফা।

আদার রসে ৩ তিন দফা।

কনকধুতরার শিকড়ের রসে ৩ তিন দফা।

বটী রতি প্রমাণ।

পূর্ণমাত্রা ১ টী

বালকদিগের বয়সানুসারে $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$ ইত্যাদি

অনুপান।

পুরাতন গুড় অভাবে মধু আর কেলেজিরে ভাজা গুঁড়া।

শোধন প্রকরণ।

অমৃত।—গোমূত্রে এক দিন ও রাত্র ভিজাইয়া রাখিবেক।

দারমুচ।—পাতিলেবুর রস দিয়া এক দিবা রাত্র ভিজাইয়া রাখিবেক, পরে গোবরের জলে দোলা যন্ত্রে এক প্রহর সিদ্ধ করিবেক।

গোদন্ত।—	ঐ	ঐ	ঐ
শিমূলক্ষার।—	ঐ	ঐ	ঐ

তুঁতে।—চূণেরজলে এক দিবা ও রাত্র ভিজাইয়া রাখিবেক।

বাঁশপাতা হরিতাল।—কুমড়ার জলে, এক দিবা ও রাত্র ভিজাইয়া রাখিবেক, পরে চুণের জলে এক দিন ভিজাইয়া রাখিবেক।

কতকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয়।

কজ্জলি।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে ৪ প্রহর মর্দ্দন করিলে কজ্জলি প্রস্তুত হয়।

অভ্র, লৌহ ও তাম্র।—ইহাদের শোধন ও জারণ ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতানুসারে হওয়া উচিত।

কজ্জলি, জারিত তাম্র, লৌহ ও অভ্র কোন বিশ্বাসযোগ্য কবিরাজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেও চলিতে পারে।

গোদন্ত হরিতাল।—আজ কাল অকৃত্রিম পাওয়া দুরূহ, বাজারে যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই কৃত্রিম, শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন ধামে অতি উত্তম অকৃত্রিম গোদন্ত পাওয়া যায়।

অমৃত, দারমুচ, শিমূলক্ষার, গোদন্ত, বাঁশপাতা হরিতাল ও তুঁতের ওজন যাহা লিখিত আছে, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বেশী লইতে হইবে, কারণ শোধন করিলে অনেক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সমস্তই জারিত দ্রব্যের ওজন লিখিত আছে।

ভাবনা।—প্রথমে সমস্ত দ্রব্য গুলি যাহাতে বেশ আপ্লুত হয় বা ডুবিয়া যায়, এমত করিয়া রস লইতে হইবে, পরে যতটুক লইলে রস মাড়া যায়, তত পরিমাণে লইতে হইবে। মড়িবার নিয়ম ছায়ায় কোন মতে যেন রৌদ্র না লাগে।

দোলাযন্ত্র।—একটা হাঁড়ির অর্দ্ধেক বা তিন ভাগ চোণা, দুগ্ধ, গোবর-গোলাজল ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া অগ্নিতে চড়াইবে। একটা দণ্ডের মধ্য-স্থলে সূত্রের এক মুখ বদ্ধ করিয়া অপর মুখে ঔষধ পোট্টলী বদ্ধ করিবে। সূত্রটী এরূপ লম্বা লইবে যে, সেই দণ্ড হাঁড়ির মুখে মধ্যস্থলে তীর্য্যক্‌ভাবে রাখিলে সূত্র বদ্ধ ঔষধ হাঁড়ির মধ্যস্থিত তরল পদার্থ ডুবিয়া যাইবে অথচ হাঁড়ির তলায় ঠেকিবে না।

কুমড়ারজল।—অর্থাৎ দেশী ছাঁচিকুমড়া কুরিয়া কাপড়ে নিংড়াইলে যে জল বাহির হইবে।

ঔষধ সেবনবিধি।

ওলাউঠা বা জ্বরবিকারে যখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা অর্থাৎ যখন নাড়ী ক্ষীণ বা ধাত বসিয়া হীমাঙ্গ হইয়া যায়, তখন ছোট বটী বয়সানুসারে ৫।৭ টী বালকদিগের পক্ষে ১।২।৩ টী ও বড় বটী ½ বা অর্দ্ধ খানি লইয়া পুরাতন গুড় অভাবে কেলেজিরে ভাজার গুড়া ও মধু দ্বারা উত্তমরূপে ঐ উভয় বিধ ঔষধ একত্রে মাড়িয়া খাওয়াইবেক। পরে ১ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল পরে রোগীর গাত্র গরম হইলে উত্তমরূপে খাঁটী সরিসার তৈল কণ্ঠায় বক্ষে পায়ের তলায় ও সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। জল পিপাসা হইলে গুড়েবাতাসা ভিজানের জল সেবনীয়। ফল মূল সম্ভবমতে খাইতে পারে। উপযুক্তানুসারে ২ বার ও ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না।

(২) নাসার ঔষধি।

করলারপাতা ৩ টা, ডালিম ফুলের কুঁড়ি ১ টা, আদা একটুক, রসুন এক কোষা। এই কয় দ্রব্য একত্রে থেঁতো করিয়া রস নাকে ফুট দিবে। ইহা নাসার উত্তম ঔষধ।

(৩) কোষ্ঠ বদ্ধের উত্তম জোলাপ।

হরিতকী গুঁড়া	।০ এক সিকি।
নূতন মৌরির গুঁড়া	।০ এক সিকি।
সোণামুখীরপাতার গুঁড়া	।০ এক সিকি।
গোলাপ ফুলের দলের গুঁড়া	।০ এক সিকি।

এই চারি দ্রব্য উত্তমরূপে মিলাইয়া ৪ ভাগ সমান করিয়া তাহারি ১ ভাগ

লইয়া তৎসমান মিশ্রির গুঁড়া মিলাইয়া রাত্রে শয়ন কালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত মিলাইয়া সেবন করিবে। প্রাতে ৩ বার কোষ্ঠ সাফ হইবেক।

ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও পাকা গোঁড়ামী দ্বারা কি এক মাত্র দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেরই অধঃপতন ঘটিয়াছে? তাত নয়, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, বেদ বল, আর পুরাণবল, রীতিবল, নীতিইবল, সাহিত্য বল আর আধুনিক যে কোন বিষয়ই বল, প্রত্যেক বিষয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে এই কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও পাকা গোঁড়ামী প্রবেশ করিয়া ঐ সকলকে একবারেই ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে। তবে চিকিৎসা বিষয়ের যে দুর্দ্দশা অধিক ঘটিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, প্রবন্ধ লেখক শরৎ বাবু নিজে ধনীসন্তান হইয়াও যে এদেশী পচা বদ্দিগিরির প্রতি কুটিল কটাক্ষপাতের পরিবর্ত্তে এত দূর আন্তরিক যত্ন লইয়া এত সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া পরোপকারের জন্য চিকিৎসা-সম্মিলনীতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা সম্মিলনীর এবং আমাদের পক্ষে যথার্থই সৌভাগ্যের ও সাতিশয় আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক। আমরা অতি আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে প্রবন্ধটী যে যথার্থই সারগর্ভ, প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বথা উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

তবে কথা এই যে, এ যে দেশী ঔষধ! কেবল দেশী নয় তাতে আবার বিষমিশ্রিত; সুতরাং বিলাতী-প্রিয় হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য লোকের একটু শুঁঠ পিপুল মিশ্রিত ঔষধের নামেই যে অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিবে না, সে কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় ও দারুণ কলঙ্কের কথা এই যে, রাজানুমোদিত এণ্টীপাইরীন্ বা এণ্টীফেবরীন্ প্রভৃতি বিজাতীয় ঔষধ দ্বারা যে অহোরহ দেশের কত শত অশূরবৎ প্রভূতবলশালী ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সে দিকে কিন্তু কোন মাহাত্মার লক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই। কেননা সে যে বিলাতী ঔষধ, তাহাতে কি আর দোষ থাকিতে পারে? কেবল যত দোষ এই দেশীর সম্বন্ধে, যেহেতু তাহা না হইলে বিষঘটিত এমন সমস্ত জীবনদাতা, প্রকৃতই মৃতশরীরে প্রাণদাতা ঔষধের প্রতি লোকের আস্থা থাকা দূরের কথা, বরঞ্চ সুবিধা পাইলে প্রাণভরিয়া ঘৃণা না করিয়াই থাকিতে পারেন না কেন?

এই যে, কলিকাতা সহরে বা নগরে নগরে ওলাউঠা রোগ দ্বারা প্রতিরোজ অসংখ্য ব্যক্তির অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ হইতেছে, এই যে ঘোরতর জ্বরবিকার দ্বারা কতশত লোকের অকালে প্রাণত্যাগ ঘটিতেছে, এসকল স্থলে কি বলিব? বলিব যে, আয়ু ছিল না

বলিয়াই তাহাদের জীবন নষ্ট হইতেছে? কিন্তু তাহা বলিতে পারি কৈ? যেহেতু শাস্ত্র যে সে দিকেও যান্ নাই। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আহারবিহারাদির অযথা-অত্যাচার অথবা কালের (স্বভাবের) নিদারুণ ব্যভিচারজন্যই এরূপ ঘটিতেছে। যে কারণেই হউক, সুদারুণ ওলাউঠাগ্রস্ত সংজ্ঞা ও নাড়ীরহিতব্যক্তির চিকিৎসায় যে এসকল বিষঘটিত ঔষধে কিরূপ অসাধারণ উপকার দর্শে, কিরূপ মৃতপ্রায় ব্যক্তির শরীরে অত্যাশ্চর্য্য রূপে জীবনসঞ্চার করে, তাহা আমরা শতমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারি না। পারি না বলিয়াই আজ শরৎ বাবুর লিখিত বিষঘটিত ঔষধের সম্বন্ধে প্রাণ খুলিয়া এত গুণগান করিতেছি।

তবে অবশ্য এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক যে, এসকল সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত ঔষধ, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ব্যবহৃত হইলে যেমন মৃতশরীরে জীবনসঞ্চার হয়, পক্ষান্তরে তেমনি যমোপম মূর্খ বৈদ্যদ্বারা ব্যবহৃত হইয়া আবার অনেক জীবন অসময়ে নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সে স্থলে ঔষধের কোন দোষ নাই। ঔষধের প্রয়োগকর্ত্তারই সমূহ দোষ বুঝিতে হইবেক। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা ভূয়োভূয় বলিয়া গিয়াছেন যে, "বরঞ্চ তীক্ষ্ণ সর্প বিষ পান করিয়া মৃত্যু ঘটে সেও ভাল, তথাপি অনভিজ্ঞ যমোপম মূর্খ বৈদ্যদ্বারা চিকিৎসা করান কোনমতেই উচিত নহে" দুঃখের বিষয় এই যে, আজকালকার দিনে অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে সঙ্গে যে সে লোক চিকিৎসক হওয়াতে ত্রিবিধ প্যাথির সকল গুলিতেই এই মূর্খের দলই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

চি, স, সম্পাদক।

ক্লোরোফর্ম্ম-আঘ্রাণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, এল, এম, এস,।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বালকগণকে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার সময় তাহারা অত্যন্ত ক্রন্দন করে এবং সময়ে সময়ে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধস্তাধস্তি করে ও তৎপরে গভীর নিশ্বাস লয়। এই রূপ পর্য্যায়ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ ও গভীর নিশ্বাস লওয়ায় অল্প সময় মধ্যে অধিক পরিমাণে ক্লোরোফর্ম্ম তাহাদিগের ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে, আর দুই এক বার ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করিলেই তাহাদিগের সম্পূর্ণ অসাড়তা উপস্থিত হয়। এই জন্য বালকগণকে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার সময় প্রথমে অল্প বাতাস যাহাতে তাহার ফুস্‌ফুসে যায়, তাহা করিতে হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে হউক না কেন, বিশেষতঃ শিশুদিগকে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার সময় প্রথম দুই একবার গভীর নিশ্বাস লওয়ার পর ইন্‌হেলার অন্তরিত করিয়া

বিশুদ্ধবায়ু সেবন করিতে দিতে হইবে। এরূপে প্রায় সকলেরই ধস্তাধস্তি কমাইয়া দিতে পারা যায়।

অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে রোগী সম্পূর্ণ ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অচেতন ও জড় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না জানিবার প্রধান উপায় চক্ষু-গোলক অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করণ; যদ্যপি এরূপে তাহার চক্ষু পলকে কোন গতি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, চক্ষু-মোচন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তখনও রোগী সম্পূর্ণ অচেতন হয় নাই। অতএব ঐরূপ প্রক্রিয়ায় যদি চক্ষু-পল্লবের কোন গতি না দেখা যায়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, রোগী সম্পূর্ণ অচেতন ও জড় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগীর এইরূপ অবস্থাতে অস্ত্রোপচার সাঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করাইলে সুচারুরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে; রোগীকে কখনও যতক্ষণে তাহার শ্বাসকার্য্য বন্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করান একেবারে উচিত নহে।

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার প্রধান নিয়ম এই যে, রোগী যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অচৈতন্য বা জড়তা প্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ কোন মতেই তাহার অঙ্গ ছুরিকা দ্বারা স্পর্শ করিবে না, কারণ অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিলে তাহার ভয়ে এবং "শ্যকে" (shock) অর্থাৎ স্নায়বিক ধাক্কায় মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যিনি ক্লোরোফর্ম্ম দিবেন, তাঁহার রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে অসাড়তা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শ্বাস কার্য্য বন্ধ না হয়।

যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ক্লোরোফর্ম্ম দিবার পূর্ব্বে রোগীর বক্ষঃস্থল ও উদর অনাবৃত রাখিতে হইবে, তাহা হইলে যিনি ক্লোরোফর্ম্ম দিবেন, তিনি রোগীর শ্বাস-কার্য্য চলিতেছে কি না স্বয়ং তাহা দেখিতে পাইবেন। যদ্যপি কোন কারণে এমন কি ক্লোরোফর্ম্ম দিবার আরম্ভেই রোগীর শ্বাস-কার্য্যের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা তাহা ঘড়্‌ঘড়ে হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিকরূপে না চলিবে, ততক্ষণ ক্লোরোফর্ম্ম কোন মতে দেওয়া উচিত নহে। যদিও এরূপে অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে ক্লোরোফর্ম্মের কার্য্যফল বিলম্বে উপস্থিত হইবে, তথাপি তাঁহার দ্বারা রোগীর প্রাণনাশ হইবে না এবং অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলে তিনি একার্য্য অতি সুচারু-

রূপে করিতে পারিবেন এবং তাঁহার হস্তে ক্লোরোফর্ম্মদ্বারা কোন বিপদ ঘটিবে না।

শ্বাসকার্য্যের কোরূপ ব্যত্যয় ঘটিলে নিম্ন "জ্য" (অধ্য মাড়ি) নিম্নদিকে টানিলে কিম্বা তাহার কোণদ্বয় পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দিলে নিম্ন দন্তপাটী উপরের পাটী হইতে দূরস্থ হইলেই শ্বাস-কার্য্য উত্তমরূপে হইবে। এই প্রকরণে এপিগ্লোটিস্ উত্থিত হয় এবং লেরিংসের মধ্যে অবাধে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে; যদ্যপি ইহাতেও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক প্রকৃতি ধারণ না করে, তাহা হইলে "আরটিফিশ্যাল রিস্‌পিরেসন" করা আবশ্যক।

যদি কোন আকস্মিক কারণে নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তাহা হইলে ক্লোরোফর্ম্ম দেওয়া বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ "আরটিফিশ্যাল রেস্‌পিরেসন" করিতে হইবে। আর্টিফিশ্যাল রেস্‌পিরেশন করিবার সময় অপর একজন, রোগীর মস্তক পশ্চাৎ দিকে নত রাখিবে ও ফরসেপস্ দ্বারা তাহার জিহ্বা টানিয়া রাখিবে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক প্রকৃতি অবলম্বন না করিবে, ততক্ষণ আরটিফিশ্যাল রেস্‌পিরেশন করিতে বিরত হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

ক্লোরোফর্ম্ম দিবার পূর্ব্বে অল্প মাত্রায় ত্বক্‌নিম্নে হাইপোডার্ম্মিক্ সিরিঞ্জ দ্বারা মর্ফিয়া প্রয়োগ করিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অসাড়তা থাকে, এই জন্য যে কোন অস্ত্রোপচারের সময় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্লোরোফর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক, তখন এই প্রক্রিয়া করিলে ভাল হয়। পরিদর্শন দ্বারা দেখা গিয়াছে, এট্রোপিনে ক্লোরোফর্ম্মের কার্য্যের কোনও সহায়তা করে না, বরং তাহাতে অনুপকার ঘটিতে পারে।

ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে রোগীকে সুরাপান করাইলে মন্দ হয় না, কিন্তু দেখিতে হইবে যেন সুরাপানের উন্মত্ততা উপস্থিত না হয়। এ অবস্থায় সুরা দ্বারা বল সহকারে রক্ত পরিচালিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে ক্লোরোফর্ম্ম দিলে হাইদ্রাবাদের ক্লোরোফর্ম্মের কমিসনেরা বলেন যে, কোনরূপে বিপদ ঘটিতে পারে না বরং উপকারই হইয়া থাকে। ভিষকদর্পণ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সুবিচক্ষণ ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বাবু, ক্লোরোফরমের বিষয় আদ্যোপান্ত যেরূপ বিচক্ষণতার

সহিত ধীরভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, উপরোক্ত ঔষধের ব্যবহারকারী এলোপ্যাথ ডাক্তার মহাশয়ের এপ্রবন্ধদ্বারা নিশ্চয়ই অসাধারণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। চি, স; সম্পাদক।

পদ্য মেটিরিয়া মেডিকা।*

কি চিকিৎসা বিষয়ক কি অন্যান্য বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থমাত্রই প্রায় নানারূপ পদ্য ছন্দ ও অলঙ্কারে সজ্জিত দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যগণ সতত স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত পদ্য ছন্দকেই পছন্দ করিতেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে গদ্য ছন্দাপেক্ষা সকল প্রকার পদ্য ছন্দই সহজে কণ্ঠস্থ হয় এবং উহার অল্পাংশ মনে হইলেই সকল গুলি কথা স্মরণ হইয়া থাকে।

নাটক, উপন্যাস, জীবনী, কাহিনী ইত্যাদি কেবল অধ্যয়নের বিষয় সকল, অধিকাংশ পাঠকের রুচি বা যে কোন অনুরোধের অনুকূলে, যে রূপ ছন্দে থাকিতে হয় থাকুক, কিন্তু চিকিৎসা, তন্ত্র, জ্যোতিষ, অঙ্ক ইত্যাদি যে সকল বিষয় সতত জিহ্বাগ্রে থাকিবার দরকার, তত্তদ্‌গ্রন্থের জন্য পদ্য যত প্রয়োজনীয়, গদ্য তত বোধ হয় না। প্রাচীন আর্য্যগণ তজ্জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগ কবিতা দ্বারা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অধুনিক ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্র আর্য্য গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত হয় নাই বলিয়া এত জটিল ও দুষ্পাঠ্য হইয়াছে। এক জন কবিরাজ আর এক জন ডাক্তারকে এক স্থানে বসাইয়া দেখুন; চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা উপস্থিত হইলে প্রথমোক্ত মহাশয় কথায় কথায় বচন প্রমাণ আবৃত্তি করিয়া বিলক্ষণ রূপে স্বীয় মতের দৃঢ়তা দর্শাইবেন এবং নিজেও নিঃসন্দেহ হইবেন; আর ডাক্তার বাবু, হয় চিত্রপুত্তলিবৎ বসিয়া থাকিবেন, নয় বড় কষ্টে দুই একটী সাহেবের নামোচ্চরণ করিয়া দুই একটি দুর্ব্বল কথা বলিবেন। ফলতঃ তাহাতে সভ্যদিগের কটাক্ষও ফিরিবে না এবং তিনি নিজেও নিঃসন্দেহ-চিত্ত হইতে পারিবেন না। ডাক্তারী-বিজ্ঞানের জটিল গদ্য ছন্দই যে ইহার এক মাত্র কারণ, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ইহা কি ডাক্তার

* এই প্রবন্ধলেখকের সহিত আমাকের মতের সম্পূর্ণ একতা নাই। প্রবন্ধলেখক যে সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিপক্ষেও অনেক তর্ক ও যুক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান শাস্ত্র পদ্যে রচিত হইলে যদি তাহার একটী মাত্র গুণ থাকে, দোষ কিন্তু বিস্তর।

হো, চি, সং।

সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধার কথা নহে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অসুবিধাটি এতদ্‌গ্রন্থ-লেখক কৃতবিদ্যগণের মনে এ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় নাই।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র মধ্যে অন্যান্য মত হউক বা না হউক, হোমিও-প্যাথি মত যেরূপ কঠিন এবং কেবল অধ্যয়ন-সাধ্য, তাহাতে এতদ্বিষয়ক গ্রন্থসকল যে পদ্যে বিরচিত হইয়া কণ্ঠস্থ থাকিবার উপায় হওয়া আবশ্যক, বুদ্ধিমান সহৃদয় চিকিৎসকগণ বোধ হয় তাহা কখনই অস্বীকার করিবেন না। কোন সংস্কৃতজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যদি ইহার ভৈষজ্যতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর সুন্দর শ্লোকাকারে রচনা করেন, আমাদের বিশ্বাস যে তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের একটি মহৎ উপকার করা হইতে পারে।

আমরা সংস্কৃতানভিজ্ঞ, সুতরাং সরল বাঙ্গলা ভাষায় পদ্য ছন্দে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ সকলের ভৈষজ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ঔষধ-নির্ব্বাচক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণসকল অতি সংক্ষেপে নিম্ন লিখিত রূপে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হোমিওপ্যাথিক বিদ্যাসাগর জার, হেম্পেল, হিউজ, হেরিং, আলেন, বেল, প্রভৃতি মহাত্মগণের গ্রন্থ হইতে ঔষধ সকলের বিশেষ চিহ্ন-সকল সংগ্রহ করিয়া অনেক গুলি ঔষধের বচন প্রস্তুত করিয়াছি। তন্মধ্যে এবারে নিম্নের নমুনা কয়েকটী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া সাধারণ্যে এই নিবেদন করিতেছি যে, প্রথমতঃ তাঁহারা ইহার ভাষা ছন্দ বা ব্যাকরণের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করিতে পারিবেন না, কেননা অনেক ইংরাজি ও ল্যাটিন শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে এবং তদনুরোধে দেশীয় অপভ্রংশ কথা সকল ইহাতে লিখিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা তাঁহারা কোন রূপ উপকার বোধ করিতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে স্বীয় স্বীয় মত যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অমূল্যধন 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং দয়া করিয়া আমাকে হিতোপদেশ দানে ব্যাধিত করেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

১। আরম্ মেটালিকাম্।

সদা আত্ম-হত্যা চেষ্টা, প্রাণে নাই সাধ। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, বিমর্ষ, বিষাদ।
যে রোগ হ'য়েছে ভাবে আরোগ্য হ'বে না। (হিষ্টিরিয়া রোগে হয় হাসিও কাঁদ্‌না॥

অতিরিক্ত পারা কিম্বা উপদংশ জাত, পিনাস, অস্থিতে ব্যথা, আব, আর ক্ষত। নাসিকা বা তালুর অস্থিতে ক্ষত হ'লে ; যাহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় রাত্রিকালে॥ কর্ণে পূঁজ খণ্ড খণ্ড হাড় সহ পড়ে। চক্ষু ব্যথা—বেশী বাহ্য হইতে ভিতরে। স্পর্শে বাড়ে সেই ব্যথা—অরমের রীত। এসাফিটিডায় এর ঠিক বিপরীত॥

ক্রমশঃ—

পুঁঠিয়া। } শ্রীনলনী নাথ মজুমদার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

উপরোক্ত প্রবন্ধে এমন কোন গুণপনা নাই বা এমন কোনও আবশ্যকীয় কথা নাই, যাহার জন্য এই প্রবন্ধ অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তথাপি উদ্ধৃত করার বিশেষ কারণ এই যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় এই পদ্য প্রবন্ধ উপলক্ষে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানশাস্ত্র পদ্যে রচিত হইলে যদি তাহার একটীমাত্র গুণ থাকে, দোষ কিন্তু বিস্তর।" এ কেমন কথা? তবে কি আমাদের চরকসুশ্রুতাদি সার বৈজ্ঞানিক বৈদ্যক গ্রন্থগুলির অনেক স্থল পদ্যে রচিত হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে অসুবিধারই কারণ হইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। বরঞ্চ গদ্য অপেক্ষা পদ্যই অভ্যস্ত রাখার পক্ষে সহস্রগুণেই শ্রেয়স্কর। তাই বলিতেছিলাম যে, ডাক্তার জগদীশ বাবুর লিখিত কথার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখন কথা এই যে, তিনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক এসম্বন্ধে আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন?

চি, স, সম্পাদক।

ধাতুব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

জ্বর ভিন্ন অন্যান্য অবস্থায় নাড়ীর কি প্রকার গতি হয়, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

সুখিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া চপলা ক্ষুধিতস্য চ।

এস্থলে সুখিতস্য শব্দে ভোজন করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। অতএব ভোজনের অব্যবহিত পরে নাড়ী স্থির অর্থাৎ মন্দ

মন্দ ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। এবং সেই সময় নাড়ী অপেক্ষাকৃত স্থূল-ভাব ধারণ করে। অত্যন্ত ক্ষুধিতাবস্থায় নাড়ীও নিতান্ত চঞ্চলা হয়।

অজীর্ণেন ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে॥

অজীর্ণ শব্দে এস্থলে আমাজীর্ণ ও পক্কাজীর্ণ উভয়ই বুঝিতে হইবে। যদি নাড়ী অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে কোমল বলিয়া বোধ না হয় এবং উভয় পার্শ্বে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিয়া মন্দ মন্দ স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপ পরিপাক শক্তি থাকিলে নাড়ী কোমল, জড়তা শূন্য এবং শীঘ্রগামিনী হয়।

পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেৎশিরা।

পক্কাজীর্ণ হইলে নাড়ীর পুষ্টিতা থাকে না এবং মন্দ মন্দ বেগে স্পন্দিত হয়।

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।

অগ্নিমান্দ্য এবং ধাতু ক্ষীণতা উপস্থিত হইলে নাড়ী শীতল হইয়া মন্দ মন্দ অর্থাৎ হংস গমনের ন্যায় স্পন্দিত হয়।

পাদে চ হংসসদৃশী করে মণ্ডুকসংপ্লবা।
তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহেত্বথবা গ্রহণীগদঃ॥

পদস্থিত পরীক্ষণীয় নাড়ী যদি হংসের ন্যায় এবং হস্তস্থিত নাড়ী ভেকের ন্যায় গমন করে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্য বা গ্রহণী রোগ জন্মিয়াছে জানিবে।

ভেদেন শান্তা গ্রহণীগদেন নির্ব্বীর্য্যরূপত্বতি সারভেদে।
বিলম্বিকায়াং প্লবগা কদাচিৎ আমাতিসারে পৃথুণা জড়া চ॥

যদি অত্যন্ত মল ভেদের পর নাড়ী শান্তভাব ধারণ করে, তাহা হইলে সংগ্রহগ্রহণী, নাড়ী বীর্য্যহীন অর্থাৎ একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অতীসার, নাড়ী ভাসমান হইয়া অর্থাৎ আল্‌গাভাবে স্পন্দিত হইলে বিলম্বিকা এবং মল ভেদের পর যদি নাড়ীর জড়তা ও স্থূলতা উপলব্ধি হয়, তবে আমাতীসার

রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া স্থির করিবে। তাপমান যন্ত্রদ্বারা এই সকল রোগ জানা যাইতে পারে কি না তাহা বলিতে পারি না।

নিরোধে মূত্রশকৃতোর্ব্বিড়্‌গ্রহেত্বিতরাশ্রিতাঃ।
বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎক্রমাঃ॥

যদি মলরোধ বা মূত্ররোধ হয় অথবা মল মূত্র এক বারেই রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভেক গমনের ন্যায় নাড়ী স্পন্দিত হইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থায় নাড়ী নিতান্ত বক্র ও সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করে। মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, বিসূচিকা এবং জ্বর প্রভৃতি পীড়ার মধ্যেও যদি মলমূত্র রোধ হয়, তাহা হইলে ও নাড়ী ঐ ভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বিসূচিকা রোগ উপস্থিত হইলে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় না। কিন্তু শঙ্কর সেন এতৎসম্বন্ধে কহিয়াছেন—

বিসূচ্যাং দৃশ্যতে নৈব নৈবস্থানং বিমুঞ্চতি।

অর্থাৎ বিসূচিকা রোগে নাড়ীর স্পন্দন হইতে দেখা যায় না কিন্তু মূলস্থান অঙ্গুষ্ঠ হইতেও নাড়ী স্খলিত হয় না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে এই রোগে নাড়ী এতদূর সূক্ষ্ম ও তাহার স্পন্দন এতদূর মৃদু হইয়া পড়ে যে, সাধারণ স্পর্শ-জ্ঞান দ্বারা তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না।

ক্রমশঃ—

দীনাবাজার
জলপাইগুঁড়ি } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, লেখক মহাশয় প্রকৃতপক্ষে বড়ই কঠিন প্রশ্নের অবতারণ করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবারেও বলিতেছি যে, তাঁহার প্রশ্ন যথার্থই কঠিনতম। যাহা হউক, এখন লেখক মহাশয়কে ধর্ম্মতঃ একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধানুসারে কেবল মাত্র নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা তিনি গ্রহণ্যাদি পীড়া ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন কি না? আশা করি, আগামী বারে তিনি প্রাণখুলিয়া যথার্থই সরলভাবে আমদের এপ্রশ্নের উত্তর দিয়া সুখী করিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই নাড়ী পরীক্ষা-সম্বন্ধে তিনি সরল পথে গমন করিলে আমরাও অবশ্যই আমাদের প্রাণের সকল কথাই খোলসা করিয়া লিখিব।

চি, স, সম্পাদক।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
ভোজ্য ও ভোজন।

(উদ্ধৃত)

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ জীব। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান দেখা যায়, মানব স্বীয় বুদ্ধি-বলে সেই সমস্ত বস্তু স্বীয় ব্যবহারে আনিয়া থাকে। এই বিবেচনা শক্তি আছে বলিয়াই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব।

পৃথিবী স্বীয় উৎপাদিকা-শক্তি প্রভাবে সকল পদার্থই প্রসব করিতেছেন। সেই সকল পদার্থ হইতে মানবশরীর নির্ম্মিত। এই কথাটী হঠাৎ শুনিতে কি এক রকম বুঝায়। উপমাদ্বারা আমরা এই বুঝি যে "পঞ্চভূত শরীর।" সামান্য তৃণ হইতে স্তন্যদুগ্ধ পর্য্যন্ত মানবশরীর নির্ম্মাণে প্রয়োজন হয়। গাভীতে তৃণ ভক্ষণ করে, তাহা গাভীর জীবন; তাহা গাভীর শরীরের পোষণ করিয়া শরীরে দুগ্ধ জন্মে, সেই দুগ্ধ মানব শরীর রক্ষা করে। এইরূপ পশু পক্ষী প্রভৃতিও মাংসাশীদের শরীর নির্ম্মাণ-পক্ষে সহায়তা করে। অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক উপাদান বিশ্লেষণে দেখা যায়, পৃথক্ পৃথক্ পার্থিব আঙ্গারিক ও অনাঙ্গারিক দ্রব্যে সেই সকল প্রস্তুত।

শরীর একটী কল। প্রতিনিয়ত এই কলের কার্য্য অবিরামভাবে চলিতেছে। কল চলিবার জন্য যেমত জল, কয়লা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সেগুলির অভাবে কল চলিতে পারে না, শরীরও তদ্রূপ। ইহা প্রতিনিয়ত যে ভাবে চলিতেছে, পুনঃ পুনঃ খাদ্যরূপ জল কয়লা না দিলে দীর্ঘকাল শরীর-ক্রিয়া চলিতে পারে না। মানবনির্ম্মিত কল ইচ্ছানুসারে বন্ধ করা যায়, তাহার জীবনরূপ খাদ্য না দিলে তাহা চলিতে পারে না। ঈশ্বরনির্ম্মিত মানবশরীর-রূপ কলেও সেইরূপ প্রতিনিয়ত কার্য্য চলিতেছে, প্রতিনিয়ত এই কলের প্রত্যেক বিভাগে অভাব হইতেছে ও তাহা পূরণের আবশ্যক হইতেছে। স্নায়ু-যন্ত্ররূপ তাড়িত-বার্ত্তাবহ-যোগে মন এই সংবাদ জানিতে পারে। ক্ষুধা ইহার লিপিবাহক ও ক্ষতিপূরণের প্রার্থী; পাকস্থলী ইহার সংগৃহীতদ্রব্যের ভাণ্ডার; নাসিকা, শিরা ও গ্রন্থি সকল ইহার স্থপতি বা মিস্ত্রী; ধমনী-শ্রেণী তাহাদের সহকারী এবং ভগ্নস্থান গ্রথিত করার নামই জীবন। এই যুদ্ধে পরিশেষে মৃত্যুরই জয়লাভ হয়; যতদিন জীবন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, ততদিন

জীর্ণ সংস্কার করিতেই হইবে, নতুবা প্রতি মুহূর্ত্তেই শত্রু কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আহারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা—সুতরাং আহার অপরিহার্য্য।

কিন্তু যাহা হারাইবে, তাহাই আহরণ করিতে হইবে। রসায়নবিৎদিগের মতে আল্‌বুমেন বা আন্তিক, গ্লুটেন বা মাংসিক এবং কেসীন্, গ্লোবুলীন প্রভৃতি অনেকগুলি রূপান্তরিত পদার্থ, প্রোটীন্ নামক পদার্থের অবান্তর-ভেদ মাত্র। আমরা পাঠকগণের সুবিধার জন্য ইহা "যবক্ষারমূল" পদার্থ বলিব। কার্য্যক্ষেত্রে মাংসপেশী সমূহের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণবশতঃ যবক্ষারমূল পদার্থ সকল প্রচুরপরিমাণে নষ্ট হয়। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে জন্তুগণের মাংস এবং মৎস্য, ডিম্ব ও দুগ্ধাদি পদার্থে যবক্ষারমূল বহুলপরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে এই সকল পদার্থই শারীরিক মাংসপেশী প্রভৃতি ক্ষয়প্রতীকার করিতে সম্যক্-রূপে সমর্থ। যবক্ষার-মূল খাদ্যদ্বারা শরীরে বলাধান হইয়া আমাদিগকে কার্য্য-ক্ষম করে এবং অম্লজান-সহযোগে সম্মিলিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে মেদ বা তৈলপ্রধান পদার্থ শরীরের অন্যতম প্রধান উপা-দান এবং দেহের সর্ব্বত্র প্রাপ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই শারীরিক তাপসংরক্ষণের প্রধান উপাদান। খাদ্য-দ্রব্যমধ্যে উদ্ভিদ ও জান্তব তৈলে এবং শর্করা ও শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থে এই তাপরক্ষণের উপযুক্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীর উত্তপ্ত না থাকিলে জীবিত থাকিবার উপায় নাই। মৃত্যুর পরে যে ভয়ানক শীতলতা দেখা যায়, সাংঘাতিক তাপনাশই তাহার মূলীভূত কারণ; সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের খাদ্য জীবনের ইন্ধন-স্বরূপ। রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, যখন দীপের অগ্নি প্রজ্জলিত করা যায়, তখন বাহিরের বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত দীপস্থ তৈলের অঙ্গার নামক জড়পদার্থের সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগক্ষেত্রের বিক্রম প্রকাশেই তাপ ও আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অতি আশ্চর্য্য একতা এই যে, বহির্জ্জগতের এই দহনপ্রণালীর অনুকরণে শরীরাভ্যন্তরেও তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিনিশ্বাসে বাহ্য বায়ুস্থিত অম্লজান প্রচুরপরি-মাণে বক্ষ গহ্বরান্তরে নীত হইয়া শারীরিক মেদাদি তন্তুস্থিত অঙ্গারের সহিত সংযুক্ত হইতেছে; এবং একদিকে যেমন তদুৎপন্ন তাপ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীর উষ্ণ রাখিতেছে, তদ্রূপ ঐ দাহ হইতে উৎপন্ন অপকৃষ্ট

অংশ আঙ্গারিক অম্লবাষ্প নামে বায়ুর আকারে প্রশ্বাস সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে বাষ্পীয় শকটের যন্ত্র-প্রকোষ্ঠে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হয়; তদুৎপন্ন আঙ্গারিকাম্ল উচ্চগামী নলদ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যে অংশ হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহারই বিক্রমে শকট গুরুভার বহন করিয়া তীব্র-বেগে ছুটিতে থাকে। বিভেদ এই যে, বাষ্পীয় শকটের তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য যে অঙ্গার আবশ্যক, তাহা মৃদঙ্গারে পাওয়া যায়; শরীররূপ শকটের চালনার জন্য যে অঙ্গার আবশ্যক, তাহা পাথরিয়া কয়লার বর্ত্তমান থাকিলেও জীর্ণ করা যায় না বলিয়াই ঘৃত, তৈল, বসা এবং শর্করা, গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া তাপ উৎপন্ন করিতে হয়। সুতরাং ঘৃত ও শর্করা প্রভৃতি শরীর-রূপ কলের পাথরিয়া কয়লা, শরীররূপ রন্ধনশালার জ্বালানি কাষ্ঠ। শরীর উত্তপ্ত রাখা ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা। পোষণ ও বলবিধান ইহাদিগের গৌণ কার্য্য। লবণময় পদার্থ সকল শরীর মধ্যেও যত, সাধারণ উদ্ভিদ খাদ্যেও তত প্রচুর। অস্থি প্রভৃতি স্থানে যে চূর্ণক আছে, রক্তে যে লৌহ আছে, চুলে যে গন্ধক আছে, নখ ও চর্ম্মে যে সৈকতক (সিলিকা) আছে, দন্তে যে কাচান্তক (ফ্লুরীন্) আছে, স্নায়ু প্রভৃতি স্থানে যে প্রস্ফুরক (ফস্‌ফরস্) আছে এবং সর্ব্ব শরীরে যে সোডা ও পটাশ আছে, তাহাদের ক্ষয় হইলে উদ্ভিদরাজ্য হইতে পূরণ হয়। সর্ব্বশেষ, কিন্তু সর্ব্বপ্রধান উপা-দান জল যেমন সর্ব্বদাই নষ্ট হইতেছে, আমরাও তদ্রূপ সর্ব্বদাই জলপান করিয়া তাহার পূরণ করিতেছি। সুতরাং জলের কখনও অভাব নাই।

কাগজে লিখন যত পরিষ্কার প্রাকৃতিকপদার্থ বা কার্য্য সকল তত সরল নহে। উল্লিখিত চারি শ্রেণীর পদার্থ জান্তব ও উদ্ভিদ উভয় শ্রেণীর খাদ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনশ্চ, আমরা দেখাইয়াছি যে, তাপ সংরক্ষণ ও মাংসাদির সংগঠনই পোষণের প্রধান কার্য্য। এই জন্য প্রতিদিন শরীরমধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যবক্ষার জানা আবশ্যক। কিন্তু যদি তাহাই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে কয়লা ভক্ষণ বায়ুসেবন করিলে মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারিত, কারণ বায়ু ও কয়লাতে এই দুই পদার্থ প্রচুরপরিমাণে আছে; কিন্তু এই সকল পদার্থ রূঢ় বা অসংযুক্ত অব-স্থায় কোন উপকারই করে না; তাহারা জান্তব পদার্থে সংযুক্ত থাকিয়া খাদ্য-রূপে পরিণত না হইলে জীর্ণ করা যায় না। কেবল ইহাই নহে; ফরাশী

পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, কেবল এক শ্রেণীর খাদ্য (যথা কেবল চিনি, বা কেবল ভাত বা কেবল মাংস) আহার করিলেও জীবন ধারণ হইবে না। প্রাগুক্ত চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থকেই এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার করিতে হইবে, অধিক লইলে পীড়া জন্মিবে, অল্প লইলেও সেই ফল।

"প্রকৃতির কুট-বুদ্ধি মনুষ্যের কূট-বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক অধিক" বহুকাল পূর্ব্বে পণ্ডিতবর বেকন এই কথা বলিয়াছিলেন *। বাস্তবিক শারীরবিধান-তত্ত্বের পচনক্রিয়া (Digestion) ও জান্তব রসায়নের আণবিকগঠন (Molecular or atomic constitution) এই উভয়ের দুর্ব্বোধ্য সম্বন্ধ আলোচনা করিলে বেকনের উক্তির সত্যতা অনুভব করা যায়। এই জন্য ভোজনবিষয়ক স্বাস্থ্য বিধান শাস্ত্রের অনেকগুলি মত অদ্যাপি অনিশ্চিত ও আধ্যাত্মিক, সুতরাং সেই সকল মতের বর্ণনা করিয়া আমরা পাঠকগণের বিরক্তি উদ্দীপন করিব না। ভোজন সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিষয় অনুষ্ঠান যোগ্য, প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্য-রক্ষক, কেবল তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই বলা উচিত যে, যে যবক্ষার মূল, গ্লুটেন্ প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মাংসই তাহার প্রধান আধার, কিন্তু দুই এক শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেও এই গ্লুটেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে, সুতরাং পুষ্টি-কারিতায় ও শারীরিক বল-বীর্য্যসাধন জন্য এই সকল উদ্ভিদও পূর্ব্বোক্ত মাংসাদির তুল্য হওয়া উচিত, কেবল উচিত কেন, এই সকল উদ্ভিদ্ ভোজনে পোষণকার্য্য উত্তমরূপে সাধিত হয়।

অথচ এই মত সর্ব্বজনীন নহে। কেবলমাত্র উদ্ভিদ ভক্ষণদ্বারা জীবন ধারণ সম্ভব হইলেও তাহাতে স্বাস্থ্যের বিঘ্ন হয় কি না, অথবা পক্ষান্তরে উদ্ভিদের সঙ্গে মৎস্য মাংসাদি ভোজন করা উক্ত বিঘ্নের নিবারণ করা সম্ভব কি না, এই সকল প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবসমাজে পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত আলোচিত ও ইহার এক বা অপর মত পরিগৃহীত হইয়াছে। যে দুই পরাপর বিরুদ্ধ সম্প্রদায় এই বিবাদ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার এক সম্প্রদায় হইতে আমরা শিখিয়াছি যে অসংখ্য উদ্ভিদ ও দুগ্ধঘৃতাদি জান্তব পদার্থে শরীর-

* Novum organum, aphorism X.

পোষণ ও বলবর্দ্ধন হয় বলিয়া কৃপাপাত্র ইতর প্রাণীগণের হনন অবৈধ। হস্তী মহিষ ও বৃষ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত জীবগণ কেবলমাত্র উদ্ভিদ ভক্ষণ করিয়া যে প্রভূত বলশালী হয় এবং মনুষ্যগণের মধ্যেও যাহারা উদ্ভিদ ও দুগ্ধ ঘৃতাদি আহার করিয়া—সবলশরীর ও দীর্ঘজীবী হইয়াছেন, এই মতাবলম্বীগণ সেই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মাংসভক্ষণ-বাদীদিগের মতের অসত্যতা প্রমাণ করেন।

অপর সম্প্রদায় সমস্বরে বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র উদ্ভিদ ভক্ষণদ্বারা জীবনধারণ সম্ভব হইলেও যথেষ্টপরিমাণে মাংসাদি ভক্ষণ ব্যতিরেকে দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠদেহ, সাহসিক ও উদ্যমশীল মন এবং তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় ও আত্মীয় অভ্যুদয় লাভ করা অসম্ভব। তাঁহারা শ্বাপদজন্তু ও বিহঙ্গম, কীট-পতঙ্গাদির মধ্যে পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—সন্দর্শন করিয়া—মাংসভক্ষণকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বিবেচনা করেন না, পরন্তু মনুষ্যগণের মুখগহ্বরস্থ দন্ত বা জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রাকৃতি,—কোনটী সূচিকা, কোনটী ছুরিকা, কোনটী যন্ত্রপেশনীর ন্যায় দর্শন করিয়া মাংসভক্ষণে তাহাদের উপযোগিতা ও উদ্ভিদ ভক্ষণে সকল দন্তের অনাবশ্যকতা বিবেচনা করেন এবং তন্নিবন্ধন মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় মানবগণের নির্ব্বুদ্ধিতা, দরিদ্রতা, ভীরুতা ও চিরপরাধীনতার কেবলমাত্র উদ্ভিদ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করাই সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং পরামর্শ দেন যে ;—

"———If you would improve your thought
You must be fed as well as taught
Observe the various operations
Of food and drink in several nations
Was even Tartar fierce or cruel
Upon the strength of water gruel ?
But who shall stand his rage and force
If first he rides, then eats his horse ?"

উভয়ই সত্য, উভয়ই ভ্রান্ত। কথা এই যে, আহারবিষয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ কার্য্যকর নহে। গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, সামান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই যে, শীতময়

দেশে উদ্ভিদপ্রধান ভোজন অথবা গ্রীষ্মময় দেশে মাংসপ্রধান ভোজন সম্যক্ স্বাস্থ্যবর্দ্ধক হইতে পারে না। সুতরাং গো-বৎসের পরামর্শে হস্তীর পক্ষে দুগ্ধপান করিয়া থাকা উচিত নহে, অথবা হরিণ-শাবকের পরামর্শক্রমে পশু-রাজ সিংহের পক্ষে তৃণ ভক্ষণ করা উচিত নহে।

কিন্তু তাহাতেই মাংসভক্ষণ আমাদিগের পরিত্যজ্য নহে। আমরা জানি যে, ইউরোপেও উদ্ভিদভোজী জন্মিতেছে এবং ভারতেও মাংসভোজী আছে। কিন্তু সমাজসংস্কারক ও স্বাস্থ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের দেখা উচিত যে আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় দণ্ডায়মান আছি, তাহাতে কি করা উচিত। আমরা স্বীকার করি যে,—"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি" "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য অপেক্ষা উদার শিক্ষা আর নাই। সুতরাং বিপিনবিহারী যোগী ও শান্তমতি গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতি সুব্যবস্থা। দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে এত পরিশ্রম করিতে হইত না, সুতরাং তখনও এই ব্যবস্থায় চলিত, কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ লোকেরই দেহপাত কল্পনা করিয়া জীবনের যুদ্ধসম্পন্ন করিতে হইতেছে, অতএব এই সম্বর্দ্ধিত পরিশ্রম থাকিতে উক্ত মত অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত নহে। বিশেষতঃ আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা "শশক, শল্লকী, গোধা, কূর্ম্ম, গাণ্ডার, ছাগ, মেষ ও হরিণ" ভক্ষণের অনুমতি দিয়াছিলেন। শ্রমজীবীগণের মধ্যে এই সকল মাংস ভক্ষণ প্রচলিত হইলে ভূয়সী উন্নতি সাধিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ দেখাইতে পারি না সত্য, কিন্তু তথাপি কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন যে, যে শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য ভারত দুরপনেয় কলঙ্কে বহুকালাবধি মগ্ন হইয়াছে, আহারের নীচতাই তাহার অন্যতম কারণ? কোন কোন গ্রন্থকার বিবেচনা করেন যে মাংসাদিতে যে সকল গ্লুটেন প্রভৃতি, পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তাহা আমাদিগের শরীরস্থ পদার্থের সহিত একই প্রকৃতির পদার্থ। সুতরাং তাহার প্রায় সমস্তই অনায়াসে শোণিতীভূতহয়, আর গ্লুটেন প্রধান উদ্ভিদেও সেই সেই পদার্থ আছে বটে, কিন্তু উদ্ভিদতত্ত্ব বিধান হইতে প্রাণীতত্ত্ব বিধানে সমীকৃত হইতে অনেক আয়াস ও অপব্যয় হয় এবং সেই জন্য পোষণ ও ক্ষতিপূরণ কার্য্য সম্যক সাধিত হয় না। প্রমাণাভাব বলিয়া এইমতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, উপযুক্ত উদ্ভিদ ভক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষাকরা সম্ভব বটে, কিন্তু

"——— Man is a carniverous production.

And must have meals, atleast one meal a day ;
He cannot live, like wood cocks. upon suction
But like the shark and tiger must have prey ;
Although his anatomical construction
Bears vegitables in a grumbling way,
Your laboring people think beyond question
Goat, fish * * and mutton, better for digestion.

বিশেষতঃ এই চিররুগ্ন, চিরদুর্ব্বল, বঙ্গবাসীগণকে যিনি মাংসাদি ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন, তিনি ইতর জন্তুগণের উপকারী বন্ধু হইতে পারেন কিন্তু মনুষ্যের শত্রু। এই মাংস ভক্ষণবিষয়ে বিজ্ঞানের মত এখনও অন্ধকারময়।

মৎস্যের মধ্যে ইলিস অতিশয় সুস্বাদু, কিন্তু উদ্বায়ি ও স্থায়ী তৈলের আতিশয্য-বশতঃ এই মৎস্য দুর্ব্বল ব্যক্তির অনুপযুক্ত। রোহিৎ মৎস্য ও চিংড়ি মৎস্য নামক জলজন্তু উভয়েই পুষ্টিকারক। অন্যান্য মৎস্যেরও পুষ্টিকারক গুণ আছে, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অল্প। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মৎস্য বংশবর্দ্ধক। বঙ্গদেশে এত লোক জন্মিবার ইহা কি একটী কারণ?

ময়দা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। নিম্নলিখিত পদার্থ কয়েকটীর ১০০ ভাগে গ্লুটেনের পরিমাণ, যথাঃ—

মটর—২২
মাংস—১৫
ময়দা—১৪॥
ডিম্ব—১৩॥
চাউল—৫
গোল আলু—৭॥

} পুষ্টিকারিতার অনুপাতও এইরূপ।

সুতরাং প্রধান খাদ্যের মধ্যে চাউল অপেক্ষা ময়দা বহুগুণে পুষ্টিকর পদার্থ। এতদ্দেশীয় অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, ধান্য স্বয়ংজাত বা অল্পায়াসজাত, সুতরাং ইহাই বঙ্গবাসীগণের স্বাভাবিক খাদ্য ও শরীর-রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। আমরা এই কথা বিশ্বাস করি না। কেবল জীবনধারণ অতি নীচ খাদ্য দ্বারাও বহুদিন করা যাইতে পারে, কিন্তু সুস্বাদু বা

বলকারক খাদ্যমাত্রই মনুষ্যের পক্ষে (ইতর জন্তুর নহে, তাহাদের খাদ্যজ্ঞান জন্মাবধিই থাকে) আনায়াস লভ্য নহে, প্রত্যুত বিশেষ পরিশ্রম ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শরীরবিধানতত্ত্ব ও রসায়ন অনুসন্ধান করিয়া যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে এই বুঝিতে পারি যে, যদি কখন আমাদিগের জাতির শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ময়দা-ভক্ষণ তাহার অন্যতম উপায় না হইলে চলিবে না। ইহাও আশা করা যায় যে, আমাদিগের সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হইলে অনতিদূরবর্ত্তী কালে ময়দা ভক্ষণ-দ্বারা অন্নভোজনের স্থানাধিকৃত না হউক, ময়দা ও অন্ন এই উভয়ের মিশ্র ভোজন বিধি দ্বারা বহুল উপকার সাধিত হইবে।

উপরে প্রকটিত ক্ষুদ্র তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, চাউলের ন্যায় গ্লুটেন্-হীন পদার্থ প্রধান খাদ্য-মধ্যে অল্পই আছে, সুতরাং "ভেতো বাঙ্গালী" কিরূপে বলবান্ হইবে? আমরা জানি, এ কথায় অনেকে হাস্য করিয়া উত্তর দিবেন যে, যদি চাউলের অপরাধেই আমরা দুর্ব্বল, তবে প্রায় চাউলের ন্যায় অপকৃষ্ট পদার্থ আলু খাইয়া আয়র্লণ্ডবাসীগণ কিরূপে সবলশরীর হইল? আমরা জানি জন্‌সন বলিয়াছেন যে, চাউল যেমন অল্পসার, তেমনি অনেক ভাত খাইয়া তণ্ডুলভোজী জাতি গ্লুটেনের মাত্রা পোষাইয়া লয়; কিন্তু আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, এই মহাপণ্ডিতগণ অস্মদ্দেশীয় অন্নভোজনের প্রথার দিকে দৃষ্টি না করিয়াই এ কথা বলিয়াছেন। "ধানসিদ্ধ" নামক প্রক্রিয়া দ্বারা চাউলের সারাংশের যে কত ক্ষতি হয় এবং তজ্জন্য সিদ্ধ চাউল আতপ চাউল অপেক্ষা কত অপকৃষ্ট হয়, তাহা এই উভয়বিধ তণ্ডুল ভোজন না করিলে জানা যায় না। কিন্তু এখানেই শেষ হইল না। বহুকাল অসার অন্ন ভোজন করিয়া আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই পাকস্থলী এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে, "নূতন চাউল" সহ্য হয় না। সুতরাং পৌষ, মাঘ মাসে যে চাউল উৎপন্ন হইল, তাহা পুরাতন করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত রাখা হইল; যে কিছু গ্লুটেন চাউলে লাগিয়াছিল, তাহা এই কয়েক মাস মধ্যে নানা-প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় ও কীট-দংশনে নষ্টপ্রায় হইল। তখন ইহা পুরাতন এবং ভক্ষণের উপযুক্ত হইল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই; এত পুরাতন অন্নও সিদ্ধ হইলে তাহার মণ্ড, ফেণ বা ক্বাথ ফেলিয়া কেবল মাত্র শুভ্র, সরল শ্বেতসার (স্তার্চ) পরিপূর্ণ দানাগুলি

ভক্ষণ করা হইল। এই সকল দানার সহিত সিদ্ধ সাগুদানা ও আরুট প্রভৃতির বিশেষ বিভেদ নাই। ভাতের মণ্ড খাওয়া আমাদের দেশে গালাগালি। কেননা, আমরা কি সার কি অসার জানি না; কিন্তু পূর্ব্বকালে কোন কোন মহাবীর ইহা সাদরে পান করিতেন। মহাবীর ভীমসেন কতদূর ফেনভক্ত ছিলেন, তাহা মহাভারত পাঠ করিলেই বেশ জানা যায়।

* * * * * * চিকিৎসাদর্শন। ক্রমশঃ—

শ্যামনগর } ডাক্তার শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বি, এ, এম্, বি,

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কেবল কি মাংসাহারের অভাবজন্যই বাঙ্গালী জাতির দিন দিন দৈহিক অধঃপতন ঘটিতেছে? তা ত নয়, এদিকে যে দুবেলা দুমুটা পেটভরা অন্ন যুটীয়া ওঠাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোক যে প্রকৃতপক্ষেই হা অন্ন যো অন্ন করিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছে, সে খবর লেখক মহাশয় রাখেন না কি? প্রকৃত খবর রাখিলে কেন বলিবেন যে "শ্রমজীবীগণের মধ্যে ছাগ মেষাদি ভক্ষণ প্রচলিত হইলে তাহাদের ভূয়সী শারীরিক উন্নতি হয়"। উন্নতি যে হয় তাহা সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি যে, এ কি বিলাতের দেশ? যে, যেখানকার শ্রমজীবীগণ হয়ত ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই, পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তার পর প্রত্যহ ৮।১০ আনা যা পায়, তদ্দ্বারাই উদর পূর্ণ করিয়া শূকর গরু ছাগ মেষ প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু এ পোড়া দেশে যে রোজ আটদশটীমাত্র পয়সার অধিক রোজগার হয় না, তার পর স্ত্রী আছেন পুত্র কন্যা আছেন, বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন লোকলকুতা আছেন, সুতরাং এরূপ স্থলে মাংস বা ঘৃত দুগ্ধ দূরের কথা, প্রতি ব্যক্তিকরা যে এক পয়সার অধিক বুকড়ী চাউলেরই সংগ্রহ হইয়া উঠে না, সে কথার উত্তর দেয় কে? সুতরাং এসব কথার সমর্থন করিতে পারিলাম না। তবে অবশ্যই তাঁহার লিখিত ধানসিদ্ধ ও নূতন চাউল বিষয়ক বাক্যগুলি বড়ই সত্য ও সারগর্ভ, এসব কথায় প্রাণের সহিত অনুমোদন করি। চি, সু, সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই কথা শুনিয়া জয়া কহিলেন, ভগ্নি! ইতিপূর্ব্বে বন্ধ্যারোগের সামান্য লক্ষণমাত্র কহিয়াছ, এক্ষণে তাহার বিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন বিজয়া কহিলেন, বন্ধ্যারোগ দুই প্রকার। জন্মবন্ধ্যা এবং কাক-বন্ধ্যা। উভয়বিধ বন্ধ্যার লক্ষণই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই রোগাক্রান্তা মেয়েদিগকে চলিত ভাষায় বাঁজা কহে। এক্ষণে ইহার ঔষধের কথা বলা যাইতেছে।

১। শরপুঙ্খা নামক এক প্রকার গাছ আছে। রবিবারে তাহার মূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিবে। ঋতুর সময়ে সেই মূল শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিবে এবং প্রত্যহ শালিতণ্ডুলের অন্ন মুগের দাইল, দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করিবে। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ দূরীভূত হইয়া গর্ভ গ্রহণের ক্ষমতা জন্মে।

২। ঋতুস্নানান্তে তিন দিবস ছাগদুগ্ধের সহিত কৃষ্ণাপরাজিতা মূল সেবন করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হয়।

৩। ঋতুস্নানান্তে সাতদিন পর্য্যন্ত সদ্যদুগ্ধের সহিত নাগকেশর চূর্ণ সেবন করিয়া প্রত্যহ যথেষ্ঠ পরিমাণে দুগ্ধের সহিত ঘৃত ভোজন করিবে। ইহাতে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়।

৪। কদম্বপত্র এবং শ্বেত বৃহতীমূল সমভাগে ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র বা পঞ্চরাত্র সেবন করিলে নিশ্চয় বন্ধ্যার গর্ভ হয়।

৫। নিসিন্দার রসসহ গোক্ষুর বীজ পেষণ করিয়া ঋতুস্নানান্তে ত্রিরাত্র বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত সেবন করিলে বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে।

৬। এক বর্ণা জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধসহ কিঞ্চিৎ বটমূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ দূরীভূত হয়।

৭। সমূল অপরাজিতা লতা মহিষী-দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপ বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ মহিষী-নবনীতের সহিত ঋতুকালে সেবন করিতে হইবে। সপ্তাহকাল এই ঔষধ সেবন করিয়া পূর্ব্ববৎ আহারাদি করিলে কাকবন্ধ্যা দোষের শান্তি হয়।

৮। অপত্যাভিলাষিণী রমণী ঋতুস্নানান্তে লক্ষণামূল ঘৃতকুমারীর রসসহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়।

৯। বেড়েলা, চিনি, গোরক্ষ চাকুলে, মউরী, বটেরশুঙ্গা (ঝুরি) নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ সঞ্চার হয়।

অনন্তর জয়া কহিলেন, কোন কোন রমণী যতবার গর্ভধারণ করে, প্রতি

বারই এক একটী কন্যা প্রসব করে। এরূপ হইবার কারণ কি? তাহাদিগের গর্ভে কি কখনও পুত্র হইতে পারে না?

বিজয়া কহিলেন, যে সমস্ত কারণে গর্ভমধ্যে পুত্র কন্যা বা নপুংসকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা ধাত্রীবিদ্যায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে সেই দোষ শান্তির জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতেছি। আলকুশীমূল, কয়েত বেলের মজ্জা এবং উভয়লিঙ্গীবীজ? একত্রে বাঁটিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত ঋতুকালে সেবন করিলে নারীর গর্ভে কেবল পুত্রই হইয়া থাকে। জিয়াপুতা বৃক্ষের মূল, অপরাজিতা এবং ঈষলিঙ্গী এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ঋতু সময়ে আট দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে নারী গর্ভে কেবল পুত্রই ধারণ করে। ঋতুস্নানান্তে একটী পলাশ পত্র গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভমধ্যে বীর্য্যবন্ত ও রূপবন্ত পুত্রের আবির্ভাব হয়। বলবীর্য্যশালী রূপবান্ পুত্র ইচ্ছা করিলে ফলকল্যাণ ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঘৃতের কথা পরে বিশেষ করিয়া কহিব। এক্ষণে সকল প্রকার যোনিরোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে।

যে পীড়ায় আর্ত্তব ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাকে উদাবৃত্তা কহে। সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় বায়ু-শাম্যকর ক্রিয়া কর্ত্তব্য। গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং দন্তীমূল, ইহাদের ক্বাথদ্বারা যোনিধৌত করিলে অথবা তগরপাদুকা, বৃহতী, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারুর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে উপকার হয়। আর্ত্তব ঊর্দ্ধগামী হইলে আমাদিগের রজঃ প্রবর্ত্তিনী বটী একান্ত উপযোগী। জলের সহিত দুইটী করিয়া বটী দুইবেলা সেবন করিলে ২।৩ দিন মধ্যেই আর্ত্তব নিঃসৃত হইয়া পীড়ার উপশম ও যন্ত্রনার লাঘব হয়।

বিপ্লুতারোগে তগরপাদুকা, কণ্টকারী, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৎসহ তিলতৈল পাক করিবে। পরে সেই তৈলে তুলা ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য। পরিপ্লুতা ও বাতলারোগেও এই রূপ ক্রিয়া হিতকর। কণ্টকারী বাটিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় যোনিতে ধারণ করিলে বাতলা রোগের শান্তি হয়।

পিত্তদূষিত রোগে পরিষেক, অভ্যঙ্গ, বর্ত্তি প্রয়োগ এবং পিত্তঘ্ন শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। প্রস্রংসিনী রোগে যোনিতে ঘৃত মাখাইয়া উষ্ণ দুগ্ধ লিপ্তবস্ত্রখণ্ড দ্বারা

স্বেদ প্রদান করিবে। তদনন্তর শুঁঠ, মরিচ, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, দাড়িম ও পিপুলমূল একত্রে পেষণ পূর্ব্বক কোন বস্ত্রখণ্ডে লিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। লোহিতক্ষরা রোগে চিনির সহিত আমলকীর রস অথবা চাউলধোওয়া জলের সহিত হুড়হুড়ের মূল সেবন করা কর্ত্তব্য। বামিনী পীড়ায় নিম্বপত্রাদি শোধন দ্রব্য, সৈন্ধব ও গোমূত্র একত্রে পেষণ করিয়া একটী পিণ্ড করিবে। তদ্দ্বারা যোনি পূরণ করিয়া রাখিলে দোষের শান্তি হইয়া থাকে। পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত যোনিতে বচ, বাসক, পটোলপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নিম্বপত্রচূর্ণ অথবা নাওশোনার ক্বাথ দ্বারা যোনি পূরণ করিয়া রাখিলে উপকার হয়।

ক্রমশঃ—

দীনাবাজার
জলপাইগুড়ি। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়, কবিরাজ।

সম্পাদকের বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত ধাত্রীবিদ্যা প্রবন্ধটী সাধারণের পক্ষে যেরূপ অসীম আনন্দ ও উপকারবর্দ্ধন করিয়াছে, বলা বাহুল্য যে, অবলাবান্ধবও তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বরঞ্চ কোন কোন অংশের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। আমরা বরাবরই তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের উপর বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া আসিতেছি যে, লেখক মহাশয় যথার্থ ইংআন্তরিক যত্নের সহিত যথাশাস্ত্রানুযায়ী সাধারণের উপযোগী করিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিতই প্রবন্ধটী লিখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমাদের ন্যায় পাঠকগণও এ প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। চি, স, সম্পাদক।

বাঙ্গলাদেশে স্বাস্থ্য।

ডাক্তারীমতে।

বাঙ্গলাদেশে ধান ও পাটের জমিগুলি ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল এবং এমন কোন গ্রাম বা নগর নাই, যাহার চতুর্দ্দিকে ধান ও পাটের আবাদ না আছে। এই কারণ বশতঃ কোন নগর বিশেষ উন্নত ও তাহার জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিলেও তৎস্থান সম্পূর্ণরূপে মহামারীর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

পারে না। কারণ ম্যালেরিয়া বিষ অনায়াসেই নিকটবর্ত্তী ময়দান হইতে উত্থিত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

তবে বাঙ্গলাদেশের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় কি? কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে এই দেশকে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যসুখসম্পন্ন করা যাইতে পারে। বঙ্গের স্বাস্থ্য অনুসন্ধানকারী ডাক্তার মহোদয়গণ এ বিষয় ভাবিয়াছেন কি? আমাদিগের দেশের চিন্তাশীল মহোদয়গণ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন কি? মুখে ও কাগজে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আলোচনা করা এক কথা এবং কথা কার্য্যে পরিণত করা স্বতন্ত্র কথা। দুই একটী সমৃদ্ধিশালী নগরের বা দুই একটী বড় বড় গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিলে ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিলে দেশ রক্ষার উপায় নাই। পল্লীগ্রামের পাঠশালা সমূহে ভিন্ন দেশীয় স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশপূর্ণ পুস্তক সকল পান্তাভাত খেগো জলাভূমিতে অর্দ্ধশরীর নিমজ্জিত ধানগাছকর্ত্তনকারী কৃষক পুত্রের হাতে দিলেও কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। পল্লিগ্রামের ছেলেরা তোতা পাখীর ন্যায় ঐ সকল উপদেশ কণ্ঠস্থ করিয়া একজামিনে পাশ হয় মাত্র। ইহতে গ্রন্থকর্ত্তাদিগেরই যা কিছু লাভ। যাহাদের জন্য বই লেখা তাহাদের বড় একটা উপকারে আসে না। বাড়ার ভাগ মনের মধ্যে কতকগুলি বিষম খট্‌কা জন্মাইয়া তাহার সুখের ব্যাঘাত করে।

আমাদিগের সরলবুদ্ধিতে এই উপলব্ধি হয়, যে ইংরাজি পুস্তকে লিখিত ইংরাজিধরণের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম আমাদের দেশের উপযোগী নহে। কারণ এতদ্দেশের প্রাকৃতিক আবস্থা স্বতন্ত্র। যে ভেণ্টিলেসন্ (Ventilation) ড্রাইনেস্ (drynes) ও ড্রেনেজ (draniage) বলিয়া ডাক্তারগণ অবিরত চীৎকার করিতেছেন এবং সাধারণ লোকেও গোলে হরিবোল দিয়া যে চীৎকারে যোগদান করিয়াছেন; ভেণ্টিলেসন ও জলনিকাশের কথা পূর্ব্বে এদেশের লোকে স্বপ্নেও জানিত না, অথচ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে আমাদিগের অপেক্ষা সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহার সন্দেহমাত্র নাই।

রোগের নিদান সম্বন্ধে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করায় চিকিৎসকগণের যতই গবেষণা শক্তি ও শিক্ষার কৌশল প্রকাশ পাউক কিন্তু ঐ সকল নিদান তত্ত্বের আবিষ্কার রোগ নিবারণ সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। আসাম প্রদেশে একরূপ ভয়ানক মারাত্মক জ্বর দেখা দিয়াছে তাহাকে

কালাজ্বর কহে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন জঙ্গলপচা অপরিষ্কার জল পান ইত্যাদি অহিতাচরণ এই জ্বরের কারণ, কিন্তু কথা এই যে আসাম প্রদেশে পূর্ব্বে যে জল ও জঙ্গল ছিল, এখনও তাহাই আছে, এবং আসামের ন্যায় অন্যান্য জল ও জঙ্গলপূর্ণ দেশে কালাজ্বর না হইয়া ম্যালেরিয়া ও কলেরা হয় কেন এ বিষম সমস্যার কি উত্তর আছে? ইহাকেই বলে অন্ধকারে বিচরণ। আবার এখনকার অনেক চিকিৎসক জারন্ থিওরির (Geron theory) বড় ভক্ত। ইহাদিগের বিশ্বাস প্রায় সকল রোগই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগবীজ হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত রোগীগণের শরীরে ও রক্ত পরমাণু সদৃশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ পাওয়া যায়, এই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থগুলি (myerobe, Baeilli) প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই রোগবীজের অনুসন্ধানে এবং কাল্পনিক নিদানের কচ্‌কচিতে কত বড় বড় ডাক্তার জীবনপাত করিতেছেন এবং ঐ অনুসন্ধানে কত অর্থ ধ্বংস হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল myerobe ও Baeilli) আক্রমণ নিবারণের পন্থা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। এই সকল অতি সূক্ষ্ম চক্ষু কর্ণাদির অগোচর পরমাণু সদৃশ রোগবীজ বায়ুতে বিচরণ করিতেছে। ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই ওয়েসলিয়ান হাউসে কলিকাতা সাধারণ স্বাস্থ্যসমিতির সেক্রেটরি শ্রীযুত ডবলিউ, জে সিম্‌সন্ মহোদয় "বিনাশ ও বীজ হইতে রোগের উৎপত্তি" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, বিনাশ ও বিগলন ক্রিয়া আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অহরহ সংঘটিত হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র বটের পাতা পচিয়া বা নারিকেল জল পচিয়া বা বাসিঘোলে শত শত মাইক্রো-ফাঙ্গাই (mieri Fungi) উৎপন্ন হইতে পারে। একবিন্দু জলে অসংখ্য রোগ বীজ। এমন ফিলটার (জল ছাকনি কল) কি আছে যদ্বারা জলছাকিয়া পান করিলে এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ বীজের একটীও উদরস্থ করিতে পারে না? এমন নাসিকাবরণ কি আছে, যাহা নাসিকায় পরিধান করিলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম রোগবীজ সকল শরীরস্থ হইতে পায় না? বাটীর উঠান হইতে দূর্ব্বা ঘাসটী পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিতে না পারিলে আর এইরূপ রোগবীজ হইতে এড়াইবার উপায় হইতে পারে না। অতএব রোগোৎপত্তির কারণের সূক্ষ্মতম নিদান তত্ত্ব সংগ্রহে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের আত্ম প্রসাদ উৎপাদন ব্যতীত সাধারণের

কোনই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। রোগবীজগুলি যদি অন্ততঃ মশার ন্যায় বড় হইত তাহা হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উপায় হইত। কিন্তু তা ত নয়; এরা যে পরমাণু সদৃশ অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় এবং রক্তবীজের বংশের ন্যায় অসংখ্য। অতএব ইহাদিগের অস্তিত্ব জানিলেই তোমার আমার উপকার কি, আর না জানিলেই বা কি? ক্রমশঃ—

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল, এম, বি,

সম্পাদকের বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবু লিখিয়াছেন যে, "ইংরাজী পুস্তকে লিখিত ইংরাজীধরণে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম আমাদের দেশের উপযোগী নহে" কিন্তু এস্থলে আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি যে, কতকগুলি নিয়ম বলিয়া কেন, স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া ইংরাজী কোন নিয়মই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট কোন অংশেই উপযোগী হইতেই পারে না। সুতরাং পুলিন বাবু যদি "কতকগুলির" স্থলে "সকলগুলি" লিখিতেন, তবে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইতাম। অথবা ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? লোকে কথায় বলে যে "তাল-পরিমাণে বাড়ে, তিলপরিমাণে কমে" সুতরাং যে বিলাতীরোগ আমাদের মধ্যে তালপরিমাণে কেন, একবারে পর্ব্বতপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিল তিল করিয়া না কমিলে এক দিনে কি সে রোগের শান্তি হইতে পারিবে? চি, স, সম্পাদক।

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

শূলরোগে মণ্ডূর প্রয়োগ।

ত্রিফলা মণ্ডূরযোগ।

হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া এই দ্রব্য ত্রয়ের সাধারণ নাম ত্রিফলা। ফলত্রিক এবং বরা, ত্রিফলার অপর দুইটী পর্য্যায়। প্রশস্ত দেশে জাত ত্রিফলা গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য পরিণতাবস্থায় সংগ্রহ করিবে। হেমন্ত ঋতু হরীতকী এবং শিশির ঋতু আমলকী এবং বহেড়া সংগ্রহের প্রশস্ত সময়। পরিপুষ্টাবয়ব এবং যথাকালে সংগৃহীত ত্রিফলা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। শুষ্যমানাবস্থায় হিম বর্ষ প্রপাত হইতে সযত্নে রক্ষা করা আবশ্যক। দিবাভাগে রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া রাত্রিকালে উঠাইয়া গৃহে রক্ষা করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, অস্থি অর্থাৎ আটী পরিত্যাগ করিয়া এই দ্রব্যত্রয় ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয়।

হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে; প্রত্যেক দ্রব্যের বস্ত্রপূত শ্লক্ষ্নচূর্ণ ২৷৷৵৪ দুইতোলা দশ আনা চারি রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। তৎপরে গোমূত্রে সপ্তধা নির্ব্বাপিত পলূ পরিমিত মণ্ডূরচূর্ণ লইয়া উক্ত পল মাত্র ত্রিফলা চূর্ণের সহিত বেশকরিয়া মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত ভাজনে রক্ষা করিবে। এই ত্রিফলা মণ্ডূর যোগ ত্রিদোষজ শূলরোগে ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধ তোলক পরিমিত ঔষধ গব্যঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করিতে হইবে। ঘৃত মধুর পরিমাণ অতুল্য হওয়া আবশ্যক, মাধ্যাহ্নিক আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রায়েজ্য।

শতাবরী মণ্ডূর।

সংশোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৮ পল অর্থাৎ ৬৪ তোলা, শতাবরীর রস ৮ পল; নাতিব্যক্তাম্লরস মধুররস ভূয়িষ্ঠ গব্যদুগ্ধসম্ভূত দধি ৮ পল, গব্যদুগ্ধ ৮ পল এবং গব্যঘৃত ৪ পল।

উপযুক্ত মৃৎ কি লৌহ কটাহে মণ্ডূর স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে, তৎপর যথাক্রমে দুগ্ধ ও শতাবরীর রস মিশাইয়া সর্ব্বশেষে দধি মিশ্রিত করিবে; তদনন্তর চুল্লীতে চড়াইয়া মৃদু মৃদু সন্তাপে পাক করিতে হইবে। যখন জলীয়াংশ প্রায় নিঃশেষ হইয়া ঘৃত ব্যক্ত হইবে, সেই সময় নামাইয়া রাখিয়া দিবে। ঘৃত জমিলে এই ঔষধ পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে পাক সুসিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। শীত ঋতুতে এই ঔষধ পাক করা বিধেয়।

বাতিক পৈত্তিক এবং পরিণাম শূলে ও অম্লপিত্ত এবং অম্লপিত্ত নিমিত্তক শূলে শতাবরী মণ্ডূর মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মাধ্যাহ্নিক আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ।০ এক শিকি. অর্দ্ধাশনে একটী গ্রাসের সহিত ।০ এক শিকি এবং ভোজনের শেষে।০ এক শিকি ভক্ষণ করিতে হয়।

দুর্ব্বলকোষ্ঠ এবং কিশোর ও বৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে মাত্রা প্রত্যেক বারে ৵০ দুই আনা। শৈশবে এই ঔষধ অপ্রয়োজ্য। ক্রমশঃ—

মাগুরা
বারুইপাড়া } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোধ্যায় কবিরত্ন

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

অম্লপিত্ত ও শূলাদিরোগে এ সকল মণ্ডূরের ব্যবহার আমরা অনেক সময় করিয়া থাকি এবং ফলও আশানুরূপ হইতে দেখিয়া থাকি। সুতরাং এ সকল ঔষধের গুণাগুণসম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক। সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ প্রণালী।

অগ্নিমান্দ্যরোগে তৈল প্রয়োগ।

৭ম খণ্ডের শেষ তিন সংখ্যায় অর্শরোগে তৈলপাকের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া ৮ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় স্থানাভাবজন্য লিখিয়া উঠিতে পারি নাই; সুতরাং এখন হইতে পুনর্ব্বার যথারীতি তৈলপাকের বিষয় লিখিতেছি। কিন্তু অর্শরোগের ন্যায় অগ্নিমান্দ্যরোগেও শাস্ত্রে বিশেষ কোন তৈলপ্রয়োগের উপদেশ নাই; না থাকিলেও সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরা রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনেক সময়েই অগ্নিমান্দ্যরোগে অন্যান্য অধিকারোক্ত নানাবিধ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেহেতু অগ্নিমান্দ্য অর্থাৎ অজীর্ণাদি রোগে প্রায়ই রোগীর বাতপিত্তাদি বিশেষতঃ বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং তত্তৎস্থলে অবস্থাভেদে গ্রহণীমিহির তৈল, গুড়ূচ্যাদিতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল ও মহাপিণ্ড প্রভৃতি তৈল ব্যবহারে অনিদ্রা, উদরাধ্মান, পিত্ত বা বায়ুর উগ্রতা ও হাত পায়ের জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গের অতি আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এসকল রোগে তৈল ব্যবহার দ্বারা রোগীর শরীর শীঘ্রই স্নিগ্ধ ও পুষ্ট হইতেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল রোগে তৈল এতাদৃশ উপকারী হইলেও অধিক কফের সংস্রব থাকিলে বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্যের সহিত জ্বরাংশ বর্ত্তমান থাকিলে কোন তৈলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

ক্রিমিরোগে তৈল প্রয়োগ।

অগ্নিমান্দ্য রোগের ন্যায় ক্রিমিরোগেও বাহ্যিক কোনরূপ তৈল প্রয়োগের উপদেশ শাস্ত্রে নাই। এবং কবিরাজ মহাশয়েরাও ক্রিমিরোগে কোন প্রকার তৈলের ব্যবহার করেন না। তবে কোন কোন গ্রন্থে মস্তকের ইকুন বিনাশের জন্য ক্রিমি অধিকারে বিড়ঙ্গতৈল ও ধূস্তূর তৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত তৈল কাহাকে কখনও ব্যবহার করিতে দেখি নাই

এবং আমি নিজেও কখন ব্যবহার করি নাই, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত তৈলে গন্ধক ও মনঃশিলা আদি দ্রব্য থাকায় হয় ত তৈল ব্যবহারে মস্তকস্থিত কেশ সমূহের অকাল পক্কতা আদি দোষ জন্মাইতে পারে, সুতরাং এসমস্ত অপরিচিত তৈল ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ।

পাণ্ডুরোগে তৈল প্রয়োগ।

অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমিরোগের ন্যায় পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকাদি রোগেও বড় একটা তৈল প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই। কেবল কোন কোন কবিরাজ পুনর্নবাতৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং নিম্নে তাহারই বিষয় বলিতেছি।

পুনর্নবাতৈল।

কৃষ্ণতিলের তৈল /৪ চারিসের। প্রথমে তৈলটী পূর্ব্বলিখিতমত কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া তদবস্থায় কিছুদিন রাখিয়া দিবে। অনন্তর মূর্চ্ছাদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল হইতে ছাকিয়া ফেলিয়া প্রথমতঃ নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্যের সহিত পাক করিবে, যথা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুকা, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, ছোটএলাইচ, দারচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগকেশর প্রত্যেক দ্রব্য তুইতোলা ওজনে লইয়া একত্রে পূর্ব্বরাত্রে আবশ্যকমত জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে, পর দিবস উত্তমরূপে কুটিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ।৬ ষোল সের জল, কুট্টিত কল্কদ্রব্য ও তৈল একত্রে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ১২৷৷০ সাড়েবার সের শ্বেত পুনর্নবা কুটীয়া ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া।৬ ষোলসের শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত তৈল পাক করিবে। তাহার পর কল্কদ্রব্যগুলি তৈল হইতে উত্তমরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া শেষ পাক দিবে, শেষপাক বিধি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। শেষ পাকের পর তৈল ছাকিয়া রাখিয়া দিবে।

এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগ, কামলারোগ, হলীমকরোগ, রক্তপিত্তরোগ ও প্লীহারোগের শান্তি হয়। ইহার একটী অসাধারণ গুণ এই যে, ঐ সমস্ত রোগের সহিত রোগীর জীর্ণ অর্থাৎ অল্পমাত্রায় জ্বর থাকিলেও এই তৈল প্রয়োগে কোনও বাধা নাই। অপিচ বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

আমি নিজে যদিও কখনও এই তৈলের প্রয়োগ দেখি নাই অথবা নিজেও করি নাই, কিন্তু তথাপি আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এই তৈল দ্বারা পাণ্ডু কামলাদি রোগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। সুতরাং আশা করি যে, কবিরাজ মহাশয়েরা এই তৈল ব্যবহার করিয়া ইহার ফলাফল এই সম্মিলনী পত্রিকা-তেই লিখিয়া পাঠাইবেন। আর যদি কোনও সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের এই তৈলের ব্যবহারবিধি জানা থাকে, তবে তিনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলে আমাদের এবং সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

ক্রমশঃ—

আশ্বিন
কলিকাতা } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অগ্নিমান্দ্যরোগে তৈলপ্রয়োগের বিষয় শাস্ত্রে কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও লেখক মহাশয় যে সকল তৈল প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, সে সকল সম্পূর্ণ সত্য কথা। তাঁহার লিখিত পুনর্নবা তৈলের প্রতি আমাদেরও বিলক্ষণ আস্থা আছে। সম্পাদক।

ঘৃতপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রক্তপিত্তরোগে ঘৃত প্রয়োগ।

রক্তপিত্ত রোগে বাসাঘৃত ও দূর্ব্বাদ্য ঘৃতের বিষয় বিশিষ্ট রূপেই বলিয়াছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্তরোগে শতাবরী ঘৃত, সপ্তপ্রস্থ ঘৃত ও কামদেব ঘৃত এই ত্রিবিধ ঘৃত চক্রদত্ত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। চক্রদত্তের ন্যায় অদ্বিতীয় জ্ঞানশালী ব্যক্তি যখন নিজ গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; তখন এসমস্ত ঘৃত নিশ্চয়ই রক্তপিত্তরোগে অসীম উপকারী বলিয়া আমার ধারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশীয় কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি কখনও কোনও কবিরাজ মহাশয়কে রক্তপিত্ত রোগে এ সকল ঘৃতের ব্যবহার করিতে দেখি নাই। এবং আমি নিজেও কখন ইহাদের ব্যবহার করি নাই, সুতরাং যাহা নিজে কখনও ব্যবহার করি নাই এবং অন্যকেও কখন ব্যবহার করিতে দেখি নাই, সে সকল ঘৃতের আর তালিকা লিখিয়া কি করিব?

তবে জিজ্ঞাসা করি যে, দেশের কবিরাজ মহাশয়েরা এসকল ঘৃত প্রস্তুত ও ব্যবহার করেন না কেন? যে চক্রদত্ত লিখিত কুষ্মাণ্ডখণ্ড ঔষধের নাম শুনিলেই তাহার উপকারিতা ভাবিয়া কবিরাজ কুলের কর্ণকূহর আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, আর সেই চক্রদত্ত লিখিত এসকল ঘৃতের সম্বন্ধে, একবার কেহ ভ্রমেও নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন না, ইহার প্রকৃত কারণ কি? বলা বাহুল্য যে, ইহার নূতন কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র কারণ সেই পুরাতন পচা কথা, সেই ব্যবসাদারী কথা। বস্তুতঃ ভারতে এহেন অসাধরণ পরোপকারী সর্ব্বতোভাবে মহান্‌মঙ্গলজনক চিকিৎসা কার্য্যটা এরূপ পাকা ব্যবসাদারীর হাতে পড়িয়া যে কি ভয়ানক দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, সত্য সত্যই কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, দুঃখে ক্ষোভে রোষে তাপে প্রাণ ফাটিয়া যায়! সুতরাং যতদিন না দেশীয় সুবিজ্ঞ কবিরাজকুল চিকিৎসা ব্যবসায়কে নেহাৎ ব্যবসাদারী হইতে মুক্ত করিয়া ইহার প্রকৃত সংস্কারে নিযুক্ত হইবেন, ততদিন কোন মতেই বৈদ্য চিকিৎসার উন্নতির আশা করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু আপাত-সুখের প্রতি পদাঘাত করিয়া কয় জন কবিরাজ সে দিকে অগ্রসর হইতে পারেন?

ক্রমশঃ—

আশ্বিন
কলিকাতা } শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

লেখক মহাশয়ের কথা গুলি আমাদেরই অন্তরে কথা, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু না বলাই ভাল।

সম্পাদক।

শিশুদিগের যকৃতের বিলিয়ারী সিরোসিস্।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণধন বসু এম, বি।

যাঁহারা কলিকাতায় কিছুকাল চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এ রোগের পরিচয় দিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রতি বৎসরে কত শিশু ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। আর ইহাও জানেন যে, তাঁহাদের দ্বারা এ রোগের প্রতিকার প্রায় কিছুই হয় না। এসম্বন্ধে

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীতে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দুর্দ্ধর্ষ রোগের কারণ বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে অথবা ইহার চিকিৎসাপ্রণালী স্থির করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হন্ নাই। এমন কি এরূপ রোগীর চিকিৎসাভার লইতে এক্ষণে অনেকে সম্মত হন না এবং এ সম্বন্ধে নিজ নিজ অজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা মফঃস্বলে থাকেন, তাঁহাদের অনেকের পক্ষে সম্ভবতঃ এ রোগ নূতন বলিয়া বোধ হইবে, এজন্য ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

ছয় মাস হইতে আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে ইহার সূচনা হয়। প্রথমে বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হয়ত শিশু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বমন করে, স্ফূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়, আহারে তত স্পৃহা থাকে না এবং দাস্ত পরিস্কার হয় না। জ্বর হয় কি না বুঝিতে পারা যায় না এবং যদিও হয় শিশুর পিতা মাতা তাহা বুঝিতে পারে না, কারণ গাত্রের উত্তাপ প্রায় কিছুই থাকে না। হয়ত এরূপ অবস্থায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া যায়। পরে শিশু কৃশ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পিতামাতা চিকিৎসকের পরামর্শ লন। তিনি সমস্ত শুনিয়া যকৃৎটী পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, ইহা ২।৩ ইঞ্চ বাড়িয়াছে। এই সময় হইতে জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের দক্ষিণ ও বাম উভয় বিভাগ সত্বর বাড়িয়া যায়। এমন কি দেড় মাস দুই মাসের মধ্যে নিম্নে কুস্‌টা-ইলিয়াই ও পার্শ্বে প্লীহা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। পরে ইহার সঙ্কোচ আরম্ভ হয়। এ অবস্থায় প্লীহার বিবর্দ্ধন প্রথম লক্ষিত হয়। পরে পোর্টাল রক্ত-সঞ্চালনের অবরুদ্ধতাজনিত সমস্ত লক্ষণ প্রতীয়মান হইতে থাকে। উদর-ত্বক্‌স্থিত শিরাসমূহ স্ফীত হয়, পেরিটোনিয়ামে জলের সঞ্চার হয়। পায়ের ইডিমা (রস) ও জণ্ডিস্ লক্ষিত হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি পেরিকার্ডিয়েমে পর্য্যন্ত একবার জল দেখিয়াছিলাম। রোগের ভোগ ৪ মাস হইতে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত।

নিদান তত্ত্ব। মেডিকেল কলেজের নিদানতত্ত্ব-অধ্যাপক ডাক্তার গিবন্‌স এই চারিটি লিভারের পোষ্ট মরটেম পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন এ রোগে লিভারের সেল্‌স (কোষ সমূহ) প্রায় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে সৌত্রিকবিধান যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

লিভারের আয়তন অনেক বড় হয়, তাহার উপরিভাগ হরিদ্রা বর্ণ হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নডিউল (গুটিকা) দ্বারা আবৃত থাকে। পিত্তাধার সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও তাহাতে প্রায় কিছুমাত্র পিত্ত থাকে না। আবরক ঝিল্লি মোটা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ রোগের প্রকৃত কারণ এখন পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিবন্‌স অনুমান করেন যে, কলিকাতার ভূমি মধ্যস্থিত নিষ্ক্রামক পয়োনালীর সহিত এ রোগের সম্বন্ধ আছে, কারণ নিষ্ক্রামক পয়োনালী নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইহা বড় লক্ষিত হইত না; কিন্তু আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা নিষ্ক্রামক পয়োনালী নির্ম্মাণের অনেক পূর্ব্বে কলিকাতায় দেখা যাইত। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের তিনটী সন্তান উপর্য্যুপরি এই রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি তাঁহার তৎসাময়িক ডায়রী দেখিয়াছি এবং তন্মধ্যে যে যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

ডাক্তার গিবন্‌স আরও বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এ রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি ৫ বৎসরের মধ্যে ৪টী মুসলমান শিশুর মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। দুইটী বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, রোগের কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১ম। এ রোগ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বড় দেখা যায় না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় (ক) যাহারা সন্তানদিগকে গাভীদুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। (খ) যে শিশুরা সর্ব্বদা গৃহ মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বাহিরের বায়ু প্রচুর পরিমাণে সেবন করে, তাহাদের মধ্যেও হয় না। আমরা সকলেই জানি যে, স্থানের অনাটন প্রযুক্ত দরিদ্রদের সন্তানগণ অধিকাংশ সময় বাটীর বাহিরে থাকে। আর ইহাও জানি যে, আমাদের ভদ্রলোকদের মধ্যে শিশুদিগকে প্রত্যহ বায়ু সেবন করান প্রথা অতি অল্পই দেখা যায়।

২য়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জনের ৩।৪টী বা ততোধিক সন্তান এ রোগে উপর্য্যুপরি মারা গিয়াছে। এ স্থলে স্বভাবতঃ মাতৃদুগ্ধ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের সহরের ভদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন; লিভারের ক্রিয়ার শৈথিল্য হেতু, অজীর্ণ ইহাদের অধিকাংশেরই আছে। বাহিরের পরিষ্কার বায়ুর সহিত

ইহাদের কোন সম্পর্কই নাই, আহারের নিয়ম কিছুই নাই ও শারীরিক পরিশ্রম কাহাকে বলে তাহা অনেকেই জানেন না। অতএব ইহাদের দুগ্ধ যে সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। ভিষক্‌দর্পণ ক্রমশঃ—

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ নিদারুণ প্রাণান্তকারী রোগের নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধে ডাক্তার প্রাণধন বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই সার কথা। তিনি যে তাঁহার সাহেব গুরুজীর কথায় সায় না দিয়া নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যথার্থই সুখী হইলাম। বস্তুতঃ এই যে সহরের প্রায় অধিকাংশ শিশু সন্তান যকৃৎরোগে প্রাণত্যাগ করে, ইহার একমাত্র প্রধান কারণই যে মাতার অব্যায়াম জন্য অম্ল বা অজীর্ণদোষ, তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্রই সন্দেহ নাই।

কিন্তু কেবল কি মাতার অম্ল বা অজীর্ণ জন্য একমাত্র শিশুসন্তানেরাই অকালে মারা পড়ে? তা ত নয়, মাতার জন্য শিশু মরে, পিতার জন্য পুত্র মরে, প্রভুর জন্য ভৃত্য মারা পড়ে, কর্ত্তার দোষে গৃহস্থ ধ্বংস হয়, অধার্ম্মিক জমিদার বা রাজার জন্য প্রজা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তবে সে সকল এত সূক্ষ্ম কথা, এতই সুগভীর ও জটিল ব্যাপার যে, এ সকল শারীরতত্ত্বে এ স্থলে আর সে সমস্ত কথা না তোলাই ভাল। তথাপি কিন্তু এ অধঃপতিত দেশের বর্ত্তমান্ ভদ্রনামধারীগণের ব্যায়াম চর্চ্চা সম্বন্ধে এ স্থলে দুই চারি কথা না তুলিয়াই পারিতেছি না।

শুনিতে পাই—বিলাতে নাকি কোটীপতি ব্যক্তিও প্রতিরোজ যথারীতি ব্যায়াম না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, এমন কি স্বয়ং গ্লাডষ্টোনও নাকি নিজ হস্তদ্বারা কুড়ালী দিয়া বৃক্ষাদি কর্ত্তন করেন। আর এ সকল মহারথী ধনকুবেরগণের স্ত্রী পুত্রেরা যে আমাদের দেশীয় মুটেমজুরের ন্যায় নিরন্তরই স্বহস্তে বাজার হাট করিয়া বেড়ান, সে কথা বলাই বাহুল্য। অথবা অতসাত সমুদ্র পারের দরকার কি? শুনিয়াছি ভারতের মধ্যে এক মাত্র নেপাল দেশে এখনও নাকি কি রাজা, কি প্রজা সকলকে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ২।৩ ঘণ্টাকাল যথারীতি ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হয়।

আর এ পোড়া দেশের লক্ষীছাড়া হতভাগা লোকের কিন্তু সমস্তই উল্টা। যদি ভাগ্যক্রমে ২।৫ শত টাকার স্থলে ২।১০ হাজার টাকার সম্পত্তি হইল, তবেই আর বাবি কোথায়? অমনি দেখ—তাকিয়া আলবোলা মদ্য বেশ্যা ও ধামাধরা মোসাহেব ইত্যাদি ষোলকলায়পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন বাবুদের খবর লইয়া দেখ, প্রাতে ৮।৯ টার পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশের নিদ্রাভঙ্গই হয় না, সুতরাং ব্যায়ামাদি ত দূরের কথা। দুঃখের বিষয় এই যে, সাহেবী অমৃত টুকুর সময় আমাদের অরুচি আইসে, কিন্তু সাহেবী বিষ্ঠার নামেই জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া উঠে। যদি তাহাই না হইবে, তবে সাহেবী যে কোন ভাল রীতি নীতির দিকে আমরা স্বপ্নেও যাইব না, কেবল কতকগুলি পচা ওছা অনুকরণ লইয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইব কেন?

যেহেতু তোমার কোন দিকে কোন সাহেবী আনাই নাই, মাঝখান থেকে তুমি এক সাহেবী টুপী পরিয়া ট্যাস্ ফিরিঙ্গীসাজে সাজিয়া বসিবে কেন? নিদারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ যায় যায়, এমন স্থলে পদযুগলে দুই ইষ্টাকিং জড়াইবার প্রবৃত্তি আইসে কেন?

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরমণীরা যে সততপরত নানাবিধ রকমে ব্যায়াম করিতেন, এহাল ফ্যাসনের বিলাসিতা যে তাঁহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করিতে পারিত না, সে বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। তাছাড়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, প্রায় প্রত্যেক ধনশালী ব্যক্তির রমণীরাই হয় স্বহস্তে তরকারী কর্ত্তন করিয়া নচেৎ পরিবেশনাদি অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যদ্বারা ব্যায়াম কার্য্য করিতেন। আর এখনকার কালে স্বামী যদি ২৫৲ টাকার স্থলে মাসিক ৩০।৪০৲ টাকা রোজগার করিলেন, তবেই দেখ, গৃহিণী রান্নাঘরে পদার্পণও করিবেন না। অপরন্তু উল লইয়া চেয়ারের উপর বিবিয়ানা ঢঙে বসিবেন।

ফলতঃ বর্ত্তমান হিন্দু স্ত্রীগণের বিশেষতঃ কলিকাতাবাসি-বিলাসিনীগণের যে অধিকাংশেরই এই শারীরিক পরিশ্রমের অভাবজন্যই শিশুসন্তানগণ যকৃৎ রোগে প্রাণত্যাগ করে, ইহা সম্পূর্ণই সত্য কথা।

তবে এসম্বন্ধে একটা ভারি আহ্লাদের কথা এই যে, আজ কাল ভারতে মানুষের বদলে দিন দিন যেমন অবুজ পশুর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া পশুভাবে ভারতের অধঃপতনের পথ আরও প্রশস্ত করার অপেক্ষা মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই সে সকল শিশুর ভারত ত্যাগ করাই আমাদের মতে সর্ব্বাংশেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি! কেননা গোয়াল বরং শূন্য ভাল, তথাপি দুষ্ট বলদ কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে!!

চি, স, সম্পাদক

চিকিৎসাবলী।

হোমিওপ্যাথিক মতে।

রক্ত আমাশয়।

বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের পুত্র, বয়ঃক্রম দশ বৎসর। তিনমাস গত হইল ইহাঁর পেটের অসুখ হয়, আহারের অনিয়মবশতঃ পাতলা জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ভেদনিবারণ হইয়া গেল বটে, কিন্তু পেটের বেদনা ও বারবার মলত্যাগের চেষ্টায় রোগীকে বিশেষ কাতর করিয়া ফেলিল। তখনও ঐ মতের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এইরূপে দশ বার দিন চিকিৎসা হইল; রোগী নিয়মমত ঔষধসেবন ও পথ্যের ব্যবস্থা প্রতিপাল করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পেটের অসুখ সম্পূর্ণ সারিল না; কখন

পাতলা জলবৎ মলত্যাগ হয়, কখন বা স্বাভাবিক হইয়া থাকে; কখন কখন মলের সঙ্গে আম নির্গত হয়, কখন পেট ফাঁপে, ক্ষুধা হয় না, আবার হয় ত অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কিন্তু ভালরূপ পরিপাক হয় না। এইরূপে দুই মাস গত হইয়া গেল, এই বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ই তারিখে রোগী আমার চিকিৎসাধীন হয়েন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন নিম্নলিখিত লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হইল,—মল আম ও রক্ত সংযুক্ত, কখন কেবল আম ও রক্ত নির্গত হয়, কখন মলের সঙ্গে আম ও রক্ত থাকে। আম ও রক্তমিশ্রিত না হইয়া কখনই মলত্যাগ হয় না। রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিয়া মলত্যাগ করিতে হয়, সেই সময় মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা ও টন্‌টন্ করিতে থাকে। অনেক সময়ে মলত্যাগের পরেও টন্‌টনানি থাকে। পেট কলকল করিয়া ডাকিতে থাকে, রোগীর শরীর শীর্ণ, ক্ষুধা অত্যন্ত হয় কিন্তু আহার করিলে ভালরূপ পরিপাক হয় না, প্রাতঃকালেই অনেকবার মলত্যাগ হইয়া থাকে। বেলা এগারটার মধ্যে পাঁচ ছয় বার ভেদ হয়, কিন্তু বৈকালবেলা প্রায়ই হয় না। রাত্রিকালে কোন দিন একবার, কোন দিন বা দুইবার হইয়া থাকে। মৎস্যের ঝোল ও অন্ন পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে। ভাল পরিপাক হয় না বলিয়া বৈকালবেলা জলবার্লি দেওয়া হয়। এই সমুদায় লক্ষণ দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, এলোজ ইহার একমাত্র ঔষধ, অতএব এই ঔষধের ২০০ ডাইলিউসন এক মাত্রা সেবন করিতে দিলাম এবং পথ্য যেরূপ চলিতেছিল, সেইরূপই ব্যবস্থা করিলাম। রোগীর পিতা আমাকে পরদিন বৈকালে আসিয়া একবার দেখিতে বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই এক মাত্রা ঔষধেই রোগীর বিশেষ উপকার হইল। পরদিন বৈকালে গিয়া শুনিলাম যে, আজ প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত একবার মলত্যাগ হইয়াছে। আমরক্ত বড় অধিক নাই, বেশ ফল হইয়াছে। এই ঔষধ পুনরায় দিতে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু আমি বিবেচনা করিলাম, ঔষধে যখন বিশেষ উপকার হইয়াছে, তখন আর ঔষধ দেওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু রোগীর পিতা মাতা ঔষধ দিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন বলিয়া আমি সুগার অব্ মিলকের দুইটী পুরিয়া দিলাম। দুই দিন দুই পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা হইল। তৃতীয় দিনে গিয়া দেখিলাম, রোগী অন্যান্য বিষয়ে ভালই আছে, কেবল মলের সঙ্গে আম ও রক্ত সামান্য আছে। ইহা দেখিয়া আর এক মাত্রা এলোজ ২০০ ডাইলিউসন দিলাম। মধ্যে একদিন ঔষধ বন্ধ রহিল।

তৃতীয় দিনে দেখিলাম রোগীর কোন কষ্ট নাই। দিবসে প্রাতঃকালে একবার ও বৈকালবেলা একবার উত্তমরূপ মলত্যাগ হইয়া থাকে। মলে আমরক্তের কোন চিহ্নই নাই। রোগীর ক্ষুধা বেশ হইয়াছে ও পরিপাকক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে। পূর্ব্বে পেটে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু সঞ্চিত হইয়া নির্গত হইত, এখন আর তাহা হয় না। এক সপ্তাহকাল চিকিৎসা করাতেই রোগীর তিন মাসের পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক রিভিউ।

ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল্, এম্, এস্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

দেশের বৈদ্যশাস্ত্রমতে ঠিক্ এই রোগের এই অবস্থাতেই কুটজ ও আয়াপানাদি এমন সকল বিনামূল্যের অতি আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ আছে, যে সকল ঔষধ এই রোগের শান্তির জন্য ২।৪ দিনের অধিক প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয় না।

চি, স, সম্পাদক

ওলাউঠানিবারণের উপায়।

১। বিসূচিকার জীবাণু জল মধ্যেই অধিক পরিমাণে নিহিত থাকিতে দেখা যায়; অতএব জল পরিষ্কার করিয়া না লইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। অপিচ অনেকে বলেন ১০০ ডিগ্রী পরিমিত উত্তাপে সকল প্রকার ব্যাধি উৎপাদক জীবাণুধ্বংস হইয়া যায়; অতএব পরিষ্কার করিবার সুবিধা না থাকিলে জল উত্তপ্ত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে।

২। বেশ লঘু পাক খাদ্য আহার করা উচিত। বাসি, পচা, ঠাণ্ডা, গুরু-পাক ও জঘন্য উপকরণে প্রস্তুত খাদ্য বিষের মত পরিত্যাগ করিবে। ক্ষুধার বিশেষ উদ্রেক না হইলে আহার করা অনুচিত। মক্ষিকাদি দ্বারা অনেক সময় রোগবিষ সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছে; অতএব যাহাতে খাদ্য দ্রব্যে মাছি প্রভৃতি বসিতে না পারে, সর্ব্বতোভাবে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

৩। রাত্রি জাগরণ, মাদক সেবন, অতি ভোজন, কুভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবন প্রভৃতি অহিতাচার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

৪। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমনের সংস্পর্শ অতীব দোষাবহ। অত-

এব তাহার ভেদ, বমন, গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য পুষ্করিণী নদী, প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহার্য্য জলাশয়ে ধৌত না করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত কিম্বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলা আবশ্যক।

৫। গৃহ দ্বার সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে তন্মধ্যে দিবাভাগে বিশুদ্ধ বহির্বায়ু অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে, তাহারও উপায় বিধান করিবে।

৬। গন্ধক অধিকাংশ রোগোৎপাদক জীবাণুর ধ্বংসকারক। অতএব প্রত্যহ দুই বেলা গৃহমধ্যে ধূনার সঙ্গে গন্ধক পোড়াইবে; তাহা হইলে দগ্ধীভূত-গন্ধকৌথিত-গন্ধকাম্ল-নামক বাষ্প বিশেষ (sulphuricsacidgas) গৃহময় ব্যাপ্ত হইয়া বায়ু নিহিত ব্যাধিবিষ বিনাশ করিতে পারে। আমাদের দেশে দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে যে নানা প্রকার বাজি পোড়াইয়া অগ্নি ক্রীড়ার প্রথা আছে তাহাতে সেই সমস্ত বাজির বারুদ পুড়িবার কালে গন্ধকাম্ল প্রভৃতি বাষ্প নির্গত হইয়া বায়ুরাশিস্থ ব্যাধিবিষ বিনষ্ট করে।

৭। আর্দ্রতা এবং উষ্ণতার সংযোগে মৃতদেহ বিগলিত হইয়া রোগোৎপাদক জীবাণুদিগের বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; অতএব নর্দ্দামা প্রভৃতি স্থান এবং গৃহদ্বার যাহাতে বেশ শুষ্ক থাকে, সেবিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। গুঁড়া চূণ আর্দ্রতা শোধন করে এবং তদ্ভিন্ন ব্যাধিবিষনাশকও বটে; অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহ পরিষ্কার করিয়া সেখানে গুঁড়া চূণ ছড়াইয়া দেওয়া মন্দ নহে।

৮। আল্‌কাতরা, কর্ব্বলিক-এসিড্, ফিনাইল প্রভৃতি পদার্থ তাদৃশ ব্যাধিবিষ নাশক ও ইহাদের দুর্গন্ধ নাশ করিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে; অতএব কোন স্থানে কোন জিনিস পচিয়া কিম্বা অন্যবিধরূপে দুর্গন্ধ হইলে সে স্থান হইতে সমুদায় দুর্গন্ধজনক পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধ নাশক দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্ব্বলিক্-এসিড্ ও ফিনাইল জলের সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

৯। অগ্নি যতক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে, ততক্ষণ বায়ুরাশিস্থ অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করে; তদ্ভিন্ন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তাপ সহযোগে তাহার নিকটবর্ত্তী বায়ু কিয়ৎপরিমাণে উত্তপ্তও হইয়া উঠে। এই উত্তপ্ত বায়ু অম্লজানভাগ পরিত্যাগ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, চতুর্দ্দিকের শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া সেই উত্তপ্ত ও ঊর্দ্ধগামী বায়ুর স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং

পূর্ব্ববৎ তাপ সহযোগে উত্তপ্ত হইলে ঊর্দ্ধগামী হইয়া অপর বায়ু প্রবাহের জন্য স্থান প্রদান করে। গৃহাদি দাহনকালে যে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহারও কারণ এই। বায়ু এইরূপে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবার কালে তন্নিহিত রোগজনক জীবাণু সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব বাটীর ও পল্লীর স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করাও মন্দ নহে। আমাদের দেশে যে শীতকালে আকাশপ্রদীপ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে ঊর্দ্ধবায়ুরাশির অম্লজান বাষ্প দীপ-শিখা সহযোগে দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতিপূরণার্থ ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুরাশি ঊর্দ্ধগামী হয়; সুতরাং সেই সঙ্গে ব্যাধি বিষও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

১০। যখন গ্রামের চারিদিকে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে থাকা বিশেষ আবশ্যক। ভয়, শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি প্রভাবে মন যত অবসন্ন হইয়া পড়িতে থাকে, দেহের পীড়াপ্রবণতাও তত বৃদ্ধি হয়। এসম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প মনে পড়িল; গল্পটী এই;—

একজন সাধুপুরুষ বাস করিতেন। একদা গভীর রাত্রিতে সেই মহাপুরুষ বৃক্ষমূলে যোগাসনে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোককে একাকিনী গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। ঘোর নিশীথ সময়ে একটী স্ত্রীলোককে একাকিনী দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কে—কোথায়, কিজন্য যাইতেছ? স্ত্রীলোকটী বলিল, "আমি ওলাউঠা, এই গ্রামে তিনটি লোককে বিনষ্ট করিব বলিয়া যাইতেছি।" মহাপুরুষ বলিলেন, "আচ্ছা যাও, কিন্তু সাবধান তিনটির অধিক লোক যেন না মরে।" ওলাউঠা বলিলেন "না না আমি সত্যই বলিতেছি, তিনটীর অধিক লোক মারিব না।" কিন্তু সেই গ্রামে তিনটীর স্থলে প্রায় তিন শত লোক মরিয়া গেল। তারপর ওলাউঠা সেই গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে মহাপুরুষ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি এই গ্রামে প্রবেশ করিবার সময়ে সত্যবদ্ধ হইয়া বলিয়া ছিলে যে, কেবল তিনটী লোকের প্রাণ নাশ করিবে। কিন্তু অতঃপর তিনটীর স্থলে তিনশত লোকের জীবন সংহার করিলে কেন?" সাধুর কথা শুনিয়া ওলাউঠা বলিলেন, আমি ঠিক তিন জনকেই বিনষ্ট করিয়াছি, কিন্তু বাকি দুই শত সাতানব্বই জন লোক মরিল—ভয়ে।" বাস্তবিক ওলাউঠা ধরিল ধরিল মনে করিয়া ভীত হওয়া ভাল নহে; কিন্তু তা বলিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করাও অনুচিত। ৮ হরিনাম ভাবে সঙ্কীর্ত্তন,

৮ রক্ষা কালীপূজা প্রভৃতি সাধারণ হিতোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্যে যোগ দিলে মন প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হয়।

১১। কর্পূরের আরক ওলাউঠার একটী ঔষধ। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বদা কর্পূর খাইলে এবং কর্পূরের ঘ্রাণ লইলে ওলাউঠা হইতে পারে না। মধ্যে মধ্যে কর্পূরের ঘ্রাণ লওয়া মন্দ নহে; কিন্তু অধিক পরিমাণে কর্পূর সেবন করিলে অতিসার রোগ জন্মিতে পারে।

১২। তাম্রখণ্ড তলপেটে সংলগ্ন করিয়া রাখায় অনেকের ওলাউঠা হইতে পারে নাই। আমরা প্রায় ১২।১৩ বৎসর পরীক্ষা দ্বারা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। আজ তিন বৎসর হইল শ্রীরামপুরে যে, একবার ওলাউঠার মহামারি হয়, তাহাতে আমরা যত লোককে ঘুন্‌সির সঙ্গে এইরূপ তাম্রখণ্ড গাঁথিয়া পরিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেবল একটী বালিকার সামান্য উদরাময় ভিন্ন অপর কাহারও পেটের দোষটী পর্য্যন্ত হয় নাই।

ডাক্তার শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার হরিদাস বাবু হিতবাদীতে ওলাউঠা রোগের কারণ ও প্রতীকারাদি সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বলা-বাহুল্য যে, তাঁহার লিখিত উপদেশ গুলি সম্পূর্ণ সত্য ও যথার্থ যুক্তিপূর্ণ। অতএব আমরা আশা করি যে, ওলাউঠায় সময় সকলে এসকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ঔদাস্য করিবেন না। চি, স, সম্পাদক

গৃহচিকিৎসা।

(মুষ্টিযোগ)

সাময়িক প্লাবনে আমাদের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, গৃহচিকিৎসাও তাহার একটী। গৃহচিকিৎসা কিরূপ উপকারী, ইহার অভাবে বঙ্গমহিলা-দিগকে অনেক সময় কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, বামাবোধিনীতে এ কথা অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় এখানে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া অদ্য আমাদের পরীক্ষিত কতিপয় সুলভ ঔষধ দেশীয় ভগিনীদিগের জন্য লিখিতেছি। আজিকার এই ডাক্তার কবিরাজ

ছড়াছড়ির দিনে, পেটেণ্ট ঔষধের জাঁকাল বিজ্ঞাপনের দিনে এবং ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি বাক্স রাখার দিনে, যদি কোনও ভগিনী আমাদের লিখিত "গাছ গাছাড়া" প্রভৃতি হইতে উপকৃতা হন, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। তবে গুরুতর রোগে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে উপেক্ষা করিয়া গৃহচিকিৎসায় নির্ভর করা সকলেরই অকর্ত্তব্য।

শিশুদিগের উদরাময়ের ঔষধ—দাস্তের রঙ্ যদি হল্‌দে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি সাদা বা সবুজ রঙের দাস্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অপাঙ্গ (চিড়চিড়ে) গাছের কতক গুলি শিকড়, একটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লোহার পাত্রে রাখিয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর পক্ষে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা। সাত আট বৎসরের বালকদিগকেও এ ঔষধ দেওয়া যায়। বয়স বুঝিয়া মরিচের মাত্রা (পূর্ণমাত্রা ৩টী) ও ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে দিতে হয়।

২।৩ বৎসরের শিশুদিগকে উদরাময়ে এক ছটাক শীতল জলে একটী পাতি বা কাগজি লেবুর রস দিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবন করাইলে আরাম হয়। এই ঔষধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও দেওয়া যায়।

সকল প্রকার উদরাময়েই দুগ্ধ পথ্য অনুপকারী। (চূণের জল দিয়া) বার্লিই সুপথ্য। অভাবে সাগু ও এরারুট দেওয়া যাইতে পারে। মিছরির জল দেওয়া ব্যবস্থা হইলে, খুব পাতলা দেওয়া উচিত। মিছরির জল ঘন হইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

শিশুদিগের কাশির ঔষধ—ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইলে কাশি আরাম হয়। যদি সর্দ্দি বসিয়া গিয়া কাশি হয় এবং হাঁপানির ন্যায় কষ্টকর হয়, তাহা হইলে আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া গলায় সেঁক দিলে হয়। একটা মাটীর গামলায় আগুন রাখিয়া তাহাতে আকন্দের পাতা তৈল দিয়া রাখিলেই গরম হয়। ঐ তৈল গরম থাকিতে থাকিতে গলায় ধরিতে হয়। এইরূপে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেঁক দিলে হাঁপানির ন্যায় কষ্ট দূর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের কষ্টকর হাঁপানিতে এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

পেট ফাঁপার ঔষধ—পেটে টার্পিণ তৈল মালিশ করিয়া গরম জলে ফ্লানেল

ভিজাইয়া সেঁক দিলে, প্রায়ই এক ঘণ্টার মধ্যে আরাম হয়। কতকগুলি মৌরি একখানি ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জলে রাখিতে হয়। সেই জল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে, ইক্ষুচিনি দিয়া রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে পেট ফাঁপা আরোগ্য হয়।

আমাশয়ের ঔষধ—রাখাল ছিট্‌কী গাছের পাতা ৫।৬ টী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লৌহপাত্রে গরম করিয়া খাইলে আমাশয়ের পীড়া আরাম হয়। দিনে তিন বার সেবন করিতে হয়। শিশু হইলে মরিচের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাশয়ের রোগীর যদি জ্বর না হয়, তাহা হইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন চাউলের অন্ন চাই। সেই সঙ্গে ডালিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া আমাশয়ের রোগীকে দেওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে বেলশুঁট দিয়া সাগু, বার্লি প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা।

বেল পোড়া আমাশয়ের রোগীর পক্ষে কিরূপ মহৌষধ, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বেল কয়লা অপেক্ষা কাষ্ঠের আগুনে পোড়ানই ভাল। বেল পোড়া ইক্ষুচিনি দিয়া খাইতে হয়।

পানে চূণ বেশী হইলেই তো গাল পুড়িয়া যায়। সেই চূণ গালের যেখানে লাগে, সেখানে এক রকম ঘা হইয়া থাকে। উহা এরূপ যন্ত্রণাদায়ক যে, উহার জন্য অনেক সময়ে আহারাদি করিতে বা কথা কহিতে বড় ক্লেশ হয়। এরূপ হইলে, বাজারে বেণের দোকানে "রসমাণিক্য" বলিয়া একরূপ পদার্থ পাওয়া যায়, (তাহার আকার বায়্‌লেট কালির ডেলার মত), তাহা মধু দিয়া পাথরে ঘসিতে হয়, তাহা হইতে হলুদের রঙের মত যে দ্রব বাহির হয়, তাহা ঐ চুণেপোড়া ঘায়ের উপরে দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। সামান্যরকম চূণে পুড়িলে একটু সরিষার তৈল আঙ্গুলে লইয়া ঐ চূণেপোড়া স্থানে মালিস করিলে আরাম হয়।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া নিবারক—খয়ের চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে আরাম হয়। যদি বেশীপরিমাণে রক্ত পড়ে, তাহা হইলে আমরুল পাতা চিবাইয়া দিলে বন্ধ হয়।

গর্ভিণীদিগের প্রসব বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ ধড়্‌ফড়ে ব্যথার সময়ে) যদি ব্যথা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক গ্লাস খুব শীতল জল অথবা শীতল দুগ্ধ পান করাও, শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

বামাবোধিনীর লিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধ গুলি বাস্তবিকই বিশেষরূপ পরীক্ষিত। আমরা প্রতি নিয়তই এ সকল ঔষধের সমূহ উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং এমন সমস্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের প্রতি সাধারণেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। কেননা এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের বুকে ভয়ানক সর্দ্দি বসিয়া হাঁপ ধরিয়া প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, বড় বড় এম্ ডি সাহেব ডাক্তার আসিয়া যাতনার বিন্দুমাত্রও লাঘব করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু সেই সেই স্থলে বামাবোধিনীর লিখিত আকন্দপাতা ও সরিষাতৈল, ক্ষণকালের মধ্যেই শিশুর সে প্রাণান্তকারী যন্ত্রনার সম্পূর্ণ শান্তি করিয়াছে। সুতরাং এ সকল ঔষধ যে সর্ব্বসাধারণেরই যত্নের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? চি, স, সম্পাদক

মুষ্টিযোগ ঔষধ।

নালিঘা।

১। পুরাতন ঘৃত পাঁচ তোলা, তুঁতিয়া ভস্ম চারি আনা ভালরূপ মিশাইয়া যতদূর সম্ভব নালিঘাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

২; ভেরেণ্ডা গাছের মূলদেশ হইতে অর্দ্ধ হাত উপর পর্য্যন্ত ছাল তুলিয়া লইবে। তাহা হইতে যে রক্তবর্ণ রস নির্গত হইবে, তাহা লইয়া ঈষৎ লবণের ছিট দিয়া ক্ষতে প্রবেশ করাইবে।

৩। অত্যন্ত উৎকট দুরারোগ্য ঘায়ে, মনুষ্যের মস্তকের হাড়, কাঁকড়ার পা, পৃথক্ পৃথক্ ভস্ম করিয়া চূর্ণ করতঃ উহাতে তৈল অথবা চর্ব্বি কিম্বা মশিনার তৈল মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিবে। উহা ক্ষতস্থানে প্রবেশ করাইবে।

পরিশিষ্ট;—ঘায়ের রোগীর পক্ষে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা একটি নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা। সুতরাং কোষ্ঠশুদ্ধি কারক ও ক্ষত শুষ্ক কারক কোন ঔষধ সেবন সহ উল্লিখিত কোন ঔষধ ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার হইবে। ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

১৮। প্রমেহরোগ।

১। ফিঠকারী ত্রিশ রতি, এক বতল পরিষ্কার জলে ফেলিয়া খুব ঝাঁকরাইয়া লইবে। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে উহার দুই তোলা পরিমাণ মাত্রায় সেবন করিবে।

২। কাবাবচিনি চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় হিম জল সহ দিবসে তিন বার খাইলে জ্বালা নিবারণ ও প্রস্রাব পরিষ্কার হয়।

৩। আদসের দুগ্ধ মধ্যে আদ পোয়া কচি লাউ (অলাবু) কাটিয়া দিয়া ক্ষীর পাক করতঃ তিন বারে খাইয়া ফেলিবে। এইরূপ ৩।৪ দিন খাইবে।

৪। হাতিশুঁড়ের গাছের রস, কিম্ভ ফুলবাদে এক তোলা একত্রে দুই তিন দিন খাইলে জ্বালা ও পুঁয় নিবারণ হয়।

১৯। ধ্বজভঙ্গাধিকার।

১। এক নম্বর ব্রাণ্ডি এক তোলা মধ্যে আদ আনা কুচিলা ঘসিয়া, গরম করিয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রলেপ দিবে। তাহার উপরে পান জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি বাঁধিয়া রাখিবে। চারি পাঁচ দিনেই ভাল হয়।

২। মনসাসিজের আঠা দ্বারা এক খণ্ড নেকড়া সাত বার ভিজাইবে ও ছায়াতে শুখাইয়া ঐ নেকড়া তরল ঘৃতে ভিজাইয়া একটি লোহার শিকের সহিত জড়াইবে এবং উহাতে উত্তাপ দিতে থাকিবে। উহার নিচে একটি পাত্রে জল রাখিতে হইবে। উত্তাপ পাইয়া ঐ জলের মধ্যে যে তৈলাক্ত পদার্থ চোয়াইয়া পড়িবে, উহা লইয়া প্রত্যহ দুই তিন বার জননেন্দ্রিয়ে মালিশ করিবে।

পরিশিষ্ট—বলকারক ঔষধ, দুগ্ধ ঘৃত আদি পুষ্টিকর আহার হিতকর। আন্তরিক অসুখ, দুশ্চিন্তা, রাগ ও স্ত্রী-সহবাস অহিতকর। ক্রমশঃ—

পুঁটিয়া। } ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

হিক্কারোগের দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়।)

যে কোন রোগের যে কোন অবস্থাতেই যত বড় প্রবল হিক্কাই কেন না হউক, নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধগুলি পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে প্রায়ই হিক্কার শান্তি হইতে পারে।

(১) কুলে আঠির শাঁস, রসাঞ্জন ও খৈ চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত গুলিয়া অথবা পিপুলচূর্ণ, আমলকীচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও হিঙ্গুচিনি সমভাগে লইয়া মধুরসহ, কিংবা পিপ্পলীচূর্ণ ও খর্জ্জুরের মাথি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিলে হিক্কার শান্তি হয়।

(২) যষ্টিমধুচূর্ণ মধুসহ, কিংবা পিপ্পলীচূর্ণ চিনিসহ অথবা শুঁঠচূর্ণ ইক্ষু-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

(৩) স্তনদুগ্ধসহ মক্ষিকা বিষ্ঠা মিশাইয়া কিংবা স্তনদুগ্ধে আল্‌তা গুলিয়া অথবা স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও অচিরাৎ হিক্কার শান্তি হয়।

(৪) মাষকলাই পোড়াইয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে প্রবল হিক্কার শান্তি হয়।

(৫) মরিচচূর্ণ ইক্ষুচিনিসহ পুনঃপুনঃ সেবন করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

(৬) কদলীমূলের রস মধুসহ পুনঃপুনঃ পান করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কার শান্তি হইতে পারে। উপরোক্ত মুষ্টিযোগ গুলির মধ্যে যাঁহার যেটীর সুবিধা হয়, তিনি সেইটী ব্যবহার করিতে পারেন। এগুলি আমাদের বিশেষরূপ পরীক্ষিত।

সম্পাদক।

নিদারুণ শোকসংবাদ।

কলিকাতার কবিরাজ-কুলভূষণ পরমদয়ালু কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কণ্ঠাভরণ মহোদয়ের সহসা অকাল মৃত্যুজন্য আমরা যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক শোকে অভিভূত হইয়াছি, তাহা আর লিখিয়া জানাইতে পারি না। প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন কবিরাজের অভাবে আমরা যে কিরূপ অভাবনীয় অভাব বোধ করিতেছি, তাহাও আজ বলিতে অক্ষম। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আজ্ কিন্তু এ শোকের দিনে এ চঞ্চলহৃদয়ে কোন কথাই বলিতে আমরা সক্ষম নহি। সুতরাং আগামীতে তাঁহার সেই পবিত্র জীবনীসম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিব।

ব্রজেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কলুটোলার খ্যাতনামা কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুজন্যও আমরা এস্থলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ব্রজেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেই চন্দ্রকিশোরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।

সম্পাদক।

৮ম বৎসর। শ্রাবণ ও ভাদ্র। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

৮ম খণ্ড, ১২৯৮ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই দুই সংখ্যায় যাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ আছে।

কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন। ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এ, বি, এল জমীদার। কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্, এম্, এস্। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এম্, বি। বাবু নলিনীনাথ মজুমদার। বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী জমীদার। এবং সম্পাদক।

কলিকাতা।

শিমলাষ্ট্রীট্ ৫নং, জ্যোতিষপ্রকাশযন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা, মোট দুই সংখ্যার নগদ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আগে কি চাই ?		...	১
ঐ	ভোজনসংবাদ	...	৩
ঐ	নিন্দনীয় স্থূল ও কৃশ শরীর	...	৪
আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা		...	৬
মূলে ভুল	(ডাক্তারী)	...	১০৯
মূলে ভুল কি প্রকারে বলি ?	(কবিরাজী)	...	১১৩
বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্য	(ডাক্তারী)	...	১২১
অবলাবান্ধব	(কবিরাজী)	...	১২৪
রোগনিদান	(ডাক্তারী)	...	১২৫
বহুমূত্র রোগে আফিংয়ের অসাধারণ গুণ	(কবিরাজী)		১২৮
চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ	(ডাক্তারী)	...	১৩২
ভোজ্য ও ভোজন	(ডাক্তারী)	...	১৩৩
অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় আরোগ্য সংবাদ	(কবিরাজী)		১৪১
চিকিৎসকের ভ্রম	(ডাক্তারী)	...	১৪৪
আয়ুর্ব্বেদীয়সদৃশ চিকিৎসা		...	১৫০
পদ্য মেটিরিয়ামেডিকা	(হোমিওপ্যাথিক)		১৫৩
ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী	(কবিরাজী)		১৫৪
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	ঐ	...	১৫৫
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা	(কবিরাজী)	...	১৫৭
মুষ্টিযোগ ঔষধ	(কবিরাজী)	...	১৬১
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	(সম্পাদকীয়)	...	১৬২
আমাদের কথা		অতিরিক্ত	পত্রে

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

আগে কি চাই ?

কেবল এই সুবিশাল ভারতবর্ষের ২০।২৫ কোটী লোক বলিয়া নহে, সমস্ত পৃথিবীর কোটী কোটী অথবা অসংখ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, যাহার অন্তরের কথা জানিতে চাহিবে, সেই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে যে, "আমার এইটী চাই" "এইটী আমার না হইলেই নয়"। কেহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়াও বিষয়ভোগের বাসনা ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, আবার কেহ বা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পরলোকের হিতকামনায় দেহপাত করিতেও ত্রুটী করিতেছে না। জীবশ্রেষ্ঠ মানবের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি সামান্য কীটপতঙ্গাদির প্রতিও লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারাও ক্ষণকালের জন্য স্ব স্ব কামনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। ফলকথা কামনা বা ইচ্ছা, জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যদিও গীতাদিধর্ম্মগ্রন্থে এই কামনা পরিত্যাগের জন্য অনেকানেক উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, যদিও এই কামনা-ত্যাগকেই মনুষ্যের চরমসুখ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে, কিন্তু জানি না একবারেই কোনপ্রকার কামনা-রহিত মনুষ্য এ পৃথিবীতে আছেন কি না। কোন জীবই এই কামনা হইতে একবারে বিরত থাকিতে সমর্থ নন্ বলিয়াই আমরা আজ্ এই কামনাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আরম্ভ করিব। নিষ্কাম পাঠক যদি কেহ থাকেন, অবশ্য এ প্রবন্ধ পাঠে তিনি বিরক্তই হইবেন, কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের ন্যায় সকাম পাঠকের পক্ষে যে, উপস্থিত প্রবন্ধটী বড়ই প্রীতিজনক হইবে, সাহসপূর্ব্বক সে কথা অগ্রেই গাহিয়া রাখিলাম।

কামনাবিষয়ে আলোচনা করিব বটে, কিন্তু একটা অতি আহ্লাদের কথা এই যে, এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজের কোনরূপ মতলব বা বুদ্ধি অনুসারে আলোচনা করিব না। তবে আয়ুর্ব্বেদভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন চরকসংহিতায় এই কামনাসম্বন্ধে যাহা বর্ণিতা আছে, তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু কথাটা বড়ই কঠিন, কেন না এ জগতে জীবের বিশেষতঃ মানবের

রাশি রাশি প্রার্থনীয় উপভোগ্য পদার্থের মধ্যে "আগে কি চাই" এ কথার মীমাংসা করা কি প্রকৃতপক্ষেই সহজ কথা? হয়ত আমাদের প্রস্তাবিত প্রার্থনার কথা শুনিয়াই কেহ মনে করিবেন যে, একি ভোজনব্যাপারের কিংবা পরিচ্ছদ বা অন্য কোনও ব্যাপারসম্বন্ধীয় কোন চাওয়ার কথা না কি?

আসল কথা কিন্তু তা নয়, তবে কথা এই যে, এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া চাহিবার অসংখ্য ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিমান্ মানবের পক্ষে চাহিবার কি আছে, প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কোন্ বিষয়ের প্রতি প্রখরদৃষ্টি রাখিবার আছে? তাহাই উপস্থিত প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য। মহাত্মা চরক বলিয়াছেন,—

ইহ খলু পুরুষেণানুপহতসত্ত্ববুদ্ধিপৌরুষপরাক্রমেণ হিতমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে সমনুপশ্যতা তিস্র এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি।

অর্থাৎ যাহার মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত, যিনি সমভাবে ইহলোকের ও পরলোকের হিতকামনা করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটী এষণার (কামনা বা ইচ্ছার) প্রতি নিরন্তর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া উহাদের অনুসন্ধানের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। যথা—

প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি।

অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রাণকে (শরীর ও মনকে) স্বচ্ছন্দ রাখিবার ইচ্ছা, যথোচিত ধনোপার্জ্জনের ইচ্ছা এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা। এই ত্রিবিধ এষণার মধ্যে কিন্তু প্রাণৈষণার প্রতিই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কস্মাৎ?

কিন্তু কেন, কিজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রাণৈষণার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে?

প্রাণত্যাগে হি সর্ব্বত্যাগঃ।

যেহেতু প্রাণত্যাগ হইলেই সকলের সহিতই সম্বন্ধ

ঘুচিয়া যায়, এ জন্যই সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বিঘ্নে প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমানের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—
সম্পাদক।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে ভোজন-সংবাদ।

৭ম খণ্ডে প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠার পর।

ভোজনের সহিত সত্ত্বরজ ও তম এই গুণত্রয়ের যে কিরূপ সম্বন্ধ, ইতিপূর্ব্বে আমরা গীতা হইতে সে সকল কথা খুব্ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় যে ব্যাপারটা কি, তাহার আভাস দিতেও ত্রুটী করি নাই; কিন্তু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, এ সকল অতি কঠিন কথা। আভাসে বলিলে চলিতে পারে না। কেননা এ সকল জ্ঞান এতই গভীর যে, তন্নতন্নরূপে খুলিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিলেও আমাদের ন্যায় পণ্ডিতের সংখ্যা এ সংসারে এতই অধিক যে, তথাপি তাঁহারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ স্থল। কাজেই কথা গুলির যতদূর সাধ্য নিম্নে বিশদরূপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ গুণত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণের বিষয়ই বলিতেছি। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধারণ ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় সত্ত্বাদি গুণত্রয় স্বাভাবিকরূপে মনুষ্যমাত্রেই অবস্থিতি করে। যেহেতু এমন অনেক দেখা যায় যে, কোন কোন লোক বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিক শিষ্ট শান্ত, দয়ালু, অনেকাংশে নিস্পৃহ অথচ তেজস্বী ও বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিমান্। সুতরাং এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি স্বভাবতই সত্ত্বগুণপ্রধান। এই সাত্ত্বিক ব্যক্তি দিবারাত্রই রজ ও তমগুণবর্দ্ধক প্রচুর মদ্যপানই করুক বা মাংসাদিই ভক্ষণ করুক, স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে কিন্তু তাহাতে সত্ত্বগুণ ষোল আনা বজায় না থাকুক, তবে আংশিক সত্ত্বগুণ তাহা হইতে কোন কালেও তিরোহিত হইবে না। কেননা "স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে" অর্থাৎ স্বভাব সকলেরই উপরে অবস্থিতি করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি গুণত্রয় সাধারণ ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তবে আর তাহার আন্দোলন আলোচনায় লাভ কি? যেহেতু যাঁহার যে গুণ, তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাই সৃষ্টি

হয় এবং তাহাই যদি আজীবন অবস্থিতি করে, তবে তাহা লইয়া আর অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি?

উত্তর—সত্য বটে ক্ষুধা তৃষ্ণা বা সত্ত্বাদিগুণ মনুষ্যগণের জন্মের সহিত স্বাভাবিকরূপেই জন্মিয়া থাকে এবং মনুষ্যও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই এই স্বভাবের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু তাহা হইলেও যে মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে একথা সঙ্গত (স্বভাবের আধিপত্য যে অক্ষুণ্ণ থাকে,) একথা স্বীকার করিতে পারি কৈ? কেন যে পারি না তাহাও বলি। মনে কর রাম বাল্যকাল হইতেই সাত্ত্বিক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। রামেতে দয়া আছে, ধর্ম্ম আছে, পরোপকারে প্রবৃত্তি আছে, অসাধারণ সহ্য গুণ আছে। মোট কথা সত্ত্বগুণের যে যে লক্ষণ, প্রায় তাহার অধিকাংশই রামেতে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে রাম যে রজ ও তমগুণ হইতেও একবারে বিমুক্ত, তাহাও নহে। অনুসন্ধান করিলে রজ বা তমগুণের অংশও যে রামেতে পাওয়া না যায়, তাহাও নহে, সুতরাং রামের আহারাচার ও পরিচ্ছদাদির সংবাদ লইলে জানা যাইবে যে, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক ঘৃত দুগ্ধাদি সাত্ত্বিক ভোজন এবং রজতমগুণবর্দ্ধক মৎস্য মাংস ও লঙ্কা ইত্যাদি রাজসিক ও তামসিক ভোজন এই ত্রিবিধ ভোজনেই রামের অভ্যাস আছে। কাজেই দয়া ধর্ম্ম বা রাগদ্বেষাদি ত্রিবিধ গুণের আধিপত্য রামের উপর থাকিলেও স্বাভাবিক শক্তিতে রাম সাত্ত্বিক বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত।

এখন কথা এই যে, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সহিত ভোজন ব্যাপারের যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অসাধারণ নিগূঢ় সম্বন্ধ এবং সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভোজনের ইতরবিশেষদ্বারা যে কি অনির্ব্বচনীয়রূপে সত্ত্বাদি গুণের ও ইতরবিশেষ হইতে পারে, তাহা আমরা এই রামশ্যামের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ক্রমশঃ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ——

সম্পাদক।

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
নিন্দনীয় স্থূল ও কৃশশরীর।

(৭ম খণ্ডে প্রকাশিত ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

কেমন করিয়া মনুষ্যশরীর অতি স্থূল বা অতি কৃশ হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোক যে কিজন্য

অসাধারণ স্থূলশরীরে যার পর নাই কষ্টভোগ করিয়া জীবনযাপন করেন, তাহাও বলিতে ত্রুটী করি নাই। অতঃপর দেখা যাউক যে, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যের স্থূলদেহের কৃশতা এবং কৃশদেহের স্থূলতা আসিতে পারে। চরক বলিয়াছেন—

স্থূলকায় ব্যক্তির স্থৌল্যবিনাশের জন্য গুরুপাকী অথচ যে সমস্ত আহারদ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পুষ্ট না হয়, এমত আহার প্রদান করিব। অপর কৃশ ব্যক্তির কৃশতা বিনাশের জন্য লঘুপাকী এবং যে সকল আহারদ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পুষ্ট হয়, এরূপ আহার করিতে দিবে।

অপরন্তু স্থূল ব্যক্তি বায়ুনাশক এবং শ্লেষ্মা ও মেদনাশক অন্নপান, রুক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বস্তিকার্য্য এবং রুক্ষ মালিশাদি ব্যবহার করিবেক।

স্থূলব্যক্তির সম্বন্ধে গুলঞ্চ, মুথা ও ত্রিফলা, প্রভৃতির ক্বাথ বা ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত মদ্যাদি, মধু এবং বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার ও লৌহচূর্ণ বিশেষ হিতকর। কেবল ইহাই নহে। চরক বলেন—

প্রজাগরং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাভিপ্রবর্ত্তয়েৎ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেহের অতিস্থূলতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনিদ্রা, স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম, এবং চিন্তা, এ কয়েকটী ক্রমে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিবেন।

বলা বাহুল্য যে, অতি স্থূলতাবিনাশের জন্য চরকোক্ত কথাগুলি যে কতদূর সার ও সত্যপূর্ণ, তাহা শতমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারি না। কেননা উপরোক্ত চারিটী উপদেশের মধ্যে অপর তিনটী ছাড়িয়া দিয়াও যদি অতি স্থূলব্যক্তি একমাত্র যথারীতি অতি ব্যায়ামের শরণ লইতে পারে, তবে আর কখনই সে ব্যক্তিকে অতিস্থূলতা জন্য কষ্টভোগ করিতে হয় না।

প্রায় চারিবৎসর পূর্ব্বে কোন ধনকুবের তাঁহার ৮ম বর্ষীয় প্রাণাধিক পুত্রের অতিস্থূলতা ধ্বংসের জন্য আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আমি উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে বালকের পক্ষে যোগ্য বলিয়া, কেবল ব্যায়ামের জন্যই ব্যবস্থা দিই। ধনকুবেরও আমার কথায় আস্থা আনিয়া সেই অবধি সে পুত্রের জন্য যথারীতি নানাবিধ কষ্টকর ব্যায়ামের বন্দবস্ত করিয়া দেন।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, ছয়মাস যাইতে না যাইতেই বালকের শরীরের স্থূলতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল এবং শুনিলে হয়ত বিশ্বাসই হইবে না যে, বৎসরাধিক অতীত হইতে না হইতেই এহেন মহিষাশূর বালক যেন প্রকৃতই তালপাতার সিপাহীতে পরিণত হইয়া আসিল। যে বালকের উদরটা ইতিপূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড জয়ঢাকের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যাহার উরুস্থানটা ঠিক্ সাধারণের দেহের ন্যায় স্থূল হইয়াছিল, যে বালক এক আধ পা হাঁটিলেই কামারের যাঁতার ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিত, মহর্ষি চরকের একটীমাত্র উপদেশে একমাত্র ব্যায়ামক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই সেই বালক আজ্ সকল যন্ত্রণা হইতে অবসর পাইল। সুতরাং ইহাতেও যে এ হতভাগ্য দেশের হতভাগা লোকে এমন আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, ইহার বাড়া আর দুঃখ ও ক্ষোভের কথা আর কি হইতে পারে?

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

৭ম খণ্ডে প্রকাশিত ৩০৯ পৃষ্ঠার পর।

রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতার ইন্দ্রিয়স্থানে চক্ষুকর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া যেরূপ আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যুপরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইয়াছি। অদ্যও কিঞ্চিৎ দেখাইতেছি।

অন্তরেণ গুদঙ্গচ্ছন্নাভিঞ্চ সহসানিলঃ।
কৃশস্য বংক্ষণো গৃহ্নন্ সদ্যো মুঞ্চাতি জীবিতং॥

অর্থাৎ যদি বায়ু সহসা মলদ্বারের নিকট হইতে নাভিতে গমনপূর্ব্বক কৃশ ব্যক্তির বংক্ষণদেশে বেদনা জন্মায়, তবে ঐ বায়ু সদ্যই উক্ত কৃশ ব্যক্তির জীবন সংহার করিয়া থাকে।

বিতত্য পশুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যায়তাক্ষস্য সদ্যো মুঞ্চাতি জীবিতং॥

অর্থাৎ বায়ু যাঁহার পার্শ্বাস্থির অগ্রভাগে বিস্তারপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে বেদনা জন্মায়, আর তাহার যদি চক্ষু স্থির ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবে সদ্যই সেই ব্যক্তির জীবন ধ্বংস হইবে।

হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
দুর্ব্বল্যস্য বিশেষণ সদ্যো মুঞ্চাতি জীবিতং॥

অর্থাৎ বায়ু বলবান্ হইয়া মলদ্বার ও হৃদয়ে প্রবল বেদনা জন্মাইলে দুর্ব্বল রোগীর জীবন শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া থাকে।

বঙ্ক্ষণৌ চ গুদঞ্চোভে গৃহীত্বা মারুতো বলী।
শ্বাসং সঞ্জয়ন্ জন্তোঃ সদ্যো মুঞ্চাতি জীবিতং॥

অর্থাৎ যদি বলবান্ বায়ু বঙ্ক্ষণ ও মলদ্বার এই উভয় স্থানে বেদনা উৎপাদনপূর্ব্বক শ্বাসরোগ জন্মায়, তবে সদ্যই প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

নাভিং বস্তিং শিরো মূত্রং পুরীষঞ্চাপি মারুতঃ।
বিবধ্য জনয়ন্ শূলং সদ্যো মুঞ্চাতি জীবিতং॥

যদি বায়ু নাভি, বস্তি, মস্তক, মূত্র এবং পুরীষ বিবদ্ধ করিয়া শূল জন্মায়, তবে ঐ বায়ু সদ্যই রোগীর প্রাণনাশ করিতেছে জানিবে।

উদ্যেতে বঙ্ক্ষণৌ যস্য বাতশূলৈঃ সমন্ততঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্য প্রাণান্ জহাতি সঃ॥

বাতজনিত শূলদ্বারা যাহার চারি দিকে বঙ্ক্ষণ ভিন্ন হইতে থাকে, অথচ পুরীষ ভঙ্গ ও তৃষ্ণাধিক্য হয়, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে।

আপ্লুতং মারুতেনেহ শরীরং যস্য কেবলং।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতং॥

যাহার শরীর কেবল বায়ুদ্বারা আচ্ছন্ন; অথচ মলভঙ্গ ও তৃষ্ণাধিক্য বিদ্যমান থাকে, সে সদ্যই জীবন ত্যাগ করে।

শরীরং শোফিতং যস্য বাত শোফেন দেহিনঃ।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতং॥

যে ব্যক্তির শরীর বাতজনিত শোথে ফুলিয়াছে, অথচ মলভঙ্গ ও তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, সে সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

আমাশয়সমুত্থানা যস্য স্যাৎ পরিকর্ত্তিকা।
তৃষ্ণাগুদগ্রহশ্চোগ্রঃ সদ্যো জহ্যাৎ স জীবিতং॥

যাহার আমাশয়ে পরিকর্ত্তিকা, তৃষ্ণা এবং মলদ্বারে উগ্রবেদনা হয়, সে সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

পক্বাশয়মধিষ্ঠায় হত্বা সংজ্ঞাঞ্চ মারুতঃ।
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা সদ্যো হরতি জীবিতং॥

বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থান ও সংজ্ঞা হরণপূর্ব্বক কণ্ঠে ঘুর্ঘুরক শব্দ জন্মাইলে রোগী সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

দন্তাঃ কর্দ্দমচূর্ণাভাঃ মুখং চূর্ণকসন্নিভং।
সিধ্রায়ন্তে চ গাত্রাণি লিঙ্গং সদ্যো মরিষ্যতঃ॥

যাহার দন্ত সকল কর্দ্দম লিপ্তের ন্যায় ও মুখ চূর্ণেরদ্বারা পরিপূর্ণ বোধ হয় এবং শরীরে ঘর্ম্ম বা লোমাঞ্চ হয়; তাহা সদ্য মরণের চিহ্ন বলিয়া জানিবে।

তৃষ্ণাশ্বাসশিরোরোগমোহদৌর্ব্বল্য কূজনৈঃ।
স্পৃষ্টঃ প্রাণান্ জহাত্যাশু সকৃদ্ভেদেন চাতুরঃ॥

যে ব্যক্তি তৃষ্ণা, শ্বাস, শিরোরোগ, মোহ, দৌর্ব্বল্য এবং কণ্ঠকূজন এই সমুদায়ের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অতীসারদ্বারা পীড়িত হয়, সে শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

তত্র শ্লোকঃ।

এতানি খলু লিঙ্গানি যঃ সম্যগববুধ্যতে।
স জীবিতঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মরণঞ্চাববুধ্যতে॥

যিনি এই সমুদায় সদ্য মরণের চিহ্ন সকল সম্যক্‌রূপে অবগত হন; তিনি মনুষ্যদিগের জীবন ও মরণের বিষয় যথার্থরূপে জানিতে পারেন। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

মূলে ভুল।

(এলোপ্যাথিমতে)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তারপর কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় ধাতুব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলভিত্তি বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই বায়ু পিত্ত ও কফ অনুসারে চিকিৎসাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। এই বায়ু পিত্ত ও কফের মর্ম্মগ্রহ না করিতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। এই বায়ু পিত্ত ও কফ বাদ দিলে আয়ুর্ব্বেদ একটা নূতন মত বলিয়া গণ্য হয় না। এই বায়ু, পিত্ত, কফ বুঝিবার পক্ষে কিছু কঠিন ও জটিল। আমি এই জটিল বিষয়টীর মীমাংসা জন্য "ধাতু" নামে একটী প্রবন্ধ সম্মিলনীতে প্রকাশ করি। আমি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ততটা ব্যুৎপন্ন নহি। ভাবিয়াছিলাম কোন উপযুক্ত কবিরাজ এই বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্রকে ধাতুব্যাখ্যা সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতে দেখিয়া বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম যে, বুঝিবা এতদিনে আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইল। কিন্তু তদপরেই আমাদিগকে হুতাশ হইতে হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় বলেন, অন্যের সঙ্গে বৃথাতর্ক করিয়া বায়ু পিত্ত সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা হইবে না। বায়ু, পিত্ত, কফ কি তাহা শ্রবণ কর। বায়ু হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু, পিত্ত হচ্ছেন ব্রহ্মা এবং কফ হচ্ছেন স্বয়ং মহাদেব। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যে বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোন ব্যক্তি উন্মাদ বা মৃগী-রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে কি বিষ্ণুনাশক তৈল দিবেন, না বায়ুনাশক তৈল দিবেন, অথবা তুলসীপত্র প্রদানে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিবেন? বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান। তিনি কোপ করিলে কি রক্ষা আছে? আবার পিত্ত কুপিত হইয়া পীড়কা উৎপন্ন হইলে অথবা রক্তপিত্তের পীড়া হইলে ব্রহ্মানাশক ঔষধ দিবেন, না পিত্তনাশক পটোলপত্রের ব্যবস্থা দিবেন; আর শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া বাতশ্লেষ্ম বিকার হইলে কি মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন? আর আমরাই যেন হিন্দু, সুতরাং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মানিয়া থাকি, কিন্তু মুসলমানেরা বা ব্রহ্মদেশীয় মগেরা ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মানে না, তবে কি মুসলমানের শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ

নাই? না তাহাদের পীড়ার নিদান স্বতন্ত্র? তবে ত আপনি আয়ুর্ব্বেদের উপাসক হইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীলোকের চিকিৎসায় অধিকারী হইতে পারিলেন না? ভাল, ধর্ম্মই যেন ভিন্ন হয়, বিজ্ঞান ত কখনও ভিন্ন হইতে পারে না। বলি, এই কি আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান?

তারপর কবিরাজ মহাশয় নাড়ীতত্ত্বের সমালোচনায় বলেন জীবদেহে সর্ব্বসুদ্ধ সাড়েতিনকোটী নাড়ী বিদ্যমান * * * ইহাদিগের মধ্যে আবার চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী অপেক্ষাকৃত আরও স্থূল। ইহারা সকলেই নাভিকন্দের অব্যবহিত নিম্ন হইতে সমুত্থিত হইয়া দেহমধ্যে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছে। যে স্থান হইতে এই কয়েকটী নাড়ী উত্থিত হইয়াছে, তাহার আকৃতি ঠিক একটী কচ্ছপের ন্যায়; মহাত্মা দত্তাত্রেয় ইহাকে কূর্ম্ম বলিয়াই বর্ণনা করেন। * * * ইহার মুখ হইতে ২টী এবং পুচ্ছ হইতে দুইটী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে * * * ইহার মধ্যে যে নাড়িটী হস্ত হইতে পাদপর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ইত্যাদি।—

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যদি আয়ুর্ব্বেদের শারীরশাস্ত্রোক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে দেখা যায় আয়ুর্ব্বেদের শারীরস্থান (এনাটমি) ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ। যাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আবার কল্পনা ও মতবিভেদে কাজ কি? এবং দত্তাত্রেয় কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহাই বা মানিবার প্রয়োজন কি? শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেই এগুলি অনায়াসে জানিতে পারা যায়। এই যে প্রতি শীতকালে মেডিকেলকলেজের ছাত্রেরা শবব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবের নাড়ীমাংসাস্থি প্রভৃতির সংস্থান তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করেন, সে শিক্ষাকে ভুল বলিব কেমন করিয়া? যদি বলেন মৃতদেহ হইতে কূর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দুইটী হস্তের স্থলে চারিহাত হইয়াছে, তবে আর উত্তর নাই। কিন্তু এই ধমনী স্নায়ু মাংস প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তারদিগের গুরুতর অস্ত্রকার্য্য সকল নিরাপদে সম্পন্ন হইতেছে। এই সকল নাড়ীর যথাযথ সংস্থান, উৎপত্তি ও গতি না জানিলে কি আর চিকিৎসা চলে? বলি, ঘোড়ার কামড়ে হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীটী ছিন্ন হইয়া হুহু শব্দে ছিট্‌কাইয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে পদের নাড়ীতে না বাহুর নাড়ীতে না আর কোথাও নাড়ী বন্ধন করিলে ঐ রক্তপড়া নিবারণ হয়। আপনি ত বলিলেন একটা নাড়ী বরাবর সরলভাবে হাত হইতে পা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শারীর-

বিদ্যায় এক্ষণে আর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। কবিরাজ মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি ডাক্তার গ্রে অথবা কোয়েন সাহেবের সচিত্র বৃহৎ "এনাটমি" একবার দর্শন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদিগের সুশ্রুতের কয়েকপাতা মূল শারীরতত্ত্ব লইয়া এক্ষণে কতবড় শারীরতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা মানববুদ্ধির গোচর, ইহাতে তৎসমুদয়ই আছে। যেমন ভূগোলশাস্ত্র প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ গ্রাম নদী নগরাদির সংস্থান নির্ভুল, সেইরূপ এই শারীরবিদ্যাও নির্ভুল। ইহাতে তর্ক ও কল্পনা বা অনুমানের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা প্রত্যক্ষ বা দৃশ্যবিজ্ঞান।

আমাদিগের বক্ষঃস্থলে বামদিগে যে হৃদয় আছে এবং যাহা সর্ব্বদা ডুড় ডুড় করিতেছে বা স্পন্দিত হইতেছে, ঐ হৃদয় সমস্ত ধমনীর মূল। ঐ হৃদয় রক্তের আধার। ঐ হৃদয় হইতে প্রথমত একটীমাত্র বৃহৎ নলস্বরূপ ধমনী নির্গত হইয়াছে; তাহা হইতে নানা শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বাহুতে যে একটী শাখার শাখা আসিয়াছে, উহার নাম ব্রেকিয়াল ধমনী। এই ধমনীর স্পন্দন উপরকার বাহুর ভিতর দিকে পাওয়া যায়। এই ধমনী হস্তের কনুয়ের নিকট দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া হস্তের মনিবন্ধ পর্য্যন্ত নামিয়াছে, তাহারই বামদিগে শাখাটীতে লোকে "ধাত" পরীক্ষা করে। উহার নাম বেড়িয়াল ধমনী। উহার মূলস্থান মনিবন্ধ নহে। তারপর পায়ের ধমনীর নাম "কিমোরাল"। ইটী বস্তিগহ্বরের একটী বৃহৎ ধমনীর শাখা। ইহা কুচ্‌কির নিকট আরম্ভ হইয়া বরাবর উরুর ভিতর দিক বহিয়া নামিয়া হাঁটুর নিকট দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। কুচ্‌কির অব্যবহিত নিম্নে এই ধমনীর স্পন্দন পাওয়া যায়। শরীরের নানাস্থানে যেখানে যেখানে ধমনীগুলি কিছু উপর দিয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানে ধমনীগুলির স্পন্দন পাওয়া যায়। এইত ধমনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা মাত্র। ইহার সবিস্তর বিবরণ অল্প কথায় বুঝিবার যো নাই। তবে এইমাত্র বলি যে, ধমনীর স্পন্দন হৃদয়ের সংকোচন ও প্রসারণের প্রতিশব্দ মাত্র। হৃদয় রক্তের আধার। ঐ হৃদয়যন্ত্র জীবিতদেহে অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া পম্পের ন্যায় ধমনীমধ্যে রক্ত প্রেরণ করিতেছে। ধমনীর ভিতর রক্তের ঢেউ উপলব্ধি হইতেছে। এই রক্তের তরঙ্গের উপলব্ধিই ধাত নাম অভিহিত। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্. বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবুর লিখিত "মূলে ভুল" নামক প্রবন্ধের সকল অংশে যে আমরা মত দিতে সমর্থ নহি, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর বর্ত্তমান কবিরাজগণের শারীরতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা জন্য যে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন চিকিৎসকপদবাচ্য নহেন, সে কথাও বলিতে ত্রুটী করি নাই। এখন কথা এই যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান ও আস্থার অভাবে পুলিনবাবুর সুর ক্রমেই সপ্তমে চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্যের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা করিতে গেলে সচরাচর সাধারণের যে সকল দোষ আসিয়া পড়ে, পুলিনবাবুর প্রবন্ধেও যে সে সকল দোষ কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন।

কেন না কবিরাজ প্রসন্নবাবু যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র অবলম্বন না করিয়া লেখেন নাই। সুতরাং পুলিনবাবু কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধের উপর যে সকল দোষ দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত দোষই কিন্তু প্রসন্নবাবুতে না বর্ত্তিয়া হিন্দু-চিকিৎসা শাস্ত্রেতেই বর্ত্তাইয়াছে। কাজেকাজেই পুলিনবাবুর কথার সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে এখন আমূল বৈদ্যশাস্ত্রের বিষয় তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সে সময় ও স্থান আমাদের নাই। না থাকিলেও এক আধটী কথা বলা আবশ্যক যে, পুরুষসংসর্গ ব্যতীতও যে রমণী গর্ভধারণ করিতে পারে, একথা একবারেই উড়াইয়া দিতে পারি কৈ? যেহেতু মনুষ্যের সম্বন্ধে উড়াইয়া দিলেও যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, একটী মেয়ে হাঁস পুষিয়া রাখুন, সে হাঁসটী ক্রমান্বয়ে ডিম্ব প্রসব করিতে থাকিবে। সুতরাং একটী মেয়ে হাঁস যদি পুংহাঁসের সংসর্গের অভাবে গর্ভধারণ ও ডিম্ব প্রসব করিতে পারে, তবে মনুষ্যেরও যে কেন তাহা ঘটিবে না, একথা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহা একটা মেয়ের হাঁসের ঘটিল, সেই ঈশ্বর সৃষ্ট মেয়েমানুষের যে তাহা কোনমতেই ঘটিতে পারে না, একথার কি পুলিনবাবু কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিয়া আমাদিগকে সুখী করিতে পারেন?

কেবলই তাহাই নহে, পুলিনবাবু আরও কতকগুলি কথার উপর (যাহা অত্যন্ত অসঙ্গত বোধে) তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আমরা নানাযুক্তি তর্ক দেখাইতে পারি, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে সময় আমাদের নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বক্তব্য শেষ না দেখিয়া আমরা এখন কিছুই বলিতে পারিব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রসঙ্গত প্রবন্ধের উপরেও আমাদের কিছু বলিবার আছে। যেহেতু তিনি যে সমস্ত পুঁথিপত্রকে যথার্থ শাস্ত্র মনে করিয়া ও যাহাদের আশ্রয় লইয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁহার নির্ব্বাচিত সে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন অংশকে আমরা অশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, বিধিমতেই দেখাইতে পারি যে, যথার্থ সাঁচ্চার মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুঁটা বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষেই রাম রহিমে ও স্বর্গ নরকে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই আজ পুলিনবাবুর কটাক্ষ নতশিরে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইতেছে। নচেৎ ঋষিপ্রণীত সনাতন হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত সার ও সত্যজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে পারেন, এমন লোক এ পৃথিবীতে কয়জন আছেন?

যাহা হউক, পুলিনবাবুর কটাক্ষে কবিরাজ মহাশয় কিন্তু স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার আংশিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই এদিকে কবিরাজ মহাশয়ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং অগ্রে পাঠকগণ অবহিতচিত্তে তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী অবলোকন করুন, শেষে জয়পরাজয় স্থির করিয়া লইবেন। আমরাও উভয় কুল বজায় রাখিতে সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

সম্পাদক।

মূলে ভুল কি প্রকারে বলি?

আমার বিবেচনায় মূলে বড়ই খাঁটি। মূলে খাঁটি বলিয়াই হিন্দুদিগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হয় নাই, বরং একটু একটু করিয়া ক্রমেই আলোচনা বৃদ্ধি হইতেছে। যদি মূলেই ভুল হইত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নাম গন্ধও থাকিত না। যে দিন হইতে ভারতাকাশে দুরাচার লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে, যে দিন হইতে ভারত-বাসীগণ স্বাধীনতা হারাইয়া উদরান্নের জন্য দাস্যবৃত্তিকেও পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেছে, সেই দিন হইতেই ত ভারতের সকল আশা সকল ভরসা তিরোহিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যবনরাজগণ হিন্দু শাস্ত্র সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে এবং হিন্দুনাম জগত হইতে উঠাইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার ঘরের শত্রু কালাপাহাড় ও হিন্দু দেবমন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শাস্ত্র সমূহকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে ও যে আয়ুর্ব্বেদ নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই কি যথেষ্ট নয়? আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শরীর তত্ত্ব এবং অস্ত্র চিকিৎসা বিস্তাররূপে নাই তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রের ন্যায় উহা ও যে বিস্তাররূপে ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। কেননা, অনেকগুলি গ্রন্থ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কথিত আছে ভগবান পুনর্ব্বসু ঋষির এক শতটী শিষ্য ছিল। সকলেই এক এক খানি সংহিতা রচনা করিয়া গুরুদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক্ষণে কেবল হারীত এবং অগ্নিবেশ কৃত সংহিতাই

দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থ গুলিতে কি ছিল তাহার বিন্দুমাত্রও কেহ অবগত নহে। শরীর তত্ত্ব এবং অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে মোটামোটি জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি চরক এবং সুশ্রুতসংহিতায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তাহার আর কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। কেননা, তাহা ঋষিপ্রণীত বেদ। যদি ডাক্তারী শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার অনৈক্য হয়, তবে ডাক্তারী শাস্ত্রই এক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার সহিত ঐক্য হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ চর্চ্চা না থাকাতেই তাহার এইরূপ দূরবস্থা হইয়াছে। দীর্ঘ যবনরাজত্বের সময় যদি বাঙ্গলাদেশে চক্রপাণিদত্ত, মদ্রদেশে মাধবকর এবং পশ্চিমাঞ্চলে ভাবমিশ্র জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে হতভাগ্য আয়ুর্ব্বেদের ভাগ্যে আরও যে কি হইত তাহা কে বলিতে পারে? ইংরেজ রাজত্বের সময়ও ৺ গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের জীবনরক্ষা করিয়াছেন। নতুবা যবনরাজও যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরেজ রাজত্বের প্রথমেই তাহা সুসিদ্ধ হইত। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র দেশ হইতে একবারে উঠিয়া যাইত। সুবিস্তৃত ভারত রাজ্যের মধ্যে এক এক সময় এক একটী মাত্র কবিরাজ প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় শাস্ত্রের আন্দোলনে কতদূর পর্য্যন্ত কৃত-কার্য্য হইতে পারেন, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। অধুনা মৃত কবিরত্ন মহাশয়ের অনুগ্রহে কবিরাজের সংখ্যাও যেমন বেশী হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চাও সেই পরিমাণে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের অবনতি সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী দিগেরই দোষ, নব্য বাবুদিগের ইহাতে কোনও দোষ নাই তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় ত এক জনের এক-চেটিয়া নহে। ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই সমান অধিকার আছে। তবে কেন বাবুগণ ঘরের সম্পত্তি উপেক্ষা করিয়া পরের ধনে দৃষ্টি করিতেছেন? ইহাতে কি তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে? যাঁহারা স্বকীয় শাস্ত্রের দুরবস্থা দেখিয়া পরকীয় শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে প্রাণপণে যত্ন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমরা কি দুইটা আক্ষেপও করিতে পারিব না? প্রতিবৎসর কতটী শিক্ষিত লোকে ডাক্তরী উপাধি লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন? আর কয় জনেই বা কবিরাজ হইয়া বাহির হইতেছেন? ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে সমাজের লোকসংখ্যা যত অধিক, সেই সমাজের উন্নতিও তত অধিক হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে নব্য

বাবুদিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাল, এম, এ, পাশ করিয়া কি কেবল ওকালতীই করিতে হয়? অথবা বি, এ, পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজের উপাধি না লইলে নয়? তা হউক, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের বিষয় রক্ষা করিতে তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। ঘরের ছেলে যদি পরের পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? এক্ষণে আমার নিজের কথা আমি নিজে বলিয়া রাখিতেছি। আমি দরিদ্রের সন্তান, আমার কোন পুরুষেও কোনদিন কবিরাজীশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই। আমি সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অর্থাভাবজন্য অনেক সময় আমার অনেক কার্য্য মিথ্যা আড়ম্বরে পরিণত হয়। আমি অনেক সময় দেশীয় ধন-কুবের দিগের নিকট অনেক বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি। আমার কোন প্রার্থনাতেই কেহ কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই। তা করিবেন কেন? আমি যদি লেডিডফারীণের স্মরণার্থ কোন ফণ্ড করিবার প্রস্তাব করিতাম, আমি যদি টম্‌সন্ হল্ নির্ম্মানার্থ অথবা মন্‌রো সাহেবের শ্যালকের পিসাত ভাইয়ের চিত্ত বিনোদনার্থ লক্ষমুদ্রা উড়াইয়া দিতে চাহিতাম, আমি যদি সাতসমুদ্র তের নদী পারস্থিত কোন জনপদের ভাবী অনিষ্ট দূরীকরণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে কোন্ দিন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া যাইত। আমি নিজদেশের মঙ্গলার্থ, হিন্দুজাতির গৌরব বর্দ্ধনার্থ এবং নিকটস্থ লোকদিগের উপকারার্থ প্রস্তাব করিয়াছিলাম বলিয়াই মায়া মন্ত্রমুগ্ধ দেশীয় ধনকুবেরগণ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আজ যদি কেহ কোন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য অথবা কোন মেডিকেল্ স্কুল সংগঠনের জন্য প্রস্তাব করেন, তবে চারিদিক্ হইতেই একটা হৈ হৈ রব উঠিবে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই হয়ত লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া পড়িবে। আমার এই দেশীয় ভাষায় দেশীয় প্রস্তাব কে শুনিবে? ইহাতে ত আর বিজাতীয় প্রসাদ পাইবার উপায় নাই? যাহা হউক, এক্ষণে আর অন্তরের কথা অধিক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। অন্তরের দুঃখ অন্তরেই মিশিয়া যাউক। তাহা মিথ্যা প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে এইমাত্র বলিতেছি যে, হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি চিকিৎসা ব্যবসায়দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা হইলে কবিরাজ মতে করাই ভাল। কিন্তু এই কথায় বৈদেশিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষেধ করিতেছি না। বৈদেশিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি দৈশীয় মত শিক্ষা

করিয়া দেশীয় মতে ব্যবস'য় করা যায়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের অনেকটা উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে এবং তাহাতে জাতীয়তারও রক্ষা হইতে পারে। আধুনিক বাবু সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত মহাত্মগণ কি তাহা করিতে ইচ্ছা করেন? যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর বিষয়ে সম্পূর্ণ বিদ্বেষ করিবেন এবং বিজাতীয় প্রসাদ ভক্ষণে উদরের তৃপ্তি সাধন করিবেন, তাঁহাদিগের দোষ উল্লেখ না করিয়া, সহায় সম্পদবিহীন দুই একটী আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর দোষ উল্লেখ করিয়া কি ফল হইবে?

হোমিওপ্যাথী সম্প্রদায় রাজার সাহায্য না পাইয়া ও দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছেন তাহা সত্য। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই স্থির প্রতিজ্ঞ এবং অনেকেই সম্পত্তিশালী, সুতরাং তাঁহারা যাহা ঐচ্ছা তাহাই অনায়াশে সংশোধন করিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা একা কিছুই করিতেছেন না। আমাদিগের মধ্যেও যে সকল মহাত্মাকে আমরা সাতিশয় সম্পত্তিশালী বলিয়া জানি এবং যাঁহাদিগকে আমরা আধুনিক শিক্ষিত বলিয়া মনে করি, সেই সকল মহাত্মাগণও আবার তাঁহাদিগেরই সহায়তা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা উন্নতিলাভ না করিবেন কেন? সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত-বাবু পুলিন চন্দ্র সন্যাল এম্, বি, মহাশয় একজন আধুনিক শিক্ষিত চিকিৎসক, বৈদেশীক মত হইতে সার কঙ্কলন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অভাব দূর করা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীদ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, বৈদেশিক ভাষায় তাঁহাদের তাদৃশ অধিকার নাই। যদি পুলিনবাবুর ন্যায় দুই চারি জন শিক্ষিত লোকে আয়ুর্ব্বেদের অযথা নিন্দা এবং ডাক্তারীশাস্ত্রের উন্নতিসাধনে সাতিশয় আগ্রহ না করিয়া অন্তরের সহিত কবিরাজদিগের সাহায্য করেন, তাহা হইলে বোধ হয় কবিরাজগণ শীঘ্রই আবার আয়ুর্ব্বেদকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। আমার এই সকল কথা যুক্তিসঙ্গত কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ থাকিলেও রাজদণ্ড ভয়ে কবিরাজগণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন না। কঠোর রাজদণ্ড বিভীষিকা সত্বে ও যে কোন কোন পল্লীতে এখনও দুই একটী দেশীয় অস্ত্রচিকিৎসক না আছেন এমন নয়। তাঁহারা অশিক্ষিত হইলে ও স্থল বিশেষে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, তাহা পরিদর্শন করিলে শিক্ষিত

সিভিল্‌সার্জ্জনকেও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু রাজদণ্ডভয়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এস্থলে দুই একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। ফরিদপুর জেলায় লক্ষ্মীকোল নামে এক জনপদ আছে। ঐ জনপদে নবীন কবিরাজ নামক একটী দেশীয় অস্ত্রচিকিৎসক ছিল। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল নবীন কবিরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। শারীরতত্ত্বে তাহার তাদৃশ অধিকার ছিল না। সে সামান্য রূপ লেখা পড়া জানিত মাত্র। কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিল। কোন্ রোগে কেমন করিয়া কোন্ সময় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সে বিলক্ষণ অবগত ছিল। সহসা কুগ্রহের কুটিল দৃষ্টিতে তাহার হস্তে অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত কোন রোগীর মৃত্যু হয় এবং সেই অপরাধজন্য ফরিদপুরের ইংরেজ বিচারপতি কর্ত্তৃক হতভাগ্য নবীন কবিরাজের কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হতভাগ্য আপনার অদৃষ্ট মন্দ স্বীকার করিয়া রাজদণ্ড সহ্য করিতেছিল। কিন্তু যে চিরকাল নিঃস্বার্থভাবে পরের মঙ্গল সাধন করিয়াছে, সহসা দৈবঘটনায় তাহার হাতে একটী মাত্র লোকের অমঙ্গল হওয়ায় লোক-নিয়ন্তা ভগবান্ তাহা সহ্য করিবেন কেন? দুই মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে না করিতেই হতভাগ্যের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ কারাগার মধ্যে একটী লোকের উরুস্তম্ভ হওয়ায় তত্রত্য সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত বি, বসু বাঁচিবে না বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় নবীন কবিরাজ উপস্থিত থাকায় কহিয়াছিল, "মহাশয়! আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাই যমদণ্ডের ন্যায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি। আপনারা এই রোগীকে বাঁচিবে না বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন কিন্তু এইরূপ শত শত রোগী আমার হস্তে নিরাপদে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তখন বিচারপতি এবং বি, বসুর অনুমত্যানুসারে নবীন কবিরাজ সেই উরুস্তম্ভ ছেদন করিয়াছিল। এবং কয়েদ অবস্থাতেই জাঙ্গল ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানে পুটলেপ প্রদান করিয়াছিল। এইরূপে অনতিবিলম্বে সেই রোগী সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করায় উপরোক্ত সিভিল্‌সার্জ্জনের প্রশংসা পত্রে নবীন কবিরাজ কারাগার হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছিল। বরিশালের অন্তর্গত রামসিদ্ধি নামক গ্রামে এখনও পদ্ম কবিরাজ নামে জনৈক অস্ত্রচিকিৎসক বাস করিতেছেন। অনেক অনেক অস্ত্রসাধ্য কঠিন পীড়া তাঁহা দ্বারা প্রতিকৃত হইয়া থাকে। যে সকল পীড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করিলে

প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল পীড়ায় তিনি কখনও অস্ত্রপাত করেন না। কয়েক বৎসর হইল জলপাইগুড়ীর রাজা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণদেব রায় বাহাদুরের দক্ষিণহস্তে একটী সামান্য ক্ষত হয়। জলপাইগুড়ীর সিভিল্-সার্জ্জন মেঃ ক্রস ক্রমাগত তিনবার পর্য্যন্ত সেই ক্ষত অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করেন কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। যখন ক্ষত কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে জ্বরও বিদ্যমান থাকিত, তখন রাজাবাহাদুর ভীত হইয়া রামসিদ্ধি হইতে পদ্ম কবিরাজকে আনিয়াছিলেন। কিন্তু পদ্ম কবিরাজ দেশীয় মতে চিকিৎসা করেন এবং তিনি মেডিকেলকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ নহেন, তাই জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিসনর এবং মিং অ্যাস্ তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে অনুমতি করিলেন না। অবশেষে রাজাবাহাদুরকে কলিকাতা যাইয়া বহুকষ্টে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে হইয়াছিল। তবেই দেখুন, আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসা রাজার অনুমোদিত না হইলে কবিরাজেরা কেমন করিয়া অস্ত্র ধারণ করিবেন? ধাত্রীবিদ্যা অস্ত্রচিকিৎসার একটী অঙ্গ বিশেষ, তাহা অবশ্যই আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ না করিলে সন্তান প্রসব করাইতে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়, তাহাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না। প্লেফেয়ার এবং লিস্‌ম্যান্ প্রভৃতির ধাত্রীবিদ্যায় প্রসবসম্বন্ধে কি প্রকার কৌশল বিবৃত আছে এবং সন্তানের মস্তক প্রসবদ্বার অপেক্ষা বড় হইলে কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারা যায় ইত্যাদি যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। তবে কার্য্যতায় অনেক স্থলে ডাক্তারদিগের কল্পনা যে সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি করিয়া থাকি। এস্থলে তাহারই দুই একটী নামোল্লেখ করিব। সত্য মিথ্যা পুলিন বাবু পত্র লিখিয়া বিশেষরূপ জানিবেন। ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ি। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সত্য সত্যই দেখিতেছি যে, আমাদিগকে উভয়কুল বজায় রাখিতে হয়। কেননা ডাক্তার বা কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত উভয় প্রবন্ধসম্বন্ধেই আমরা যখনই মনঃসংযোগ করিতে যাই, তখনই উভয়প্রবন্ধের সার ও সত্যবাক্যগুলি পাঠ করিয়া যেন আহ্লাদে

গদগদ হইয়া পড়ি। প্রকৃতই মনে হয় যেন লেখকদ্বয় যথার্থই গভীর গবেষণা ও চিন্তার শরণ লইয়া প্রবন্ধ দুইটী লিখিতেছেন। পক্ষান্তরে একথাও বলা অসঙ্গত নয় যে, এমন আনন্দেও যখন আবার উভয় প্রবন্ধে অজ্ঞানতা বা গোঁড়ামীর ছায়া নয়নপথে পতিত হয়, তখনই যেন আমরা আবার হতাশার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত হই। বলা বাহুল্য যে, এজন্যই ডাক্তার পুলিন বাবুর লিখিত প্রবন্ধের শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াও শেষটা বাড়াবাড়ি দেখিয়া আবার দোষ দিতেও ত্রুটী করি নাই। সেইরূপ কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রসঙ্গত প্রবন্ধ অশাস্ত্রীয় বলিয়া ঘোষিত করিয়া আবার তাঁহার লিখিত ২।১ টী কথা পড়িয়া একবারেই গলিয়া গিয়াছি। কেননা ডাক্তার বাবুর লিখিত "মূলে ভুল" প্রবন্ধের উত্তরে কবিরাজ মহাশয়ের কথিত "মূলে বড়ই খাঁটি" এই বেদবাক্যসদৃশ সম্পূর্ণ সত্যবাক্য পাঠ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। কিন্তু কেন, তাহাও বলি—

ডাক্তার পুলিন বাবুর "মূলেভুল" নামক সমগ্র প্রবন্ধের সার বা মূল কথা এই যে, হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রে শারীরতত্ত্বই থাকুক, আর শবচ্ছেদের ব্যবস্থা বা অস্ত্রশস্ত্রাদির বিবরণই থাকুক যেন তেন প্রকারে রোগনির্ব্বাচন প্রণালীই থাকুক, আর বটীকার বন্দ-বস্তই থাকুক, আসল কথা কিন্তু হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলটা একবারেই শূন্য! অর্থাৎ হাতুড়েমীতে পরিপূর্ণ! সুতরাং মূলে সত্যের লেশমাত্র নাই বলিয়াই "মূলে ভুল" নামক প্রবন্ধ অখ্যাত হইয়াছে। আর এই "মূলে ভুল" নামক প্রবন্ধেরও যে অর্থ, বলা অধিকন্তু যে, "হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক" এই চিরপ্রচলিত জাঁকাল অথচ পচা ও নিতান্ত অসার কথাটারও ঠিক্ সেই অর্থ।

এখন কথা এই যে, যথার্থই কি, হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলটা একবারেই শূন্য? সত্য সত্যই কি এচিকিৎসা-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত নহে? কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারি কৈ? মূলে ভুল স্বীকার করা দূরের কথা, বরঞ্চ স্পর্দ্ধার সহিত এস্থলে আজ্ তারস্বরে একথার ঘোষণা করিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, অস্ত্র বা শারীরতত্ত্বে আধুনিক উন্নতিশীল ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত তুলনায় আংশিক অঙ্গহানি থাকিলেও ঋষি-প্রণীত সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ন্যায় যথার্থ সার ও সত্য জ্ঞানপূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্র অদ্যাপি ও এপৃথিবীর কোনও স্থানে সৃষ্ট হয় নাই এবং সেইরূপ সত্যজ্ঞানে পৌঁছিতে যে প্রকৃতপক্ষেই এখনও বিদেশীয়দিগের অনেক বিলম্ব আছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন?

তাহাতেই প্রথমে বলিয়াছি যে, এসকল কথার প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে আমূল বৈদ্য-শাস্ত্রের আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়। কিন্তু সে সময় আমাদের নাই। না থাকিলেও বলা আবশ্যক যে, পুলিন বাবু আজ্ যে বৈদেশিক চিকিৎসা-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শক্তির পরিচয় পাইয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন, সে চিকিৎসার শক্তি রোগ আরোগ্য করা ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু হিন্দু-চিকিৎসার অসাধারণশক্তি এই যে, রোগের শান্তি ত হইবেই, অপরন্তু এই শাস্ত্রের

আশ্রয়ে থাকিলে আদৌ রোগই জন্মিবে না। সুতরাং সুবিজ্ঞ পাঠক। বলুন দেখি, ইহার কোন্‌টী ভাল? প্রকাণ্ড একটা জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া উভয় পক্ষের যথাসর্ব্বস্ব ধ্বংসের পর মীমাংসা ভাল, কি প্রথমেই মোকদ্দমা উপস্থিত না করাই শ্রেয়ঃ?

অথবা কেবল রোগাদির সম্বন্ধে বলিয়া কেন, বিশুদ্ধ সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে, পাঠকগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে, তদনুসারে চলিলে এসংসারের রোগ শোক, জরা বার্দ্ধক্য ও দুঃখ দারিদ্রের অনেকাংশে বিরহিত হইয়া মানবগণ প্রকৃত সুখে কালযাপন করিতে পারে।

তবে অবশ্য সে কিন্তু এ অধুনাতন প্রচলিত আটঘাট বন্ধনাপূর্ণ ও পঙ্গু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র নহে। আর এখনকার ন্যায় সম্পূর্ণ পশুধর্ম্মাবলম্বী রোগী বা আমাদের ন্যায় নরপিশাচসদৃশ দারুণ অর্থলোভী প্রবঞ্চক চিকিৎসকও নহে। ফলতঃ স্বর্গ ও নরকে যত পার্থক্য, হিন্দু ও মুসলমানে যেরূপ বৈপরীত্য, ধর্ম্মতঃ বলিতেছি যে, কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া নহে, এখনকার এ কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য চলিত হিন্দুধর্ম্মের বলিয়া যাহা কিছু, তৎসমস্তই এইরূপ ঘোর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবাদি জাতি, যেমন কুলিন ও পণ্ডিত ইত্যাদি উপাধি, সমস্তই এখনকার কালে শব্দ ও কার্য্যগত আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে; তেমনি সমস্তের মধ্যে কি একা চিকিৎসাবিজ্ঞান সতেজে ও স্ব-ভাবে খাড়া থাকিতে পারে? সকলের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রও একেবারে স্বর্গ হইতে গভীরতম নরকের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেবোপম উপাসকগণও প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণ রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

কাজে কাজেই নকল দেখিয়া কে কবে তাহার সুখ্যাতি করিতে পারে? স্বর্গের নামে নরকে পৌঁছিয়া কে কোথায় সুখী হইতে পারিয়াছে? হীরককণার বদলে ধূলিকণা পাইয়া এ জগতে কেই বা আপনাকে লাভবান্ মনে করিতে পারে? অতএব তাহা যদি না পারে, তবে এ বর্ত্তমানের প্রচলিত নিতান্ত ওঁছা ও অসত্যপরিপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদের প্রতি লোকের আস্থা আসিবে কেন? তাতেই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আধুনিক কবিরাজকুলের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুলিনবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সহ্য করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার লিখিত "মূলেভুল" একথা কোনমতেই মনেও স্থান দিতে পারি না। পারি না বলিয়াই কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত "মূলে বড়খাঁটী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আজ এত অধিক উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছি। বস্তুতঃ হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রের মূলটা যে সর্ব্বাংশেই খাঁটী, যথার্থই যে ইহা বিজ্ঞানসম্মত, তাহা শতসহস্র কারণ দর্শাইয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। অধিক কথায় দরকার কি, হিন্দুর সমস্তেরই মূলে খাঁটী বলিয়াই এখনও গোটা ধর্ম্মটার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এত প্রহারে নিষ্পেষিত হইলেও এখনও কিন্তু নির্জ্জীব বা নিস্পন্দ হয় নাই। প্রাণবায়ু এখনও সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যায় নাই। বরঞ্চ

এতকাল বিনা ঔষধে বিন্দুমাত্র সাহায্য না পাইয়াও যে স্বভাবের গতিতে আস্তে আস্তে আবার বলের সঞ্চার হইতেছে, ইহাই সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। আর কালে হয়ত বা আবার ভীমপরাক্রমে সিংহনাদ গর্জ্জন করিয়া সমগ্র ভারতকে মাতাইয়া তুলিতে পারিবে না, সে কথাই বা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, মূল সত্যসতাই খাঁটী বলিয়া ইহার উপর যতই আবর্জ্জনা বোঝাই হউক না কেন, যাহা খাঁটী, যাহা মূল্যবান্, যাহা যথার্থ সাঁচ্চা, তাহা চিরকাল তাহাই থাকিবেই থাকিবে, তবে অবশ্য ২।১০ দিনের জন্য বা ২।৪ শত বৎসরের জন্য ভাগ্যদোষে কালচক্রে ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে। কিন্তু ভস্ম বা ধূলিবালি দ্বারা ব্যাপ্ত হইলেই যে, মণিমুক্তাদির মূল্য বা গুণগরিমা থাকিবে না, এমন কোন কথা নহে। সেই জন্যই হিন্দুকবি গম্ভীরস্বরে ঘোষিত করিয়াছেন যে,

কিমপৈতি রজোভিরোর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা?

অর্থাৎ ধূলাবালিদ্বারা পরিব্যাপ্ত মণিমুক্তাদির মূল্য কি কখনও দূরীভূত হইয়া থাকে? না, কখনই নহে। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, হিন্দুধর্ম্মরূপ মণিমুক্তা আজ আমাদের ন্যায় ভারতবর্ষীয় অকাল কুষ্মাণ্ড পাষণ্ডরূপ ধূলিবালিদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তবে যদি কালে কোন মহাত্মা এ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া সজোরে পদাঘাতেই হউক, বা সম্মার্জ্জনীর সাহায্যেই হউক, অথবা যেরূপেই হউক, আমাদের ন্যায় ধূলিবালির অপসরণ করিয়া দিতে পারেন, তবেই দেখিবে যে, সোণার ভারত আবার সেই মণিমুক্তা সকলের নির্ম্মল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। নচেৎ এধূলিবালি ও আবর্জ্জনা বোঝাই থাকিতে কেহ যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহা ত স্বপ্নেও মনে হয় না।

সম্পাদক।

বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্য।

ডাক্তারীমতে।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তবে কি আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণকার চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল পথ দেখাইয়া দিতেছে, কেবলমাত্র সেই পথে গমন করিলে এ দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না। শ্রীযুক্ত সিম্‌সন্ সাহেব উপরি উক্ত প্রবন্ধের শেষে কলিকাতার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বলেন "কেহ কেহ বলেন যে, কলিকাতা কখনই

স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে না; তাঁহারা এই কারণ দর্শান যে, বিজ্ঞানবলে অন্যত্র যেরূপ, কলিকাতাতেও সেইরূপ উন্নতি করা গিয়াছে, তথাপি অপরাপর স্থান অপেক্ষা আমাদের এখানকার মৃত্যুসংখ্যা তুলনায় অধিক, একথা আমি অস্বীকার করি; এবং এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, উন্নতি সম্বন্ধে আপাততঃ যাহা করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, কলিকাতায় আরও উন্নতি করা যাইতে পারে, আমার বিবেচনায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলেই আমাদিগের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইতে পারে। কেহ বা অর্থদানে, কেহ বা ক্ষমতাপ্রভাবে, কেহ বা বিশেষ জ্ঞান থাকাপ্রযুক্ত এবং কেহ বা এই সকল গুলির দ্বারা এ কার্য্যে যোগদান করেন"। শ্রীযুক্ত সিম্‌সন্ মহোদয়ের এই উক্তি টুকুতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, নিম্নবঙ্গের ভূমি স্বাভাবিক কত অস্বাস্থ্যকর এবং দুই মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রশস্ত মাত্র ভূমির স্বাস্থ্য ভাল করিতে কত চেষ্টা ও কত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। এত করিয়াও এখনও কলিকাতা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। যখন এইটুকু স্থানের স্বাস্থ্য লইয়াই এত, তখন সমগ্র নিম্নবঙ্গকে ম্যালেরিয়া ও কলেরাবিমুক্ত করিবার চেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল।

যদি বঙ্গদেশকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করা একরূপ অসম্ভব, তবে এমন উপায় বাহির করা আবশ্যক, যদ্দারা বঙ্গবাসীদিগের শরীরের এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে যে, সেরূপ শরীরে রোগবীজ প্রবিষ্ট হইয়া আপনা আপনিই বিনষ্ট হইতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই আবিষ্কারটী খুব সত্য যে, শরীরের অবস্থা ভাল থাকিলে রোগবীজ সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনা আপনি বিনষ্ট হয় এবং ঐ শরীরে কোনক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। শরীরের এইরূপ অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে দুইটী পথ অবলম্বন করিতে হইবে। (১) পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্তির উপায়বিধান (২) দেশীয় নিয়মে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী পালন করা। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে শরীরের এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় যে, অতি সামান্য কারণেই নানাবিধ ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে। অতিভোজন অপেক্ষা অল্প ও অপর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্তিই শরীরের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকে ভাল করিয়া স্বাস্থ্যকর আহার পায় না; দরিদ্রতাই ইহার মূল। নিতান্ত দরিদ্র লোকেরা পুষ্টিকর আহার দূরে থাকুক, দুই বেলা

পেট ভরিয়া শাক-ভাত খাইতে পায় না। এইরূপ দীর্ঘকাল পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে আমাদিগের দেশের অনেক দরিদ্র লোক একরূপ Chronic starvation অবস্থায় থাকে, তাহাতে শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, যে কোন রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র শরীর রোগাক্রান্ত হয়। অতএব যাহাতে দেশের লোকের অন্নসংস্থান হয়, যাহাতে আমাদিগের কৃষক সম্প্রদায় ও মধ্যবিদ্ লোকেরা পর্য্যাপ্তপরিমাণে চাউল, ময়দা, লবণ ও ডাইল খাইতে পায়, তাহার উপায় বিধান করিলেই এ দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে। আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার দ্বিতীয় উপায়, আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদবিধিবিহিত স্বাস্থ্যরক্ষার সরল ও সহজসাধ্য নিয়মগুলি পালন করিয়া চলা। তাহাতে সহজেও স্বল্পব্যয়ে আমাদিগের শরীরের অবস্থা ভাল হইতে পারে। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে যেরূপ আহার বিহারাদি করিলে ও যে যে দ্রব্য খাইলে আমাদিগের শরীর ভাল থাকে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে, সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়া সেইরূপভাবে আমাদিগের চলা কর্ত্তব্য। যে যে ঋতুতে যে যে আচরণ করিতে হয়, তাহা চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অবশ্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত সত্যপথগুলি যে একবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে আমরা তাহা বলি না। তবে নিতান্ত পরানুসরণ না করিয়া এবং দেশকালভেদে ঐ সকল নিয়মের কতকগুলির নিষ্ফলতা ও পালন করা সাধ্যাতীত ভাবিয়া সহজসাধ্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঋতুচর্য্যা অবলম্বন করিলে যে আমরা কতকাংশে সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইতে পারি, এইরূপ অনুমান হয়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বর যে এ দেশে সেকালে ছিল না এখন নূতন দেখা দিয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন সুশ্রুত অন্যেদ্যুষ্ক, সন্ততক, চাতুর্থক প্রভৃতি ম্যালেরিয়া জ্বরের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং ঐ রোগের আকর্ষণ হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যায় তাহাও কতক কতক বলিয়া গিয়াছেন। যথা, সুশ্রুতে বিধান আছে, বর্ষাকালে শূন্যে শয়ন করিবে, যেহেতু ভূমি হইতে সেই সময় দূষিত বাষ্প উঠে। এইরূপ শূন্যে মাচা করিয়া বাস করা নিতান্ত দরিদ্র লোকেরও সাধ্যায়ত্ত এবং ইহা আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মতও বটে। নিম্ন ও জলসিক্ত আর্দ্রভূমিসম্ভূত রোগ সকলের নিদান আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যেরূপ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণকার ইউরোপীয় বিজ্ঞান তদপেক্ষা বড় বেশী করিতে পারে নাই। গোদ, কোরণ্ড, জলদোষ প্রভৃতি রোগের নিদানসম্বন্ধে

সুশ্রুতাচার্য্য বলেন যে, নিম্ন ও আর্দ্রদেশে এই সকল রোগ জন্মাইয়া থাকে। এই কথাগুলি অতি যথার্থ; আমরা দেখিতে পাই ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ সমুদয়, (খাগড়া বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে) গোদের জন্মস্থান। এই সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে রাত্রিকালে শূন্যে শয়নই ব্যবস্থা। এবং এই সোজা কথা অনুসারে যে কেহ মাচা পাতিয়া বাস করিলেই ম্যালেরিয়া-বাষ্প এবং জলদোষসম্ভূত রোগাক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি।

অবলাবান্ধব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে পুত্রঘ্নী বা মৃতবৎসার চিকিৎসা বলা যাইতেছে। যদি প্রতিবারেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়া যায়, অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সন্তানই নষ্ট হয়, তবে তাহাকেই মৃতবৎসা কহে। যে বৃক্ষে ফল ধরে নাই এমন একটী দাড়িম্ব বৃক্ষের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিলে দীর্ঘজীবী সন্তান লাভ হয়। মৃতবৎসা রোগে কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত এবং ফল ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঋতুস্নান পর ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঘৃত দীর্ঘকাল সেবন করিলে রমণীদিগের রজোদোষ ও যোনিদোষ অচিরে বিনষ্ট হয়, শরীরের পুষ্টি ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায় এবং অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন মেধাবী দীর্ঘজীবী পুত্র প্রসূত হয়। যাহারা কেবল কন্যা প্রসব করে, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ প্রশস্ত। পিপুল, মরিচ, মাষকলায়, শলুফা, কুড় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনির শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। কর্ণিণীরোগে গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দন্তী, ইহাদের কাথদ্বারা যোনি ধৌত করিতে হয়। খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, জাতীফল, নিম্ব ও গুবাক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মুগেরযূষসহ একত্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ঐ যূষ যোনিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে বিবৃতা যোনি সঙ্কীর্ণা হয় এবং জলস্রাব নিবারণ হয়। আলকুশীমূলের কাথদ্বারা যোনি ধৌত করিলে যোনি সঙ্কীর্ণা হয়। জীরা, কৃষ্ণজীরা,

পিপুল, করলাপত্র, তুলসী, বচ, বাসক, সৈন্ধব, যবক্ষার ও যমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতদ্বারা অল্প ভাজিয়া চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এবং অগ্নির বলাবলানুসারে ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করিলে সকল প্রকার যোনিরোগ নষ্ট হয়। ইন্দুরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা তিল তৈল পাক করিবে। সেই তৈলে তুলার পলিতা ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই সকল প্রকার যোনিরোগ নষ্ট হয়।

সোম ঘৃত।—গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত এই ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে ॥০ তোলা হইতে ১ এক তোলা মাত্রায় সেবন করা যায়। ইহাতে গর্ভের সমস্ত দোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদি সম্পন্ন সুন্দর পুত্র লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ী দিনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

রোগনিদান।

ডাক্তারীমতে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোগের তিন প্রকার কারণ আছে; বাহ্যিক, আভ্যন্তরিক এবং শারীরিক, এই শেষোক্ত কারণকে রোগ প্রবণতাও বলে। এই তিন প্রকার কারণের মধ্যে আভ্যন্তরিক কারণ শরীরের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন অথবা কতক পরিমাণে রোগকেই বুঝায়। সুতরাং রোগ-নিদানে বাহ্যিক এবং শারীরিক এই দুইটী কারণের বিষয়ই বিবেচ্য। কখন কখন একটী মাত্র কারণ অবস্থা বিশেষে কখনও বা বাহ্যিক এবং কখনও বা শারীরিক কারণে পরিণত হইতে পারে। বাহ্যিক কারণকে উত্তেজক কারণও বলা যায়।

রোগের কারণ সকল অবগত হইতে পারিলে রোগ নিবারণ এবং রোগ চিকিৎসায় অনেক সুবিধা হয়। কারণ জানা থাকিলে সময় সময় রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে রোগকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে পারা যায়। অনেক স্থলে রোগের কারণের উপর চিকিৎসকদিগের কোনই ক্ষমতা থাকে না।

অনেক ব্যাধির ঔষধ নাই। কিন্তু ঐ সকল ব্যাধির কারণ জানা থাকিলে আমরা সেই সকল কারণ হইতে দূরে থাকিলে তত্তৎ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

এক্ষণে রোগের দুই একটী কারণের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করা যাইতেছে।

শীতাতপের ইতর বিশেষ দ্বারা স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে। সর্ব্ব প্রথমে ইহাদিগের বিষয় বলা যাইতেছে।

পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ জলবায়ু দেখা যায়। কোন স্থল অতিশয় উষ্ণ এবং কোন স্থল অত্যন্ত শীতপ্রধান। অত্যন্ত অধিক শীতে বা অত্যন্ত অধিক উষ্ণতায় জীব জন্তু মরিয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীতে এইরূপ স্থান অত্যন্ত বিরল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই মনুষ্যের বাস দেখা যায়। পৃথিবীর বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল অত্যন্ত উষ্ণ এবং মেরুসন্নিহিত স্থান অত্যন্ত শীতপ্রধান। কিন্তু এই সকল স্থানেই মনুষ্য অনায়াসে বাস করিতেছে। অত্যন্ত শীতপ্রধান অথবা অত্যন্ত উষ্ণস্থানে বাস করিলে যে পীড়িত হইতে হয় এমন নহে। কিন্তু এই সকল স্থানে ক্রমে বাস অভ্যাস করিতে হয়। এই সকল স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে করিতে মনুষ্য ও জীব জন্তুর আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। অত্যন্ত শীতল স্থান অপেক্ষা অত্যন্ত উষ্ণস্থানে বাস করা সহজ। অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হইলে শরীরের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক যত্ন করিতে হয়। আহারাদির বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে দুরন্ত শীতে প্রাণ রক্ষা হয় না। এই জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীত-প্রধান দেশে অল্প লোকের বাস দেখা যায়। ভারতবর্ষ আফ্রিকা প্রভৃতি অত্যন্ত উষ্ণদেশে অনেক লোকের বাস দেখা যায়, কিন্তু উত্তর আমেরিকা, ল্যাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি মেরুসন্নিহিত শীতলদেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। ভারত-বর্ষের স্থান বিশেষে গ্রীষ্মকালে ফারেণহিটের ৮০, ১০০ এবং ১১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। আবার মেরুসন্নিহিত স্থানে কোন কোন স্থান এত শীতপ্রধান যে, তথায় পারদ শূন্যের নিম্নে ৪০ অথবা ৫০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ দুরন্ত শীতপ্রধান স্থানেও মানুষের বাস আছে। কিন্তু এই সকল স্থানে অতি অল্প মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেসকল মনুষ্যও নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি। অনুমানে বোধ হয় যে, পৃথিবীর

বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণস্থানে অথবা মেরুসন্নি-হিতস্থান অপেক্ষা কিঞ্চিদধিকতর শীতল স্থানে মনুষ্য কিয়ৎকালের জন্য ও প্রাণধারণ করিতে পারে না। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে ১১০ ডিগ্রির অপেক্ষাও অধিকতর উত্তাপে কিয়ৎকালের জন্য মানুষ অনায়াসে প্রাণধারণ করিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদেশ অপেক্ষা শীতলস্থানে মানুষ বাঁচিতে পারে কিনা, তাহা এক্ষণেও জানা যায় নাই।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উত্তাপাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উত্তাপে মানুষ প্রাণধারণ করিতে পারে না। এই মতটী এক্ষণে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ফারনহিট্ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। ফারেনহিট্ একটা অত্যন্ত উষ্ণ ভাটীর মধ্যে (যাহার উষ্ণতা ১৪৬° ডিগ্রি ছিল) একটী চড়াইপক্ষী ছাড়িয়া-দিয়াছিলেন, ঐ পক্ষী সাত মিনিটের মধ্যে মরিয়া গেল। একটা বিড়াল ছাড়িয়া দিলে ১৫ মিনিট মধ্যে মরিয়াছিল এবং একটা কুক্কুর অর্দ্ধ ঘণ্টার পর প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে হটাৎ এমত একটী ঘটনা ঘটে, যদ্বারা ইহা নিশ্চয়রূপে স্থিরকৃত হয় যে, ইহাপেক্ষাও অধিকতর উত্তাপে মানুষ কিয়ৎ-কাল থাকিলে মারা পড়ে না। ১৭৬০ এবং ৬১ খৃঃ অব্দে ডুহামেল্ এবং টিলেট্ নামক দুইজন পণ্ডিত এই বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য গল্প আছে। উক্ত ৬০—৬১ সালে ফরাশী দেশের এংস্থুওমাই প্রদেশে একরূপ কীট জন্মিয়া শস্য নষ্ট করিত। ডুহামেল্ এবং টিলেট শস্য কীটে নষ্ট না করিতে পারে এমত কোন উপায় আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, এমন কোন উত্তপ্ত স্থানে শস্য রাখিলে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, যে উত্তাপে কীট মরিয়া যায় অথচ শস্য নষ্ট না হয়। তাঁহারা একটী ভাটী তৈয়ার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া উহা উত্তপ্ত করেন। ঐ উত্তপ্ত ভাটির উত্তাপ নির্ণয়ার্থ টিলেট্ সাহেব একটী থার্‌মমিটার একটা লম্বাকার দ্রব্যে ঝুলাইয়া ভাটীর মধ্যে স্থাপন করেন, তৎপর ভাটীর দুয়ারের নিকট ঐ থার্‌মমিটার আনিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, ফুটন্তজলে থার্‌মমিটার রাখিলে যতটা পারা উঠে, ইহাতেও তাহাই উঠি-য়াছে। কিন্তু ভাটীর অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা ভাটীর দ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল এজন্য ভাটীর ভিতর হইতে থার্‌মমিটার বাহির করিবার

সময় পুনর্ব্বার কতকটা পারা নামিয়া পড়িয়াছিল, ঐরূপ অনুমান করিয়া টিলেট সাহেব ভাটীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ঠিক্ নির্ণয় করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, ইহাই অবহিতচিত্তে ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় একটী কুলি বালিকা কহিল "সাহেব আমাকে অনুমতি করুণ আমি ঐ উত্তপ্ত ভাটীর অভ্যন্তরে গমন করিয়া থার্মমিটারের পারা কতদূর উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া আসিতেছি। বালিকা অনুমতি পাইলে ঐ ভাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ২।৩ মিনিটকাল থাকিয়া দেখিল যে, তাপমাণযন্ত্রের পারদ ২৬০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। টিলেট্ সাহেব এই সময়ে বালিকার অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু বালিকা ঐ ভাটীমধ্যে আরও দশ মিনিটকাল থাকিয়া ছিল। ঐ দশ মিনিটে ভাটীর উত্তাপ ২৮৮° ডিগ্রি হইয়াছিল। অর্থাৎ যে উত্তাপে জল ফুটিতে থাকে তাহাপেক্ষাও ৭৬° ডিগ্রী বেশী হইয়াছিল। যখন এই বালিকা ভাটীর বাহিরে আসিল তখন দেখা গেল যে, তাহার বর্ণ গাঢ় উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু তাহার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইয়াছিলনা বা অন্য কোন অসুখ হয় নাই। তদ্‌পরে ঐ বালিকার দেখাদেখি আর একটী বালক ভাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রায় ঐ সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। সে যে সময় প্রবেশ করে, ঐ সময় ভাটীর অভ্যন্তর ৩২৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া ছিল, অর্থাৎ ফুটন্ত জলের উত্তাপ অপেক্ষাও ১১৩° ডিগ্রী উত্তাপ বেশী হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

(সম্পাদকীয়।)

বহুমূত্ররোগে আফিংয়ের অসাধারণ ক্ষমতা।

মেদিনীপুর জেলার কোন পল্লীগ্রামস্থ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি এমন গুরুতর বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হন্ যে, তাঁহার সে ভয়ানক অবস্থায় আর বাঁচিবার আশা কিছুমাত্রই ছিল না। একে বয়স অধিক, তাহাতে স্থূলশরীর, তার উপর প্রত্যহ দিবারাত্রে ২০।২৫ বারে প্রায়

১০।১২ সের প্রস্রাব হইত এবং রোগীর হাত পায়ের জ্বালা ও গাত্রদাহ এতই অধিক হইত যে, ২।৩ জন ভৃত্য দিবারাত্রি পাখার বাতাস করিয়াও তাঁহাকে সুস্থ রাখিতে পারিত না। বিশেষতঃ দিবারাত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নিদ্রা আসিত না। আর সঙ্গে সঙ্গে পিপাসার এতই আধিক্য ছিল যে, আকণ্ঠ জলপান করিয়াও তাঁহার পিপাসার কিছুমাত্র শান্তি হইত না।

প্রথম অবস্থায় তিনি তাঁহার নিজ গ্রামের কবিরাজ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করান। কিন্তু তাহাতে ফল না হওয়াতে অগত্যা মেদিনীপুরের সিবিল্-সার্জ্জন সাহেবের নিকট গমন করেন। ডাক্তার সাহেব ভালরূপে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষতঃ তাঁহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া জীবনের আর আশা নাই, তথাপি চিকিৎসা আবশ্যক এই বলিয়া ঔষধাদি দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় মাসাধিককাল ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াও কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। অপরন্তু রোগী ক্রমশই দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হইতে আরম্ভ হন্। অবশেষে জীবনের আর কিছুমাত্র আশা নাই ভাবিয়া ডাক্তার সাহেবের মতানুসারে তিনি গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। উদ্দেশ্য——মৃত্যু ত হইবেই, তবে পাড়াগাঁয়ে না হইয়া গঙ্গাতীরে হওয়াই শ্রেয়ঃ।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রোগী প্রথমেই আমাকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করেন। আমি রোগীর বাসায় গিয়া ও তাঁহার আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া এবং বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিশেষতঃ তিনি যে একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ীর একহাঁড়ী ফেণাপূর্ণ প্রস্রাব করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিব কি, একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলাম। রোগী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আমাকে তখন পুনঃ পুনঃ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার ভাবী ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তখন তাঁহাদের কথায় যে কি সন্তোষজনক উত্তর দিব, তাহার ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন বুঝিলাম যে, এরোগীর ত জীবনের আশা কিছুমাত্রই নাই, তখন এস্থলে নিজের বিশ্বাসমত সত্য কথা বলাই কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া স্পষ্টই বলিলাম যে, এরোগ অতি কঠিন সুতরাং এরূপ দুঃসাধ্য অতি কঠিন রোগের চিকিৎসা আমি একাকী করিতে পারিব না। সুতরাং আমার বিবেচনায় কলিকাতাস্থ অন্যান্য প্রবীণ কবিরাজ মহাশয়দিগকে

আনাইয়া পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। অনন্তর সকলেই আমার প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইয়া তৎপরদিনেই কুমারটুলীর কবিরাজ-শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় ও কলুটোলার চন্দ্রকিশোর ও ফৌজদারী বালাখানার বিনোদ বাবু এবং যোড়াসাঁকোর মৃতমহাত্মা ৺ ব্রজেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি কয়েকজন সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয়কে আনয়ন করেন।

বহুদর্শী ও প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় প্রথমতঃ রোগীর পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা বিশেষত প্রকাণ্ড হাঁড়ীবোঝাই প্রস্রাব দেখিয়াই ত শিহরিয়া উঠিলেন, অনন্তর ধীরভাবে আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া কর্ত্তব্যানুরোধে রোগীর সম্মুখে আশ্বাস দিয়া অন্তরালে আমাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, "এরোগীর আর বাঁচিবার কিছুমাত্রই আশা নাই। তথাপি এই এই অর্থাৎ সোমনাথ রসাদি কতকগুলি ঔষধ দাও" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর ও বিনোদ বাবুও প্রায় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কথাতেই এক প্রকার সম্মতি দিলেন। অধিকন্তু বিনোদ বাবু বলিলেন যে, রোগীর ত আশা নাই, তবে দেখুন যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকেন এবং যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে, কেননা রোগীর অবস্থাটা যে বেশ স্বচ্ছল। অবশেষে ব্রজেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় আসিয়া বলিলেন যে, রোগী মরিতেও পারে, বাঁচিতেও পারে, অতএব এখন সে বিচারে না গিয়া ঔষধাদি দেওয়া হউক, এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি দিতেই সম্মতি দিলেন।

এই ত ব্যাপার, এখন সুবিজ্ঞ পাঠক বলুন দেখি, এ আসন্নমৃত্যু রোগীর উপায় কি? কোন্ চিকিৎসকই বা সাহসে বুক বাঁধিয়া এ মরমর রোগীর চিকিৎসায় হাত দিতে পারেন? বলা বাহুল্য যে, বেগতিক বুঝিয়া সর্ব্বশেষটাতে আমিও আমতা আমতা করিয়া ২।৪ টী কথা বলিয়া ও টাকা দুইটী টেঁকে গুঁজিয়া প্রস্থান করিলাম। ওদিকে রোগীও তাঁহার আত্মীয়বর্গের সহিত একত্রে চিকিৎসক নির্ব্বাচনের জন্য জল্পনা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে বেলা ৩ টা বাজিতে না বাজিতেই আবার রোগীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে, কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছা যে, আপনিই তাঁহার চিকিৎসা করেন ও ঔষধাদি দেন। তবে দরকারমত গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়দিগকে সময় সময় আনান যাইবে। আমিও এ কথায় আর আপত্তি না

করিয়া তখনই গিয়া পুনর্ব্বার রোগীকে দেখিয়া সাধ্যমত বিবেচনাপূর্ব্বক সেই পূর্ব্বব্যবস্থিত সোমনাথরস প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তকুসুমাকর নামক সুবিখ্যাত ঔষধ দিতেও ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ২।৩ দিন ঔষধ ব্যবহারে রোগের উপশম হওয়া দূরের কথা, বরঞ্চ মৃগনাভিঘটিত গরম ঔষধ পড়াতে রোগীর মুখশোষ ও গাত্রদাহাদির আরও ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। অগত্যা ৪র্থ দিন হইতে সে সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া খুব্ অল্পমাত্রায় অহিফেণ লইয়া একটা যে সে বড়ীর সহিত মিশাইয়া তাহা এবং উপার্জ্জনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রমেহচিন্তামণী প্রভৃতি আরও ২।৩টী নগণ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মর্দ্দনের জন্য গুড়ূচ্যাদি তৈলটীও দিতে ত্রুটী করিলাম না।

পাঠক! কথাটা শুনিয়া একবারেই বিস্মিত হইবেন, এমন কি গাঁজাখুরী গোচের কথা বলিয়াও হয় ত ধারণা করিতে ত্রুটী করিবেন না যে, সেই দিন হইতেই রোগীর সে প্রস্রাবের মাত্রা কম হইতে আরম্ভ হইল, গাত্রদাহ কমিয়া আসিল, মুখশোষ ও নিদারুণ প্রাণান্তকারী পিপাসারও অনেক হ্রাস হইয়া গেল। এইরূপ সপ্তাহকাল মধ্যেই রোগীর প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক রোগের শান্তি হইয়া আসিল।

এইরূপে মাসাধিকের মধ্যেই রোগীর সর্ব্বপ্রকার রোগযন্ত্রণার শান্তি হইয়া রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উক্ত আফিংঘটিত ঔষধ ও গুড়ূচ্যাদি তৈল তাঁহাকে আরও ৮।১০ মাস কাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন তিনি কেবল নিজেই অল্পমাত্রায় আফিং ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং দরকারমত কখন কখন তৈলও ব্যবহার করেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আফিংয়ের এই অসাধারণশক্তির বিষয় আজ্ যে আমিই ঘোষণা করিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তার কবিরাজমাত্রেই ইহার শক্তির বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন। তবে আফিংয়ের উপস্থিত শক্তির পরিচয়টা নাকি প্রকৃতপক্ষেই অসাধারণ, তাই সাধারণের অবগতির জন্য আদ্যোপান্ত বিবরণ যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক।

চিকিৎসিতরোগীর বিবরণ।

এলোপ্যাথিমতে।

শোথরোগ।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে একটী তিন বৎসর বয়স্ক মুসলমানপুত্র শোথরোগাক্রান্ত হইয়া আমার চিকিৎসাধীনে আইসে। রোগী বিগত ভাদ্র মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল; পরে ক্রমে ক্রমে উহার পদদ্বয় ও মুখ ফুলিয়া উঠে। তৎপরে সর্ব্বশরীর শোথদ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগীর মুখ, শরীর, উদর, হস্তপদ সমস্ত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষান্তে দেখা গেল, উদরগহ্বরে যথেষ্ট জল সঞ্চার হইয়াছে; উদরটী বিলক্ষণ বড়; উদরের চর্ম্ম জলের ভারে সটান হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছে; অণ্ডকোষ দুইটীও জলভারাক্রান্ত এবং উহার চর্ম্ম ঐরূপ অস্থণ ও সটান হইয়াছে। চক্ষের পাতা ফুলিয়া চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র দেখা যাইতেছে। পাদদ্বয়ে অঙ্গুলির চাপান দিলে টোল খাইয়া যাইতেছে। চক্ষুর পাতা উল্টাইয়া দেখা গেল রক্তের লেশমাত্র নাই। প্লীহা যকৃৎবিবৃদ্ধি বুঝিতে পারা গেল না। রোগীর হৃদয়ও ফুসফুস্ সুস্থ। দুই দিন পরীক্ষান্তে জ্বর বুঝিতে পারা গেল না। রোগীর পিতা কহিল রোগীর খুব অল্প প্রস্রাব হয়।

আমি বুঝিতে পারিলাম ম্যালেরিয়াজ্বর দ্বারা রক্তহীনতা হওয়াতেই শোথের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি ৫ ফোটা টীংফেরি পারক্লোরাইড্ এবং ৫ গ্রেণ সাইট্রেট্অবপোটাসিয়ম্ জলসহকারে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে, দুই প্রহর এবং সন্ধ্যায় এই তিনবার করিয়া খাইতে ব্যবস্থা করিলাম। এই ঔষধ ৬।৭ দিন সেবন করাতেই শোথ অনেক কমিয়া গেল। এই সময়ে রোগীর জ্বর হয় বুঝিতে পারা গেল; তখন উক্ত ঔষধের সহিত প্রতিমাত্রায় দুইগ্রেণ পরিমাণে কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বলিয়া দিলাম জ্বরের বিরামাবস্থায় প্রত্যহ ৩ বার করিয়া খাইবে। দুই দিন পরেই জ্বর আরাম হইয়া গেল। এইরূপে দুই সপ্তাহ মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল।

শ্রীপুলিনচন্দ্রসান্যাল এম্, বি।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
ভোজ্য ও ভোজন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

নেপাল দেশের অনেকস্থানে অন্ন রন্ধনের এত পারিপাট্য যে, সুসিদ্ধ অন্ন নির্জ্জল অবস্থায় নামান হয়, সুতরাং মণ্ড ফেলিতে হয় না।

অতএব দেখা গেল যে, যদিও আতপ তণ্ডুল গ্লুটেন্হীন পদার্থ নহে এবং তজ্জন্যই অস্মদ্দেশীয় বিধবা ও পুরোহিতবর্গ অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীর, যদিও নূতন এবং সমস্ত অন্ন নিতান্ত অসার নহে এবং তজ্জন্যই এদেশের শ্রমজীবীগণ বলিষ্ঠ থাকে; তথাপি ভদ্রলোকের বা জনসাধারণের ভোজ্য অন্ন নিতান্ত অসার ও স্টার্চ পরিপূর্ণ। কিন্তু অন্নের সঙ্গে যে মটর, ছোলা, মুসুরী প্রভৃতি দাইল ভক্ষিত হয়, তাহা বিলক্ষণ পুষ্টিকর।

মটর উদ্ভিদ্-খাদ্যের রাজা। পূর্ব্ব প্রঘটিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, সাধারণ মাংস অপেক্ষা এই পদার্থ অধিক পুষ্টিকর। ছোলাও এইরূপ। এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছোলা ও মটরে যত গ্লুটেন্ আছে, সেই পরিমাণ অন্য কোন খাদ্যসামগ্রীতে তত নাই। আর কতকগুলি উদ্ভিদ্ও গ্লুটেন্-প্রধান; তন্মধ্যে কাঁটাল বীচি, কাঁচাকলা, ওল, মানকচু, বাঁধাকপি, নারিকেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গোল আলু গ্লুটেন্ সম্বন্ধে প্রায় ভাতের ন্যায়।

কিন্তু গ্লুটেন্ যুক্ত হউক বা না হউক, অনেক উদ্ভিদেই তৈলের অংশ অল্প, তজ্জন্য ঐ সকল পদার্থের সহিত তৈল বা ঘৃতযুক্ত না করিয়া আহার করিলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। তৈলের এই সামান্য বিরেচক ক্ষমতা চিকিৎসক মাত্রেরই পরিজ্ঞাত; কিন্তু এতদ্ব্যতীত তৈলের যাহা প্রধান কার্য্য, তাহাও এস্থলে বক্তব্য। এই পদার্থ প্রায় সমস্তই শরীরের মেদ-সংগঠনে ব্যয়িত হয়। বাহ্য ত্বকের অব্যবহিত নিম্নেই মেদ সঞ্চিত হইয়া শরীর পরিপুষ্ট করে। অলস অবস্থায় থাকিলে অথবা অত্যধিক ঘৃতপানাদি করিলে মনুষ্য শীঘ্র মেদবিশিষ্ট হয়। অস্মদ্দেশীয় ধনীগণের দীনবন্ধু বাবুর 'জলধরের' ন্যায় প্রকাণ্ড স্থূল শরীরের সহিত দরিদ্রগণের ক্ষীণবয়বের যে বৈদেশিকগণের বিস্ময়োদ্দীপক বৈসদৃশ্য

লক্ষিত হয়, ধনীগণের অলসতা ও ঘৃতপান ভিন্ন তাহার অন্য কারণ দেখা যায় না।

অন্যান্য উদ্ভিদ প্রায়ই অসার। মোচায় কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড থাকায় সংকোচক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। থোড়ের লবণ দ্বারা পরিবর্ত্তক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। বার্ত্তাকু ও ঝিঙ্গের কোন বিশেষ গুণ দেখা যায় না; পটল এবং অলাবুও এই শ্রেণীর খাদ্য। বিলাতী কুমড়া ও কয়েক প্রকার ডাঁটায় শর্করা বিদ্যমান থাকাতে এই সকল দ্রব্য কিঞ্চিৎ উপকারী। সীম ও সজিনাখাড়া গ্লুটেন-প্রধান খাদ্য। মূলায় কিঞ্চিৎ গন্ধক থাকাতে সময় সময় উপকার হয়। পলতা, নালিতা ও নিম্ব তিক্তাস্বাদবশতঃ ঔষধরূপে খাওয়া যায়। তাহারা অগ্নেয় ও বায়ুনাশক। আহার করিতে আরম্ভ করিয়াই এই সকল দ্রব্য খাইলে পাকস্থলীর দ্রাবক রস উত্তমরূপে নিঃসৃত হইয়া পরিপাকের সাহায্য করে। অন্যান্য যত প্রকার শাক আছে, মলবন্ধন ভিন্ন তন্মধ্যে অন্য কাহারো উপকারিতা দেখা যায় না। একটী সাধারণ প্রবাদ আছে;—

"মাংসে হয় মাংস বৃদ্ধি, দুগ্ধে বৃদ্ধি বল।
ঘৃতে মেদ বৃদ্ধি পায়, শাকে বৃদ্ধি মল॥"

ইহা প্রায় সত্য।

কাঁচা ফল প্রায় জীর্ণ করা যায় না। তজ্জন্য কাঁচা শশা, কাঁকুড়, কাঁচা আম্র ও অন্যান্য কাঁচা ফল ভক্ষণ অল্পই করিবে। সুপক্ক ফলের মধ্যে দাড়িম, বেদানা, পেস্তা ও কাঁটাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুপক্ক আম্রও উত্তম খাদ্য, কিন্তু অধিক খাইলে স্থানে স্থানে স্ফোটক ও অন্নবহানালীর বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। সুপক্ক জাম ক্ষুধাবর্দ্ধক। অনেকে বলেন, কাঁচা পেঁপে প্লীহা রোগের মহৌষধ; তাঁহারা এইরূপ অবস্থায় কাঁচা ও সিদ্ধ পেঁপে খাইতে এবং পেঁপের আটা লিহাহানে দিতে পরামর্শ দেন। সুপক্ক বেল অতি উত্তম খাদ্য, ইহার সরবৎ পান করিলে কোষ্ঠ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়। আবার যদি উদরাময় থাকে, তাহা হইলে কাঁচা বেল দগ্ধ করিয়া খাইলে মহোপকার হয়। কিন্তু ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে বেল জীর্ণ করা কঠিন। ওলের সংকোচন ক্রিয়া স্পষ্টই দেখা যায়। মলদ্বারের সন্নিকটস্থ শিরার উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া অনেক অর্শরোগী ওল রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকেন।

যে সকল ফল অম্লরস-প্রধান বা অম্লরসময় তাহাদিগের দ্বারা অবস্থা বিশেষে উপকার অপকার উভয়ই সাধিত হইয়া থাকে। যুনানী চিকিৎসকগণ দেখাইয়াছেন যে, অম্ল খাইলে পাকস্থলীর দ্রাবক রস-নিঃসরণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে এবং ক্ষার বা তিক্ত পদার্থ দ্বারা ঐ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। * সেই জন্য আহারের প্রথমে ক্ষার ও তিক্ত পদার্থ খাইয়া আমরা ঐ দ্রাবক রস বাহির করিয়া লইতে থাকি, তাহাতে পরিপাক উত্তম হয় এবং সেই জন্যই আহারে প্রথম অম্ল খাইলে অজীর্ণ হয়। কিন্তু আহারের শেষ ভাগে, যখন পাকস্থালী হইতে দ্রাবক রস নিঃসরণের শেষ হইতে থাকে, তখন কিঞ্চিৎ অম্ল খাইলে এই উপকার হয় যে, যদি ঐ দ্রাবক রস নিঃসরণ সম্যক্‌রূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের ভক্ষিত অম্ল তাহার সহিত মিলিত হইয়া মাত্রা পোষাইয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা আহারের সময় অধিক ক্ষার খাইয়া থাকি তাহাও এই অম্ল ভক্ষণদ্বারা নষ্ট হয়। এই জন্যই অস্মদ্দেশে আহারের শেষ ভাগে অম্ল ভোজনের প্রথা বিজ্ঞান-সম্মত ও প্রশংসনীয়; কিন্তু অধিক অম্ল খাইলে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কিন্তু অম্ল দ্রব্যের আরও অনেক গুণ আছে। ডাক্তার রিঙ্গার বলেন যে; "সকাল বেলা আহার করিবার পূর্ব্বে এক বা দুইটা কমলা লেবু খাইলে দীর্ঘ স্থায়ী কষ্ট-মল-ত্যাগ রোগের অনেক উপকার হয়, অথবা এই আহারের পূর্ব্বে এক গেলাশ জল ও আহারের পর একটি কমলালেবু খাইলেও অনেক সময়ে উপকার হয়।" তেঁতুল মৃদু বিরেচক, সুস্বাদু ও জীর্ণকারক। যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। অল্প পরিমাণে ঘোল দধি প্রভৃতি জীর্ণকারক পদার্থ। পাতি ও কাগজি লেবু স্নিগ্ধকারক এবং সেই জন্য উদরাময় রোগের পক্ষে উপকারী। ইহার রস ব্যবহার করিলে স্কর্বীরোগের ভয় থাকে না।

মিষ্টান্ন সকলের বিশেষ বিবরণের আবশ্যক নাই। চিনি, ঘৃত, ময়দা, ছানা ও অন্যান্য দুই একটী পদার্থের যে উপকারিতা, ভিন্ন ভিন্ন মিষ্টান্ন ভক্ষণের ও তাহাই। কিন্তু বাজারের মিষ্টান্ন যেরূপ অপকৃষ্ট, ইহার ঘৃত যেরূপ তৈল-

* পাকস্থলীর দ্রাবক রস অম্লরসযুক্ত, সম্ভবতঃ গন্ধক দ্রাবক বা লবণ দ্রাবকমিশ্রিত। কোন পদার্থ পাকস্থলীতে পড়িলেই এই রস তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া ঐ ভুক্তপদার্থ জীর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

BLEED THROUGH.

মিশ্রিত, পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও কটু, ইহার ময়দা যেরূপ পুরাতন, কীটদষ্ট ও তণ্ডুলাদি মিশ্রিত এবং পুরাতন মিষ্টান্ন নূতন আকার ধারণ করাতে সাধারণে যেরূপ বঞ্চিত হয়, তাহাতে এরূপ মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে বরং টাট্‌কা চাউল ভাজা ও মুড়ি খাওয়া ভাল। * কেননা, মুড়ি ও চাউল ভাজা উপকারী না হউক, অল্প পরিমাণে খাইলে নির্দ্দোষ; কিন্তু এই সকল বাজারের মিষ্টান্ন বিশেষ অনিষ্টকর। গুড় সামান্য বিরেচক এবং অল্পমাত্রায় নির্দ্দোষ ও চিনির ন্যায় উপকারী।

খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে অনেক গুলি মসলা অতীব প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লবণ শরীরের এক প্রধান উপাদান, সুতরাং ইহা খাওয়া অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদ ও মৎস্য মাংসাদিতে স্বভাবতঃ যে লবণ থাকে, তাহাতে সম্পূর্ণ পোষণ হয় না বলিয়াই আমরা আরও লবণ মাখিয়া খাই। লবণ না খাইলে রোগ উৎপন্ন হয়। সামান্য কারণে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়া রক্ত পড়ে এবং ওলাউঠা ও জ্বর প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়।

তৈল ও ঘৃতের প্রয়োজন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হরিদ্রাদ্বারা কেবল বর্ণের উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য কার্য্য হয় না। লঙ্কা মরিচ ক্ষুধা বর্দ্ধক। ইহাদ্বারা খাদ্য-দ্রব্যের যে উগ্রতা সাধিত হয় তাহা অনেকের পক্ষে আহারে প্রবৃত্তিদায়ক। ইহাদ্বারা মুখের লালা ও পাকস্থলীর দ্রাবকরস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করে। গলিত মৎস্য ও মাংসের দুর্গন্ধময় বাষ্প ইহাদ্বারা নিবারিত হয় এবং এতৎ সহযোগে পাক করিলে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণের উপযুক্ত হয়। বহুদিবস ভক্ষণ করিলে ইহার ক্ষুধা উদ্রেক করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয়; তখন অনেক লঙ্কা না খাইলে কার্য্য হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ ইহার প্রমাণ স্থল।

সর্ষপ ভক্ষণ করিলে পাকস্থলী মধ্যে উষ্ণতা অনুভূত হয়, এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, সর্ষপ ক্ষুধা বর্দ্ধক; কিন্তু দুই একজন বিজ্ঞ লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাকস্থলীর দ্রাবকরস ইহাদ্বারা অধিক নিঃসৃত হয় না।

পলাণ্ডুর ন্যায় হিঙ্গু ও গন্ধপ্রধান দ্রব্য, সুতরাং ইহাদের পরিবর্ত্তক ক্রিয়া শরীরে প্রকাশিত হয়। গ্রহণী ও অজীর্ণরোগে বৈদ্যগণ হিঙ্গুর ব্যবস্থা করেন।

* মুড়ির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বায়ু প্রবিষ্ট থাকাতে চাউল ভাজা অপেক্ষা শীঘ্র জীর্ণ হয়। উভয়েই ভাত অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।

ধনিয়া, এলাইচ, লবঙ্গ, তেজপত্র ও অন্যান্য গরম মসলা কেবল সদ্‌গন্ধকারক, বায়ু-নাশক ও ক্ষুধা-বর্দ্ধক।

সমস্ত দিবসে কতবার আহার করা উচিত? দেশভেদে ইহার বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহা নিশ্চিৎ যে, একবারে অত্যধিক ভোজন করিয়া বহুক্ষণ উপবাসী থাকা অপেক্ষা চারি পাঁচ ঘণ্টান্তর অল্প অল্প আহার করা শ্রেয়ঃ; কারণ, তাহাতে উদর স্ফীত হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন করিবার আশঙ্কা থাকে না। আফ্রিকা মহাদেশস্থ উত্তমাশা অন্তরীপের উত্তরাংশের অসভ্য জাতিগণ ২।৩ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া তৎপরে ১০।১২ সের মাংস একবারে ভোজন করে। ইংরাজ প্রভৃতি শীতময় দেশ-বাসীগণ দিবসে ৩।৪ বার আহার না করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। অস্মদ্দেশে বহুকালাবধি দুইবার আহারের বিধি দেখা যায়। ঃ—

মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যং।
অহনিচ তথা তমশ্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ॥”

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতিসকল দুই বারের অধিক আহার করিত। মৃচ্ছকটীক নাটকের সূত্রধার ক্ষুধিত হইয়া গৃহিণীর নিকট প্রাতরাশ বা ব্রেক্‌ফাষ্টের জন্য প্রার্থী হইতেছেন, দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। অদ্যাপি এতদ্দেশীয় ইতর জাতিগণ সমস্ত দিবসে বহুবার আহার করিয়াও সুস্থ থাকে।

শান্ত ও প্রফুল্লচিত্তে আহার করিবে। ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির আধিক্য থাকিলে স্নায়ুযন্ত্রের উদ্দীপন বশতঃ পাকস্থলীর পাচক রস উত্তমরূপে নির্গত হয় না, সুতরাং পরিপাক কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপ চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করা উচিত, বিশেষ বাঙ্গালীর ন্যায় তণ্ডুল-ভোজী জাতির পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ পাকস্থলীর দ্রাবক রসে তণ্ডুল জীর্ণ হয় না, কেবল মুখের মধ্যস্থিত লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে পাকস্থলীর অভ্যন্তরে গিয়া শর্করার ন্যায় একপ্রকার পদার্থে পরিণত হয়, তাহা শীঘ্রই জীর্ণ হয়। লালাই তণ্ডুল জীরণের অভিষব। ভগবান্ মনুও এই বিষয়ে বলিয়াছেন। ঃ—

“পূজয়েদশনং নিত্যং অদ্যাচ্চৈতদকুৎ সয়ন্।
দৃষ্ট্বাহৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥

পূজিতং হ্যশনং নিত্যংবলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তং উভয়ং নাশয়েদিদং ॥
নোচ্ছিষ্টং কস্যচিৎ দদ্যাৎ নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরং।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিৎ ব্রজেৎ ॥

ডাক্তার ইন্‌নান্ বলিয়াছেন যে, ক্লান্ত শরীরে পূর্ণাহার করিবে না। এরূপ অবস্থায় প্রথমে কিঞ্চিৎ জলযোগ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে আহার করিবে। অতিক্লান্ত নিবন্ধন এরূপস্থলে স্নায়ুযন্ত্র অবসন্ন ও পচন কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। বরযাত্র প্রভৃতি দূরাগত অতিথি সৎকারে আমরা এই নিয়মের উপর দৃষ্টি রাখিয়া থাকি। স্বস্ব জীবনেও ইহা অবধান করা উচিত।

অতি পুষ্টিকর পদার্থও পুনঃ পুনঃ ভক্ষিত হইলে প্রথমের ন্যায় উপকারী হয় না, বোধ হয় সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা তিথিভেদে পদার্থ বিশেষ ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

আহার্য্য পদার্থ অল্প উষ্ণ অবস্থাতে ভক্ষণ করিবে। আমাদিগের পাকস্থলীর তাপাংশ ৯৬ ডিগ্রী, ফাঃ, সুতরাং খাদ্যদ্রব্যও ঐরূপ উষ্ণ হওয়া আবশ্যক। রসায়নের পরীক্ষা গৃহে দেখা যায় যে, ৭০ ডিগ্রী তাপের ন্যূনে কৃত্রিম পচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই জন্যই দুর্ব্বল ব্যক্তিরা শীতল খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না।

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ পদ্ধতি এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত। পূর্ব্বে ইহা এত আদরণীয় ছিল যে, সম্রাটগণের তাম্বুল করঙ্ক-বাহক ও বাহিকাগণ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে গণ্য হইত। পান, সুপারি, খদির ও চূর্ণক একত্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে প্রচুর পরিমাণে লালা নির্গত হইতে থাকে। তাম্বুল ভোজীগণের পক্ষে জীর্ণ করণের জন্য লালার যে আবশ্যকতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণদ্বারা অধিক পরিমাণে লালা নিঃসারিত করিয়া আমরা জীর্ণকার্য্য সুসাধ্য করিয়া থাকি। অপিচ, এতন্মধ্যবর্ত্তী চূর্ণকদ্বারা দ্রাবক রসেও ভক্ষিত অন্নের আধিক্য বিদূরিত হয়। কাপ্তেন উইস্‌কিস্ বলিয়াছেন যে, "তাম্বুল চর্ব্বণে ঘর্ম্মের হ্রাস হয়, দন্তমূল দৃঢ় হয়, মাড়ি অপরিস্কৃত হয়, মুখ গহ্বর শীতল হয়, নিশ্বাস সুগন্ধি হয় এবং ইউরোপীয়ের ঘৃণাজনক

ও ভারতবর্ষীয়ের অলঙ্কার স্থানীয়—ওষ্ঠাধর লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হয়।" সময়ে সময়ে ইহার যে মাদকশক্তি দৃষ্ট হয় তাহা কিয়ৎপরিমাণে পত্র ও অধিক পরিমাণে গুবাকের দ্বারাই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আর্দ্র ও জ্বর প্রপীড়িত প্রদেশ সমূহ, যেখানে অধিবাসিগণ স্বল্প ও হীনবীর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে তথায় ইহার ফলোপধায়কতার বিষয় সকলেই স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ পর্ণপত্রের রস স্বীয় সংক্রামকস্বর নিবারণ ক্ষমতাদ্বারা এই সকল স্থলে উপকার করিয়া থাকে। অহিফেণ সেবনে বিষাক্ত হইলে এতদ্বারা যে উপকার হইয়া থাকে তাহা সকলেরই জ্ঞাত। এই সকল স্থলে চা ও কাফির ন্যায় এই পদার্থ উত্তেজক হইয়া উপকার করে। এতদভিপ্রায়ে পর্ণ, ও গুবাক প্রভৃতি যথারীতি একত্রিত করিয়া চর্ব্বিত বা পেষিত করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলাধঃকরণ দ্বারা উত্তেজিত করিতে পারিলে অনেক উপকার সাধিত হয়। পুনশ্চ ইদানীন্তনকালে চূর্ণক খদিরাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং দারুচিনি, এলাইচ প্রভৃতি সদ্‌গন্ধময় পদার্থ সকল একত্রিত করিয়া তাম্বুল প্রস্তুত করিবার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে দ্রব্যগুণজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, এতন্মধ্যস্থিত খদির প্রভৃতি সংকোচক পদার্থ সকল উদরাময়, অতিসারাদিরোগে যদ্রূপ উপকারী, এলাইচ্ প্রভৃতি সদ্‌গন্ধকারক ও বায়ুনাশক পদার্থ সকলও অজীর্ণ প্রভৃতি অন্নবহানালীর বহুবিধ রোগে তদ্রূপ কার্য্যকর। কিন্তু দোষ ভিন্ন গুণ নাই। অধিক তাম্বুল ভক্ষণ করিলে, ক্ষুধা মান্দ্য হয়, মুখ অপরিস্কৃত হয়। বাক্যের জড়তা জন্মে, পরিত্যক্ত মলে লোহিতবর্ণ দেখা যায়, এবং সুপারির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে উদরাময় ও অন্ত্রশূল (পেট কামড়) উপস্থিত হয়। তজ্জন্য তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া শেষভাগ পরিত্যাগ করিবে ও কেবল আহারের পর এক একবার ভিন্ন তাম্বুল ভক্ষণ করিবে না।

আহারের অব্যবহিত পরেই গুরুতর পরিশ্রম করা অবিধেয়। অধুনা দেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণ এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, যখন কেবলমাত্র পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তৎক্ষণাৎ উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া হীন পরিপাকশক্তি ও দুর্ব্বলশরীর হইতেছেন। বিদ্যালয়স্থ বালকগণও এই কারণে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজরাজ ইহার নিমিত্ত নিন্দনীয় ও অনুযোজ্য।

অতি ভোজন পীড়ার সর্ব্বপ্রশস্ত দ্বার। পানপাত্র ও ভোজন পাত্রই অনেক সময়ে যমের আসন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা অল্পাহার জনিত, উচ্চ-

শ্রেণীস্থগণ অতিভোজন জনিত, পীড়া ভোগ করে। অতি ভোজনের বিষয়ে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন।—

"অনারোগ্য মনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতি ভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎপরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই মত সম্পূর্ণ অনুমোদিত যে, পরিমিতাহার দীর্ঘজীবন লাভের এক অতি প্রধান উপায়। মেঃ ডুমুলিন্ নামে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া বলিয়াছিলেন "বন্ধুগণ! রোদন করিও না, আমি দুইজন প্রাজ্ঞ চিকিৎসক রাখিয়া যাইতেছি, তাঁহারাই জগৎকে নীরোগ করিবেন;—সে দুই জনের নাম 'পরিমিতাহার' ও নদীর জল।" বাস্তবিক এই কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মহামূর্খ ভিলারস্ ধনী হইয়াছিল। কেবলমাত্র সীন্নদীর জলে বোতল পূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিত সোরা গুলিয়া—"আমার পিতৃব্য প্রদত্ত, দেড়শত বৎসর জীবনলাভের শ্রেষ্ঠ ঔষধ" বলিয়া বিক্রয় করিত। ক্রেতাগণের প্রতি অলঙ্ঘনীয় আদেশ দেওয়া হইত যে, পরিমিতাহার, যথেষ্ট ব্যায়াম ও দুশ্চিন্তার পরিহার না করিলে ঔষধ ফলোপদায়ক হইবে না। ভিলারস্ জীবন শাস্ত্রের মূলমন্ত্র শিখিয়াছিল,—খাদ্যের সুব্যবহারই জীবন, অপব্যবহারই মৃত্যু। চিকিৎসাদর্শন।

শ্যামনগর। } শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবীণ ডাক্তার মহাশয় দেশী বিলাতী উভয়বিধমতের অনুসরণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপরে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ যুক্তিযুক্ত ও সাধারণের হিতকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাঁহার লিখিত দেশীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সকল কথায় আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কেন যে পারি না, তাহা দুই একটী কথাদ্বারাতেই দেখাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, "বার্ত্তাকু (বেগুণ) ও ঝিঙের কোন বিশেষ গুণ দেখা যায় না। পটোল এবং অলাবু (লাউ) এই শ্রেণীর খাদ্য।" অর্থাৎ পটোল এবং লাউদ্বারাও কোনই উপকার হয় না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার লিখিত একথায় আমরা বড়ই বিস্মিত হইলাম। কেননা এমন রোগ নাই, যাহাতে পটোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যরূপে ব্যবহৃত না হয়, আর এমন রোগীও কম, পটোলে যাঁহার রুচী ও উপকার না হয়। আর সাধারণের পক্ষে ত কোন কথাই নাই, বস্তুতঃ পটোলেএইরূপ অসাধারণ গুণ আছে বলিয়াই বৈদ্যশাস্ত্র

শাস্ত্র, তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহং।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচনং ॥

অর্থাৎ পটোলের পাতা (পল্‌তা) পিত্তনাশক, ডাঁটা কফনাশক, ফল অর্থাৎ পটোল বাতাদি ত্রিদোষনাশক এবং মূল বিরেচক। কিন্তু পাঠক, উপরের প্রবন্ধে দেখুন যে, লেখক পটোলকে উপেক্ষা করিয়া শেষটা পলতাকে বরং কিঞ্চিৎ গুণকারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই লেখাতে আমাদের সন্দেহ আসাতেই আমরা এই পটোলের গুণাগুণ সম্বন্ধে কলিকাতার খ্যাতনামা বিচক্ষণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। আহ্লাদের বিষয় এই যে, তিনিও পটোলের অসাধারণ গুণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয় কেন যে, পটোলকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহার কারণ ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ডাক্তার বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাছে পটোলের ন্যায় হিতজনক দ্রব্যের প্রতি সাধারণের কোনরূপ অভক্তি আইসে, এই ভাবিয়াই আমরা তাঁহার লিখিত বাক্যের উপর এতগুলি কথা বলিলাম।

সম্পাদক।

অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় আরোগ্যসংবাদ।

(কবিরাজীমতে)

মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কবিরাজ মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনি চিকিৎসা-সম্মিলনীর প্রচার ও চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি কামনায় ও যাহাতে দেশীয় লোকের উক্ত প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্বাস, ভক্তি ও আস্থা জন্মে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এতদ্দেশের যে এক মহা হিতকর ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে আপনি সম্পূর্ণ পূর্ণ-মনোরথ হউন, ইহা জগদীশ্বরের নিকট আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা এবং মহাশয়ের সেই উৎসাহবর্দ্ধন করিবার মানসে আপনাকে কবিরাজী চিকিৎসাদ্বারা নিম্নলিখিত আরোগ্য সংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এই বিষয় আপনাকে জানাইবার আরও এক কারণ এই যে, আপনি আমাদিগের এক বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও পরম হিতৈষী বন্ধু।

আরোগ্যের বিবরণ।

এই যে——আমার সহোদর শ্রীমান্ রামচন্দ্র ঘোষ পাথুরিরোগে আক্রান্ত হইলে বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে ডাক্তারি চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথমে বাঙ্গালী ডাক্তার অনেক দিন চিকিৎসা করিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই উপকার হইল না। তৎপরে ইংরাজ ডাক্তারের (কমলিসাহেব) চিকিৎসা আরম্ভ হইল। তিনি প্রায় আন্দাজ মাসাবধি চেষ্টা করিলেন। তিনি প্রস্রাব পরীক্ষা ও শলা প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা প্রস্রাবদ্বার পরীক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বনে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছুই উপকার হইল না। অবশেষে দেশের প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার রে সাহেবের সহিত পরামর্শ করা স্থির হইল এবং উভয় ডাক্তারে পরামর্শ করিয়া রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করতঃ স্থির করিলেন যে, অস্ত্র করিয়া পাথুরি বাহির করিতে হইবে। কিন্তু আমরা অস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে পাথুরি আরাম করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিলে রে সাহেব ও কমলিসাহেব অনেক চিন্তার পর বলিলেন যে, হয় অস্ত্র করিয়া, না হয় ব্ল্যাডারের (মূত্রস্থলীর) ভিতর ঠেলিয়া দিয়া অস্ত্রের দ্বারা চূর্ণকরত পাথুরি বাহির করিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। এবং আরও বলিলেন যে, শীঘ্র অস্ত্র না করিলে রোগের বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে রোগীকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। অস্ত্রের কথা শুনিয়া রোগীর আহার নিদ্রা ত্যাগ ও বাটীর সকলে ভাবিয়া অস্থির এবং কি উপায়ে কি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারা গেল না। অবশেষে একদিন আমি কথায় কথায় ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদের নিকট এই কথা উত্থাপন করিলাম। তিনি সমস্ত সবিশেষ শুনিয়া বলিলেন যে, যখন রোগীর প্রস্রাব একেবারেই বন্ধ হয় নাই, যে সেই মুহূর্ত্তে অস্ত্র না করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে, ঔষধের দ্বারা পাথুরি নিশ্চয়ই আরাম করিব। মহাশয় বলিতে কি, আপনি আমাদিগের সকলকে ভালরূপ জানেন এবং কবিরাজী চিকিৎসায় আমাদের কেমন ভক্তি, তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পারেন। প্রথমে ডাক্তার রে সাহেবের ন্যায় বিখ্যাত চিকিৎসকের যাহা অসাধ্য, তাহা যে একজন দেশীয় কবিরাজ সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা মনে কোনক্রমেই ধারণা করিতে পারিলাম না। কিন্তু কবিরাজ হরিনাথ বিশারদের ন্যায় ব্যক্তির কথা আমি সহজে অবিশ্বাসও করিতে পারিলাম না, কারণ আমি হরিনাথ বাবুকে অত্যন্ত ভালরূপ জানি এবং আমি বহুদিনপর্য্যন্ত তাঁহার নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার বিশ্বাস হরিনাথ বাবুর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি খুবই কম ও তিনি একজন বিশেষ সুপণ্ডিত। যাহাই হউক, বাটীর সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া—অসারে জলসারের ন্যায়—হরিনাথ বাবুর ঔষধ সেবনই স্থির করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার দর্শিবে এবং গোক্ষুরের ক্বাথ, চন্দনের ক্বাথ ও মুথার রস প্রভৃতি দ্বারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তিনবার ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাশয় বলিতে কি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও হরিনাথ বাবুর সুচিকিৎসার গুণে ৩।৪ দিবসের মধ্যে প্রস্রাবের সহিত পাথুরি নির্গত হইয়া গেল! বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়ের জন্য আমরা সকলে হরিনাথ বাবুর নিকট যে কি পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না এবং আমাদিগের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গ যে কেহ ইহা শুনিতেছেন, সকলেই হরিনাথ বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছেন। আমাদিগের বন্ধু এক সাহেব (আমেরিকান) যিনি আমাদের বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া আমার ভ্রাতার পীড়া ও চিকিৎসার বিষয় ভালরূপ জানিতেন এবং যাহাতে পীড়া শীঘ্র আরাম হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন, এই আরোগ্য দেখিয়া তিনি এতাদৃশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি বলেন যে, কোন ধনী মহাজন কবিরাজ হরিনাথ বাবুর ন্যায় চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া আমেরিকায় যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলে অতি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে পারেন, কারণ আমেরিকায় পাথুরীরোগের প্রকোপ কিছু বেশী। ফলতঃ আমার ভ্রাতার আরোগ্য দেখিয়া আরো এক বিষয়ে হরিনাথ বাবুর কৃতিত্ব দেখিয়া আমাদের এখন এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, আমরা যেরূপ ভাবিতাম, কবিরাজী চিকিৎসা সেরূপ নহে, বস্তুতই অতি চমৎকার ও বিশেষ উপকারী এবং আমরা এতাদৃশ মূর্খ যে, আমাদিগের নিজের এমন উপাদেয় বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক মারীচিকা বিভ্রমের ন্যায় মরুভূমিতে বারি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ইহাতে আর এক কথা এই যে—যদিও আমরা এই চিকিৎসাসম্বন্ধে ব্যয় করিতে

কাতর হই নাই, তথাপি বলিয়া রাখি যে, প্রথমে ডাক্তারি চিকিৎসার বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসায় যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা উহার সহিত তুলনা করিতে গেলে কিছুই নয় বলিয়া বোধ হইবে। ইতি তাং ২০ পৌষ ১২৯৮।

ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এ, বি, এল্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

বাঙ্গালা দেশের ধনী ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে কলিকাতা শ্যামবাজারের বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ দানশীল জমীদার ৺ তুলসীরাম ঘোষের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। প্রবন্ধ লেখক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এ, বি, এল, জমীদার, সেই বিখ্যাত ঘোষবংশেরই অন্যতম সুসন্তান। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ধনশালী সম্ভ্রান্ত অথচ কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে এত আন্তরিক আগ্রহের সহিত সরলভাবে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত পক্ষেই আমাদের নিকট সবিশেষ গৌরব ও আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক। বলা বাহুল্য যে, উপরি লিখিত ঘটনার সমস্ত বিষয়ই আমরা বিশেষরূপে জানিয়াছি। রোগী চিকিৎসক, ঔষধ পথ্য, আমেরিকান্ দর্শক ও প্রবন্ধ লেখক প্রভৃতি সকলকেই জানি বলিয়াই প্রবন্ধটী আমাদের নিকট এত আদরের হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, আমাদের ন্যায় পাঠকবর্গও এপ্রবন্ধ পাঠে সুখী হইয়া মৃতপ্রায়দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ——

সম্পাদক।

চিকিৎসকের ভ্রম।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্ এস্।

সম্প্রতি লেখক কিছু দিনের জন্য কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁস্পাতালের স্ত্রী-চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং নিম্নলিখিত কয়েকটী স্ত্রী-চিকিৎসার ইতিহাস লিখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

১ম প্রবন্ধ। পিলে না ছেলে।
২য় ঐ। ছেলে না বাই।
৩য় ঐ। বাই না হিষ্টিরিয়া।
৪র্থ ঐ। যথার্থ গর্ভ।

১ম (ক) একটী পূর্ণবয়স্কা রমণী ৫।৬ মাস মেলেরিয়া জ্বর ও প্লীহা রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার্থ আনীত হয়, পরীক্ষাদ্বারা

জানা গেল যে, প্লীহায় তাহার উদর পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং পাঁচ ছয় মাস কালাবধি ঋতু বন্ধ হইয়াছে। ঘটনাক্রমে রোগীণী একদিন একটী পাঁচ মাসের শিশু সন্তান প্রসব করিল, অবশ্যই তাহার উদরাভ্যন্তরে সময়ের বৃদ্ধি অনুসারে সন্তান ও প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই গর্ভ, প্রসূতির সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে জানা যায় নাই।

(খ) আর একবার কোন পল্লীগ্রামের জমীদারের পত্নী বহু দিবসাবধি ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উদর-গহ্বরকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং তৎসঙ্গেই ঋতু বন্ধ হইয়াছিল, ক্রমশঃ যেমন প্লীহার আয়তন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে উদরেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনেকেই মনে করিল তাঁহার উদরী হইয়াছে। একদিন তাঁহার উদরে বেদনা উপস্থিত হইল ও সেই যন্ত্রণায় রোগীণী ক্রমে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সকলে স্থির করিল যে, মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ রোগীণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ ও বিষয় রক্ষা করিল।

পাঠক, দেখুন কোন কোন সময়ে উদরস্থিত সন্তান প্লীহাদ্বারা আবৃত থাকে, প্লীহা বৃদ্ধির সহিত ঋতু বন্ধ, বমনাদি গর্ভের কোন কোন লক্ষণ থাকিলেই চিকিৎসকের গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে মনোনিবেশসহকারে সময়ে পরীক্ষা করা উচিত। ম্যালেরিয়া প্রদেশস্থ চিকিৎসকগণের এই বিষয় বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(২) কলিকাতার সন্নিহিত কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোকের হৃষ্টা ও বলিষ্ঠকায়া, একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। বিবাহের পরবর্ত্তী সময়াবধি নিয়মিতরূপে তাহার ঋতু হইতেছিল। কিয়দ্দিন পরে, ঋতুবন্ধ, প্রাতঃবমন প্রভৃতি গর্ভের লক্ষণগুলি উপস্থিত হওয়াতে, সকলেই স্থির করিল যে, তাহার গর্ভোৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমে স্তনের বৃন্তদ্বয় বর্দ্ধিত হইল ও বৃন্তের চারিদিকে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন পড়িল, সময়ের বৃদ্ধি অনুসারে যুবতীর উদরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গেই উদর মধ্যে সন্তানের প্রচলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা অনুভূত হইতে লাগিল। প্রচলিত বিহিত প্রথানুযায়ী, পঞ্চম মাসে কাঁচা সাধ, সপ্তম মাসে ভাজা ও নবম মাসে মহাসমারোহে ও বহু ব্যয়ে পঞ্চামৃত ও সাধ ভক্ষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত কার্য্যসকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল। ক্রমান্বয়ে নবম,

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না। বাটীর সকল লোকেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া প্রসূতিকে পরীক্ষার্থ কলিকাতা নগরীতে আনয়ন করিলেন। চিকিৎসক চিকিৎসার্থ আহূত হইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এই সকল গর্ভের নিশ্চয় লক্ষণ নহে। যদি গর্ভ হইয়া থাকে, তবে চারি মাসের অধিক নয়; কারণ আভ্যন্তরিক পরীক্ষা ব্যতিরেকে চারিমাসের গর্ভ নয় ইহা কেহ বলিতে পারে না. এবং বলাও উচিত নয়। উদরের অভ্যন্তরে সন্তান নাই বরং বায়ুই আছে। রোগীণীকে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে ও সর্ব্বদা হাঁটিয়া বেড়াইতে পরামর্শ দেওয়ায় ক্রমে উদর কমিয়া গেল, কিছু দিন পরে রোগিণী আবার ঋতুমতী হইল এবং পুনরায় গর্ভবতী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিল।

(খ) আর এক সময়ে কোন একটী প্রৌঢ়া ফিরিঙ্গি রমণী দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হওতঃ পুত্রমুখদর্শন লালসায় ব্যাকুলা হইলেন, ও বলবতী আশা তাঁহার চিত্তকে ক্রমশঃ উতলা করিতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক বৎসরাবধি তাঁহার গর্ভের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না। দৈবাৎ ঋতু বন্ধ হওয়ায় রমণী হর্ষোৎফুল্লা হইয়া স্থিরীকৃত করেন যে, তাঁহার গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এবং ক্রমে বমনেচ্ছা ও তৎসঙ্গেই বমন প্রভৃতি গর্ভের আনুমানিক লক্ষণগুলি দৃষ্টি হইতে থাকে। তাহার পর স্তনবৃন্ত অল্প উচ্চ ও তাহার চতুর্দ্দিকে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখা দেয় এবং স্তন টিপিলে অল্প অল্প দুগ্ধ বাহির হইতে থাকে। ক্রমে উদর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং প্রসূতি উদর মধ্যে সন্তান নড়িতেছে ইহা অনুভব করিতে লাগিলেন। রমণী, প্রথমাবধি প্রসব কালীন ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য ও ভাবী সন্তানের পরিধেয় নানাপ্রকার পরিচ্ছদ, বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে দশ, একাদশ ও দ্বাদশ মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রসূতি কিছুই প্রসব করিলেন না, দেখিয়া গৃহস্থ সকল লোকেই উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা ইহার কারণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রোগিণীর উদরে সন্তান নাই, তিনি বাইগ্রস্তা। প্রথমতঃ রমণী সন্তান সন্ততির আশায় আশ্বাসিত হইয়া পরিশেষে ভগ্নোদ্যম হইয়া সেই দুরাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। অতঃপর আর তাঁহার ঋতুও হয় নাই এবং কিয়দ্দিন পরে তিনি আবার বিধবা হইলেন।

চিকিৎসকগণের উপরি লাভ, বড় কম। রোগী ভাল হইয়া আসিলে একবার যাইয়াই, নাড়ি টিপিয়া বা ক্ষত দেখিয়া, বেশ আছ, যেমন চল্‌ছে তেমনি সব চলুক, বলিয়া শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিলেই, উপরি লাভ মনে করেন। কিন্তু এবার চিকিৎসক মহাশয়ের সত্যসত্যই কিছু উপরিলাভ হইল। ঠিক এই সময়ে চিকিৎসকের স্ত্রীও গর্ভবতী হইয়া সদ্যঃপ্রসূতা ছিলেন। রোগীণী তাহা জানিতে পারিয়া পশম, রেসম ও সূতানির্ম্মিত যাবতীয় পরিচ্ছদ নিজ সন্তানের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সরল মনে চিকিৎসককে উপঢৌকন দিলেন।

পাঠক! দেখুন সময়ে সময়ে চিকিৎসককে প্রকৃত গর্ভ কি না নির্ণয় করিতে হয়।

৪।৫ মাসের পর হইলে, চিকিৎসককে গর্ভ নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু চারি মাসের পূর্ব্বে আভ্যন্তরিক পরীক্ষা না করিলে কেহই গর্ভ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গ দেশীয়া কোন একটী যুবতী স্ত্রী-লোক সন্ধ্যার সময়ে পাত্রাদি মার্জ্জন ও ধৌতকরতঃ খিড়্‌কির দ্বার দিয়া বাটী আসিতে আসিতে অনুভব করিলেন যে, যেন একটী প্রবল বায়ু তাঁহার গাত্রে লাগিল ও কিয়ৎ পরিমাণ উদরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সময় উপরিস্থিত আকাশ নির্ম্মল ছিল, কোন প্রকার প্রবল বাতাস বহে নাই।

স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ভীত হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিল ও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত, বাটীর সকলের নিকট, বিবৃত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী অজ্ঞান হইয়া গেলেন ও তাঁহার উদর ফুলিয়া উঠিল।

যুবতীর জ্ঞান হইবার পর তাঁহার উদর কমিয়া গেল। কিন্তু দিনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইত ও উদর ফুলিত। কিয়দ্দিন পরে আর তাঁহার উদর বিশেষ কমিত না, যেন কিয়ৎ পরিমাণে ফুলিয়া থাকিত। গৃহস্থ, ভূতে পাইয়াছে অনুভব করিয়া অনেক ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞ ওঝা আনাইয়া ঝাড়ন ঝোড়ন ও চিকিৎসা করাইল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য হইল না। দেখিয়া রোগিণীকে কলিকাতা নগরীতে চিকিৎসার্থ আনয়ন করিয়া কোন উপযুক্ত চিকিৎসক হস্তে প্রদান করিল। চিকিৎসক, রোগিণীর অর্দ্ধ মূর্চ্ছাবস্থা অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার উদর ক্রমাগত ব্যোমযানের ন্যায় এক ফুট আন্দাজ উচ্চ

হইয়া উঠিতেছে ও পরক্ষণেই নামিয়া পড়িতেছে ও রোগিণী হাঁপাইতেছেন, দেখিলেন। রোগিণী কিছুমাত্রই আহার করেন না; যদিও অল্পপরিমাণ দুগ্ধপান করেন, তাহাও রোগিণীর বিশ্বাস উদর মধ্যে প্রবেশ করে না; খাইবার পর উহা বুকে আটকাইয়া থাকে। কিছুদিন ধরিয়া নানাপ্রকার চিকিৎসা হইল। কিন্তু কিছুতেই রোগিণীর রোগের বিশেষ উপশম হইল না। পরিশেষে এরণ্ড তৈল, তার্পিন ও এসেফেটেডার পিচ্‌কারী দিতে রোগিণী আরোগ্য লাভ করিলেন।

চিকিৎসককেও উদরের ঊর্দ্ধাধঃগতি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। পাঠকগণ! বলুন দেখি, একি রোগ? আপনারা চিকিৎসা করিতে করিতে যে, শত শত প্রকারের হিষ্টিরিয়া দেখিয়া থাকেন; ইহাও একটী উপরোক্ত ২টী রোগের ন্যায় আর এক রকমের হিষ্টিরিয়া।

কিছুদিন পূর্ব্বে, পশ্চিমদেশীয়া কোন এক বিধবা রমণী অন্যের পাশব প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গর্ভবতী হয় এবং লজ্জায় কলিকাতা কাম্বেল হাঁসপাতালে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। তখন তাহার ৭ মাস গর্ভ নির্ণীত হইল। যোনিদ্বার দিয়া পরীক্ষা করিবার আপত্তি করায় আভ্যন্তরিক পরীক্ষা হইল না। হাঁসপাতালে এক পক্ষকাল অতিবাহিত হইবার পর হটাৎ একদিন তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল; তখন ওয়ার্ডের ধাত্রী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, যোনিদ্বার একেবারেই বদ্ধ, অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না।

এই বিষয় হাঁসপাতালের অপরাপর চিকিৎসকগণকে ও মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয়কে জ্ঞাত করা হইল। সকলেই ক্রমান্বয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে অঙ্গুলিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, যোনিদ্বার একটি কঠিন পর্দ্দাদ্বারা রুদ্ধ, নিকটেই ছোট ছোট চারি পাঁচ খানি ক্ষত রহিয়াছে; সুতরাং জানা গেল যে, তাহার পূর্ব্বে উপদংশ রোগ হইয়াছিল।

পরীক্ষাদ্বারা বোধ হইল যে, অবরোধকারী পর্দ্দাটি অতিশয় কঠিন, বহুদূরব্যাপী, সম্মুখে মূত্রাশয়, পশ্চাতে মলভাণ্ড ও জরায়ুর অস্ ও পার্শ্বে যোনিপ্রাচীর সমস্তই পর্দ্দাদ্বারা আবৃত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমিত হইল। এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহার যুক্তি স্থির হইতে লাগিল।

যুক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, রোগিণীকে অবশ্যই ক্লোরোফর্ম্ম দেওয়া হইবে এবং প্রথমতঃ পর্দ্দাটী কাটিয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে যদ্যপি জরায়ুর

মুখপর্য্যন্ত আক্রান্ত না হইয়া থাকে, তবে আর কিছুই করিতে হইবে না, প্রসব অক্লেশে হইয়া যাইবে। কিন্তু যদ্যপি পর্দ্দাটী কর্ত্তন করিবার পর নিকটবর্ত্তী অস্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে এবং পর্দ্দা ব্যবচ্ছেদের পরও অস্ অনুভূত না হয় বা কোন প্রকারে প্রশস্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কি করা যাইবে। তখন উদর কর্ত্তন করিয়া সন্তান বাহির করিতেই হইবে। এবং যদি তাহাই করিতে হয়, তবে জরায়ু কাটিয়া সন্তান বাহির করিবার পর জরায়ু পুনঃসংস্থাপন করিতে হইবে, না সন্তান ও ইউটিরস্ দুইটি বাহির করিয়া লওয়া হইবে। প্রথম উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, প্রসূতির জীবনের আশা খুব কম, কিন্তু প্রসূতি আরোগ্য হইয়া উঠিলে আবার সন্তানোৎপত্তির আশা থাকিবে। চিকিৎসকগণ, একটী যন্ত্র নষ্ট করিয়া প্রসূতির জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অবশেষে জরায়ু ও সন্তান দুই কাটীয়া বাহির করা যুক্তিযুক্ত হইল, ইহা সিদ্ধান্ত হইবার পর জরায়ুর গ্রীবা শক্ত লিগেচার দ্বারা বাঁধিয়া বস্তিগহ্বরে নিক্ষেপ করা উচিত, না উক্ত জরায়ুর গ্রীবা বড় বড় পসম্ বোনা কাঁটাদ্বারা এফোঁড় ওফোঁড় বিদ্ধ ও উত্তোলিত করতঃ বস্তি-গহ্বরের বাহিরে উদরের ক্ষতের সহিত আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য এই তর্ক উপস্থিত হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং আবশ্যক মতে উক্ত প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করাই স্থিরীকৃত হইল। তদনুযায়ী একটী স্বতন্ত্র গৃহে কার্য্যোপযোগী যাবতীয় অনুষ্ঠান করা হইল। হাঁস্‌পাতালের মাননীয়, বহুদর্শী সুবিজ্ঞ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার কব্‌সাহেব (যিনি সর্ব্বদাই হাঁস্‌পাতালের রোগীদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে স্বহস্তে এইরূপ অপারেশন করিয়া থাকেন) রোগীণীকে ক্লোরোফর্ম্ প্রদান করিতে বলিলেন ও অতীব যত্ন সহকারে ও অতি সাবধানে কাঁচিদ্বারা পর্দ্দাটী কাটিয়া দিলেন। মূত্রাশয় ও মলভাণ্ডে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগিল না; কাটিবামাত্রই দেখা গেল যে, অস্ সম্পূর্ণ বিস্তৃত হইয়াছে ও সন্তানের মাথা বাহির হইতেছে। সন্তানের মাথা বাহির হইতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ছোট ফর্সেপ দিয়া প্রসব-কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। প্রসবান্তে সন্তান নিশ্বাস ফেলে না দেখিয়া, তাহার নাড়ী কাটিয়া দিয়া আর্টিফিশিয়াল রেস্পিরেশনদ্বারা বহুক্ষণ পরে তাহার শ্বাসকার্য্য আরম্ভ হইল। সন্তানটী পর দিবস পর্য্যন্ত

জীবিত থাকিয়া কন্‌ভল্‌শন্ হইয়া মরিয়া গেল। প্রসূতি সত্বরেই সুস্থ হইয়া উঠিল।

পাঠকগণ! বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে, উদর কর্ত্তন করিয়া, চিকিৎসকগণ সন্তান, জরায়ুর ও ওভেরী সংক্রান্ত টিউমার বাহির করতঃ রোগিণীকে বাঁচাইতে সফল-চেষ্ট হন নাই; কিন্তু এক্ষণে অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যা, ক্রমান্বয়ে এত উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে যে, এই প্রকারের অনেক রোগিণীই অপারেশনদ্বারা অনায়াসে আরোগ্য লাভ করিতেছে। ভিষক্‌দর্পণ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার যোগেন্দ্র বাবু, উপরে যে সকল ভ্রমের কথা উল্লেখ করিলেন, ইহা যে যথার্থই ভ্রম, আর এরূপ ভ্রমপ্রমাদ হইতে যে কোন দেশীয় কোন চিকিৎসকই কোন কালেও মুক্ত হইতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ত্তাদের অর্থাৎ ডাক্তার মহাশয়গণের এরূপ ভ্রমপ্রমাদস্থলে বড় একটা আসে যায় না, যত দোষ এ নরাধম নেটিব বৈদ্যগণের সম্বন্ধে? কেমন নয় কি?

আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিসূচিকা।

লোকমুখে শুনিতে পাই, পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে ওলাউঠারোগ ছিল না, তাই কবিরাজীমতে ইহার কোন উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-বিধান লক্ষিত হয় না। ওলাউঠা একটী বিলাতি রোগ, সুতরাং এই রোগে সকলেই বিলাতি মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রোগীদিগের মধ্যে গণনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিলাতি মতে চিকিৎসিত হইলে যতটী রোগী বাঁচিয়া উঠে, হতভাগ্য কবিরাজদিগের মতে চিকিৎসিত হইলে তদপেক্ষা অধিক রোগীর জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াও কাহারও সংশয়

অপনয়ন হয় না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে ওলাউঠা শব্দ যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যাহাকে বিসূচিকা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান সময়ে ওলাউঠা নাম ধারণ করিয়াছে। পীড়া উপস্থিত হইলে যখন ভেদ বমি হইয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, সেই সময় সমস্ত শরীরে সূচী-বিদ্ধের ন্যায় এত তীব্র বেদনা হয় যে, তাহাতে রোগী সময় সময় একবারে জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে। তাই ইহাকে বিসূচিকা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সকল প্রকার উদরের পীড়ায় এইরূপ হয় না।

এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজকাল অনেকে অনেকরূপ কহিয়া থাকেন। কেহ বলেন ওলাউঠা-বীজ নামক একপ্রকার বিষ আছে, তাহাই কোন প্রকারে শরীরস্থ হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কেহ বলেন বায়ুর দোষ, কেহ বা জলদোষকেই একমাত্র নিদান বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। আবার কাহারো মতে এই রোগের কোনও কারণ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাই আমরা আলোচনা করিতেছি। প্রাণীদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের তারতম্যে এবং অন্যায় আহার বিহারের দোষে দেহাভ্যন্তরে আপনা হইতেই এক এক সময় এক এক প্রকার বিষের উৎপত্তি হয়। আবার গ্রহ উপগ্রহাদির স্থিতি এবং জল বায়ুস্থ নানাপ্রকার উপকরণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে ও সময় সময় পার্থিব জলবায়ু বিষাক্ত হইয়া পড়ে। এই স্বয়ং উৎপাদিত বিষ এক জাতীয় নহে এবং ইহার পরাক্রমও সকল সময় একপ্রকারের হয় না। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিষের মধ্যে এক জাতীয় বিষদ্বারাই বিসূচিকা রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। রোগ উপস্থিত হইলে যখন যে প্রকার উপদ্রব লক্ষিত হয়, সেই উপদ্রবগুলি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার পর ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। গ্রামের মধ্যে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে সকলেরই কটিদেশে অলাবুত্বক্ ধারণ এবং তাহার ধূঁয়া গ্রহণ করা উচিৎ। যদি পীড়ায় আক্রমণ করে এবং দুই একবার ভেদ বমি হইয়া মুখশ্রীর বৈলক্ষণ্য ও শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে জয়পাল মূলের ঘ্রাণ লওয়া আবশ্যক। অথবা এক তোলা চিনির মধ্যে তৃণদ্বারা এক বিন্দু জয়পাল তৈল নিক্ষেপ করিয়া চিনি গুলি উত্তমরূপ আলো-ড়িত করিয়া লইবে এবং অর্দ্ধদণ্ড বা একদণ্ড কাল আবৃত করিয়া রাখিয়া দিবে।

পরে ঐ চিনি সমান ১৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া ৪ দণ্ড অন্তর এক এক বার জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। কিন্তু যখন শ্বেতবর্ণ বা জলের ন্যায় দাস্ত হওয়া আরম্ভ হইবে, তখন আর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে না। এক্ষণে জয়পালের তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম বলা যাইতেছে। জয়পালের বহিস্থ এবং মধ্যস্থ খোসা উন্মোচন করিলে শ্বেতবর্ণ বীজাংশ বাহির হয়। ঐ বীজ মাষ কলায়াদির ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত। অথচ উহারা এমন ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, একখানা ছুরিদ্বারা পীড়ন করিলে উহা অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। তদ্রূপে বীজ গুলিকে দ্বিখণ্ডিত করিলে বৃন্তের দিগে শ্বেতবর্ণ দুইটী পত্র পাওয়া যায়। তাহাকে বিষপত্র কহে। প্রত্যেক বীজ হইতে ঐ বিষপত্র ফেলাইয়া দিবে। পরে ঐ বীজগুলি দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। এইরূপে সাতবার পাক ও সাতবার প্রক্ষালন করিয়া লইলেই জয়পাল বীজের দোষ রহিত হয়, ইহাকেই শোধন করা বলে। এইরূপে শোধিত জয়পাল-বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলেই তাহা ঔষধার্থে প্রয়োগ করা যায়। তৈল বাহির করিবার আর কোন নিয়ম নাই। অন্যান্য তৈল যে প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাও সেই প্রণালীমতে প্রস্তুত করিয়া লইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

আবার বিসূচিকা বিষ সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত হইলে যখন মর্ম্মগ্রন্থি সমূহ একবারে শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর হইতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া মলাকারে নির্গত হয়, এবং সময় সময় রোগী চৈতন্যহারা হইয়া যায়; তখন শিমূলক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শিমূলক্ষারকে ইংরাজীমতে আর্সেণিক (Arsenic) কহে। এই শিমূলক্ষারের শোধন ও মারণ প্রণালী ইতিপূর্ব্বে কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয় সম্মিলনীতে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর আমার বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। তদ্রূপে মারিত একরতি পরিমিত শাল্মলিক্ষার ৩২ অংশে বিভক্ত করিয়া তাহারই এক এক অংশ শ্বেতবিছাটীমূলের রস সহ মূহুর্মুহুঃ সেবন করাইবে।

যখন ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, সময় সময় নেত্র উর্দ্ধগামী হইয়া উঠে, নাড়ীস্পন্দন সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেক বিলম্বে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় নাড়ীস্পন্দন অনুভূত হয়, তখন একটী প্রস্ফুটিত ধুতুরাপুষ্পের মধ্যস্থিত রেণু-

গুলি উত্তোলনপূর্ব্বক আড়াইটা গোলমরিচের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং শীতলজলের মধ্যে তাহা গুলিয়া সেবন করাইবে। (ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ী।
দিনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত দুই একটী কথায় কিন্তু আমরা সম্মতি দিতে সমর্থ নহি। কেন যে অসমর্থ, তাহা পরে বলিব। সম্পাদক।

পদ্যমেটেরিয়া মেডিকা।

ইপিকা কুএনহা।

(উদ্ধৃত)

বমন বা বিবমিষা পেট ব্যথা সহ,
তদনুসঙ্গিক কষ্ট বড়ই দুঃসহ।
ঘাসের বরণ মল তরল স্বভাব,
নাভিকুণ্ডে খিমছানী, লাল রক্তস্রাব।
জরায়ু হইতে রক্ত ক্রমাগত পড়ে,
তখন প্রশ্বাস শ্বাস চলয়ে সজোরে।
বক্ষঃস্থল ধড়ফড়ি শ্লেষ্মারব গলে,
কখন শিশুরা শ্লেষ্মা বমি ক'রে তোলে।
কাশিতে কাশিতে শিশু পড়ে নেতাইয়া,
গা, পা, মুখ, হাত শক্ত ফেঁকাসে হইয়া।
তল পেটে কষ্ট বোধ মলে মাখা ফেনা,
বমন উদ্রেক সহ কলিক বেদনা।
মস্তক করিলে নিচু বলি বৃদ্ধি হয়,
তৃষ্ণা ঘর্ম্ম সহ মন্দ গন্ধ শ্বাস বয়।
কাটার মতন ব্যথা নড়িলে চড়িলে,
বাম দিক হ'তে যায় ডা'ন দিকে চ'লে।
সর্ব্বক্ষণ বিবমিষা অথবা বমন,
কুইনিন্ আর্স যেই পীড়ার কারণ।

রক্ত বমনের পেলে প্রথম সময়,
ইপিকাকে উপকার হইবে নিশ্চয়।
অল্পক্ষণ শীত হ'য়ে দীর্ঘস্থায়ী জ্বর,
গাত্রের উত্তাপ হয় সমধিকতর।
মাথা ধরা, তৃষ্ণা, কাশি, বমনের ভাব,
সর্ব্বশেষে ঘর্ম্ম হওয়া জ্বরের স্বভাব।
মহাত্মা জারের মতে জ্বরের প্রথমে,
ইপিকাক দিতে হয় ত্রিংশত ক্রমে।

হোঃ, পাঃ, চিঃ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-সম্পাদক ইতিপূর্ব্বে এইরূপ পদ্যপ্রবন্ধের উপর কটাক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার সাদরে এরূপ পদ্যপ্রবন্ধ কেন যে নিজ পত্রিকায় স্থান দান করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা বুঝিতে সমর্থ নহি। আর এ প্রবন্ধের লেখকই বা কে? সম্পাদক।

ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী।

শূলরোগে মণ্ডূরপ্রয়োগ।

তারামণ্ডূর গুড়।

একদিকে নবপল পরিমিত বিশুদ্ধ মণ্ডূর চূর্ণ এবং তৎপরিমিত সম্বৎসরাতীত ইক্ষুগুড় মৃৎকটাহে স্থাপনপূর্ব্বক ষট্‌ত্রিংশৎপল গোমূত্রে গুলিয়া লইবে। অপর দিকে বিড়ঙ্গের তণ্ডুলচূর্ণ, শোধিত রক্তচিতার শিকড়চূর্ণ, চইচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ, শুঁটচূর্ণ, মরিচচূর্ণ এবং পিপ্পলীচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল অর্থাৎ ৮ আট তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। তৎপর মণ্ডূরাদি দ্রব্যত্রয় সম্বলিত কটাহ চুল্লীতে চড়াইয়া মৃদু মৃদু সন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাককালে সর্ব্বদা দর্ব্বীদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। ঘন হইয়া আসিলে সবেগে দর্ব্বী সঞ্চালন করিবে এবং খুন্তীদ্বারা কটাহের পার্শ্বদেশ বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে, যেন তাতিয়া না যায়। যৎকালে দেখিবে পচ্যমান ঔষধ বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে,—তাড়ুকাটীতে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িয়া পড়িতেছে;—একধারে পড়িতেছে না; এবং প্রক্ষিপ্য চূর্ণগুলি দিলে পিণ্ডীভূত হইয়া যাইবে এরূপ

বুঝিবে; তখন পূর্ব্বে মিশ্রীকৃত বিড়ঙ্গাদির নবপলচূর্ণ ছড়াইয়া ছড়াইয়া প্রক্ষেপ দিতে থাকিবে এবং ঘন ঘন দর্ব্বীসঞ্চালনদ্বারা মিশ্রিত করিয়া দিবে। প্রক্ষেপ দেওয়া হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া কিছুকাল নাড়িয়া লইয়া উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

তারামণ্ডূরগুড় পরিণাম শূল এবং অম্লপিত্তরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল দর্শে। তদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামলা, শোথ এবং ক্রিমিরোগে এই ঔষধ মহোপকারী। শতাবরী মণ্ডূর যে মাত্রায় যেরূপ প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয়, ইহার মাত্রা ও ব্যবহার প্রণালী তদনুরূপ। ক্রমশঃ—

মাগুরা,
বারুইপাড়া। } শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রক্তপিত্তরোগে তৈল প্রয়োগ।

ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুরোগে তৈল প্রয়োগের বিষয় বলিয়াছি। পাণ্ডুরোগের পরেই রক্তপিত্ত রোগ, সুতরাং এবারে রক্তপিত্তরোগে তৈলপ্রয়োগের কথা বলিতেছি। কিন্তু কথা এই যে, রক্তপিত্তরোগেও দুই একটা ভিন্ন তৈল প্রয়োগের বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। আর দুঃখের কথা এই যে, যাহাও দুই একটা তৈলের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে কিন্তু আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণ ভ্রমেও সে তৈলের ব্যবহার করে না। অন্তত আমি ত আমার জীবনে একজন কবিরাজকেও এই রোগে কোন তৈল ব্যবহার করিতে দেখি নাই, তবে অবশ্য রক্তপিত্তের সহিত কাসাদির সংস্রবে কোন কোন কবিরাজ সারচন্দনাদি তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা উপকারও আশানুরূপ হইয়া। কিন্তু সে স্থলে রক্তপিত্ত রোগ না বলিয়া যক্ষ্মা বা যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএত সে কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রক্তপিত্তরোগের সম্বন্ধে তৈল প্রয়োগের কথা বলিতে গেলে ইহা নিশ্চিত যে, কেবল রক্তপিত্তরোগে প্রায়ই কেহ তৈল ব্যবহার করেন না। কিন্তু কেন? কেন যে, সে প্রশ্নের উত্তরে মাথা মুণ্ডু আর কি বলিব? সেই পুরাতন কাহিনী, এখনকার কবিরাজ কুলের

সেই বাঁধাবোল, সেই খাঁড়াবড়িথোড় বা থোড়বড়িখাঁড়া অর্থাৎ টীয়াপাখীর ন্যায় গুরুদেবের নিকট যাহা শিক্ষা করেন, গুরুদেবকে যে পথে চলিতে দেখেন, শেষটা নিজে চিকিৎসাক্ষেত্রে নামিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া সেই পথেই সটান চলিতে আরম্ভ করেন, সুতরাং শাস্ত্রে কি আছে বা কি ছিল, সে খবর লইয়া কয়জন কবিরাজ এ সংসারক্ষেত্রে চলিয়া থাকেন?

সে যাহা হউক, রক্তপিত্তরোগে হ্রীবেরাদি তৈল প্রভৃতি ২। ৪ টী তৈলের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও আমরা সাধারণের অবগতির জন্য এ প্রবন্ধে কেবল এক হ্রীবেরাদি তৈলেরই উল্লেখ করিতেছি।

হ্রীবেরাদি তৈল।

প্রথমত চারিশের খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল ইতিপূর্ব্ব লিখিতমতে কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া পরে মূর্চ্ছাদ্রব্য তৈল হইতে ভালরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যদ্বারা পাক করিবেক। যথা—বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনদ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, বয়ড়ার ছাল, আঁবের আঠী, রক্তোৎপলের মূল, প্রত্যেকে দুই তোলা ওজনে লইয়া একত্রে উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ। ৬ ষোলশের জলের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া কল্কদ্রব্য গুলি তৈল হইতে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিবে। অনন্তর লাক্ষার কাথ। ৬ ষোল সের দ্বারা তৈলপাক করিবে। তারপর। ৬ ষোল সের দুগ্ধদ্বারা তৈলের পাক শেষ করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, পঞ্চপ্রকার কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মারোগের শান্তি হয় এবং এই তৈলদ্বারা শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত তৈল রক্তপিত্তরোগে যদি কোন মহাত্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথবা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিয়া থাকেন, তবে লিখিলে সুখী হইব। তবে এ স্থলে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে, আমার চিকিৎসাধীন কোন কোন সুদারুণ দাহগ্রস্ত রক্তপিত্ত রোগীকে আমি গুড়ূচ্যাদি তৈল ব্যবহার করিতে দিয়া সবিশেষ উপকার দর্শিতে দেখিয়াছি। একবার একটী রক্তপিত্ত রোগীর হাত পা ও সর্ব্বশরীরের জ্বালা উক্ত তৈল ব্যবহারেই দূর হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়!

গত বারের চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকায় আমার প্রেরিত মুষ্টিযোগাদি সাধারণের হিতার্থে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি ও তন্নিম্নে মহাশয়ের বক্তব্যপাঠে সাতিশয় বাধিত হইলাম। এবারেও কতকগুলি পাঠাইলাম, আশা করি মহাশয় আগামী সংখ্যায় স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন। মহাশয় বিষবড়ী সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ।

—

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪) পুরাতন উদরাময় (chronice Diarrhoea) রোগের ঔষধি।

বেলের কুঁড়ি	১।২ টা
জোয়াইন	অল্পপরিমাণ।
সোহাগার খৈ	ঐ ঐ
বড়এলাচের খোসা	২ টা।
লবঙ্গ	২ টা
বিট্‌লবণ	অল্প।

এই কয়টী দ্রব্য পাতিলেবুর রস দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিটা বড়ী করিবেক, পরে বিবেচনানুসারে প্রতিদিন ২।১ টী জলের সহিত খাইলে অতি শীঘ্র পুরাতন উদারাময় ভাল হয়। বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ বটী।

জোয়াইন।
সিদ্ধি।
মরিচ।

এই কয়টী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবেক, পরে বয়স বিবেচনানুসারে প্রতিরাত্রে শয়নকালে কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া সেবনীয়।

সেই বাঁধাবোল, সেই খাঁড়াবড়িথোড় বা থোড়বড়িখাঁড়া অর্থাৎ টীয়াপাখীর ন্যায় গুরুদেবের নিকট যাহা শিক্ষা করেন, গুরুদেবকে যে পথে চলিতে দেখেন, শেষটা নিজে চিকিৎসাক্ষেত্রে নামিয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া সেই পথেই সটান চলিতে আরম্ভ করেন, সুতরাং শাস্ত্রে কি আছে বা কি ছিল, সে খবর লইয়া কয়জন কবিরাজ এ সংসারক্ষেত্রে চলিয়া থাকেন?

সে যাহা হউক, রক্তপিত্তরোগে হ্রীবেরাদি তৈল প্রভৃতি ২। ৪ টী তৈলের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও আমরা সাধারণের অবগতির জন্য এ প্রবন্ধে কেবল এক হ্রীবেরাদি তৈলেরই উল্লেখ করিতেছি।

হ্রীবেরাদি তৈল।

প্রথমত চারিশের খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল ইতিপূর্ব্ব লিখিতমতে কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া পরে মূর্চ্ছাদ্রব্য তৈল হইতে ভালরূপে ছাঁকিয়া ফেলিয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যদ্বারা পাক করিবেক। যথা—বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনদ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, বয়ড়ার ছাল, আঁবের আঠী, রক্তোৎপলের মূল, প্রত্যেকে দুই তোলা ওজনে লইয়া একত্রে উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ।৬ ষোলশের জলের সহিত একত্রে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া কল্কদ্রব্য গুলি তৈল হইতে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিবে। অনন্তর লাক্ষার কাথ।৬ ষোল সের দ্বারা তৈলপাক করিবে। তারপর।৬ ষোল সের দুগ্ধদ্বারা তৈলের পাক শেষ করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, পঞ্চপ্রকার কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মারোগের শান্তি হয় এবং এই তৈলদ্বারা শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত তৈল রক্তপিত্তরোগে যদি কোন মহাত্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথবা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিয়া থাকেন, তবে লিখিলে সুখী হইব। তবে এ স্থলে এ কথাটা বলা আবশ্যক যে, আমার চিকিৎসাধীন কোন কোন সুদারুণ দাহগ্রস্ত রক্তপিত্ত রোগীকে আমি গুড়ূচ্যাদি তৈল ব্যবহার করিতে দিয়া সবিশেষ উপকার দর্শিতে দেখিয়াছি। একবার একটী রক্তপিত্ত রোগীর হাত পা ও সর্ব্বশরীরের জ্বালা উক্ত তৈল ব্যবহারেই দূর হইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্মানপুরঃসর নিবেদন মিদং—

সম্পাদক মহাশয়!

গত বারের চিকিৎসা-সম্মিলনী পত্রিকায় আমার প্রেরিত মুষ্টিযোগাদি সাধারণের হিতার্থে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি ও তন্নিম্নে মহাশয়ের বক্তব্যপাঠে সাতিশয় বাধিত হইলাম। এবারেও কতকগুলি পাঠাইলাম, আশা করি মহাশয় আগামী সংখ্যায় স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন। মহাশয় বিষবড়ী সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ।

—

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪) পুরাতন উদরাময় (chronice Diarrhoea) রোগের ঔষধি।

বেলের কুঁড়ি	১।২ টা
জোয়াইন	অল্পপরিমাণ।
সোহাগার খৈ	ঐ ঐ
বড়এলাচের খোসা	২ টা।
লবঙ্গ	২ টা
বিট্‌লবণ	অল্প।

এই কয়টী দ্রব্য পাতিলেবুর রস দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিটা বড়ী করিবেক, পরে বিবেচনানুসারে প্রতিদিন ২।১ টী জলের সহিত খাইলে অতি শীঘ্র পুরাতন উদারাময় ভাল হয়। বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ বটী।

জোয়াইন।
সিদ্ধি।
মরিচ।

এই কয়টী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবেক, পরে বয়স বিবেচনানুসারে প্রতিরাত্রে শয়নকালে কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া সেবনীয়।

(৫) রক্তপিত্তরোগের ঔষধ।

ছাগী অথবা গব্যদুগ্ধ	৮ তোলা।
জল।	৮ তোলা।
ফটকিরি।	৬ রতি।

এই কয় দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দিবসে ৩ বার সেবনীয়।

(৬) শিশুদিগের কাশরোগের মহৌষধি।

যষ্টিমধু ⁄০ ছটাক, কাঁচা বা শুষ্ক ঢেঁড়স অথবা কণ্টকারী অর্দ্ধ ছটাক কুটিয়া ॥০ সের জলে সিদ্ধ করিবা ।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে ।০ পোয়া মিছরি দিয়া পাক করিবে, ঘন হইলে শিশি বা বোতল মধ্যে কাক দিয়া রাখিবে। ।০ তোলা হইতে ॥০ তোলা মাত্রায় দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইলে বালকদিগের কাশি অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

(৭) প্রস্রাবের বৃদ্ধি নিবারণের ঔষধ।

চাটীমকলা	১ টা
আমলার রস	

কাঁচা অভাবে শুক্‌না আনিয়া জলে ভিজাইয়া ঐ জল ১ তোলা।

মধু।	১ তোলা।
দুগ্ধ।	১ ছটাক।

এই কয়টী দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া প্রাতে স্নানান্তে সেবনীয়। এইরূপ ২।৪ দিন সেবন করিলে প্রস্রাবের বৃদ্ধি অবশ্য নিবারণ হয়।

(৮) পাঁচড়ার ঔষধ।

তিল তৈল	।০ পোয়া।
গন্ধক।	১ তোলা।
তুঁতিয়া।	১ তোলা।

প্রথমে তৈল জ্বালে চড়াইবে। যখন দেখা যাইবে যে উহার ফেণা মরিয়া গিয়াছে, তখন গন্ধক ও তুঁতিয়া চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই তৈল পাঁচড়া ঘায়ে দিলে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়, স্নানান্তে ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

(৯) ফোড়া ফাটাইবার ঔষধ।

পল্লিগ্রামে বেড়ারধারে পান গাছের ন্যায় এক প্রকার লতা পাওয়া যায়, তবে পানপাতা অপেক্ষা ইহার পাতা কিছু ছোট, ইহাকে কালীয়ক লতা (চলিতভাষায় কাল্কেলতা বা কেলেলতা) কহে। এই পাতার এমন অসাধারণ গুণ যে, ফোড়ার উপর সোজা পিঠ (অর্থাৎ যে পিঠ অতিশয় মসৃণ) লাগাইয়া রাখিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়, তাহার পর ঐ পিঠ পুনঃপুনঃ বদলাইয়া রাখিলে সমস্ত ক্লেদ টানিয়া বাহির করে। ২।১ দিন পর যখন দেখা যাইবে যে, আর পুঁজ নাই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, তখন ঐ পাতার উল্টা পিঠ ২।১ দিন লাগাইলেই ফোড়া শুকাইয়া যাইবে। কোন কোন স্থলে পাতারদ্বারা ফোড়া ফাটে না, সে স্থলে অপর কোন দ্রব্য বা অস্ত্রদ্বারা উহা ফাটাইয়া লইয়া ঐ পাতা লাগাইবে। ইহার নাম দেশভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে। এই পাতার অসাধারণ গুণ আমরা একমুখে শেষ করিতে পারি না।

(১০) অর্শরোগের ঔষধ।

(ক) কৃষ্ণতিল ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা, মাখন ১ তোলা একত্রে বাটীয়া প্রাতে স্নানের পর ভক্ষণ করিবে। রাত্রে হরীতকী চূর্ণ ॥০ তোলা ও চিনি ॥০ তোলা জলের সহিত সেবন করিবে। উপরোক্ত মতে ১ সপ্তাহ সেবনীয়। উহা বিশেষ ফলপ্রদ।

(খ) পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময় পুরাতন শুষ্ক মূলা ১ তোলা জলের সহিত উত্তমরূপবাটিয়া পাথরের অথবা কাঁচের পাত্রে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া শিশিরে রাখিবে। পর দিবস প্রাতস্নান করিয়া উহা খাইয়া ১ তোলা কৃষ্ণতিল ও ১ তোলা আতপ চাউল ভিজা চিবাইয়া খাইবে। উহাও কিছুদিন খাইলে অর্শরোগীর বিশেষ উপকার হয়। ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা } শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ সকল মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং সর্ব্বদাই আমরা এ সকল ঔষধের ব্যবহার করিয়া থাকি। সম্পাদক।

মুষ্টিযোগ ঔষধ।

সঙ্কেত।

১। যে সকল মুষ্টিযোগের পূর্ব্বে (*) এইরূপ তারা চিহ্ন থাকিবে, সেই গুলি বিশেষ পরীক্ষিত।

২। যাহার পূর্ব্বে (+) এইরূপ যোগ চিহ্ন থাকিবে, সেগুলি অল্প পরীক্ষিত।

৩। যাহার পূর্ব্বে কোন চিহ্নই নাই ;-সে গুলির পরীক্ষা শেষ হয় নাই। রোগী পাইলে পরীক্ষান্তে লিখিব।

৪। যে সকল স্থলে কোন ঔষধের ক্বাথ বলিব, সেখানে ক্বাথ শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিবে যথা ;—"যে কোন ঔষধ হউক না কেন, উহার সকল গুলি পদ একত্রে মিশাইয়ে মোট ওজন দুই তোলা হইবে। সেই দুই তোলা দ্রব্য আদছেঁচা ক'রে, আদসের জলে কিছুকাল ভিজিয়ে রেখে পর, অল্প জালে ফুটাইতে হবে। সমস্ত জল শোষণ হ'য়ে আদপোয়া থাক্‌তে নামিয়ে ছেঁকে নিও, তা হ'লেই ক্বাথ প্রস্তুত হোল। ক্বাথ ও যেমন, যার নাম, পাঁচনও তেমনি তারির নাম, ক্বাথ পাঁচন প্রায় একই কথা।

৫। আমি যতগুলি ঔষধ বলিব সে সকলই যুবা ব্যক্তির মাত্রা অর্থাৎ পুরা মাত্রা। ইহাই বুঝিয়া নিতান্ত শিশুকে তাহার শিকি মাত্রা, বালককে অর্দ্ধ মাত্রা, বৃদ্ধের চারিভাগের তিনভাগ, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রলেপের ঔষধ যাহা বলিব, সেগুলি সকলেরই সমান মাত্র।

২০ শয্যামূত্র।

(বিছানায় প্রস্রাব।)

১। সাধারণতঃ কৃমির জন্যই এই অসুখ অধিক হয়। কৃমিগ্রস্ত বালক-বালিকাদিগেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে কৃমি দমন জন্য, কৃমির মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিলেই সারিয়া যায়।

২। * ধ'নে তিন মাসা পাথরপাত্রে চূর্ণ করিবে, উহা চিনি বা মিছিরির সরবতের সহিত প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালে পান করিতে দিবে।

৩। * কাবাবচিনিচূর্ণ দুই আনা হিমজলের সহিত রাত্রে শয়নকালে খাইবে।

২১ অর্শরোগ।

১। * নাগেশ্বরের ফুলের রেণু মাখন ও মিছিরির সহিত প্রত্যেক দুই তোলা ওজনে চারি পাঁচ দিন সেবনে নিশ্চয়ই আরাম হয়।

২। * একটা ইন্দুর ধরিয়া তাহার মস্তক ছেদন করতঃ সেই মাংস কাপড়ের পোঠলায় পুরিয়া আগুণে তাতাইয়া স্বেদ দিলে অর্শের বলি শুষ্ক ও বেদনা নিবারণ হয়।

২২। কুষ্ঠরোগ।

১। শিমুলক্ষার এক রতি আকন্দের ছাল চূর্ণ ২৷৷০ আড়াই তোলা ভাল-রূপ মিশাইয়া দুই শতটা পুরিয়া প্রস্তুত করিবে, প্রত্যহ আহারের এক প্রহর পরে দুইবেলা সেবন করিবে। এইরূপে এক সপ্তাহ সেবন ও অপর সপ্তাহ বাদ, এই ভাবে পর্য্যায়ক্রমে খাইবে।

২৩। বাতরোগ।

১। * আকন্দের আঠা লবণের সহিত মিশাইয়া বেদনা স্থানে প্রয়োগ করিলে বাতের ফুলা ও বেদনা নিবারিত হয়।

২৪। উপদংশরোগ।

(গরমীর ব্যারাম।)

২। * বুটীং কাগজে আকন্দের আঠা মাখাইয়া শুষ্ককরতঃ উহাদ্বারা চুরট প্রস্তুত করিয়া সেই চুরটের ধুম পান বা শ্বাসগ্রহণ করিবে, আর ঐ আঠার শিকি রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুতকরতঃ প্রত্যহ প্রাতে এক বটিকা ; এইরূপ সপ্তাহ সেবন করিবে।

১। কিরাতাদি পাচন।

বৃহতি, চিরতা, শুঁঠ, কণ্টিকারী, বালা ;
গুলঞ্চ, গোক্ষুর, মুথা, শাল্পানি, চাকুলা ;
এই দশ খানা দিয়া পাচন করিবে,
সেবনে বাতিক জ্বর বিনাশ হইবে।

২। কলিঙ্গাদি পাঁচন।

ইন্দ্রজব, কটফল, মুতা, আকনিদি,
কটকী সহিত মেপে লবে যথাবিধি,
ইহার পাচনে চিনি প্রক্ষেপ ফেলিবে,
নিশ্চয় পিত্তের জ্বর ইহাতে নাশিবে।

৩। নিম্বাদি পাচন।

চিরতা, বৃহতি, কুঁড়, দেবদারু, পিপুল,
গুলঞ্চ, গজ পিপুল, শটি, নিমছাল;
শুঁঠ সহকারে ক্বাথ সেবন করিবে।
অবশ্য কফের জ্বরে অমোঘ হইবে॥

৪। গুড়ূচ্যাদি পাচন।

নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, আরক্তচন্দনে,
গুলঞ্চ সহিত দিবে সমভাগে ধ'নে।
এপাচনে বিনাশিবে কষ্ট সাধ্যজ্বর
বমিভাব নাশে ইহা অগ্নি বৃদ্ধিকর। ক্রমশঃ—

পুঁটিয়া,
রাজসাহী। } শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

নলিনীবাবুর পদ্যে লিখিত পাঁচন পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম। সম্পাদক।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

সম্পাদকীয়।

(১) স্ত্রীজাতির বাধকবেদনা বা অনিয়মিত ঋতুজন্য বেদনাতে ওলট-কম্বলের মূল অর্দ্ধতোলা বা তদধিকমাত্রায় এবং তাহার তুল্যপরিমাণ গোল

মরিচচূর্ণ লইয়া একত্রে বাটীয়া উষ্ণজলের সহিত ঋতুর সময় ৩ দিন বা ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত পান করিতে দিবে। ইহা আমাদের পরীক্ষিত।

(২ কেবল আমাশয় বা রক্তামাশায়রোগে বনমূলাপাতার নির্জ্জলরস প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধছটাক ও বৈকালে অর্দ্ধছটাক পান করিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়। এটী বিশ্বস্ত বন্ধুদ্বারা পরীক্ষিত।

(৩) ভগন্দররোগের ভাল ঔষধ। কাঁচাতুতেঁর পাতলা জলদ্বারা একদিন অন্তর পিচ্‌কারী দিবে এবং হাপরমালী আঠাদ্বারা একদিন অন্তর ভগন্দরের ক্ষত পূরণ করিবে। অচিরাৎই ভগন্দর আরাম হইবেক। এ ঔষধটী আমাদের দ্বারা পরীক্ষিত না হইলেও ইহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

(৪) আমাদের কোন আসামবাসী বিশ্বস্ত বন্ধুলোক নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিয়া অনেক লোকের প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গরোগের শান্তি করিয়াছেন। যথা—

গাঁজা——২ তোলা।
ছোটএলাচি——৪ তোলা।
দারচিনি——৪ তোলা।
জৈত্রী——২ তোলা।
ইক্ষুচিনি——৪ তোলা।
গাওয়াঘৃত——৪ তোলা।

ঘৃত ও চিনিবাদে অপর দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণদ্বারা ঘৃত ও চিনিদ্বারা ছোট ছোট মোদক প্রস্তুত করিবে। সহ্য অনুসারে এই মোদকের কিয়দংশ প্রাতে ও কিয়দংশ সন্ধ্যাকালে ব্যবহার করিবে। ইহাও আমাদের পরীক্ষিত নহে। না হইলেও গাঁজা থাকায় ধ্বজভঙ্গরোগে উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

(৫) উদ্ধৃত মুষ্টিযোগ—বিছায় কামড়াইলে—ক্ষতস্থানে গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়। গোময় উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়, দ্রষ্টস্থানে চিটেগুড় লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

ছুলির ঔষধ—কদলিমূল ভস্ম এবং হরিদ্রাচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সমভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ছুলির দাগ বিনষ্ট হয়। আপাঙ্গপত্রের রস মূলার বীজসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শীঘ্র উপকার হয়।

চিকিৎসা-সংবাদ।

(৬) কুইনাইন। কুইনাইন পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের মহৌষধ; কিন্তু কুইনাইন বাতজ্বরে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। হিন্দুদিগের ভৈষজ্যবিচার এই সনাতন সূত্রের উপর স্থাপিত আছে।

ডাক্তার স্মিথ্ বল্লেন যে, একোনাইটের জ্বরনাশকতা শক্তি কুইনাইনের নীচেই। অবশ্য কুইনাইনের নিন্দা করিতে কে সাহস করিবে? কিন্তু, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কুইনাইনের পর্য্যায় নিবারকশক্তি একোনাইটের অন্যান্য গুণ উহার অপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে একটী গুণ এই যে, একোনাইট্ জ্বরকালে ও জ্বরবিচ্ছেদে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কুইনাইন জ্বরকালে ব্যবহার করা যায় না। আর রসস্থ জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা একোনাইটের কার্য্যকারিতা অধিক ইহা ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছি যে, প্লীহা রহিত পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে একোনাইটের কার্য্যকারিতা অধিক। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কুইনাইনের অতি সেবনে ম্যালেরিয়া দেশে যে একপ্রকার পুরাতন জ্বর হইতেছে, তাহার নিবারণে কুইনাইন অপেক্ষা একোনাইটের কার্য্যকারিতা অধিক। পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে কুইনাইনের কার্য্যকারিতা ও বাতপিত্ত ও বাতশ্লেষ্মাজ্বরে একোনাইটের কার্য্যকারিতা অধিক। ম্যালেরিয়া বিষে যে অজীর্ণ দোষ, অতিসার দোষ ও গ্রহণীদোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার নিবারণে একোনাইট্ উপাদেয় ঔষধ।

যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু লবণ, তাহা বায়ুনাশ করে। যাহা কিছু কষায়, যাহা কিছু কটু, যাহা কিছু তিক্ত, তাহা শ্লেষ্মানাশ করে। সুলভ দৈনিক।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সত্যবটে কুইনাইনের ন্যায় একোনাইট্ শীঘ্র শীঘ্র জ্বর বন্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে, অবিচ্ছেদী জ্বরকে বিচ্ছেদ করিতে একোনাইটের ন্যায় মহৌষধ আর কিছুই নাই। একোনাইটের বাঙ্গালা নাম অমৃত বা মিঠাবিষ। দেশীয় কবিরাজ মহাশয়দিগের কিন্তু এই অমৃত ভিন্ন নূতন জ্বরের চিকিৎসাই চলে না। সম্পাদক।

আমাদের কথা।

পুষ্প-প্রদর্শনী বা ফুলমেলা।—এবারেও আমরা কলিকাতার সাতপুকুরের বাগানে ফুলের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। তবে পার্থক্য এই যে, সেবার আমরা রবাহূত হইয়াই গিয়াছিলাম, আর এবারে অধ্যক্ষ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

মেলার প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এই ফুলমেলার মধ্যে বাবু বিবির বিহার, অসংখ্য ফুলের বাহার, রকমারি ধান্যের নমুনা, নানাবিধ অসাময়িক ফল মূল এবং নাম মাত্র ২।১০ টা বৈদ্যক গাছগাছড়া উপস্থিত থাকিলেও ইহার মূল ভিত্তিটা যে একমাত্র ফুলখেলার উপরেই স্থাপিত, সে পরিচয় বোধহয় দূরদর্শী দর্শকের নিকট আর কিছুই দিতে হইবে না। সুতরাং এই ফুলমেলা বা ছেলেখেলার সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছুই লিখিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে চাহি না।

মেলা সম্বন্ধে কিছুই বলিব না বটে, কিন্তু ছেলেখেলা সম্বন্ধে ছেলেমানুষের মত দুই চারিটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি কৈ?

আহা মরি মরি কিবা ফুলের বাহার! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাঁবুর মধ্যে সুসজ্জিত ফুলরাশি দেখিয়া এবং তাহাদের সেই প্রাণমনমুগ্ধকর আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রাণ মন যেন যথার্থই বিভোর হইয়া উঠিল। প্রকৃতই বোধ হইল, যেন কলিকাতারূপ নরক ছাড়িয়া আজ জীবন্তেই সাতপুকুররূপ-স্বর্গে হেমবাবুর রচিত নন্দনকাননে আগমন করিয়াছি।

কিন্তু আমাদের ন্যায় হতভাগার সুখ যে বৈকুণ্ঠেও নাই,—ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতেই যখন নয়নদ্বয় সেই সর্ব্বথা অযত্নে সংগৃহীত ও প্রচণ্ডরৌদ্রে অতি অবহেলার সহিত স্থাপিত নামমাত্র কতকগুলা দেশীয় ঔষধের গাছগাছড়ার প্রতি পতিত হইল, তখন যেন স্বর্গ হইতে একবারেই গভীর নরকে পতিত হইলাম।

ভাবিলাম—পরাধীন পরপদ-দলিত অন্তঃসার-শূন্য অন্নবস্ত্র-হীন ভারতবাসীর পক্ষে আজ্ ফুলখেলা করিবারই উপযুক্ত সময় বটে! ভাবিলাম——এই যে পুষ্পপ্রদর্শনী, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কি প্রদর্শিত হইতেছে? প্রদর্শিত হইতেছে

যে, দেশের ধান চাউল, দেশের ঔষধপথ্য সমস্তই উড়িয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া চলিয়া যাউক, আর আমরা পেটে না খাইয়া এইরূপে ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাহেব বিবিগণের সেবা করি। প্রকৃতই কি আমাদের ন্যায় অধমজাতির ফুলমেলায় এ সকল কথা বলা যাইতে পারে না?

আরও ভাবিলাম—যেমন অপরিণামদর্শী তরুণ যুবক উঠন্ত বয়সে ঘরে অন্ন নাই, পিতা মাতা হা অন্ন যো অন্ন করিয়া বেড়াইতেছেন, স্ত্রী বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ করিতে পারিতেছেন না, অথচ নিজে কিন্তু লম্বাকোঁচা ঝোলাইয়া ভিক্ষামাগিয়াও কটু আতর গোলাপ এমন কি মদ্যের পর্য্যন্ত শরণ লইয়া তেড়িটী বাগাইয়া বাহিরে দিব্বি ফুলবাবুটী সাজিয়া বাহার দিয়া বেড়ায় এবং সেইরূপ বাবু দেখিয়া লোকে যেমন মনে করে, এ অন্নবস্ত্রহীনদেশে হেমবাবুর ফুলমেলাও যে সেই ছকুবাবুর বাবুয়ানা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে, সে কথা কি আর বলিতে হইবে?

শোক সংবাদ।—গতবারে আমরা কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার ও কবিরাজ চন্দ্রকিশোরের মৃত্যুবার্ত্তা ঘোষিত করিয়া আমাদের পাঠকবর্গকে দুঃখিত করিয়াছি। এবারেও জানাইতেছি যে, ব্রজেন্দ্র ও চন্দ্রকিশোরের অব্যবহিত পরেই কলিকাতার প্রাচীন কবিরাজ মাননীয় লোকনাথ মল্লিক মহাশয়ও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন নদীয়ার জয়েণ্টমাজিষ্ট্রেট্ আশুতোষ গুপ্তের অকাল মৃত্যুতেও আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছি।

আর এইসম্মিলনী-সম্পাদকও অল্প কিছু দিন হইল জেষ্ঠপুত্রের বিয়োগ-জন্য যে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সম্পাদকের শোকতাপিত পরিবারবর্গ ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

লক্ষ টাকা দান।—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর নামে হিন্দুবিধবাগণের দুঃখমোচনের জন্য লক্ষ-টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার বার্ষিক চারিসহস্র টাকা সুদদ্বারা অনাথা বিধবাগণ মাসিকবৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। লোকে কথায় বলে "লাখটাকা দান"। সুতরাং তাহার উপর আর আমাদের বলিবার কি আছে? সম্পাদক।

৮ম বৎসর। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

—oo—

৮ম খণ্ড, ১২৯৮ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭৫নং কটন ষ্ট্রীট্ বড়বাজার "নারায়ণ" যন্ত্রে

শ্রীরামনারায়ণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। এই দুই সংখ্যার নগদ মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

এই দুই সংখ্যায় যাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ আছে।

ডাক্তার প্রাণধন বসু এম্, বি, ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি, কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়, কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, ডাক্তার রাধা-গোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার ডি, এন্ রায় এম্, ডি, কবিরাজ কিরণচন্দ্র গুপ্ত, ডাক্তার নলিনিনাথ মজুমদার এবং সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার		১৬৭
পুত্রশোকে সম্পাদক		১৭২
রায় যতীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসা-সম্মিলনী		১৭৭
মৃগনাভি মৃত-শরীরে জীবন দান করে	(কবিরাজী)	১৭৮
শিশুদিগের যকৃতের বিলিয়ারী সিরোসিস্	(ডাক্তারী)	১৮৩
মূলে ভুল	(ঐ)	১৮৫
মূলে ভুল কি প্রকারে বলি	(কবিরাজী)	১৮৯
ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে	(ঐ)	১৯১
আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যু পরীক্ষা	(ঐ)	১৯৮
হাইড্রো ফোবিয়া বা জলাতঙ্ক	(ডাক্তারী)	১৯৯
ধাতু ব্যাখ্যা	(কবিরাজী)	২০১
এজ্‌মা বা শ্বাস রোগ	(ডাক্তারী)	২০৩
চিকিৎসিত রোগাবলী	(ঐ)	২০৫
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ-চিকিৎসা	(কবিরাজী)	২০৭
নূতন ঔষধ	(ডাক্তারী)	২১১
অবলা বান্ধব	(কবিরাজী)	২১২
চিকিৎসা-সংবাদ	(ঐ)	২১৫
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ	(ঐ)	২২২
উত্তাপহারক ঔষধ	(ডাক্তারী)	২২৫
প্রত্যক্ষফলপ্রদ—মুষ্টিযোগ	(কবিরাজী	২২৮
সমালোচনা	(ঐ)	২২৯



কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার।

সত্য বটে কালস্রোত অবিশ্রান্ত চলিয়াছে, আর এই স্রোতের মুখে যে সংসারের যাবতীয় শোভা সৌন্দর্য্য ও সুখ শান্তি প্রতি নিয়তই ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাও যথার্থ। ফলতঃ কাল, ভাল মন্দ সকলই ধ্বংস করে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিশেষ দুঃখ ও কলঙ্কের কথা এই যে, মন্দের দিকে কালের আসক্তি বড়ই কম। সাধারণ জীবের ন্যায় কালও যেন প্রকৃতই সৌন্দর্য্যকামী, যথার্থই সুখ-প্রত্যাশী। যদি তাহাই না হইবে, তবে ভবের ভাণ্ডারে এত অসংখ্য রত্নরাজি সাজান থাকিতে তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নগুলিতে সর্ব্বাগ্রে কালের হাত পড়িবে কেন? অথবা এ সংসার-ক্ষেত্রের ব্যাপারই এইরূপ। নচেৎ এ দুর্দ্দিনে দেশীয় চিকিৎসার এইরূপ চরম অধঃপতন সময়ে ভারতবাসী ব্রজেন্দ্র কুমারের ন্যায় একজন দেশীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে অকালে হারাইবেন কেন?

COLOUR PAPER

প্রায় ৬ মাস অতীত হইতে চলিল, কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমারের আত্মা ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হয় ত এতদিনে সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া স্বস্ব কর্ত্তব্যকার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি আমরা কিন্তু ব্রজেন্দ্র কুমারের অভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। কিন্তু কেন? তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্, তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী সুচিকিৎসক, আর কি এ সহরে কেহই নাই, যাঁহার দ্বারা আজ্ আমরা ব্রজেন্দ্রকুমারের অভাব পূর্ণ করিতে পারি না? অবশ্য তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বা বিজ্ঞ বিচক্ষণ সুচিকিৎসক যে আর কেহই নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না, ব্রজেন্দ্র কুমারের ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্যাদি অশেষবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন কবিরাজেরও যে নিতান্তই অসদ্ভাব, তাহাও বলিতেছি না, তবে তাঁহাতে যে একটী অসাধারণ গুণ অহোরহ বিদ্যমান্ ছিল, তাহা কিন্তু অত্যল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। সে গুণ আর কিছুই নহে, অত্যাশ্চর্য্য সরলতা। যিনি তাঁহার সহিত পরিচয়ে একটু মনঃসংযোগ করিতেন, তিনিই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের সরলতা, ঠিক্ যেন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সরলতা হইতে কোন অংশেই হীন ছিল না। কিন্তু কেবল সরলতাই কি তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল? তাহা নহে, তিনি যেমন সরল, তেমনি দয়ালু, যেমন পণ্ডিত তেমনি ধীর, যেমন সুচিকিৎসক তেমনি অহঙ্কারশূন্য, যেমন সহৃদয় তেমনি দীনপালক ছিলেন। চতুরতা, শঠতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না।

ফলতঃ কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমারের ন্যায় একাধারে এত গুলি গুণের সমাবেশ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা এখনও তাঁহার শোক ভুলিতে পারিতেছি না। আর কোন কালেও যে ভুলিব, সে সম্ভাবনাও অতি অল্প। শোক ভুলিনাই বলিয়াই মৃত্যুর এতদিন পরে আজ্ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

জেলা বর্দ্ধমান কাটোয়ার অন্তর্গত বৈদ্যনপাড়া গ্রামে ৺ হারাধন কবিরাজের ঔরসে ব্রজেন্দ্রকুমার জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হারাধন কলিকা-

তার মধ্যে একজন অতি সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত কবিরাজ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্র কুমারও উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়া পৈতৃক নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে মুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণ ও সংস্কৃতকলেজে সাহিত্যাদি পাঠ ও তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার নিকটেই চরকসুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থ গুলি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার বিশেষরূপ অধিকারও জন্মে। তদ্ভিন্ন কবিরাজী তৈল ও ঘৃতাদির প্রস্তুত ও প্রয়োগ নিয়মও তিনি উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শারীরতত্ত্ব বিশেষতঃ শবচ্ছেদপ্রণালী শিক্ষা করিবার প্রশস্ত উপায় না থাকায় ব্রজেন্দ্র কুমার পুনর্ব্বার সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিন বৎসর কাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ার পর পিতৃদেবের আপত্তিতে অগত্যা তাঁহাকে আবার পিতার নিকটেই পৈতৃক ব্যবসায় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়! আহ্লাদের বিষয় এই যে, মেডিক্যাল কলেজে যাহা কিছু পাঠ্য, প্রকৃত যতটা শিক্ষিতব্য, তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যেই প্রায় তাহা সম্যকরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফলকথা, ডাক্তারী বিদ্যাতেও তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ছিল, এবং সেই জন্যই তিনি নব্য শিক্ষিত সমাজে বড়ই সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া অত্যল্প দিনের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রকুমার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও চিকিৎসাকার্য্যে সম্যক্ দক্ষতা লাভ করিয়া অবশেষে তিনি নিজেই স্বতন্ত্র হইয়া বৈদ্যমতে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন ও মুখোজ্জ্বল করিতে আরম্ভ করেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সেই গুণরাশি, সেই খ্যাতিপ্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভিন্ন কখনও কোন কলঙ্ক রেখা তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই।

তাঁহার জীবন এরূপ নিষ্কলঙ্ক, প্রকৃতি এরূপ উদার ও অন্তঃকরণ এরূপ

অসাধারণ সরল ছিল বলিয়াই তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশকে মহান্ ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। হিন্দু সন্তানগণ যথার্থই একজন উপযুক্ত হিন্দু-চিকিৎসক হারাইয়াছেন। দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা সকল সেই জন্যই সকলে একবাক্যে তারস্বরে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেক সংবাদপত্রেই তাঁহার অসাধারণ গুণ গরিমা ও অসীম চিকিৎসা-শক্তির পরিচয় ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবীণ দৈনিক সম্পাদক তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করিয়া তাঁহার জীবনী যেরূপ প্রশস্তভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এমন আর কোন সংবাদ পত্রেই বাহির হয় নাই। আমরা আমাদের পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে দৈনিক হইতে এস্থলে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, দৈনিকের কথা গুলি কতদূর সত্য। দৈনিক লিখিয়াছেন———

"ব্রজেন্দ্রকুমার অতীব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। দয়া তাঁহার হৃদয়ে ধরিত না; পরহিতৈষিতায় তিনি পাগল ছিলেন। তাঁহার মত বন্ধু-প্রেম অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। পরদুঃখে ব্রজেন্দ্রকুমার বড়ই কাতর হইতেন, যতদূর সাধ্য—কখনও সাধ্যাতীত সাহায্য করিবার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন। বন্ধুগণের বা আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই, অপর সাধারণের দুঃখ যন্ত্রণার কথা শুনিলেও, ব্রজেন্দ্রকুমার প্রবীণ বয়সেও বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিতেন; তখন স্বাভাবিক ধৈর্য্য যেন কোথায় চলিয়া যাইত। বিদ্যাগুণে—চিকিৎসাগুণে—ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয়গুণে তিনি জনসমাজে—বন্ধুসম্প্রদায়ে—যেরূপ উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, এমন আসন অতি অল্প লোককেই পাইতে দেখা যায়। ব্রজেন্দ্রকুমারকে যিনিই জানিতেন, তিনিই ভাল বাসিতেন—ভক্তি করিতেন। ব্রজেন্দ্র বিয়োগে এখন সকলকেই আমাদের ন্যায় কাতর এবং শোক বিহ্বল হইতে হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার যেমনই সহৃদয়, উদার প্রকৃতি এবং দয়ালু ছিলেন, মিষ্ট-ভাষী এবং শিষ্টচারীও সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক এবং সরলাত্মা লোক আজিকার কালে বড় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজগুণে

ব্রজেন্দ্রকুমার অসংখ্য বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়? তাঁহার অসংখ্য বন্ধুকেই আজ শোকসাগরে ভাসিতে হইতেছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার আর্য্যোচিত আচার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়াই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন; অর্থার্জ্জনের খাতিরে নিত্যকর্ম্মে ত্রুটী করিতেন না। নবীন বয়সের অভাব ত্রুটীর প্রাচীন বয়সে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, ব্রজেন্দ্রকুমার প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবের অনুরাগী হইয়া ছিলেন; সাত্ত্বিক ভাবের অধিকারীও তিনি হইয়া ছিলেন। কপটাচার কাহাকে বলে, তাহা ব্রজেন্দ্রকুমার কোন কালেই জানিতেন না; তাঁহার মত সাদা মন আমরা অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।

ব্রজেন্দ্রকুমার বড়ই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালায়ও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সংবাদপত্রে এবং সাময়িক পত্রে তিনি অনেক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমাদের প্রভাত সমীরে ও আর্য্যদর্শন প্রভৃতি সাময়িকপত্রে ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রবন্ধ প্রকটিত এবং পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার খ্যাতিপ্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; লোক সমাজে পরিচিত হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না।

ব্রজেন্দ্রকুমার দীনপালক ছিলেন। কলিকাতার বাসায় অনেক অসহায় আত্মীয় স্বজন এবং পরজন তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত, অনেক ছাত্র তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত এবং তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইত। আহা! মৃত্যুকালেও বাসায় অনেক অসহায় প্রতিপালিত হইতেছিল।"

বলা বাহুল্য যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের সম্বন্ধে দৈনিকের লিখিত একটী মাত্র অক্ষরও মিথ্যা নহে, সুতরাং এহেন মহাত্মার মৃত্যুতে হিন্দু সমাজে যে কি এক মহান্ অভাব সংঘটিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষেই দেশীয় চিকিৎসার ভাগ্যে কিরূপ অসীম ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দেশের হিন্দুগণই বিচার করিবেন।

পরিশেষে আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের একমাত্র পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া পিতা পিতামহের গৌরব রক্ষা করুন, আর তাঁহার ভাগিনেয় কিরণচন্দ্রও যে মাতুল ও মাতামহের কীর্ত্তিরক্ষা

বিষয়ে কখনও উদাসীন হইবেন না, সে আশাও আমাদের বিলক্ষণ রূপ আছে।

সম্পাদক।

পুত্রশোকে সম্পাদক।

সকল বিষয়েই যদি লোককে ভুগিয়া ভুগিয়া ঠেকিয়া ঠকিয়া শিক্ষা পাইতে হয়, তবে ত দেখি, বড়ই গোলযোগের কথা; কেননা যখনই তুমি কোন একটী বিষয়ের মধ্যে পড়িবে, পড়িয়া তখনই তোমার চৈতন্য আসিবে, ঠেকিয়া তখনই তুমি শিক্ষা পাইবে। নচেৎ জ্ঞানবলে বা দর্শন-বলে বা অন্য কোন উপায়ে তোমার কি সে শিক্ষা ঘটিতে পারে না? যদি না পারে, তবে তুমি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া শিক্ষিত বলিয়া কোন্ সাহসে সাধারণের নিকট পরিচিত করিতে অধিকারী হও? লোকে কথায় বলে যিনি বিপন্ন না হইয়া, যিনি সুখের অধিকারী না হইয়াও নিজ অন্তরে সেই সেই সুখ দুঃখের ওজন ঠিক্ রাখিয়া তদনুরূপ চলিতে পারেন, এ সংসারে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ সুকবি, এ জগতে তিনিই যথার্থ মনুষ্য-পদবাচ্য। আর যিনি যখন যে বিপদে পড়েন, যখন যে সুখের অধিকারী হন্, তখনই সেই সেই সুখ দুঃখের প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া লন, তিনি প্রকৃত জ্ঞানী না হইলেও অবশ্য একবারে অজ্ঞান বা মূর্খ নহেন, সুতরাং তিনি মধ্যমপদ-বাচ্য। আর যিনি পদে পদেই ঠকিতেছেন, অথচ চৈতন্যের নাম মাত্রও নাই—সামান্য গবাশ্বাদি পশুর ন্যায় ক্ষেত্রপতির দারুণ প্রহার খাইয়াও আবার সেই কচি কচি ঘাসের জন্য লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া ছুটেন, তিনি অজ্ঞান, তিনিই মূর্খ, তিনিই এ সংসারে মনুষ্যজাতির অধমপদবাচ্য।

ঠিক্ এই হিসাবে ধরিতে গেলে বোধ হয় যেন এ জগতে প্রকৃত জ্ঞান-বানের সংখ্যা আদৌ নাই বলিলেও চলে। অথবা অন্যে সেরূপ জ্ঞানী

থাকিতে পারেন, থাকুন; আমরা কিন্তু সেরূপ জ্ঞানের কিছুমাত্রও অধি-কারী নহি। যে হেতু সংসারের সকলেই সেরূপ জ্ঞানী, সকলেই সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইলে এ জগৎ যে এতদিনে নিশ্চয়ই অচল হইয়া পড়িত। ঘোরতর দুঃখজনক, পশ্চাতে ভয়ানক তাপজনক জানিয়াও মানবজাতি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে না বলিয়াই মানবীয় ধর্ম্মও কোন কোন অংশে পশু ধর্ম্মের সহিত তুল্য হইয়া পড়ে। এবং সেই জন্যই মনুষ্য বিশেষে বা একবারে পশুর মধ্যে পর্য্যন্ত গণ্য হইয়া থাকে। আমা-দের জ্ঞানের সীমা যে কীদৃশ, দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপিও আমরা তাহা ঠিক্ স্থির করিয়া লইতে সমর্থ হই নাই। তবে এটুকু নিশ্চয় জানিয়াছি যে, আমরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাত্রও অধিকারী নহি। আমাদের জ্ঞানের সীমা তাদৃশ নাই বলিয়াই আজ্ আমরা পুত্রশোকের কথা তুলিয়া এস্থলে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত করিতেছি। অপুত্রক বা পুত্রশোক-বিরহিত পাঠক, হয়ত এ প্রবন্ধ পাঠে যথার্থই বিরক্ত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু যিনি আমাদের ন্যায় পুত্রশোকাতুর, এবার্ত্তা যাঁহার মরমে মরমে স্পর্শিয়াছে, তিনি এ সকল মর্ম্মকথা পাঠ করিয়া এ সকল প্রাণের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারুন, কিন্তু বিরক্ত যে হইবেন না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ ভরসা করিতে পারি।

লোকে কথায় বলে "বন্ধ্যানারী প্রসববেদনা বোঝে না"; "যার হয় সেই জানে"; "যার যায় সেই বুঝে" ইত্যাদি কথাগুলি ভাষা কথা হই-লেও প্রকৃতভাবার্থে যে বেদবেদান্ত সদৃশ, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আর অধিক বুঝাইতে হইবে না। ফল কথা, অবস্থায় না পড়িলে যে সহসা চৈতন্য আসে না, ইহা ইতি পূর্ব্বে মনে মনে কথঞ্চিৎ জানা থাকিলেও এখন অব-স্থায় পড়িয়া সে জ্ঞানটা যে কেমন পরিষ্কার রূপে জন্মিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এস্থলে সরল ভাবে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

লেখক যখন অবিবাহিত ছিলেন, তখন অন্যান্য বিবাহিত ব্যক্তির (দুঃখের ভাগ বাদ দিয়া) সুখ, স্বচ্ছন্দের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে কতই না ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিতেন। শেষটা যখন তিনি নিজেই আবার তাহাদের শ্রেণীভুক্ত হইলেন, তখনই ঠিক্

বুঝিলেন যে, বিবাহ জিনিষটা কি এবং তাহাতে আনন্দ কতদূর অসীম? লেখক যখন কপর্দ্দক-শূন্য ছিলেন, তখন ভাবিতেন যে, জগতে যাহার অর্থ আছে, সেই প্রকৃত সুখী; তারপর নিজে ক্রমশঃ যখন কপর্দ্দক হইতে শত ও শত হইতে সহস্রাধিক অর্থের অধিকারী হইলেন, তখনই যথার্থই বুঝিলেন যে, অর্থ জিনিষটা কি এবং অর্থবান্ লোক কিরূপ সুখী। সেইরূপ তিনি যখন অপুত্রক ছিলেন, তখন সেই অবস্থায় পুত্রবান্ লোকের হাব ভাব দেখিয়া কত কিনাই মনে ভাবিতেন। পুত্রাদির প্রতি অত্যাসক্তি দেখিয়া কত লোককে নির্ব্বোধ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কত মহাজন ব্যক্তিকে পুত্রাদির অসুস্থতা নিবন্ধন উদ্বিগ্ন হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কতই না অজ্ঞান বলিয়া স্থির করিতেন। তারপর নিজেই যখন পুত্রবান্ হইলেন, তখনই বুঝিলেন যে, হাঁ পুত্র কি জিনিষ; কিরূপ আদর করিলে কিরূপ ভাবে খাওয়াইলে পরাইলে কিরূপে রাখিলে তবেই পিতার তৃপ্তিজনক হইতে পারে। তখনই ঠিক্ বুঝিলেন যে, যাহাদের পুত্র আছে, এ জগতে তাহারা কিরূপ আশ্চর্য্য সৌভাগ্যশালী। কেবল তাহাই নহে, পুত্রবিয়োগে দারুণ শোকাতুর দেখিয়া কত কত পণ্ডিত ব্যক্তির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে সন্দেহ আনিতেও যিনি এক সময়ে কিছু মাত্রই সঙ্কুচিত হন্ নাই, কিন্তু আজ তাঁহারই পক্ষে সেই পরীক্ষার দিন উপস্থিত। পুত্র কি জিনিষ, তাহা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবিয়োগ যে কি নিদারুণ অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, তাহাও বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

পুত্রশোকে যাঁহাদের হৃদয় জরজর, পুত্র কন্যাগণকে বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা বুকে পাষাণ বাঁধিতে পারিয়াছেন, সেই সকল ধীরচিত্ত মহাত্মাদিগকে অবশ্য এস্থলে কোন কথাই বলিবার নাই, কোন কথাই বুঝাইবার নাই, তবে যাঁহারা অপুত্রক, কিম্বা পুত্রশোক-বিরহিত, তাঁহাদিগকেই দুই চারি কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এত বুঝাইবার কথা নয়, কাহাকে বলিবার কথাও নহে, কেননা এযে হৃদয়ের অন্তস্তলের কথা, যথার্থই প্রাণের ভিতরকার কথা, সুতরাং যথার্থ প্রাণের ভাব কি কখনও ভাষায় ব্যক্ত করিয়া কাহাকেও বুঝান যাইতে পারে? সুতরাং ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যকে বুঝান যায় না বলিয়াই প্রথমে ভূমিকায় অত কথা লিখিয়াছি।

সে যাহা হউক, অকালে প্রাণাধিক পুত্ররত্ন হারাইয়া প্রাণে গুরুতর আঘাত পাইয়া বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; মনের কথা খুলিয়া বলিলে লোকে হয় ত পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, কিন্তু বলে বলুক, উপহাস করে করুক, তথাপি কিন্তু বলিতেছি যে, পুত্ররত্নের অভাবে এ জীবনে যে অভাবনীয় অভাব ঘটিয়াছে,—হৃদয়ে শক্তিশেল সম যে সুদারুণ তীক্ষ্ণ শেল বিঁধিয়াছে, প্রকৃতই হৃদয়াভ্যন্তর যেরূপ একবারেই শূন্য হইয়া গিয়াছে, জানিনা এ নশ্বর পৃথিবীতে এ নশ্বর জীবনে এমন আর কি আছে, যাহা কখনও সে অভাব মোচন করিতে পারিবে? এমন আঘাত, এমন বেদনা আর কি আছে, যাহা সে আঘাতের অপেক্ষাও অধিক তীব্র হইতে পারে? যথার্থই এজগতে এমন ধন, এমন রত্ন, এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় কি আছে, যে রত্ন পুত্ররত্নের তুল্য হইতে পারে? সত্য সত্যই যে ধনে অধিকারী হইয়া লোকে পুত্রধনের বিষয় ভুলিয়া যাইতে পারে? লোকে কথায় বলে "শোক দুঃখাদি ক্ষণস্থায়ী; এমন শোক বা এমন দুঃখ এ সংসারে কিছুই নাই, যাহা আজীবন সতেজ থাকিয়া কষ্টদান করে; যাহা ক্রমশঃ কালের গর্ভে বিলীন না হয়"। ইহার উত্তরে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অন্য কোন রকমের শোক দুঃখে হয় ত সে কথা খাটিতে পারে, কিন্তু পুত্রশোকে সে কথা আদৌ গ্রাহ্য নহে। গ্রাহ্য যে নহে, সে বিষয়ে বিশিষ্টপ্রমাণও আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গের মৃতকবি মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন, সেই জন্যই গাইয়া গিয়াছেন:—

এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে
ইহার অধিক হতে, গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা!
সর্ব্বহর্ কাল্ তাহে, না পারে হরিতে!

মধুসূদন! তুমি এ শোক দুখসঙ্কুল অনিত্য-সংসার ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছ, সত্য বটে; কিন্তু তুমি যাহা রাখিয়া গিয়াছ, তুমি যাহা গাহিয়া গিয়াছ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বঙ্গভাষা কখনও তোমার সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

অথবা পুত্রশোকই হউক, আর এ জগতে যে কোনও প্রকারের দুঃখ-দারিদ্র্যই হউক, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবিচলিতচিত্তে তৎসমুদায় বহন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কেননা যিনি শোক-তাপাদিতে যিনি বিপদ-বিপত্তিতে যত অধিক উদ্বেজিত হইবেন, তিনিই এ সংসারে পদে পদে তত অধিক দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিবেনই করিবেন। আর যিনি যতই বুঝিয়া সুজিয়া সংযমী হইয়া দুঃখদারিদ্যাদি ভোগ করিবেন, তিনিই এ সংসারে তত অধিক সুখী হইতে পারিবেন। কেননা শোকদুঃখাদি হইতে যে কাহারও অব্যাহতি নাই। ফলতঃ সহ্য করাই সুখ, আর তাহার বিপরীতই দুঃখ। গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থেও এই শোকদুঃখাদি সহ্য করাইবার কথাই প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অতি জ্বলন্ত সত্য কথা যে, যাঁহারা যত অধিক সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারাই তত অধিক জ্ঞানী, তাঁহারাই তত অধিক লাভবান্ হইয়া থাকেন। আর যাহারা যতই অধীর হন্, তাঁহারা প্রকৃতই তত অধিক মুর্খ, তাঁহারাই তত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সুখ দুঃখের জ্ঞানী ও অজ্ঞানের পার্থক্য এইরূপ বুঝিতে পারিয়াই হিন্দীকবি তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যেঃ—

"দেহ ঘরেকো দণ্ড হ্যায়,
সব্ কাহুকোঁ হ্যাঁয়।
জ্ঞানী ভুগতে জ্ঞান্সে,
মূর্খ ভুগতে রোয়্॥"

অর্থাৎ দেহরূপ গৃহের দণ্ড (রোগ শোক ও দুঃখ দারিদ্র্যাদি) সকলকেই ভোগ করিতেই হইবে, তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বুঝিয়া অবিচলিত চিত্তে সেই দণ্ড ভোগ করেন, আর মূর্খ ব্যক্তিরাই অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শোক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

আহা! কি সুন্দর কবিত্ব!!

সম্পাদক।

রায় যতীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসা-সম্মিলনী।

আজ্ বড়ই আহ্লাদচিত্তে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসে উচ্ছাসিত হইয়া পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, মৃতপ্রায় চিকিৎসা-সম্মিলনীর মৃতপ্রাণে আবার নবজীবন প্রতিষ্ঠিত হইল। আট বৎসর পূর্ব্বে টাকীর সুবিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহোদয়ের অকপট অনুরাগে ও অসাধারণ দেশহিতৈষিতায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া যে সম্মিলনী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎকাল উত্তরোত্তর সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কালধর্ম্মে দেশীয় সাময়িক পত্রিকার চির প্রচলিত নিয়মানুসারে আজ্ তাহার সমূহ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে! যথার্থই সম্মিলনীর কণ্ঠাগত প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে! কিন্তু কেন? বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ সজ্জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যে সম্মিলনীকে গত আট বৎসর হইতে অতি আদরের সহিত স্থানদান করিয়া আসিতেছেন, দেশীয় রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত যে সম্মিলনীকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই, এমন কি, বিলাত প্রত্যাগত একান্ত ইংরাজীভক্ত ব্যক্তিগণও যে সম্মিলনীকে আদরের সহিত পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই; এ হেন সম্মি-লনীর এমন সহায় সম্পত্তি বর্ত্তমান থাকিতেও এতাদৃশ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কেন?

কারণ আর কিছুই নহে, এ হতভাগ্য দেশে হতভাগা মাতৃভাষায় লিখিত প্রায় কোন বিষয়ই চিরদিন সমাদৃত হয় না। সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দেশে স্বদেশের বলিয়া প্রায় কোন জিনিষেরই গৌরব নাই; স্বজন বলিয়া প্রায় কাহাকেই আদর করিতে জানে না; সে দেশে যে মাতৃভাষায় লিখিত সম্মিলনীর অবস্থা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা ত কোন মতেই সম্ভবে না।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা ইহাও বলিব যে, কেবল গ্রাহকপাঠক-গণের দোষেই সম্মিলনীর এহেন শোচনীয় দশা ঘটে নাই; পরিচালকদিগের দোষেও ইহার এইরূপ পতনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। প্রকৃতই দোষ একের নয়; দোষ উভয়েরই। উভয়দোষেই আজ্ সম্মিলনীর এহেন দুর্গতি ঘটিয়াছে। কেননা একদিকে যেমন গ্রাহকগণের বার্ষিক মুল্য প্রদান সম্বন্ধে

ক্রমশঃ ভয়ানক অমনোযোগিতা, পক্ষান্তরে সম্পাদক, পরিচালক ও লেখকগণেরও তেমনি ক্রমশিথিলতা আসিয়াই এ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

যে কারণেই হউক, রামেই মারুক, আর রাবণেই মারুক, এ যাত্রা কিন্তু সম্মিলনীর জীবনের আশা আমাদিগকে একবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। এত সাধের এত কষ্টের প্রতিপালিত সম্মিলনীর জীবন আর রাখিতে পারিলাম না ভাবিয়া প্রকৃতই আমরা আকুল হইয়া অন্ধকার দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু ভগবানের কৃপায় ও রায় যতীন্দ্রনাথের একমাত্র অনুগ্রহে আজ্ সে অন্ধকার দূর হইয়াছে। গোড়ায় যাঁহার একমাত্র অর্থবলে ও জলন্ত উৎসাহবাক্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাঁহার সদাশয়তা ও জ্ঞানস্পৃহাবশতই এতদিন ইহার প্রচার হইয়া আসিয়াছে, সেই যতীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতে—প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক বিদ্যমান্ থাকিতে তাঁহার স্ব-রোপিত তরু শুকাইয়া যাইবে, ইহাও কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

এই কারণেই সম্মিলনীর এহেন শোচনীয় দশা দূরীকরণে যতীন্দ্র বাবু আবার অধিকতর উৎসাহে ও অধিকতর অনুরাগের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। সম্মিলনী যাহাতে পূর্ব্ব গৌরবে প্রকাশিত হয়, তন্নিমিত্ত তিনি বিশেষ রূপে মনোযোগী হইয়াছেন। আর আমরাও তাঁহার এই অধিকতর উৎসাহ ও অধিকতর অনুরাগকে আমাদের পক্ষে সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিয়া অগণ্যধন্যবাদের সহিত আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। পরিশেষে গ্রাহকবর্গের নিকট একটী মাত্র প্রার্থনা এই যে, প্রতিষ্ঠাতা যেরূপ উৎসাহ, যেরূপ অনুরাগে পরিচালিত হইয়াছেন, আশা করি যে, সম্মিলনীর উন্নতির পক্ষে গ্রাহকগণও সেই উৎসাহের সেইরূপ অনুরাগের অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সম্পাদক।

মৃগনাভি মৃত শরীরে জীবন দান করে।

বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের সৃষ্ট অসংখ্য পদার্থের মধ্যে কখন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা যে কি সুমহান্ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষেই মানববুদ্ধির

অগম্য। যথার্থই এ সকল দ্রব্য-মাহাত্ম্য, মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, অন্তঃকরণ প্রকৃতই আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

সংপ্রতি কিছুদিন অতীত হইল, আমরা মৃগনাভি প্রয়োগে এমন একটী রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে দেখিয়াছি, যাহা কল্পনাতে আনিলেও হয়ত তাহাতে বিশ্বাস আনিতে সাহস হয় না। সুতরাং যাহা কল্পনায় অবিশ্বাস জন্মে, আজ্ আমরা তৎসম্বন্ধে একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা আমাদের পাঠকবর্গের বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিব।

ঠিক্ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে দুইটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহিত আমি বাহিরের রকের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় আন্দাজ ৩ বৎসর বয়স্ক একটী ওলাউঠাগ্রস্ত মৃতপ্রায় শিশুকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিতা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় আসিয়া কহিল, মহাশয়, গতকল্য বৈকালে ৫টার সময় প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর ওলাউঠা হয়, আমি নিতান্ত গরিব হইয়াও সকলের পরামর্শে সুবিখ্যাত হোঃ পেঃ ডাক্তার——অমুককে লইয়া আসি। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে রাত্রি ৮টা না বাজিতেই পুত্রটীর মৃত্যু হয়। তৎপরে রাত্রি ১০টার সময়েই আমার স্ত্রীও উক্তরোগে আক্রান্ত হয়। তাহাতেও আমি অনিচ্ছাস্বত্ত্বে সকলের পরামর্শে ও উত্তেজনায় আমার যাহা কিছু থালা ঘটী ইত্যাদি ছিল, তৎসমস্তই বিক্রয় করিয়া উপরোক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়কে আনয়ন করি। কিন্তু আমার অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, রাত্রি প্রভাতি হইতে না হইতেই স্ত্রীরও জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। অপরন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটীও উহার পাড়িতা মাতার স্তনপান করিতে করিতে উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

ইহাতে আমি বলিলাম, ৩।৪ বার দাস্ত ও বমি হওয়াতেই যখন বালকটী এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ উহার নাড়ীও যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন আর উহার বাঁচিবার আশা মাদৌ নাই। বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরে কবিরাজের নিকট যখন কেহই ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা করায় না, তখন তুমিও বাপু, বালকের চিকিৎসার ভার আমার উপর না দিয়া অন্য কোনও ডাক্তারের নিকট লইয়া যাও। ইহাতে বালকের পিতা আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, কবিরাজ মহাশয়! আমার আর

এক কপর্দ্দকও নাই! যাহা কিছু ঘরে দ্রব্যাদি ছিল, তাহা সমস্তই গতকল্য বাঁধা দিয়া ৪।৫ বার ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধের দাম দিয়াছি। বিশেষত ডাক্তারের বাটীতে লইয়া গেলেও এখন নগদ ঔষধের দাম দিতে হইবে, কিন্তু সে ক্ষমতাও যে আর আমার নাই। এই বলিয়া সে আমাকে ঔষধ দেওয়ার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। অগত্যা তাহার হাত এড়াইতে না পারিয়া আমি বালকটীকে আমাদের মহাগন্ধক প্রভৃতি ধারক, অগ্নিদীপক ও জীর্ণকারক তিনটা ঔষধ সেবন করিতে দিয়া তখন তাহাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬ বার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও তাহার কিছু মাত্রই উপকার দর্শিল না। দাস্ত বা বমি ত বন্ধ হইলই না, অপরন্তু বালকটী সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া শেষটা কেবল পুনঃ পুনঃ হাঁ করিতে লাগিল। এবং তৃষ্ণাজ্ঞানে যত বরফজল তাহার মুখে দেওয়া হইতে লাগিল, ততই বমির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে ঔষধের দ্বারা বিন্দুমাত্রও উপকার না পাইয়া এবং বালকটীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অবশেষে একটু অধিক মাত্রায় অহিফেণ ঘটিত ঔষধ প্রদান করিলাম। যখন অহিফেণের ঔষধ তাহাকে খাওয়ান হইল, তখন বেলা ৩টা হইবেক। ক্রমান্বয়ে ৪।৫ বার পুনঃ পুনঃ অহিফেণ-ঘটিত ঔষধ দেওয়াতে অবিলম্বেই বালকটীর দাস্ত ও বমি একবারেই বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু দারুণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, ২ ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই তাহার উদর ভয়ানক ফুলিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসেরও পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইল, সন্ধ্যার পর রোগীকে গিয়া দেখিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির। ভাবিলাম—আহা! সাধ করিয়া অহিফেণ দিয়া বালকটীকে মারিয়া ফেলিলাম, যে হেতু ইহার যে আর মরিতে বিলম্ব নাই। বস্তুত বালকের তখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত যে, যে কেহ তাহাকে দেখিতেছে, সেই তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় জানিয়া দুঃখ করিতেছে।

পরদিন প্রাতে শিশুর পিতা আসিয়া আমাকে যে সংবাদ দিল, সে সংবাদটা যেন কৌতূহলজনক। সে বলিল—বালকটী রাত্রিতে সেইরূপ পেটফুলা ও শ্বাস পীড়িত থাকিয়া এখন মরে তখন মরে অবস্থায় প্রায় রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল, অন্দাজ ৪টার সময় হইতে পুনর্ব্বার ২।৩ বার ভয়ানক পাতলা

চাউল ধোয়ার জলের ন্যায় দাস্ত হইয়া এখন যদিও পেটফুলা ও শ্বাসের ন্যায় ভাব দূর হইয়াছে, কিন্তু এখন সে প্রকৃতই জীবিত, কি মৃত, তাহা আমরা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না। শুনিবামাত্রেই আমি তৎক্ষণাৎ বালকটিকে গিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা শুনুন।

বালকটীর শরীর ঠিক্ যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, চক্ষু দুইটী একেবারেই অন্তর্নিবিষ্ট, শরীরের সমুদায় চর্ম্ম এমত শক্ত হইয়াছে যে, স্পর্শে ঠিক্ মৃতব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়, চৈতন্যের লেশমাত্রও নাই, হাত ধরিয়া দেখিলাম, নাড়ীর স্পন্দন আদৌ লক্ষিত হয় না, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি খুব্ মনঃসংযোগ করিলে অল্প পরিমাণ বোধ হয়। মোটের উপর আকৃতিপ্রকৃতিতে শিশুকে মৃত সদৃশ বলিয়া বোধ হইলেও অবশ্য তাহার প্রাণবায়ু যে তখনও দেহ হইতে পলায়ন করে নাই, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা গেল। অপরন্তু ঠিক্ এই সময়ই বালকটী বোধ হয় পিপাসাজন্য অত্যল্প হাঁ করিল, তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধ ঝিনুক বরফজল মুখে দেওয়া গেল, কিন্তু সে জল গিলিল কি না, তাহা বোঝা গেল না। তবে খানিক পরে আবার হাঁ করাতে বোঝা গেল যে, বালক জল গিলিয়াছে।

ঠিক্ এই সময়েই আমার সহসা মনে হইল যে, মৃগনাভিই এ অবস্থায় মহৌষধ হইতে পারে। কেননা এখন পেটফুলা নাই, নাড়ীর স্পন্দনও অনুভূত হয় না। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় অর্থাৎ সচরাচর যুবকদিগকে আমরা যে মাত্রায় মৃগনাভি সেবন করিতে দিই, ঠিক্ সেই মাত্রাতেই অর্থাৎ ১ রতির কম নহে, শিশুকে কেবল বিশুদ্ধ মৃগনাভী তিন পুরিয়া এক ঘণ্টান্তর তিনবার সেবন করিবার জন্য বলিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

দ্রব্যের এমনই মহাত্ম্য যে, ভগবানের কৃপায় তাহার এক মোড়া মৃগনাভি বালকের উদরস্থ হওয়ায় এক ঘণ্টা মধ্যেই যে কি অসাধারণ আশ্চর্য্য ফল দর্শিল, কিরূপে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল, তাহা শুনিলে প্রকৃতই শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। পিতা আসিয়া কহিল মহাশয়, ঈশ্বর বুঝি এ যাত্রা আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলেন। যেহেতু তাহার শরীর একটু গরম হইয়াছে, মিটমিট করিয়া চক্ষু চাহিতেছে

ও চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ লালবর্ণ হইয়াছে, আর একটু আধটু হাত পাও নাড়িতেছে। আমি তাহার কথা শুনিয়া প্রকৃতই চম্‌কিয়া উঠিলাম, যেন যথার্থই স্বর্গের চাঁদ হাতের মধ্যে প্রাপ্ত হইলাম। অথবা এরূপ স্থলে এ শ্রেণীর আনন্দ যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ঠিক বুঝিবেন যে, সেস্থলে আমার অন্তঃকরণে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, পুনর্ব্বার ১ মোড়া মৃগনাভি তৎক্ষণাৎ সেবন করাইতে বলিয়া তাহাকে তখন বিদায় দিলাম, এবং বৈকালে ৩টার সময় স্বয়ং গিয়া দেখিলাম যে, বালকটী যথার্থই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, মোটের উপর যতকিছু কুলক্ষণ, প্রায় তাহার সমস্ত গুলিই তখন দূর হইয়া গিয়াছে। কেবল তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল এই মাত্র। সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার আর একমোড়া মৃগনাভি সেবন করিতে দিতে বলিলাম। যদিও ঐ দিনের শেষরাত্রিতে আর ২ বার দাস্ত হওয়াতে বালকটীর অবস্থা কিঞ্চিৎ মন্দ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরদিন প্রাতে আবার মৃগনাভি দেওয়াতেই সেটুকু তৎক্ষণাৎ দূর হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমশঃ অল্প মাত্রায় ক্রমাগত ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া অত্যল্প মাত্রায় মৃগনাভি দিতে দিতে প্রায় ৫।৬ দিনের মধ্যেই বালকটী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া মৃগনাভির অপার মহিমা ঘোষিত করিয়া ছিল।

মৃগনাভির এইরূপ-অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়াই আমাদের দেশের ধনবানেরা পরোপকারের জন্য নিজ নিজ গৃহে সর্ব্বদাই প্রচুর মৃগনাভির সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন; কিন্তু হায়, সে দিন আর নাই, প্রকৃত পক্ষেই সে রামও আর নাই, সে অযোধ্যাও আর নাই, সুতরাং সে নিঃস্বার্থ পরোপকার-রত ধনীও আর নাই, সেরূপ অকৃত্রিম মৃগনাভিও আর দেখা যায় না। কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় এখন ষোলকড়াই কাণা, সবই ঝুঁটো, কেবল বাহ্যিক চাক্‌চিক্যই এখনকার দিনে সার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে এহেন উপকারী মৃগনাভি ও পুরাতন ঘৃতাদির স্থান এখন বিলাতি ব্রাণ্ডিই অধিকার করিয়া বসিয়াছে! কেমন নয় কি?

সম্পাদক।

শিশুদিগের যকৃতের বিলিয়ারী সিরোসিস্।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণধন বসু এম্, বি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

গতবারে বলিয়াছি যে, দরিদ্রদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নাই, অর্থাৎ যে শিশুরা গাভী-দুগ্ধের উপর নির্ভর করে না, তাহারা ইহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের দুইটী উত্তর সম্ভব। ১ম—হয়ত দুগ্ধের সহিত যকৃতের ক্রিয়া-বিরোধী কোন বস্তু মিশ্রিত থাকে। ২য়—হয়ত শিশুর পাচক-শক্তির অতিরিক্ত দুগ্ধ তাহাকে পান করান হয়। প্রকৃত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই দুইটী কারণেরই অস্তিত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

১ম। গাভী-দুগ্ধের বিশুদ্ধিহীনতা—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। কলিকাতায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ কিরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা সকলেই জানেন। গোপ-মহাত্মারা সচরাচর যে সামগ্রীকে দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করেন, তাহার সহিত প্রকৃত গাভী দুগ্ধের কি সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতে গেলে অঙ্ক-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা আবশ্যক। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া ঘন করিবার জন্য ময়দা, চালের গুঁড়া, পানফলের গুঁড়া, বার্তাসার গুঁড়া ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রীর সহায়তা অবলম্বন করে। আমরা সকলেই জানি যে, শিশুদের পক্ষে ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটীই অপকারক। ময়দা, চালের গুঁড়া, পানফলের গুঁড়া কেবল ষ্টার্চ সম্বলিত। ষ্টার্চ উত্তমরূপে সিদ্ধ না হইলে অর্থাৎ ইহার কোষ (Cells) সমূহের আবরক-ঝিল্লি (Capsule) অগ্ন্যুত্তাপে সম্পূর্ণ না ফাটিয়া গেলে, পাকস্থলী ও ইণ্টেষ্টাইনের উত্তেজনা (Irritation) উৎপন্ন করে; এইরূপে পাকস্থলীতে ও ইণ্টেষ্টাইনে কতকগুলি ডাইজেষ্টিভ ইরিট্যাণ্ট (Digestive irritant) জাত হয়, যদ্দ্বারা শিশু-যকৃতের রক্তাধিক্য (Congestion) ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। ইহা (Congestion) হইতে ক্রমশঃ বিবর্দ্ধন (Enlargement) ও কিছুকাল পরে সিরোসিস (Cirrhosis) আসিয়া পড়ে। মফঃস্বলে বিশুদ্ধ গাভীদুগ্ধ সহজে পাওয়া যায়, এজন্য সেখানে এ রোগ বড় একটা দেখা যায় না। গাভীদুগ্ধের দুর্মূ-

ল্যতা-হেতু দরিদ্রদের শিশুরা মাতৃ দুগ্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—এজন্য তাহাদের মধ্যে এ রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

২য়। পাচক শক্তির অতিরিক্ত দুগ্ধপান করান। একে ত কলিকাতায় দুগ্ধের এইরূপ অবস্থা, তাহাতে আবার যদি সেই দুগ্ধ অতিরিক্ত পরিমাণে পান করান হয়, তাহা হইলে শিশুদের কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা আমার বলিবার আবশ্যক নাই। আর এরূপ যে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, তাহাও আমি উল্লেখ করিতে চাহি না। শিশু পরিপাক করিতে পারুক বা নাই পারুক, প্রত্যহ তাহাকে সেই অমৃতসম দুগ্ধ একসের বা ততোধিক খাওয়াইতেই হইবে। "অমুকের ছেলে ১৷৷০ সের খায়, আমার ছেলে কেন কম খাইবে" একথা আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ছেলে হয়ত দুধ খাইয়া ক্রমাগত বমন করিতেছে অথবা অজীর্ণ-জনিত বায়ুতে তাহার পাকস্থলী ও অন্ত্র পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু মাতার সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি সন্তানের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুগ্ধের পরিমাণ কিছুমাত্র কমাইবেন না। অবশেষে যখন চিকিৎসকের মুখে শুনেন যে, সন্তানের "লিবারের" সূত্রপাত হইয়াছে, তখন পা ছড়াইয়া বসিয়া ক্রন্দন ও নিজ অদৃষ্টকে মিষ্টসম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠকগণ, এ চিত্রটীকে অমূলক ভাবিবেন না, আমি এরূপ ঘটনা অনেক বার দেখিয়াছি।

কেহ কেহ ইঁহাকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার সহিত যে ইহার কোন সংস্রব নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—ম্যালেরিয়াজনিত লিভারের বিবর্দ্ধনের পূর্ব্বে স্পষ্ট জ্বর হইয়া থাকে। দুই তিনবার বা ততোধিক প্রবল জ্বরের পরে লিভারের বিবর্দ্ধন লক্ষিত হয়। কিন্তু এ লিভারের বিবর্দ্ধনের পূর্ব্বে যে জ্বর হয়, তাহা অতি সামান্য; এমন কি জ্বর হয় কি না, শিশুর পিতা মাতা অনেক সময় তাহা বলিতে পারেন না। কেবল ক্ষুধামান্দ্য ও বমন এই দুই লক্ষণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই দেখিতে পান না। দ্বিতীয়তঃ ম্যালেরিয়াতে প্রায়ই লিভারের পূর্ব্বে প্লীহার বিবর্দ্ধন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ রোগে উহা অনেক পরে প্রতীয়মান হয়। এমন কি লিভারের সঙ্কোচ আরম্ভ না হইলে এ লক্ষণটী অনেক সময় লক্ষিত হয় না। তৃতীয়তঃ—ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে ইহার বড় একটা প্রাদুর্ভাব

নাই। আমি মফঃস্বলের অনেক চিকিৎসককে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাঁহারা সকলেই বলেন যে, এ রোগ তাহাদের পক্ষে নূতন।

(গতবারে একটী ভুল করিয়াছিলাম। ভূমিমধ্যস্থিত পয়োনালীর সহিত এ রোগের সম্বন্ধের কথা ডাঃ ক্রম্বী (Dr. Crombie) লিখিয়াছেন—ডাঃ গিবন্স (Dr. Gibbons) নহেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের (Medical Anuual) মেডিক্যাল এনুয়ালের ৩২৪-৩২৫ পৃষ্ঠা দেখ। ভিষক্‌দর্পণ। ক্রমশঃ—

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধলেখক যতদূর সাধ্য, বুদ্ধি বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত যে উপরোক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধটী পড়িবামাত্রেই বেশ বোঝা যায়। জানি না শিশুগণের যকৃতের পীড়া উৎপত্তির ও মৃত্যুর পক্ষে উপরোক্ত কারণগুলি ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? ফলতঃ লেখকের ঐ সকল কথায় আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কেননা আমরা যে এবিষয়ে ভুক্তভোগী হইয়া বিলক্ষণরূপেই শিক্ষা পাইয়াছি। সম্পাদক।

মূলে ভুল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তারপর কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষাদ্বারা কিরূপে জ্বর ও মৃত্যু পরীক্ষা হয় তাহার আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু এই আলোচনায় প্রায় প্রতি শ্লোকের শেষ ভাগে ডাক্তারী তাপমান যন্ত্রের নামে একটী করিয়া খোঁচা আছে। এই খোঁচার তাৎপর্য্য কি? পরন্তু জিদ বজায় করিতে গিয়া গন্তব্য পথের বাহিরে যাওয়া উচিত নহে। তাপমান যন্ত্র শরীরের উত্তাপ পরীক্ষার যন্ত্র, ধাতু পরীক্ষার যন্ত্র নহে। অতএব ঐ দুই বিসদৃশ এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস তুলনা হইতে পারে না। এই নাড়ীতত্ত্বে যত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একটীতেও ত উত্তাপ পরীক্ষার কথা নাই? থাকিবেই বা কেন? উত্তাপ পরীক্ষা আধুনিক ডাক্তারীমতের নূতন আবিষ্ক্রিয়া। কবিরাজীমতে সূক্ষ্মরূপে উত্তাপ পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। ঐ মত ও শাস্ত্র আলাদা। হাত দিয়া নাড়ী দেখিয়া কখন উত্তাপ ঠিক করিয়া বলা যায়? কখনই না। যখন শাস্ত্র আলাহিদা, মত আলাহিদা, চিকিৎসা পদ্ধতি আলাহিদা, তখন বিবাদ বিসম্বাদ তর্কে বিতর্কে কি প্রয়োজন? তবে কোন শাস্ত্রে ভুল

থাকিলে তাহার সংশোধন করিতে পারেন। আপনি আপনার উদ্ধৃত বচনের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলেন, আমি ত আপনার উদ্ধৃত কোন বচনেই উত্তাপ পরীক্ষার ব্যাপার জানিতে পারিলাম না; অতএব আমার যাহা লইয়া কায, যাহা নইলে আমার চিকিৎসা ব্যবসা চলে না, তাহা আমি কবিরাজী গ্রন্থে পাইলাম কৈ? আপনারা বলেন আমার সংশয় নিরাকরণ প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছি যে, কবিরাজী অপেক্ষা ডাক্তারী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধটী আলোচনা করিয়া দেখিলাম এমন ভাব কোথাও নাই। তবে এই মাত্র বলিয়াছি যে, উত্তাপ পরীক্ষা অথবা উত্তাপের সূক্ষ্মতা কবিরাজ মহাশয়রা হাত দেখিয়া ঠিক করিয়া কখনই বলিতে পারেন না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের চিকিৎসা কার্য্যের ক্ষতি হয় না, যেহেতু কবিরাজী শাস্ত্রে বায়ু পিত্ত কফ অনুসারে চিকিৎসা, উত্তাপানুসারে নহে। বটেই ত, তাহা যদি না হইবে, যদি এই পার্থক্য স্বীকার না করেন, তবে ত ডাক্তারী ও কবিরাজীকে এক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়! তাহা হইলে ত ডাক্তারি শাস্ত্র কবিরাজীশাস্ত্রের শাখামাত্র। তবে আর কবিরাজী মত, ডাক্তারী মত বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন; দুই মত এক করিয়া লন না কেন? কবিরাজ মহাশয় ধাতুব্যাখ্যা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "পীড়িতাবস্থায় ডাক্তারগণ রোগ পরীক্ষা করিতে আসিয়া শরীরে বিলাতি তাপমান যন্ত্র লাগাইয়া এই এত অংশ ডিগ্রী হইল, এই এত অংশ ডিস্‌মিস্ হইল ইত্যাদি বলিয়া হতভাগ্য বাবুদিগকে মোহিত করিয়া থাকেন, আবার অবস্থাভেদে সময় সময় এরূপও দেখা যায় যে, প্রতিবারেই ডাক্তার বাবু এই যন্ত্রদ্বারা রোগ ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়া যান কিন্তু তত্রাপি রোগীর জীবনরক্ষা হয় না"। কবিরাজ মহাশয়ের থার্‌মমিটার সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণা থাকায় এবং তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হওয়ায় আমি সংশয় নিরাকরণ নাম দিয়া একটী প্রবন্ধে তাপমান যন্ত্রের ব্যাপারটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে কবিরাজী শাস্ত্রের প্রতি কোনরূপ কুটিল কটাক্ষ নাই। আমি ত উদারভাবে গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, জ্বর চিকিৎসায় কবিরাজ ডাক্তারের সমান অধিকার, তবে শাস্ত্র ও মত পৃথক্। আচ্ছা, ডাক্তারগণ ত সময় সময় রোগ ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়া যান অথচ রোগীর জীবন রক্ষা হয় না। আর কবিরাজ মহাশয়রা কি একমাত্র হাত ধরিয়া মরা বাঁচার কথা সকল সময় ঠিক করিয়া

বলিতে পারেন?. নাড়ী পরীক্ষায় কি ভ্রম হয় না? পুস্তকের কথা এবং পরহস্তগতধন সমান কথা। এই যে আছে, "মন্দং মন্দং শিথিলং শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলম্বা" ইহাতে শিথিলভাব অর্থাৎ স্খলিতভাব বা কাহাকে বলে? এবং নাড়ীর ব্যাকুলভাব বা কাহাকে বলে? অথবা কবিরাজ মহাশয় নিজে যাহা বোঝেন নাই, তাহা পরকে বোঝাইবেন কি প্রকারে? ঢেকির পাড় পড়ার শব্দ কেহ বা ঢেকুচ্ কুচ্, কেহ বা কেকুর্ কুচ্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু ঢেকির শব্দ হেঁকুচ্ কুচ্ কি কেঁকুচ্ কুচ্. যিনি ঢেকির শব্দ স্বকর্ণে না শুনিয়াছেন তিনি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী পরীক্ষার শ্লোকগুলি ঐ ঢেকির কচ্ কচিতে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যুজ্জ্যোতির ন্যায় নাড়ী স্পন্দনে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল গতি অথবা সর্পাকার গতি, কি নাড়ীর চক্ষের নিমিষে উদয় ও অন্তর্ধান বুঝিব! আর ভ্রমর যেমন পক্ষসঞ্চালন করিয়া উড়িয়া যায়, আবার আসিয়া বসে এস্থলে কি নাড়ীর পুনঃ পুনঃ অন্তর্ধান ও আবির্ভাব বুঝিব না ইহার মধ্যে আর কোন গূঢ়ভাব নিহিত আছে? এই সকল বিষয় যাঁহারা বুঝাইতে পারিতেন সে সকল গুরু বহুকাল গত হইয়াছেন।

কিন্তু এই ধাতু পরীক্ষা বিষয়ে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কবিরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রও ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ঘটিত ধাতু পরীক্ষা বিষয়ে আমাদিগের একটী বিষম খট্‌কা বাধিয়াছে। যে রোগীর ধাত এক বারেই নাই অর্থাৎ মণিবন্ধের নিকট তর্জ্জনী অনামিকা মধ্যমাদ্বারা যেখানে ধাত পাওয়া যায় না, সে রোগীর বাঁচা মরা কেমন করিয়া ধাত পরীক্ষায় স্থির হইবে। কিন্তু অধুনা চিকিৎসার গুণে অনেক ধাতছাড়া রোগী (অবশ্য জ্বর ওলাউঠা প্রভৃতিতে) যে সচরাচর বাঁচিয়া যাইতেছে, তাহার কি? তর্জ্জনীতে ধাত উপলব্ধির অভাব কি ধাতের মোটেই অভাব অপেক্ষা অধিকতর বিপদব্যঞ্জক? পরন্তু এই যে তর্জ্জনী মধ্যমা ঘটিত নাড়ী পরীক্ষা ব্যাপার, ইহা ভাল ভাল প্রামাণিক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আছে কি না জানি না। থাকিলেও কবিরাজী চিকিৎসার উন্নতি সহকারে উহার কার্য্যকারিতা বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্লোকগুলি একত্র করিলে এইমাত্র সত্য উপলব্ধি হয় যে, নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্ব্বল হইলে বা স্পষ্টরূপে স্পন্দিত না হইলে রোগীর জীবনের আশা কম। কিন্তু ধাত ছাড়িয়া গেলেও যখন ঔষধের

দ্বারা বা স্থলবিশেষে আপনা আপনি ধাত আসিয়া থাকে এবং ছিন্নভিন্ন নাড়ীও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে, তখন আর কেমন করিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অমুকরোগী দুই ঘণ্টামধ্যে বা ঠিক ২৪ ঘণ্টার পর মরিবেই মরিবে। যখন একবারেই ধাতছাড়া রোগী বাঁচিয়া উঠিতে পারে, তখন "সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্ বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা, প্রহরাচ্চ বহির্মৃত্যুর্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ" বচনের মাহাত্ম্য থাকে কই? পরন্তু উপরোক্ত কতকগুলি বচন সত্য হইলেও ইহাতে তৎকালোচিত বহুদর্শনজনিত অনুমান ভিন্ন অপরিবর্ত্তনশীল স্থির মীমাংসা নাই; কারণ চিকিৎসা শাস্ত্র ও লোকের আয়ু পরিবর্ত্তনশীল। কবিরাজদিগের সূচিকাভরণ, কি মহালক্ষ্মীবিলাস, হলাহল ও ডাক্তারদিগের ব্রাণ্ডি এমনিয়া প্রভৃতি হৃদয়ের ক্রিয়ার উত্তেজক ঔষধগুলি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে ঐ বচনগুলির মাহাত্ম্য ছিল, এক্ষণে ধাতের দুর্ব্বলাবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে বাঁচাইতে না পারিলেও ঔষধদ্বারা মৃত্যুকালের এক আধ বেলা ইতরবিশেষ করিতে পারা যায়। যখন ধাতের স্পন্দন হৃদয়ের সংকোচন ও প্রসারণের প্রতি শব্দমাত্র, তখন নাড়ীর দুর্ব্বলতা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক সুতরাং হৃদয়ের উপর প্রবল ক্রিয়া দর্শাইতে পারে এমন ঔষধ ব্যবহারে মৃত্যু-কালের ইতরবিশেষ হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে একবারেই রোগীকে প্রকৃতিস্থ করা যাইতে পারে। সর্পবিষ, ডিজিট্যালিস্, এমনিয়া, ঈথর এবং মদিরা এইরূপ ঔষধ।

অমুক রোগ হইলে রোগী বাঁচিবে না এ কথা বলা গেলেও ঠিক মৃত্যুকাল নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। বরঞ্চ চেষ্টা করিলে রোগী অবধারিত মরিলেও তাহাকে এক আধ বেলা বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদা-চার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্যা যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ। যদি মনুষ্য হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় মৃত্যুর দিন প্রহর ঘণ্টামিনিট স্থির করিয়া বলা যাইতে পারিত, তবে আর আর্য্যগণ বলিবেন কেন যে, যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণ তাবৎ চিকিৎসা করিবে।

অগ্রহায়ণ ১২৯৮ } শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবুর লিখিত উপস্থিত প্রবন্ধের উপর আমাদের এমন অনেক কথা বলিবার আছে, যাহাতে কোন কোন কথায় তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ

মিল আছে। আবার কোন কোন কথায় আমরা আদৌ অনুমোদন করিতে পারি না। যাহা হউক, সে সকল কথা আর এরূপ মন্তব্যের মধ্যে না লিখিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের লিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করিব। সম্পাদক।

মূলে ভুল কিপ্রকারে বলি?

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পাবনার অন্তঃপাতী সাঁড়াসীয়া গ্রামে দেবনাথ কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি আছে। প্রতিবৎসর তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিতে সাতিশয় যন্ত্রনা পাইয়া থাকে। কোন বার মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হয়, কোন বার বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই অমনি মরিয়া যায়। আবার কোন কোন বার গর্ভপাতও হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহাকে এক প্রকার পীড়া কহে এই পীড়ার নাম পুত্রঘ্নী (Habitual aborition)। কয়েক মাস হইল হতভাগ্য কর্ম্মকারপত্নী আবার প্রসব বেদনায় ক্রমাগত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। অবশেষে সন্তানের এক খানি হস্ত বহির্গত হওয়ায় ডাক্তারগণ মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, প্রসবদ্বার অপেক্ষা সন্তানের মস্তক অস্বাভাবিক বড় হইয়াছে সুতরাং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারিতেছে না। এক্ষণে অস্ত্র প্রয়োগ ভিন্ন আর উপায় নাই। যতই কালবিলম্ব হইবে, ততই প্রসূতির জীবিতকাল পর্য্যবসিত হইবে, এই কথা শুনিয়া কর্ম্মকারের মুখ শুখাইয়া গেল এবং "আপনারা কিছুকাল অপেক্ষা করেন, বলিয়া নিকটস্থ চর সাঁড়াসীয়া নামক কোন মুসলমান পল্লী হইতে এক জন দেশীয় অশিক্ষিতা ধাত্রী লইয়া আসিল। সেই ধাত্রী প্রথমে গর্ভিণীর অবস্থা এবং গর্ভের লক্ষণাদি উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ মুখ-মুচ্‌কিয়া হাসিল। অবশেষে গর্ভিণীর মস্তকে কিঞ্চিৎ সিজের আটা নিক্ষেপ করিয়া অবিরত গর্ভ টিপিতে লাগিল এবং এবং প্রসবদ্বারে যতদূর পর্য্যন্ত হস্ত প্রবেশ করিতে পারে ততদূর প্রবেশ করাইয়া দণ্ডকালাভ্যন্তরে মৃত সন্তান প্রসব করাইয়া দিল। সন্তানটী ভূমিষ্ট হইয়া গেলে যখন প্রসূতি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল, সেই সময় সেই ধাত্রী কহিয়াছিল "যদি সন্তানের হস্ত বাহির হইবার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিতেন তাহাহইলে বোধ হয় আমি সজীব সন্তান প্রসব করা-

ইতে পারিতাম। এক্ষণে প্রসূতি খালাস হইল বটে কিন্তু কিছু দিন তাহাকে অবশ্যই কষ্ট পাইতে হইবে। সেই প্রসূতি এপর্য্যন্তও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। এক্ষণে যদি সেই ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কি প্রকারে সন্তানকে সোজা করাইয়া প্রসব করাইলে? তাহা হইলে সে আধুনিক বিজ্ঞানানুযায়ী কোন কথারই উত্তর দিতে পারিবে না; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বিলক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। এস্থলে ডাক্তারদিগের কল্পনাকে ভুল না বলিয়া আর কি বলিব? প্রসব সম্বন্ধে সময় সময় যে সকল কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা নিতান্ত অশ্লীল এবং অসম্ভব, তজ্জন্যই মৎপ্রণীত ধাত্রীবিদ্যায় তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই। যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহাই অশ্লীল বলিয়া সময় সময় দুই এক জনে দুই এক কথা কহিয়া থাকেন। লিস্‌ম্যান্ প্রভৃতির ধাত্রীবিদ্যায় যে ভাবে সমুদয় কথা বর্ণিত আছে, তাহা অবগত হইয়া সময়ান্তরে আমাদের কথাও আমি প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। উপরে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইল, ঐরূপ আরও অনেক ঘটনার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ঘটনার কথা আন্দোলন করিয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করায় কোনও ফল নাই। এক্ষণে রমণীর স্বপ্নদোষ, ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত এবং হংসীর ডিম্ব প্রসব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

গর্ভোৎপত্তি প্রবন্ধে দুইটী স্ত্রীলোকদ্বারা গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাই উল্লেখ করিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনচন্দ্র সান্যাল কহিয়াছেন, "শীলা জলে ভাসি যায় বানরেতে গীত গায় তবুও কি এই কথা হইবে প্রত্যয়?" তিনি আরও কহিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত নহে, উহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত করিতে হইলে উহা হইতে কতক অংশ বাদ দিয়া এবং উহাতে কতক অংশ নূতন সংযোজনা করিয়া নূতন ধরণে রচনা করিতে হইবে। তাহা না হইলে অধুনিক শিক্ষিত লোকে আয়ুর্ব্বেদকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না।" এস্থলে আমাদিগের অনেক কথা বক্তব্য আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে একটী উপসর্গ বা অব্যয় শব্দও বিনা কারণে লিখিত হয় নাই। সুতরাং তাহা হইতে কোন কথাই বাদ যাইতে পারে না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিজ্ঞান শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অধুনা একটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সময় ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন

সেই সময় তাঁহারা যে প্রকার অর্থে বিজ্ঞানশব্দে বি উপসর্গ প্রয়োগ করিতেন, আজ্ কাল্ ঠিক্ সেই প্রকার অর্থে সকল সময় তাহা প্রযুক্ত হয় না। আজ্ কাল অনেক সময় অভাবার্থে বিজ্ঞান শব্দে বি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা হইলে যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? পুরুষ সংসর্গ ব্যতীত স্বপ্ন সংসর্গে অথবা কামাসক্তা দুইটী স্ত্রীলোকের পরস্পর সংসর্গে রমণীদিগের যে গর্ভ গৃহীত হইতে পারে এবং সেই গর্ভস্থ জীব যে পিতৃগুণে বর্জ্জিত হয়, তাহার মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সহজ হউক, জটিল হউক, যাহা বলিতে বসিলাম, তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত বলিতেই হইবে। অনেকেই অবগত আছেন, হংসীগণ পুংহাঁস সংসর্গ না করিয়াও ডিম্ব প্রসব করে, কিন্তু সেই ডিম্ব হইতে কখনও শাবক বাহির হয় না, কেন না তাহা পিতৃগুণ-বর্জ্জিত। পুরুষ সংসর্গ করিয়া যদি হংসিনীগণ ডিম্ব প্রসব করে, তাহা হইতেই শাবক বহির্গত হয়। কেন এরূপ হয়, তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? জীব কাহাকে বলে? কি কি উপকরণ সংযোজিত হইলে দেহের উৎপত্তি হয়, এবং দেহের সহিত জীবের (আত্মার) সম্বন্ধই বা কিরূপ? ইত্যাদি বিষয় সুন্দররূপে নিরূপণ করিতে না পারিলে কখনই প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। (ক্রমশঃ)

দীনাবাজার,
জলপাইগুড়ি। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার বাবুর লিখিত "মূলে ভুল" প্রবন্ধের শেষে যাহা বলিলাম, কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত খাঁটী মূলের উপরেও তদধিক আর কিছুই বলিব না। সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে।

কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া নহে, এ বিশাল ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছিল এবং হিন্দুর বলিয়া লোকে এখনও যাহা কিছু নাড়া চাড়া বা আন্দোলন আলোচনা করিতেছে, তৎসমস্তেরই মূলভিত্তি যে অতি দৃঢ়, মূলে যে প্রকৃতপক্ষেই বিন্দুমাত্রও ভ্রম ছিল না, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি ধীরভাবে মূলতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। জ্ঞানবান্

ভারতবাসী ত বুঝিবেনই, কিন্তু সমধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, যে ক্রমোন্নতি-শীল জাতির দৃষ্টান্ত লইয়া আজ্ অবোধ ভারতবাসীগণ আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন, সত্যসত্যই গৃহস্থিত মণিমুক্তাকে অজ্ঞানতাবশতঃ পদাঘাত করিয়া বিদেশীয় কাঁচরাশিকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন, সেই ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত জাতিগণও আজ্ ভারতীয় মূলতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইয়া ও ইহার মূলভিত্তির দৃঢ়তা দেখিয়া অবাক্ হইয়া শতমুখে মুক্তকণ্ঠে গুণগান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান যে, ইয়ুরোপ বা আমেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে কোন অংশেই হেয় নহে, বরঞ্চ বিষয়বিশেষে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, এ কথাও আজ্ তাঁহাদের মুখ হইতে তারস্বরে ঘোষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু একমাত্র মূল খাঁটী হইলে কি হইবে? কালপ্রবাহে আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ ইহার শাখাপ্রশাখা পূর্ণমাত্রায় এতদূর ঝুঁটো হইয়া গিয়াছে যে, সেই জীর্ণশীর্ণ শুষ্ক নীরস শাখাপ্রশাখা দেখিয়া ইহার মূল যে খাঁটী আছে, বা কখনও খাঁটী ছিল, তাহা ভ্রমেও মনে উদিত হইতে পারে না। না পারারই কথা; যেহেতু সর্ব্বত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া বস্তুসাধারণের অথবা কোন বিষয়েরই ভালমন্দ নির্দ্ধারণ অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন, আর সে শ্রেণীর লোকও যথার্থপক্ষে এ জগতে অতি বিরল। কাজেই জগতের প্রায় পৌণেষোল আনা লোকেরই দৃষ্টিপ্রায় এই শাখাপ্রশাখার উপর, আর মোট ষোল আনার মধ্যে বাঁকী শিকি আনামাত্র লোকের দৃষ্টি মূলপর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলভাগ অতি দৃঢ় ও প্রকৃত খাঁটী হইলেও ইহার শাখা প্রশাখার দুর্দ্দশাতেই যে আজ্ ইহা এতদূর শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সুতরাং যাঁহারা আধুনিক জীর্ণশীর্ণ শাখা প্রশাখারূপ বৈদ্যচিকিৎসা-প্রণালী অবলোকন করিয়া ইহার মূলস্থানকে পর্য্যন্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সাহসী হন্, আমরা তাঁহাদিগকে কোনমতেই দোষ দিতে পারি না। তবে অবশ্যই অল্পজ্ঞান ও অদূরদর্শী বলিয়া নিন্দা করিতে পারি। যেহেতু বিশুদ্ধ সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ন্যায় যথার্থ সার ও সত্যপূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্র এ পৃথিবীর কোন স্থানেও যে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা শতসহস্র-রূপেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে প্রতিপাদন আর ত কেবল

বাক্যদ্বারা করিলে চলিতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত যুক্তি-মূলক অস্ত্রদ্বারা সেই মূলভাগ খুঁড়িয়া সাধারণের চক্ষে ধরিতে না পারিলে যথার্থই আর সুধু কথায় চিঁড়ে ভিজিতে পারে না।

সে যাহাহউক, হিন্দুচিকিৎসা-শাস্ত্রের এই মূলভাগের সম্বন্ধে বহুকাল হইতেই এদেশে কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে। আজ্ ইংরাজরাজত্বে ডাক্তারী মাহাত্ম্যেই যে দেশের বৈদ্যশাস্ত্র ভ্রমপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে, তাহা নহে, প্রবলপ্রতাপশালী যবনরাজের রাজত্বকালেও ভারতের অধিকাংশই ঘরের ঢেঁকী গোচের লোকেও হাকিমী চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়া ঐরূপ হিন্দু-চিকিৎসার ভ্রমপ্রমাদ দর্শাইয়া এই চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং চিরপরাধীন ভারতের পক্ষে ইহা একপ্রকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী যখন যাহার পদতলে অবস্থিতি করে, তখনই তাহার বিষ্ঠাটুকু পর্য্যন্ত অমৃতময় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। সুতরাং এ চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মের উপর আর অধিক কিছুই বলিবার নাই।

তবে বলি সেই "মূলে ভুলের" বিষয়। কিন্তু ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়-দিগের এই চিরকালের বাদবিসম্বাদ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কিছু বলিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের মীমাংসা-বিষয়ক সংপ্রতি কলিকাতার দুইজন খ্যাতনামা ডাক্তার কবিরাজ একত্রে কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ নামক যে একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন, অগ্রে আমরা পাঠকবর্গকে তাহাই উপহার দিব, পরে এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাও বলিতে ত্রুটী করিব না। সম্পাদক।

কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ।

কবিরাজ;—

আজি পর্য্যন্ত সভ্য-জগতে যতরূপ চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই এক একটি মূল নিয়ম আছে। চিকিৎসকগণ কার্য্যকালে সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আপনারা কোন্ নিয়ম অবলম্বন করেন?

ডাক্তার;—

আমরা রোগের নিদান ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিচার করিয়া তদ্বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। যথা, কোন ব্যক্তির শীতঘটিত পীড়া উপস্থিত হইলে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা উহার প্রতীকার এবং উষ্ণঘটিত পীড়া ঘটিলে শীতক্রিয়া দ্বারা

তাহার নিবারণ করিয়া থাকি। এইরূপে ক্ষার দ্বারা অম্ল এবং অম্লদ্বারা ক্ষারনাশ করি। সুতরাং বিপরীত ক্রিয়া অবলম্বনই আমাদের চিকিৎসার মূল নিয়ম। চিকিৎসাকালে আমরা এই নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া থাকি। এই বিষয়ে আপনাদের যদি কোনরূপ মতভেদ থাকে, তাহার উল্লেখ করুন।

কবিরাজ ;—

চিকিৎসার মূল নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের সহিত কোনরূপ মতভেদ নাই। প্রভেদ কেবল ভাষার। আপনারা বলিবেন, *Curatio contrariorum per contraria* অথবা Contraries are cured by means of contraries; আমরা বলিব "উপশয়ঃ পুনর্হেতুব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিণাঞ্চৌষধাহারবিহারাণামুপযোগঃ সুখানুবন্ধঃ" অথবা "বিপরীতগুণৈর্দ্দেশমাত্রাকালোপপাদিতৈঃ। ভেষজৈর্ব্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যসম্মতাঃ॥" ইয়ুরোপীয়গণও আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বীজভাগ এদেশ হইতে পরম্পারাসম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং হিন্দু ম্লেচ্ছ, বা আর্য্য অনার্য্য, উভয় জাতিরই চিকিৎসাগত মূল নিয়ম এক হইবে, ইহা বিচিত্র কি? বিশ্বজনীন সত্যের কি অতুল প্রভাব! সেই নামমাত্রাবশেষ অতি প্রাচীন জাতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী মূল নিয়ম সভ্যচূড়ামণি নিত্য উন্নতিশীল ইয়ুরোপীয়গণ আজও ঈশ্বরাজ্ঞার ন্যায় অবনতশিরে বহন করিতেছেন।

ডাক্তার ;—

চিকিৎসার মূল নিয়মে মতদ্বৈধ না থাকিলেও বিষয়বিশেষে মতভেদ অবশ্য থাকিবে।

কবিরাজ ;—

ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে, যখন হিন্দুর সহিত হিন্দুর ও ম্লেচ্ছের সহিত ম্লেচ্ছের মতভেদ দেখা যায়, তখন হিন্দুর সহিত ম্লেচ্ছের মতভেদ ঘটিবে, ইহা আর অধিক কথা কি? কেননা উভয় জাতির প্রকৃতি, দেশ, কাল, আহার ও আচরণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাইতেছে। অতএব চিকিৎসা-কার্য্যে স্থলবিশেষে মত-পার্থক্যের প্রমাণানুসন্ধান অনাবশ্যক। বরং ঋষির সহিত ঋষির চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোথায় মতভেদ আছে, ইহাই আজি কালির হিন্দুদের অনুসন্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার ;—

মতভেদের কথায় আমি প্রসঙ্গাগত আর একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি ঋষিগণ এমন জ্ঞানী ছিলেন যে, তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-প্রভৃতি সাধারণমানুষোচিত দোষ ছিল না। ভ্রমাদি না হইলে পরস্পরের বিভিন্ন মত উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের আবার মতভেদ কেন?

কবিরাজ :—

আমরা যতদূর শুনিতে পাই, কার্য্যতঃ ততদূর দেখিতে পাই কোথায়? ঋষিগণ জ্ঞানী ছিলেন সত্য, কিন্তু সকলের জ্ঞান সমান ছিল কি? জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইত। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বলুন, অর্থশাস্ত্র বলুন, চিকিৎসাশাস্ত্র বলুন, সর্ব্বত্রই মতভেদ দেখা যায়। এই কারণেই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" এই বাক্যটী এদেশের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এস্থলে অন্যবিধ নিদর্শন প্রয়োজনীয় নহে; চিকিৎসাশাস্ত্রে কতিপয় মতভেদের নিদর্শন আপনাকে শুনাইতেছি। শরীরের অঙ্গোৎপত্তির পৌর্ব্বাপৌর্ব্য-সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"গর্ভস্য হি সম্ভবতঃ পূর্ব্বং শিরঃ সম্ভবতীত্যাহ শৌনকঃ** হৃদয়মিতি কৃতবীর্য্যঃ** নাভিরিতি পারাশর্য্যঃ** পাণিপাদমিতি মার্কণ্ডেয়ঃ** মধ্যশরীরমিতি সুভূতির্গৌতমঃ** তত্তু ন সম্যক্। সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গানি যুগপৎসম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরিঃ।*

সুশ্রুত, শারীরস্থান ৩য় অধ্যায়।

এইরূপ মতভেদ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। মতভেদ ঘটিলেই ঋষিত্বের ব্যাঘাত হয় না। প্রকৃত ঋষিত্ব কেবল বিশুদ্ধ-জ্ঞাননিষ্ঠ। যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানী, তিনি সেই পরিমাণে ঋষি।

---

* শৌনকের মতে উৎপদ্যমান ভ্রূণের মস্তক, কৃতবীর্য্যের মতে হৃদয়, পারাশর্য্যের মতে নাভি, মার্কণ্ডেয়ের মতে হস্ত পদ, সুভূতি গৌতমের মতে শরীরের মধ্যভাগ প্রথমতঃ জন্মে। পরন্তু ধন্বন্তরি এই সমস্ত মতের প্রতিবাদী। ইনি বলেন, সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এককালেই জন্মে।

ডাক্তার ;—

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসার সহিত দেশীয় চিকিৎসার যে সকল মতভেদ দেখা যায়, সেই সকলের কি মীমাংসা বা সমন্বয় হইতে পারে না ?

কবিরাজ ;—

কতকগুলির মীমাংসা আমাদের কথোপকথনে অল্প সময়েই হইতে পারে। কতকগুলির মীমাংসা পরীক্ষা ও কালসাপেক্ষ।

ডাক্তার ;—

যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদের যে মূলনিয়মের উল্লেখ করিলেন, ঐরূপ নিয়ম কতগুলি আছে ?

কবিরাজ ;—

এস্থলে প্রথমতঃ বলা আবশ্যক, পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মসমূহকে শাস্ত্রীয় ভাষায় সূত্র বলে। আয়ুর্ব্বেদে ঔষধ-কাণ্ডে অর্থাৎ চিকিৎসা-প্রকরণে মূলসূত্র একই। উহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিতে পারি। শাখা-সূত্র অনেক, পরন্তু অসংখ্য নহে। প্রশাখা-সূত্র অসংখ্য।

ডাক্তার ;—

সূত্রের কখনও কি অন্যথা ঘটে ?

কবিরাজ ;—

মূলসূত্রের কখনও অন্যথা ঘটে না ও ঘটিবেও না। উহা চিরদিন সমান আধিপত্য করিবে।*

ডাক্তার ;—

অনেক সময়ে চিকিৎসাকালে বিপরীত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে সদৃশ ক্রিয়াও অবম্বলন করা হয়। সুতরাং মূলসূত্রের অন্যথা নাই, এই কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

কবিরাজ ;—

প্রণিধান করিলে সদৃশ ক্রিয়ার মধ্যেও বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়। ইহা আপনারাও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। বৈদ্যকশাস্ত্রের অনেকস্থলে এই ক্রিয়ার

---

* নৈষ সামান্যবিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসরূপো ভাবস্বভাবঃ কদাচিদপ্যন্যথা ভবতি।

চক্রপাণিদত্ত।

সুন্দর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। * পরন্তু ইহা সর্ব্বত্র অবলম্বিত হয় না। মূলসূত্রের ব্যভিচার না থাকিলেও সকল সূত্রই অব্যভিচারী নহে। দেশ, কাল, বলাবল ইত্যাদি বশতঃ অবস্থা-বিশেষের অনুরোধে কখন কখন সূত্র অতিক্রমও করিতে হয়। কেননা নির্দ্দিষ্ট সূত্রে একান্ত নির্ভর করিলে মহৎ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে নির্দ্দিষ্ট সূত্রও অতিক্রম করা ঋষিগণের অনুমোদিত। ঋষিগণ বলেন ;—

"ন চৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টমেকান্তেন সমাশ্রয়েৎ।
স্বয়মপ্যত্র ভিষজা তর্ক্যং বুদ্ধিমতা ভবেৎ॥
উৎপদ্যতে হি সাবস্থা দেশং কালং বলং প্রতি।
যস্যাং কার্য্যমকার্য্যং স্যাৎ কর্ম্মকার্য্যঞ্চ বর্জ্জিতম্॥
তস্মাৎসত্যপি নির্দ্দেশে কুর্য্যাদূহ্যং স্বয়ং ধিয়া।
বিনা তর্কেণ যা সিদ্ধিযৈর্দৃষ্টাঽসিদ্ধিরেব সা॥" †

চরক, সিদ্ধিস্থান, ২য় অঃ।

ডাক্তার ;—

ইহা অতি নিরপেক্ষ ও পবিত্র কথা। ঋষিগণ যে শাস্ত্রের একান্ত গোঁড়া ছিলেন না, প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন করিতেন, এই ব্যাপারে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম।

ক্রমশঃ—

---

* বিষে বিষক্ষয়, অগ্নিদগ্ধ স্থানে উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ বা পুনর্ব্বার অগ্নির তাপ সংলগ্ন করণ ইত্যাদি উক্ত ক্রিয়ার প্রসিদ্ধ উদাহরণ। ব্যাখ্যামধুকোষ প্রভৃতি নিদান-টীকায় এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

† শাস্ত্রে যে বিষয় একান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, বিবেচনা না করিয়া, কেবল তাহাই স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বয়ংও বিচার করিবেন। কেননা দেশ, কাল ও বলানুসারে ঈদৃশ অবস্থা ঘটে, যে অবস্থায় অকার্য্যও কার্য্য এবং কার্য্যও অকার্য্য হইয়া পড়ে। এজন্য কোনরূপ নির্দ্দেশ থাকিলেও (তাহা অতিক্রম করিয়া) প্রয়োজনীয় ও হিতকর বিষয়ান্তর উহ্য করিয়া লইবে। সময়ে সময়ে বিনা বিবেচনায়ও (দৈবযোগে) যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয়, তাহা অসিদ্ধিই বলিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অণুজ্যোতিরনেকাগ্রোদুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
রতিং ন লভতে যাতি পরলোকং সমান্তরে॥

যে সর্ব্বদা মন্দাগ্নি, চিত্তচাঞ্চল্য এবং মনের দৌর্ব্বল্য এই সমুদায়ে অভিভূত হইয়া কোন বিষয়েই নিবিষ্ট থাকিতে পারে না; সে বৎসরের মধ্যেই পরলোক যাত্রা করে;

বলিং বলিভৃতো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।
লোকান্তরগতঃ পিণ্ডং ভুংক্তে সংবৎসরে। সঃ॥

যে ব্যক্তি বায়সাদি বলিভোজী প্রাণীদিগকে বলিপ্রদান করিলে তাহারা ঐ বলী ভক্ষণ না করে, তবে সে সম্বৎসরের মধ্যেই লোকান্তরে গমন করিয়া পিণ্ডভোজন করে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীং।
সংবৎসরান্তে জন্তুঃ স সম্পশ্যতি মহত্তমঃ॥

যে সপ্তর্ষি সকলের সমীপস্থ অরুন্ধতী নক্ষত্র না দেখিতে পায়, সে সেই বৎসরের মধ্যে ঘোরতর তমদর্শন অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

বিকৃত্যাবিনিমিত্তং যঃ শোভামুপচয়ং ধনং।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং সনান্তং ন স জীবতি॥

যে ব্যক্তি অস্বাভাবিকরূপে অকারণ শোভা, উপচয়, ধন অথবা অস্বাভাবিকরূপে বিভ্রংশ প্রাপ্ত হয়, সে বৎসরের শেষ দেখিতে পায় অর্থাৎ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভক্তিশীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকং।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়ভির্ম্মাসৈর্ম্মরিষ্যতঃ॥

যে ব্যক্তির বিনাকারণেই ভক্তি, শীল, স্মৃতি, বদান্যতা, বুদ্ধি এবং বল এই ছয়টীর নিবৃত্তি হয়, সে নিশ্চয়ই ছয়মাসের মধ্যে শমনভবনে গমন করিবে।

ক্রমশঃ—

হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক।

লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

একদা প্রাতঃকালে, জনৈক চিকিৎসক, কলিকাতার শিবাদিহ সন্নিকটস্থ স্থানে, একটী পূর্ণবয়স্কা ইউরেসিয়ান্ রমণীর চিকিৎসার্থ আহূত হন্। চিকিৎসককে আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, পূর্ব্বদিন হইতে গৃহকর্ত্রী ইষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন এবং তিনি প্রায় অনাহারেই আছেন। চিকিৎসক তাঁহার মানসিক আতঙ্ক ও মনশ্চাঞ্চল্যের আতিশয্য দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর নিকট থাকিয়া, তাঁহার ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একপাত্র চা আনিয়া রোগিণীকে খাইতে দিতে বলিলেন; যেমন চা, তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল ও অসাবধানতা বশতঃ কিয়ৎ পরিমাণ যেমন তাঁহার গাত্রে পতিত হইল, অমনি রোগিণী শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন ও সশঙ্কিতভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ, চিকিৎসক অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন যে, রুগ্না স্ত্রীলোকটীকে ঠিক্ তিন মাস পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছিল। তিনি, অন্যান্য লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে, রোগিণী হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্তা হইয়াছেন; ও এই রোগ বড় সংঘাতিক। সকলে রুগ্নার এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সিমলাপাহাড়প্রবাসী স্বামীকে তাড়িত-সংবাদ প্রেরণে রোগিণীর এই শোচনীয় অবস্থা জানাইলেন। তখন গৃহস্থ, একজন সুবিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ সাহেব ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিতে, চিকিৎসককে অনুরোধ করিলেন; সেই দিবস মধ্যাহ্নেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইল। তখন, উভয় চিকিৎসক যুক্তি করিয়া, মর্ফিয়া ও এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া হাইপোডার্মিক বা ত্বকের নিম্নে পিচকারী দিলেন। ডাক্তার সাহেব আর একবার একাকী দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া গেলেন, তখন রুগ্না স্ত্রী অনেক সুস্থা হইয়াছেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রোগিণী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুস্থা ও অস্থিরা হইয়া পড়িলেন; রোগিণী সমস্ত দিনে কোন খাদ্যই গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসকগণ, আবার ঐ সময়ে উপস্থিত হইলেন; গৃহমধ্যে আলোক লইয়া গেলে রোগিণী ভয়ানক চীৎকার করিয়া

উঠে দেখিয়া, ডাক্তার সাহেব অন্ধকারেই পিচ্‌কারী দিলেন। রুগ্না কিছু ক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, চিকিৎসকেরা কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বাটীর সকলে চিকিৎসকগণকে, আর একবার রোগিণীকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুযায়ী চিকিৎসকগণ যাইয়া, রোগিণীকে একবারেই সংজ্ঞাহীনা, স্পন্দহীনা ও নিশ্চলা নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, নিশ্বাসও নাই নাড়ীও নাই। তখন মৃত্যু স্থির জানিয়া তাঁহারা গৃহস্থকে অগত্যা বুঝাইয়া দিলেন যে, এ বিষম যন্ত্রণাদায়ক রোগে শীঘ্র মৃত্যুই মঙ্গল কারণ। পরে গৃহস্থের জাতীয় প্রথানুযায়ী পুরোহিত আসিয়া রুগ্নার মঙ্গলার্থ শেষ ক্রিয়া সমাধা করিলেন। বন্ধু ও প্রতিবেশীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অণ্ডার্‌টেকার কফিন্ প্রস্তুত করিবার ভার লইলেন, পরিশেষে মৃত্যুর সার্টফিকেটও প্রদত্ত হইল। এই সমস্ত ঘটনায় প্রায় ১৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হইল; পরিশেষে সকলে যেমন দ্বিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া একতলে নামিয়া আসিতে ছিলেন, এমন সময়ে রোগিণী গৃহমধ্য হইতে বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহস্থেরা ভয়ে ও বিস্ময়ে গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কাহারও সাহস হইল না যে, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। চিকিৎসকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া রোগিণীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, তৎকালে বোধ হইল যেন রোগিণীর কোন অসুখই নাই; কিন্তু নাড়ী বড় দুর্ব্বল ও নিশ্বাস আস্তে আস্তে বহিতেছে। কিছুক্ষণ পরে, বাহিরের লোক ডাকাইয়া রোগিণীর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল। অবশেষে ডেথ্‌সার্টফিকেট ফেরত লইয়া চিকিৎসকেরা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, তৎপরে রোগিণী প্রায় ৬ ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পাঠক! দেখুন, কি অদ্ভুত ঘটনা! সহর ও সাহেব বাটী বলিয়া অধিক গোলযোগ হইল না; পল্লীগ্রাম ও পল্লীগ্রামবাসী হইলে কি ভয়ানক ঘটনাই ঘটিত! হয়ত, প্রতিবেশীগণ দানা পাইয়াছে বলিয়া, সাবোল ও কুঠারাঘাতে রোগিণীকে জীবীতাবস্থায় মারিয়া ফেলিত।

এক্ষণে ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় হিষ্টিরিয়া বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; অতএব ইহার নির্ণয়তত্ত্ব ও ভাবিফল সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অতি সাবধান হওয়া উচিত।

এই রোগে শ্বাস ক্রিয়ার পেশী সমূহের আক্ষেপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া শ্বাসরোধ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করা উচিৎ।

ভিষক্‌দর্পণ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

লেখক মহাশয় কি জন্য যে, উপরোক্ত ঘটনায় এতদূর বিস্মিত হইয়া অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, তাহার কারণ ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আর পাড়াগাঁয়ে এরূপ ঘটনা হইলে যে তাহাতেই বা কি ভয়ানকত্ব উপস্থিত হইত, তাহাও ত আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে সমর্থ নহি। যেহেতু তিনমাস পূর্ব্বে যখন ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিয়াছিল, তখন ত উপরোক্ত অবস্থায় জলাতঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে ডাক্তার কেন, পাড়াগাঁয়ের একটা যে সে লোকেই স্থির করিয়া দিতে পারে। সুতরাং এস্থলে রোগনির্ব্বাচন পক্ষে প্রকৃতই আমরা কোনরূপ বাহাদুরী দেখিতে পাইলাম না। অথবা এ সম্বন্ধে সোজা কথায় এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরের দংশন দূরের কথা, একটা পোষা কুক্কুরের নখাঘাতেই যখন রোগী ও তাহার অভিভাবক মহা উদ্বিগ্নে দিনযাপন করে, তখন একটা ক্ষেপা কুকুরের দংশনে সে ব্যক্তির মৃত্যু যে অব্যর্থ, এ ধারণা ত আমাদের ন্যায় ভীত ব্যক্তির অন্তঃকরণ হইতে একমুহূর্ত্তের জন্যও যাইবার নহে। সম্পাদক।

ধাতুব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ী গরিষ্ঠতা।

আনাহ অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ-জনিত উদর মধ্যে চাপধরারোগে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র পীড়ায় নাড়ী অত্যন্ত ভার ও কঠিন হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন সদাতিবক্রাহি শিরা বহন্তী।
জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন সাধ্মান শূলেন চ পুষ্টিরূপা॥

বাতিক শূলরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ নাড়ী সর্ব্বদাই অত্যন্ত বক্রভাবে স্পন্দিত হয়। পিত্তশূলে নাড়ী অতিশয় উষ্ণ হয়। আমশূল অর্থাৎ উদরা-

শ্লানযুক্ত শূলে এবং ক্রিমিশূলরোগে নাড়ীর স্থূলতা উপলব্ধি হয়। তাপমান যন্ত্রদ্বারা এই সকল অবস্থা সুন্দররূপে বিজ্ঞাপিত হয় কি না তাহা আমি অবগত নহি।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপা সা প্রতপ্তাত্বামদূষণে।

যদি অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিলে নাড়ীর মধ্যে মধ্যে গ্রন্থির ন্যায় অনুভূত হয়, তাহা হইলে প্রমেহ রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে। পরন্তু উহাতে আম-দোষ বিদ্যমান থাকিলে নাড়ী কিঞ্চিৎ উষ্ণভাব ধারণ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন—

প্রমেহে তু জড়া সূক্ষ্মা মৃদুরাস্যায়তে স্থিরা।

অর্থাৎ প্রমেহরোগে নাড়ীর নিতান্ত জড়তা উপস্থিত হয়। নাড়ী সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম এবং মৃদুভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে।

উৎপিৎসুরূপা বিষরিষ্টিকালে বিষ্টম্ভগুল্মেন চ বক্ররূপা।
অত্যর্থবাতেন অধঃস্ফুরন্তী উত্তানভেদিন্য সমাপ্তিকালে॥

বিষ ভক্ষণ করিলে অথবা সর্পাদি দংশন করিলে শরীর মধ্যে বিষ অভি-ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সেই সময় নাড়ী নিতান্ত অস্থিরভাবে সঞ্চালিত হয়। বিষ্টম্ভ এবং গুল্মরোগে ও এই প্রকার অবস্থা হয় বটে কিন্তু তাহাতে নাড়ীর বক্রতা থাকে। বায়ুর অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে নাড়ী তীর্য্যক্‌ভাবে প্রবাহিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নাড়ী লতার ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধদিকে গমন করে।

গুল্মেন কম্পোঽর্থ পরাক্রমেণ পারাবতস্যেব গতিং করোতি। উন্মাদাবপ্যেবমেব ক্রমঃ।

গুল্মরোগে নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চলা হয় এবং পায়রার ন্যায় প্রবলবেগে ঘূর্ণায়-মান হইয়া ক্রমশঃ স্পন্দিত হইতে থাকে। উন্মাদাদিরোগেও এইরূপ অবস্থা জানিবে।

ব্রণেঽতি কঠিনে দেহে প্রযাতি পৈত্তিকং ক্রমং।
ভগন্দরানুরূপেন নাড়ীব্রণ নিবেদনে॥
প্রয়াতি বাতিকং রূপং নাড়ীপাবকরূপিণী।

পিত্ত কুপিত হইলে নাড়ী যে ভাবে স্পন্দিত হয়, ব্রণের অপক্কাবস্থায়ও নাড়ীর গতি সেই প্রকার হইয়া থাকে। ভগন্দররোগে এবং বায়ুর অত্যন্ত কুপিতাবস্থায় নাড়ী যে ভাবে গমন করে, নাড়ীব্রণেও নাড়ী অতিশয় উষ্ণ হইয়া সেই ভাবে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ী দিনাবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এরূপ নাড়ীকাহিনী শ্রবণ করিয়া ডাক্তার পুলিন বাবুর লেখনী চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে কি? সম্পাদক।

এজ্‌মা বা শ্বাসরোগ।

এলোপ্যাথিমতে।

এজ্‌মাকে বাঙ্গালায় হাঁপের পীড়া বলে। হাঁপের পীড়া উপস্থিত হইলে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয় অর্থাৎ রোগী নিশ্বাস ফেলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে কিন্তু পাঠকবর্গের স্মরণ করা উচিত যে, সকল প্রকার শ্বাসকষ্ট, এজ্‌মা মধ্যে পরিগণিত নহে। হাঁপের ব্যাম শ্বাসকষ্ট বটে; কিন্তু ইহার আরও কতক-গুলি লক্ষণ আছে। ফুস্‌ফুস ও হৃদয়যন্ত্রের নানাবিধ পীড়ায়, নাসিকা ও শ্বাস-নালীর পীড়ায় এবং আরও কোন কোন পীড়ায় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় কিন্তু সে শ্বাসকষ্ট এজ্‌মা নহে।

এজ্‌মা হইলে কিয়ৎকালের জন্য অতি যন্ত্রণাদায়ক এবং ঘন শ্বাসকষ্ট উপ-স্থিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত একরূপ শাঁ শাঁ শব্দ শ্রুত হয়। এরূপ অবস্থা কিয়ৎকাল থাকিয়া কতকটা শ্লেষ্মা উঠিয়া রোগী সুস্থ হয়। এজ্‌মার

সহিত জ্বর থাকে না। চিকিৎসকগণ অনুমান করেন, এই শ্বাসকষ্ট শ্বাসনলী-সকলের আক্ষেপজন্য হইয়া থাকে।

যে সকল রোগীর পূর্ব্ব হইতেই হাঁপের পীড়া আছে, হাঁপ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং সেই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলেই তাহারা প্রায় বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের হাঁপ হইবে। সেই লক্ষণ গুলি এইঃ—ক্ষুধানাশ, পেটফাঁপা এবং অজীর্ণ; অথবা অম্লোদ্গার, শরীরের আবল্য, নিদ্রালুতা এবং আলস্য বোধ। অনেক রোগী হাঁপ হইবার পূর্ব্বে একরূপ কষ্ট অনুভব করে;- কাহারও বা অল্প শীত বোধ এবং সাধারণ শারীরিক অসুস্থতানুভব হয়।

হাঁপের পীড়া সচরাচর শেষ রাত্রিতে উপস্থিত হয়। রোগীর সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং বোধ করে, যেন তাহার বুক ও পাঁজর টানিয়া ধরিয়াছে, সহজে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগী আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। রোগী হাঁটু দুটী জড় করিয়া পা গুটাইয়া উঠিয়া বসে। দুই হাতের কণুই দুই হাটুর উপর স্থাপন করে এবং মস্তকটী অবনত করিয়া জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। গলার ভিতর একরূপ শাঁ শাঁ শব্দ হইতে থাকে; এই শব্দ অনেকদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। রোগী খোলা বাতাস পাইবার জন্য লালায়িত হয় এবং ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দেয় কিন্তু তাহাতেও শ্বাসকষ্ট দূরীভূত হয় না। ঘন ঘন টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস লওয়াতে রোগীর অত্যন্ত শ্রম ও ক্লান্তি বোধ হয় এবং রোগীর ঘর্ম্ম হয়। মুখশ্রী কষ্ট ও উৎকণ্ঠতাব্যঞ্জক হয় এবং হস্ত পদদ্বয় শীতল হয়। রোগীর কথা কহিতে কষ্টবোধ হয়। অনেক রোগী মোটেই কথা কহিতে পারে না। এই অবস্থায় আহার ও পানীয় গ্রহণকরিতেও সাতিশয় কষ্ট হয়। কেহ কেহ সামান্য পানীয় পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারে না। নাড়ী সচরাচর সূক্ষ্ম, দুর্ব্বল, দ্রুত অথবা অসমান হয়। কোন কোন রোগীর নাড়ীর কোনই বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারা যায় না। হাঁপের সময় রোগী প্রস্রাবত্যাগ করিলে অধিকপরিমাণে জলের ন্যায় পরিস্কার বর্ণবিশিষ্ট গন্ধহীন মূত্র হয়। কোন কোন রোগীর হাঁপের সময় তরল মল নির্গত হয়। রোগী কাশিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভাল করিয়া কাশিতে পারে না এবং কাশও বড় একটা উঠে না। হাঁপ রোগীর মন সচরাচর আশা পূর্ণ থাকে। এত

কষ্ট পাইলেও এবং নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইলেও তাহার মন নিরাশ হয় না। মনে করে শীঘ্রই রোগের উপশম হইবে। যক্ষ্মারোগীর মনের ভাবও এইরূপ থাকে। মৃত্যুকালের অব্যবহিত পূর্ব্বপর্য্যন্ত যক্ষ্মারোগীর মন আশাপূর্ণ থাকে।

এইরূপ শ্বাসকষ্ট কতিপয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সচরাচর খানিক বেলা হইলেই হাঁপকষ্ট দূরীভূত হয়। অনেক রোগীর শ্বাসকষ্ট দুই তিন দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। হাঁপ ছাড়িবার সময় রোগী সচরাচর কাশে এবং খানিকটা কাশ-তুলিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থা প্রতিরাত্রে উপরি উপরি হইতে পারে অথবা কয়েকদিন ভাল থাকিয়া হঠাৎ একদিন উপস্থিত হইতে পারে। তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই। অনেক রোগী দুই তিন মাস ভাল থাকে। কোন কোন রোগীর কেবলমাত্র শীতকালে এবং কাহারও বা বর্ষাকালে হাঁপ উপস্থিত হয়; অবশিষ্টকাল সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। অনেকের রাত্রে হাঁপ উপস্থিত না হইয়া দিবাতেও উপস্থিত হয়। অনেক পুরাতন হাঁপগ্রস্ত রোগীর বারমাস অল্প বিস্তর শ্বাসকষ্ট লাগিয়াই থাকে; অল্প পরিশ্রম করিলে বা অহিতাচরণ করিলেই উহাদের রীতিমত হাঁপ উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যতপ্রকার কষ্টকর রোগ আছে, তন্মধ্যে এই হাঁপানিরোগে মানুষ যত অধিক যন্ত্রণাভোগ করিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করে, এমন আর কোন রোগেই নহে। আর এ রোগটারও স্বভাব এমনি মন্দ যে, একবার যাহাকে ধরিবে, প্রায় তাহার চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। সুতরাং এই যমোপম শ্বাসরোগের সম্বন্ধে আমরাও বিশেষরূপে বর্ণন করিব। সম্পাদক।

চিকিৎসিত রোগাবলী।

ডাক্তার ডি, এন, রায় এম্ ডি, কর্ত্তৃক চিকিৎসিত।

কষ্টরজঃ।

রোগী বিবাহিতা, ১৭ বৎসর বয়স্কা, কৃশাঙ্গী, দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা এবং বায়ুপ্রধান ধাতু। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথম ঋতু হয়। তদবধি এই কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালেই অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। তিনি

এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি উভয়বিধ চিকিৎসা প্রণালীদ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই বিশেষ উপকার দর্শে নাই, যদিও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে তাঁহার ক্ষণিক উপশম হইত। ১৮৮৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ঋতুকালে অসহ্য যন্ত্রণার সময়ে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গিয়া দেখিলাম রোগী অত্যন্ত অস্থির, শয্যায় গড়াগড়ি দিতেছে এবং কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। রমণীর নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া আমার ঐ রোগটী ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল (ovarian neuralgia) বলিয়া বোধ হইল। আমিও তাঁহাকে জাম্বক্সাইলাম মাদার টিংচার দশ ফোটা ৩ আউন্স জলে দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করিতে বলিয়া দিলাম। দুই মাত্রা ঔষধ সেবন করিতেই যন্ত্রণা এককালে বন্ধ হইয়া গেল, আর হইল না। পুনরায় মাসিক ঋতুর সময়ে ঐ বেদনা প্রত্যাবর্ত্তন করিল বটে, কিন্তু তত বেশী যন্ত্রণা হইল না; ঐ ঔষধই পুনরায় ব্যবস্থা ও প্রয়োগ করিলাম। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূরীভূত হইল। আমি রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ ঔষধ এক এক ফোঁটা ঋতুর ৭ দিবস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত খাইতে বলিয়া দিলাম। রোগী ঋতুর পূর্ব্বে এক সপ্তাহ ঐ ঔষধ ঐ প্রকার প্রণালীতে সেবন করায় আর আদৌ বেদনা উপস্থিত হইল না। ঋতু স্বাভাবিক মত হইল এবং ৫ দিবস কাল স্থায়ী হইল। তাহার পর হইতে আর কোন মাসেই বেদনা হয় নাই।

এস্থলে আমার ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, রোগীর ঋতু যে কেবল বেদনা ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল তাহা নহে; অন্যান্য সকল বিষয়, যথা সময় ও পরিমাণ সম্বন্ধেও নানাবিধ অনিয়ম ছিল। সময় সম্বন্ধে কখন ঋতু আগাইয়া হইত, কখন বা পিছাইয়া যাইত। পরিমাণ সম্বন্ধে, কখন প্রচুর ও অল্পদিন স্থায়ী এবং কখন বা অত্যল্প ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। আবার কোন সময়ে অল্প অল্প রজঃস্রাব দীর্ঘস্থায়ী থাকিত, কোন দিন বন্ধ থাকিত, কোন দিন পুনরায় হইত। আর্ত্তব শোণিতের নানাবিধ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছিল; কখন লালাভ, কখন ফিকা বর্ণ। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা ঋতুর প্রথম তিন দিবস চিরকালই ছিল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ-চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যখন রোগীর দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি এবং বাক্‌শক্তি ক্রমশঃ লোপ হইতে থাকে, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, নাড়ী একবারে বসিয়া যায়, তখন আর কোনও বিবেচনা না করিয়া বিসূচি-বিধ্বংস রস প্রয়োগ করা উচিত। এক বৎসরের শিশুদিগকে অর্দ্ধ বটী, তদূর্দ্ধ বয়সের বালকদিগকে এক বটী এবং বলবান্ যুবকদিগকে দুই বটী সেবন করিতে দেওয়া যায়। ডাবের জলের সহিত ঔষধ সেবন করিতে হয়। ঔষধ সেবনান্তে চক্ষু লাল এবং নাড়ী চেতন হইয়া উঠিলে নির্ভয়ে মস্তকে শীতল জলের ধারা এবং তক্রাদি সেবন করিতে দিবে। বৈকারিক লক্ষণ ক্রমশঃ দূর হইয়া গেলে যথেষ্ট শীতল জলে স্নান এবং ক্ষুধানুযায়ী পথ্যাদি প্রদান করিবে। কিন্তু ডাবের জল, দাড়িম্ব রস এবং দধি এই সকল দ্রব্য দিতেই হইবে। যদি ঔষধ সেবনের পর নাড়ী চেতন এবং চক্ষু লাল হইয়া না উঠে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, এই ঔষধে কোনও উপকার হইল না। তাদৃশ অবস্থায় শীতল ক্রিয়াদি করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে এই বিসূচি-বিধ্বংস রস কি কি উপকরণে কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি।

সোহাগার খই	...	১ ভাগ
স্বর্ণমাক্ষিক (শোধিত ও জারিত)		১ ,,
শুঁঠ		১ ,,
পারদ গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)		২ ,,
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত)	...	১ ,,
কৃষ্ণসর্প বিষ (শোধিত)	...	১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত)	...	৭ ,,

এই আট খানি দ্রব্য উপরোক্ত পরিমাণে ওজন করিয়া লইবে। পরে

কিঞ্চিৎ গোঁড়ালেবুর রসের মধ্যে কাষ্ঠবিষ খানি ভিজাইয়া রাখিবে। বিষ গুলি যখন কোমল হইয়া আসিবে, তখন তাহা শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং তন্মধ্যে সর্পবিষও প্রদান করিবে। পরে হিঙ্গুল খানি তাহাতে প্রদান করিয়া এরূপ ভাবে পেষণ করিবে যে, হিঙ্গুলের সহিত বিষ গুলি যেন সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়। তদনন্তর কজ্জলী, শুঁঠ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং সোহাগার খই তাহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে শুখাইবে। পর দিন আবার জামিরের রসে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুখাইবে। এই রূপে সাত দিনে সাত বার জামিরের রসে ঔষধগুলি ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপ পরিমাণে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। খুব সতর্কতার সহিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা নখের মধ্যে বা লোমকূপ দ্বারা ঔষধ-শরীরস্থ হইয়া যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে। কেহ কেহ আবার নিতান্ত মূমূর্ষ অবস্থায় বৃহৎ সূচিকাভরণ রসও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং ক্ষুর দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষত করিয়া রক্তের কণিকামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে সর্ষপ প্রমাণ লঘু সূচিকাভরণ অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র রস মর্দ্দন করিতে থাকিবে, শরীর হিম হইয়া গেলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা শরীর গরম হইয়া উঠিলে শীতল ক্রিয়াদি কর্ত্তব্য। নতুবা জীবনের আশা বৃথা। এক্ষণে উপসর্গ চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে।

হিক্কা।——হিক্কা একটী প্রধান উপসর্গ। এতদ্দ্বারা শীঘ্রই জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং হিক্কা নিবারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। উপরে যে সমস্ত জঙ্গম বিষাক্ত ঔষধের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকলগুলি ঔষধই সদ্য শ্লেষ্মা নিবারক এবং অত্যন্ত বায়ু বর্দ্ধক। যে প্রকার তাপ দ্বারা সরস বস্তু হইতে প্রথমতঃ রস নির্গত হইয়া পরিশেষে আবার সেই তাপ দ্বারাই সেই রস ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে থাকে। সেই প্রকার ব্যাধিপ্রভাবে দেহ মধ্যে আপনা হইতেই এক প্রকার তীক্ষ্ণ বিষ উৎপন্ন হইয়া প্রথমত সমস্ত শরীরের শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে তরল করিয়া স্রোতবাহী পথগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। পরিশেষে সেই বিষ দ্বারাই যখন শরীরস্থ বায়ু অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে সহসা সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারে না এবং আপনিও শরীরমধ্যে

সঞ্চালিত হইতে পারে না, তখনই হিক্কা বা ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়। এইরূপে অনতিবিলম্বেই শরীর মধ্যে বায়ুর গতি রোধ হইয়া যায়। সুতরাং জীবনও বিনষ্ট হয়। সেই সময় উপযুক্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই শরীরস্থ প্রাণনাশক বিষের তেজ হ্রাস হইয়া যায় এবং তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশও ক্রমশঃ বিশুষ্ক ও সঞ্চালিত হইতে থাকে। তখন বাহ্য বিষপ্রভাবে দৈহিক বায়ু আরও প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং বাতাধিক্য বশতঃ নাড়ীর গতিও ক্রমশঃ চঞ্চল হইতে থাকে। নাড়ী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেই বুঝিতে হইবে যে, দৈহিক বিষের তেজ কমিয়া আসিতেছে। তখন শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া বায়ু সাম্য রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি নাড়ী ক্রমশঃ চঞ্চলা না হইয়া সহসা অত্যন্ত প্রবলা হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অনুপযুক্ত সময়ে বাহ্য বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রযুক্ত বিষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই শরীরস্থ বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ প্রযুক্ত বিষ দ্বারাই রোগীর জীবনী শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিষ প্রয়োগের পূর্ব্বেই এই সকল আলোচনা করিয়া নিতান্ত মূমূর্ষ অবস্থায় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত সময়ে জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি সেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে, তাহা হইলে আর উপদ্রব নিবারণের জন্য দ্বিতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় না। প্রযুক্ত জঙ্গম বিষ দ্বারা জীবন বিনাশের মূলীভূত দৈহিক বিষ বিনষ্ট হইয়া গেলে, সেই প্রযুক্ত বিষের পোষকতা অর্থাৎ শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে আপনা হইতেই সকল প্রকার উপদ্রব উপশমিত হইতে থাকে। এ স্থলে হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণের জন্য যত প্রকার ঔষধের কথা বলা যাইতেছে, তৎসমুদায় জঙ্গম বিষ প্রয়োগের পূর্ব্বে ব্যবহার করাইবে। হিক্কা নিবারণের জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে মাষ কলাই, হিঙ্গু অথবা গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে তাহার ধূঁয়া প্রদান করিবে। তেলাপোকা নামক এক প্রকার কীট আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই তেলাপোকার পক্ষ পদাদি উন্মোচন করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া লইবে। অন্ত্রের পরিমাণ যত হইবে, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ গোলমরিচ তৎসহ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত $\frac{১}{৪}$ রতি মাত্রায় ২।৩ বার সেবন করাইলে প্রবল হিক্কা নিবারিত হয়। তেলাপোকার কথা

শুনিয়া কেহ যেন উপহাস করিয়া এই কথা উড়াইয়া না দেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহার গুণ ও প্রভাব সকলে অবগত হইতে পারিবেন।

বমি।——হিক্কার ন্যায় বমিও একটী প্রধান উপদ্রব। এতদ্দ্বারা শীঘ্রই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। উপরে যে তেলাপোকার কথা বলা হইয়াছে, ঐ তেলাপোকার বিষ্ঠা শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে আশ্চর্য্যরূপে বমির বেগ বন্ধ হইয়া যায়। বিসূচিকা রোগে প্রায়ই দুই বারের অধিক সেবন করিতে হয় না। একটী করিয়া দানা এক এক বার সেবন করিতে দেওয়া যায়। যদি সুস্থ শরীরে তেলাপোকার বিষ্ঠা কোন প্রকারে উদরস্থ হয়, তাহা হইলে অতিশয় বমি হইয়া থাকে। তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এক দানা তেলাপোকার বিষ্ঠা ও অর্দ্ধ খণ্ড গোলমরিচ একত্রে বাঁটিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা উপশমিত হইয়া থাকে। এ স্থলে সামান্য বস্তু বলিয়া তেলাপোকার বিষ্ঠাকে অনেকেই তাচ্ছিল্য করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন পদার্থই তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। সময় বিশেষে সকল বস্তু দ্বারাই, সাতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ী। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

লেখকের ন্যায় উপযুক্ত কবিরাজ যখন উপরোক্ত ঔষধগুলি প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ বলিয়া জোর করিয়া লিখিয়াছেন, তখন আমরা আশা করি যে, আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তুচ্ছবোধ না করিয়া বরঞ্চ বিশেষ রূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত উপরোক্ত ঔষধগুলির ফলাফল পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। আর আমরাও অবশ্য পরীক্ষা করিবার চেষ্টায় থাকিলাম।

চি, স, সম্পাদক।

নূতন ঔষধ।

(এলোপ্যাথি মতে)

রক্তামাশয় রোগে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া

(Sulphate of magnesia)

ডাক্তার এ, ডব্‌লিউ লিহি আমাশয় রোগে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

এই ঔষধ প্রথমে ডাক্তার বার্‌থোলও ব্যবহার করেন। ডাক্তার বার্‌থোলও বলেন "তরুণ আমাশয় রোগে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।"

আমাশয়ের তরুণাবস্থায় যখন অত্যন্ত টাটানি, বেদনা, জ্বর এবং আম-রক্ত সংযুক্ত দাস্ত হয়, সেই সময়েই ইহা বিশেষরূপে উপযোগী। ইহা প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রনা এবং কোঁতপাড়া ও টাটানি নিবারণ হয়।

ডাক্তার লিহি, ডাক্তার বার্‌থোলওর এই উপরি উক্ত মত, ডাক্তার এন্‌-ডারসনের নিকট অবগত হইয়া উক্ত ঔষধ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার লিহি হাইড্রাবাদে ৯৫ জন রোগীর উপর এই ঔষধের পরীক্ষা করেন। এই সমস্ত রোগীই হীনাবস্থার লোক এবং সকলেই শারীরিক অবস্থা খারাপ ছিল। এই ৯৫ জনের মধ্যে তিন জন মাত্র মারাপড়ে। তিনি সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেন। ৭ আউন্স জলে দ্রব হয়, এইরূপ পরিমাণে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্‌নেসিয়া লইয়া ঐ পরিমাণ জলে দ্রব করিবে, পরে তাহাতে ১ আউন্স ডাইলুটেড্ সলফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া দিবে। ১ টেবল্‌স্কুন ফুল মাত্রায় এই ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতি দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিবে। ঔষধ দিবার সময় প্রত্যেক মাত্রায় এক ওয়াইন গ্লাস্ ফুল জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। দাস্ত আরম্ভ হইলে আর ঔষধ দিবে না। এই ঔষধের সঙ্গে লডেনম মিশ্রিত শ্বেত সারের এনিমা দিবে। ডাক্তার লিহি সচরাচর উপরি উক্ত সল্যুসেনের ১ ড্রাম্ লইয়া তাহাতে দশ মিনিম ডাইলুটেড্ সল্‌ফিউরিক এসিড্ যোগ

করিয়া এক বা দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিতেন। এইরূপে প্রয়োগ করিতে করিতে দাস্ত হইতে আমরক্ত দূর হইয়া মলের বর্ণ স্বাভাবিক হয়। জ্বর কমিয়া যায় এবং বেদনা টাটানি দূরীভূত হয়। তৎপরে যখন রোগী ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ৩।৪ বার মাত্র মলত্যাগ করে এবং মল স্বাভাবিক আকার ধারণ করে, তখন একটু অহিফেনের আরক বা একসট্রাকট অহিফেন বটিকাকারে খাওয়াইয়া দিলেই রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

ডাক্তার লিহি এই চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। (১) এই চিকিৎসায় রোগীর বলহানি করে না (২) ইহাতে বমন বা বমনোদ্বেগ হয় না (৩) ইহাতে রোগীকে সুস্থ করে (৪) এই ঔষধে অন্ত্রে ক্ষত হইতে পারে না অথবা যদি পূর্ব্বেই ক্ষত হইয়া থাকে, তবে সে ক্ষত আর বিস্তৃত হইতে পারে না। ইপিকাক অপেক্ষা এই ঔষধ সুতরাং তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ।

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,

অবলা-বান্ধব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জয়া কহিলেন, ভাল বোন্! কোন্ কোন্ মেয়েমানুষ প্রতিবৎসরেই এক একটী করিয়া সন্তান প্রসব করে কিন্তু সেই সকল সন্তানের মধ্যে কদাচিৎ দুই একটী বাঁচিয়া থাকে, অনেকেই নানাপ্রকার পীড়ায় জড়িত হইয়া অবশেষে জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সংসার হইতে চলিয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ কি?

তাই শুনিয়া বিজয়া কহিলেন, সকলেই বেশ অবগত আছেন যে, গর্ভিণী মেয়েদিগের স্তন্য অতিশয় গাঢ় এবং গুরুপাক হইয়া থাকে। যদি একটী সন্তান স্তন্য ত্যাগ না করিতেই জননী আবার গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া সন্তানের প্রথমে অগ্নিমান্দ্য তারপর উদরের পীড়া হইয়া থাকে। সেই সময় জননী দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিলে প্রথম সন্তানের পীড়া আরও সাংঘাতিক হইয়া উঠে। অর্থাৎ উপযুক্ত রূপে লালন

পালন না হওয়ায় এবং একযোগে অধিক পরিমাণে তরল স্তন্য পান করায় দুই একমাস মধ্যেই প্রথম সন্তানটী যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি রোগে জীবন ত্যাগ করে। কিন্তু সেই সময় হইতেই দ্বিতীয়টীরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে থাকে। কেন না যে স্তন্য দ্বারা একজনের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইতে পারে, সেই স্তন্য দুইজনে পান করায় দ্বিতীয় সন্তানও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। সেই সময় জননী আবার গর্ভবতী হইয়া যদি আরও একটী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় সন্তান ও অগ্রজের অনুবর্ত্তী হয়। এইরূপে জননী যত সন্তান প্রসব করে, তাহার সকল গুলিই নানাপ্রকার পীড়ায় জড়িত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়। কদাচিৎ দুই একটী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। যে পীড়া দ্বারা এইরূপে সকল গুলি সন্তানই বিনষ্ট হয়, সেই পীড়াকে পারিগর্ভিক কহে। ইতি পূর্ব্বে যে মেয়েদিগের পুত্রঘ্নী বা মৃতবৎসা রোগের কথা বলা হইয়াছে, সেই রোগে প্রসব সময় প্রসূতিকে সাতিশয় যন্ত্রণা পাইতে হয়, কিন্তু ইহাতে আর কাহাকেও প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

জয়া। তবে এইরূপ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার কি কোনও উপায় নাই?

বিজয়া। তা থাকিবে না কেন? জগদীশ্বরের এমন ইচ্ছা নয় যে, প্রতিবৎসরেই এক একজনে এক একটী সন্তান প্রসব করিয়া আপনিও সর্ব্বদা জ্বালাতন হউক এবং সেই সন্তানকেও সর্ব্বদা জ্বালাতন করিয়া অকালে কালগ্রাসে নিঃক্ষেপ করুক। আজ কাল শুনিতে পাই স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ অর্থাৎ কৃত্রিম নিয়মের অনুসরণ না করিলে কখনও সভ্য হওয়া যাইতে পারে না। কেন না জীব স্বভাবতঃ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ অর্থাৎ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া সকলকেই সভ্য হইতে হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ কৃত্রিম নিয়মানুসারে কার্য্যাদি না করিয়া কোন্ মূর্খ আপনাকে ঘোর অসভ্য বলিয়া পরিচয় দিবে? প্রসবান্তে কাহারও শীঘ্র শীঘ্র ঋতুকাল উপস্থিত হইয়া, আবার ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও স্ত্রীসংসর্গ করা উচিত নহে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। কে এই নিয়ম অনুসারে চলিয়া অসভ্য হইয়া পড়িবে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে পর্য্যন্ত সন্তান আপনার প্রযত্নে আপনি পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া

ঋতুরক্ষা করিলে ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, কিন্তু তাহা কেহই করেন না। বরং প্রসবের পর শীঘ্র শীঘ্র রমণীর অঙ্গ সঙ্গ করিয়া যাহাতে তাহার জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে আরও শীঘ্র শীঘ্র ঋতুকাল সমাগত হয়, তাহাই সকলে করিয়া থাকেন। ইহাতে সন্তানের অনিষ্ট না হইয়া আর কি হইবে?

জয়া। আচ্ছা, প্রসবের পর ৪।৫ মাস অথবা বৎসরান্তেই স্ত্রীলোকদিগকে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাল মধ্যে সন্তান কখনও আপনার যত্নে আপনি পালিত হইতে পারে না। আবার ঋতু সময়ে ঋতুরক্ষা না করিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাপভাগী হইতে হয়, ইহাঁর উপায় কি?

বিজয়া। সংসারে সকল কর্ম্মই পাপপুণ্য মিশ্রিত। কোন কর্ম্মে পাপের ভাগ অধিক, আবার কোন কর্ম্মে পুণ্যের ভাগই অধিক, যাহাতে পুণ্যের ভাগ অধিক, তাহাই সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। প্রজা বৃদ্ধি করাই ঈশ্বরের একমাত্র অভিপ্রায় এবং তজ্জন্যই ঋতুরক্ষা করা কর্ত্তব্য। নতুবা জীবহত্যার পাপভাগী হইতে হয়। অনিশ্চিতভাবী জীবের রক্ষা জন্য বর্ত্তমান নিশ্চিত জীবের বিনাশ সাধনে যত্ন করা কোন মতেই উচিত হইতে পারে না।

জয়া। যাহারা কিছুতেই সংসর্গ না করিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদিগের অনিষ্ট নিবারণের কি কোনও উপায় নাই?

বিজয়া। তাহাদের পক্ষে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শুক্র শোণিতের বীর্য্যহীন করাই উচিত।

জয়া। তাহাতেও ত জীবহত্যার পাপ হইতে পারে?

বিজয়া। সে কথারও ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বেশী পাপ অপেক্ষা কম পাপভাগী হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে। অনিশ্চিত সন্তানের মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিত সন্তানের হিত কামনাই উচিত। সন্তানের উপযুক্ত বয়োপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত যাঁহারা ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারেন, তাঁহাদের জন্যই ঔষধের ব্যবস্থা।

জয়া। তবে সেই সকল ঔষধের কথাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। যে রমণী ঋতুর প্রথম তিনদিন কাঁজীর সহিত এক বা দেড় আনা পরিমাণ সিদ্ধি বাঁটিয়া সেবন করে, তাহার আর সেই বার গর্ভোৎপত্তি হয় না। এস্থলে যে সকল ঔষধের কথা বলা

যাইতেছে, তাহা প্রত্যেক বার রজোপ্রবৃত্তির সময়ই ব্যবহার করিতে হইবে। রমণী ঋতুমতী হইলে তিনদিন পর্য্যন্ত যদি পিপুল, সোহগার খই এবং বিটলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ বা জলের সহিত সেবন করে, তবে তাহার আর গর্ভ সঞ্চার হয় না। রসাঞ্জন, হরিতকী, আমলকী এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে শীতল জলের সহিত অথবা কেবল আকনাদি পত্র শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলেও গর্ভ সঞ্চারের ব্যাঘাত হয়। এই দুইটী ঔষধ ঋতুস্নান করিয়া কেবল মাত্র একদিন সেবন করিতে হয়। প্রথম ঋতু শোণিত নির্গত হওয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যদি কেহ কাঁজী ও পুরাতন গুড়ের সহিত তিনটী জয়ন্তী পুষ্প বাঁটিয়া ৮ তোলা পরিমাণে তিন দিন পর্য্যন্ত সেবন করে, তবে সেই ঋতুতে কখনও তাহার গর্ভ সঞ্চার হয় না।

(ক্রমশঃ)

জলপাইগুড়ী,
দিনাজপুর।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত জয়া ও বিজয়ার কথোপকথন গুলি যে বেশ শ্রুতি-মধুর অথচ সম্পূর্ণ সত্য ও হিতগর্ভ, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

চি, স, সম্পাদক।

চিকিৎসা-সম্বাদ।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়!

অনেক দিন হইতে আপনাদের চিকিৎসা সম্মিলনীতে একটা বিষয়ের আলোচনা করিব, মনে করিতেছি; কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে না। যখন আপনাদের একখানি পত্রিকার কোন একটী প্রবন্ধ পাঠ করি, তখনই সেই বিষয়ে কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয়। পরক্ষণে মনে হয় যে, কেবল বাদপ্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না। যখন ডাক্তারেরা ভালরূপে কবিরাজীতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন এবং কবিরাজেরাও সেইরূপ ডাক্তারীতত্ত্বে অধিকার লাভ করিবেন, তখন উভয়পক্ষ বুঝিতে পারিবেন যে,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—মূলে এক, কেবল অবতার-ভেদ মাত্র।

সে যাহা হউক, অদ্য একটী নূতন বিষয় লইয়া আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। বিষয়টি পুরাতন হইলেও কেহ কেহ নূতন মনে করিবেন। বোধ করি এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র কুমার সেন কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-প্রণালী বর্ত্তমান অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়দিগের হইতে স্বতন্ত্র ছিল। শাস্ত্রে যে সকল বাঁধা পাচন বটিকা প্রভৃতি আছে, তাহা তিনি প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন না। প্রয়োগ করিলেও, অবস্থাবিশেষে, তাহাদিগের আংশিক পরিবর্ত্তন কিম্বা তাহাদিগের সহিত অন্য ঔষধের সংযোজন করিয়া দিতেন। এরূপ চিকিৎসা, শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয়, বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক, তাহা পাঠক নিজেই বুঝিয়া লইবেন। তাঁহার ব্যবস্থা পত্র ও বিদেশস্থ রোগীদিগের পত্র সকল বর্ত্তমান আছে। সেই সকল হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, পাঠকগণকে ক্রমশঃ উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি। সেই কাগজ পত্র গুলি এক স্থানে থাকিলে কালে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তাহার বিষয় গুলি কোন চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকায় স্থান পাইলে দশ জন শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া, তদ্বিষয়ের আলোচনা হয়; এবং তাহাতে ভবিষ্যতে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেও পারে। অদ্য নিম্নে একটী চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ দিতেছি।

রোগী—বাবু বলরাম দাস। তিনি কটকজেলার বাঁকী মহকুমার সব-ডেপুটী কলেক্টার। তাঁহার প্রথম ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম; বাঁকী ৬ অক্টোবর। ১৮৮৯

"প্রিয় মহাশয়! আমি এক বৎসর হইল Bronchitis (এক প্রকার কাস) রোগে কষ্ট পাইতেছি। কিছু দিন স্থানীয় চিকিৎসা করাইয়া কোন উপকার না পাইয়া, পরে কলিকাতার কবিরাজ——মহাশয়ের "মৃগাঙ্কদ্রব (?) কিছু কাল ব্যবহার করিয়াও কিছুই উপকার পাই নাই। কোন বন্ধুর পরামর্শে আপনার চিকিৎসাধীনে উপস্থিত হইলাম। কলিকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর। আমার ৪টী সন্তান হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি। অজীর্ণই উপস্থিত রোগের কারণ বোধ হয়। প্রথমে ঘং ঘং করিয়া কাসী হইত, এক্ষণে 'Bronchial tubes' (বায়ুনলী) শ্লেষ্মায় পূর্ণ থাকায় 'Difficult breathing'

(হাঁপ) হয়। পূর্ব্বে স্থূল ছিলাম, এক্ষণে দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যহ এক পয়সার অহিফেণ খাই। ক্ষুধা ভাল রূপ হয় না।

ঔষধের ব্যবস্থা।

মুক্তাভস্ম	৪ রতি	১৫ পুরিয়া
অভ্রভস্ম	৪ রতি	
হিঙ্গুলেশ্বর	১৫ টী	

এক পুরিয়া করিয়া প্রাতে পিপুল চূর্ণ ২ রতি মধু অনুপানে।

শঙ্খভস্ম	৪০ রতি	একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে।
সাচিক্ষার	৪০ রতি	
শুঁঠ চূর্ণ	৫ রতি	
বড়এলাইচ চূর্ণ ...	৫ রতি	
অঙ্গার চূর্ণ	৫ রতি	

।০ এক আনা (৬ রতি) করিয়া বেলা ২টার সময় জল অনুপানে।

চ্যবনপ্রাশ ৪ তোলা। ।০ চারি আনা করিয়া রাত্রি ৮টার সময় উষ্ণ ছাগদুগ্ধ ।০ একছটাক অনুপানে। *

---

* মুক্তা, অভ্র, শঙ্খ প্রভৃতি কেমন করিয়া ভস্ম করিতে হয় এবিষয়, যদি চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কেহ না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে পরে লিখিতে পারি। হিঙ্গুলেশ্বরঃ—"তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষং। দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে॥ গুঞ্জার্দ্ধমিতি কেচিৎ।" বাতজ্বরের একটী ঔষধ। পিপুল, শোধিত হিঙ্গুল ও মিঠে প্রত্যেক সমান ভাগ লইয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। সেই সকল বড়ীর নাম হিঙ্গুলেশ্বর। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম যোগে মুক্তা, অভ্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও মিঠে এই ৫টী দ্রব্য আছে। অঙ্গার অর্থাৎ কয়লা (charcoal); সুঁদূরী কাঠের কয়লা হইলে ভাল হয়। চ্যবনপ্রাশ—চরক চিকিৎসা স্থানে প্রথম অধ্যায় দেখুন। চ্যবনপ্রাশে অনেক দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে আমলকী, তিলতৈল, ঘৃত, মধু, মিছ্‌রী, বংশ লোচন ও পিপুল প্রধান। ইহা কাস শ্বাসের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাদির ব্যবস্থা।

যাহা অনায়াসে পরিপাক হয়, এরূপ দ্রব্য আহার। তরকারী প্রভৃতি দুষ্পাচ্য দ্রব্য একবারে পরিত্যাগ। কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা। বিশেষতঃ রাত্রির আহার খুব কম। প্রাতে পুরাতন চাউলের অন্ন; মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি ছোট মৎসের ঝোল অথবা চচ্চড়ী। দুগ্ধ প্রাতে ঔষধ সেবনের ১ঘণ্টা পরে কিছু, বিকালে কিছু, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে, বার্লির সহিত কিছু। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহারই রাত্রির আহার, অন্য আহার নিষেধ। অহিফেণ একবারে ত্যাগ করা; একবারে না হয় ক্রমশঃ। সরিষার তৈল মাখিয়া নদীতে স্নান। একটু একটু পদচারে ভ্রমণ। স্ত্রীসেবা না করাই ভাল; নিতান্ত পক্ষে পক্ষান্তে একবার।

দ্বিতীয় পত্রের মর্ম্ম ঃ——"বাঁকী, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৯।

প্রিয় মহাশয়!

ঔষধ সেবন ও পথ্যাদির নিয়ম পালন করিয়া কিছু ভাল আছি। দুর্ব্বলতা পূর্ব্বের ন্যায়। কখন কখন স্বপ্নবিকার হইয়া দুর্ব্বল করে। অহিফেণ অনেক কমাইয়াছি। নদীতে স্নান ক্রমশঃ অভ্যাস করিব। ঔষধ পাঠাইবেন।

ঔষধের ব্যবস্থা।—প্রায় সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায়। কেবল চ্যবনপ্রাশ রাত্রিতে না সেবন করিয়া প্রাতে সেবন করা; এবং মুক্তাভস্ম যোগে 'হিঙ্গুলেশ্বর' না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গভস্ম ৮ রতি ও মকরধ্বজ ২ রতি। ঔষধ ১৫ দিনের উপযুক্ত পাঠান হয়।

তৃতীয় পত্র——"বাঁকী—১২—১১—৮৯।

প্রিয় মহাশয়! একটু একটু কাসী আছে। শ্বাস (difficult breathing) একবারে নাই। দুর্ব্বলতার কিছুই হ্রাস হয় নাই। অহিফেণ এখনও বন্ধ করিতে পারি নাই।

ঔষধের ব্যবস্থা—পূর্ব্বেকার সমস্ত ঔষধ এক মাসের উপযুক্ত পাঠান হয়। মুক্তাভস্ম যোগের মধ্যে বঙ্গভস্মের মাত্রা অর্দ্ধেক।

৪র্থ পত্রের মর্ম্ম;——"বাঁকী—২৪—১১—৮৯।

প্রিয় মহাশয়! ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছি। অহিফেণ বন্ধ করিয়াছি।

৫ম পত্রের মর্ম্ম ঃ——"বাঁকী—১৫—১২—৮৯।

প্রিয় মহাশয়! ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছি। পত্র পাঠ একমাসের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইবেন।"

৬ষ্ঠ পত্র——"বাঁকী ১—১—৯০।

প্রিয় মহাশয়। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

মন্তব্য!

ডাক্তারেরা যাহাকে bronchitis বলেন, আয়ুর্ব্বেদে ঠিক সেইরূপ রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথবা, তাহার উল্লেখ থাকিলেও আমরা কোনটী তাহা ঠিক করিতে পারি না। Bronchitis কাস শ্বাস মিলিত একটী রোগ। বাবু বলরামদাসের প্রথম পত্রের উত্তরে কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় লেখেন, "আপনার পীড়ার বিষয় পাঠ করিয়া স্থির করিলাম যে, এখন হইতে সাবধান না হইলে আপনার পীড়া শ্বাসরোগে পরিণত হইবে।" শ্বাস সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলে তাহাকে বহিষ্কৃত করা বড় কঠিন ব্যাপার হইত, সন্দেহ নাই। Bronchitis এ প্রায়ই একটু জ্বর থাকে, এই ভাবিয়া প্রথমে "হিঙ্গুলেশ্বর" প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু যখন জ্বরের উপদ্রব তত অনুভব হইল না, তখন তাহা উঠাইয়া দিয়া অন্য বলকারক ঔষধ দেওয়া হইল। ৬ অক্টোবর। ১২৮৯ হইতে ১ জানুয়ারী। ৯০ প্রায় তিস মাস। যদি রোগী চিকিৎসকের নিকটে থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তিন মাস অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন। সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করা সম্বাদ দেওয়ার পরও বাবু বলরাম দাস পুনর্ব্বার, বোধ করি অত্যাচার করিয়া, রোগে আক্রান্ত হইয়া পত্র লেখেন। এবারে রোগ তত বেশী না হইয়া জ্বরের ঔষধ সেবনে অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা,
৪ বৈশাখ ১২৯৯।

শ্রীকিরণচন্দ্র গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধলেখক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় স্বর্গীয় খ্যাতনামা ব্রজেন্দ্রকুমার কবিরাজ মহাশয়ের ভাগিনেয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইহাঁর বিশেষরূপ দখল আছে। বয়সে নবীন হইলেও বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা ইহাঁর যথেষ্টই আছে। সুতরাং তাঁহার দ্বারা যথাযথ সংগৃহীত এরূপ প্রবন্ধ দ্বারা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের অনেকটা উপকার দর্শিতে পারিবে, সে আশা আমাদের বিলক্ষণ আছে।

চি, স, সম্পাদক।

দেশীয় ঔষধ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক
মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়! মুষ্টিযোগ প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে নিম্নের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাটি সমধিক আহ্লাদিতচিত্তে লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, স্বদেশানুরাগী পাঠকবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থে ইহা সম্মিলনীর কোন অংশে স্থান প্রাপ্ত হইয়া আমাকে সফলশ্রম করিবে।

একটি [illegible], যুবা পুরুষ, দীর্ঘাকৃতি, দরিদ্র, পেশা গাড়োয়ানী। বিগত ১২৯৮ সালের ১২ শ্রাবণ রাত্রিযোগে গাড়িবহন করতঃ জাগরণ ও শিশির ভোগ করে, পরদিবস প্রাতঃকাল হইতে তাহার রক্তবমন হইতে আরম্ভ হয়। অনেক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ার পর ১৪ই শ্রাবণ বেলা ১১ টার সময় আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা গিয়া দেখি, রোগী বিছানায় ছট্ ফট্ করিতেছে। কোন পার্শ্বেই শয়ন করিতে পারে না, উঠিয়া বসিলে অধিক রক্তস্রাব হয়, চাপ চাপ লাল রক্ত ঝলক্ ঝলক্ স্রাব হইতেছে; চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, তৃষ্ণা, সর্ব্বদাই শীতল জল খাইতে চাহিতেছে; মধ্যে মধ্যে "আমি আর বাঁচিলাম না" এইরূপ চিৎকার করিতেছে। কোষ্ঠবদ্ধ, মুখমণ্ডল উদ্বেগযুক্ত ও ভীত ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া আমাদের একোনাইটের কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্ব কতকগুলি গাছড়া ঔষধাদি রোগী সেবন করিয়াছিল, বিশেষতঃ রাত্রিজাগরণ লক্ষ্য করিয়া প্রথমে একমাত্রা নক্সভমিকা ৩০ দিয়া

একোনাইট ৩০ তিন মাত্রা রাখিয়া দুঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে বলিয়া আসিলাম। ৬ ঘণ্টা পর একবার সংবাদ পাইলাম যে "রোগী অনেক ভাল, রক্তস্রাব অনেক কম, একবার দাস্ত হইয়াছে। ঔষধ দুই মাত্রা মাত্র সেবন করান হইয়াছে।" অবশিষ্ট ঔষধ মাত্রা একপ্রহরের অধিকক্ষণ দেখিয়া রক্ত বন্দ না হইলে খাওয়াইতে বলিয়া দেওয়া হইল। রাত্রি বারটার সময় পুনর্ব্বার অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে আমাদের ডাক আসিল; তখন গিয়া দেখি, ভয়ানক বেগে রক্তস্রাব হইতেছে, রোগী পূর্ব্বপেক্ষা অধিকতর অস্থির হইয়াছে। পিপাসাদি পূর্ব্বলক্ষণ কিছুই তেমন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিল, এক্ষণে তাহাতে অপারগ, একোনাইট ৩×এক ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করায় দুই মাত্রা ঔষধ সেবনের পর রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিবস সংবাদ পাইলাম রোগী ভাল আছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল। চায়না ৩০ দুই মাত্রা দুইবেলা খাইতে দেওয়া হইল। শুনিলাম রোগী সুন্দর সুস্থ হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে বিশেষ তাড়াতাড়ি রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য হইলাম। এবারে দেখিলাম রোগীর পূর্ব্বের ন্যায় অস্থিরতাদি কোন লক্ষণ নাই। নিতান্ত নিস্তেজাবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রায় প্রতি মিনিটে গলায় খেঁখার দেওয়ার ন্যায় করিতেছে, আর আদপোয়া তিনছটাক পরিমাণ লালরক্ত উঠিতেছে। রোগীর আত্মীয় বর্গ কাঁদিয়া আকুল, আমরাও বিশেষ চিন্তিত হইয়া হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়ামেডিকা অন্বেষণ করার সময় অল্প দেখিয়া দেশী ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম। জগডুম্বুরের রস এক তোলা কিঞ্চিৎ মধুদিয়া একঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা প্রয়োগ করিতে বলিয়া আসিলাম। এদিকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দুইঘণ্টা পরে সংবাদ পাইলাম "রক্ত বন্ধ হইয়াছে। পরদিবসও ভাল থাকা সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত সেই রোগীর আর কখনও রক্তস্রাব হয় নাই। স্বদেশে এমন অত্যাশ্চর্য্য মুষ্টিযোগ সকল থাকিতে আমরা কেনই যে অন্ধ হইয়া বিদেশী ঔষধের ভৈষজ্য-তত্ত্ব পড়িয়া পড়িয়া সময় কাটাইতেছি, তাহা বুঝিতে পারি না। জানিনা আমাদের এ দশা আর কতকাল চলিবে!!

পুঠিয়া, রাজসাহী।

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার,
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যজ্ঞডুম্বুরের এক রক্তরোধক শক্তির পরিচয়েই প্রবন্ধ লেখক এত চমৎকৃত হইয়াছেন, না জানি প্রমেহাদি অন্যান্য রোগের শান্তির পক্ষে যজ্ঞডুম্বুরের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইলে তিনি কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হন্?

চি, স, সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

মুষ্টিযোগ।

১। জ্বরাধিকার।

১।* সাতখণ্ড কেশুচ্যের মূল আদার সহিত ভক্ষণ করিলে, বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং দ্বন্দ্বজ জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। কেশুচ্যেকে স্থানবিশেষ কেশুরে বা কেশরাজ বলে।

২।* শুঁঠ, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, প্রত্যেক ৩১ রতি ওজন লইয়া ক্বাথ করতঃ সেবন করিলে কম্প ও তীব্র বেদনা বিশিষ্ট বাতিক জ্বর শীঘ্র নষ্ট হইবে।

৩।* রবিবার দিবসে অপামার্গের (আপাঙ্গ) জটা (সিকড়) সাতগাছি লাল সুতা দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে যে কোন রকম পিত্তজ্বর, পালা, ত্র্যাহিক ইত্যাদি উৎকট জ্বর শীঘ্র আরাম হইবে।

৪।* কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা রোগীকে আবৃত করিয়া গুগ্‌গুল (গুগ্‌গুল) ও উলুকের পুচ্ছ (উলুরকুল) দ্বারা ধূপিত করিলে চাতুর্থক অর্থাৎ ত্র্যাহিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

৫।* ধন্নিয়া /৮ পোয়া, নিমছাল /৷ পোয়া, চিরতা /৷ পোয়া, হরিতকী /৷ পোয়া, এই একসের দ্রব্য ।৬ শোল সের জলে জ্বাল দিয়া /১ একসের থাকিতে নামাইয়া এক ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেবনে প্লীহা সংযুক্ত জ্বর, অতি প্রাচীন জ্বর, জ্বর সংযুক্ত জড়িভূত ব্যারাম এবং ঔষধ শঙ্কর জ্বর (অর্থাৎ বহুবিধ ঔষধ সেবনেও যাহার কোন উপকার হয় নাই) আদি উৎকট রোগী আরাম হয়।

৬।* কুকুরসোঁকার পাতার রস দুই তোলা, পরিষ্কার চিনি এক তোলা সহ খালিপেটে প্রাতঃকালে ২১ দিন সেবন করিলে বহুকালের প্রাচীন জ্বর এবং ঔষধ শঙ্করাবস্থা আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

৫। দ্বিতীয় গুড়ূচ্যাদি।

গুলঞ্চ, বহেড়া, নিমছাল, হরিতকী,
পটলের পাতা আর তাহে আমলকি,
চারি আনা মধু দিয়া এই ক্বাথ পানে,
বিনাশ করিবে অম্লপিত্তজ বমনে।

৬। দশমূল পাচন।

গাম্ভারী, পারুলি, বিল্ব, সণা, গণিয়ারী,
শালপাণি, চাকুলে, বৃহতি, কণ্টিকারী,
গোক্ষুর সহিত দশ পুরণ করিবে;
এ সবার মূল হ'তে বাকল তুলিবে।
এ ক্বাথ সেবনে নাশে সান্নিপাত জ্বর,
শ্বাস, কাশ নাশে আর পার্শ্বব্যথাহর।
পিপুল চূর্ণের সহ সেবন করিলে,
হৃদয় কণ্ঠের ব্যথা নাশে এককালে।

৭। কট্‌ফলাদি পাচন।

কট্‌ফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গন্ধতৃণ, মুতা,
হরিতকী, দেবদারু বামনহাটি, তথা।
ধ'নের চাউল, ক্ষেৎপাপড়া, বচ আর শুঁঠ,
মৃদুজ্বালে এসকল হবে পরিস্ফুট।
চারি আনা মধু কিম্বা হিং একরতি,
ছিটা দিয়া দুই বেলা পান কর যদি,
ক্ষয়রোগ, কণ্ঠরোগ, বাত, শ্বাস, কাস,
নিশ্চয় ইহাতে সব করিবে বিনাশ।

৮। অষ্টাদশাঙ্গ পাচন।

বিল্ব, সণা আদি দশমূলের যে ছাল,
শটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী তাহে করিবে মিশাল,

হরালতা বামন্‌হাটী, কুড়, ইন্দ্রযব,
কটকী, পটলপাতে মিলাইবে সব,
হৃদয় বেদনা, হিক্কা, সন্নিপাত জ্বর,
শ্বাস কাশ বমি, ব্যথা পার্শ্বের ভিতর,
ছট্‌ফটি, ভূলবকা জ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে,
এ সব আরোগ্য হবে এ কাথ সেবনে।

৯। ভার্গ্যাদিপাচন।

সণা, বিল্ব আদি ছাল লও দশমূল,
মিশাও তাহাতে ক্ষেৎপাঁপড়া পিপুল,
বামন্‌হাটি, কুড়, শুঁঠ, হরিতকী মুতা,
একত্রে কুটিয়া কাথ কর যথা প্রথা।
এ পাঁচনে অগ্নিমান্দ্য, শোথ, জীর্ণ জ্বর,
নিশ্চয় নাশিবে; হবে অতি হিতকর।

১০। বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন।

সণা, বিল্ব আদি পূর্ব্ব উক্ত দশমূল,
বামনহাটি, কুড়, মুতা, গুলঞ্চ, পিপুল;
ক্ষেৎপাঁপড়া, হরিতকী, কটকী ও শুঁঠ,
মৃদুজ্বালে এ সব করিবে পরিস্ফুট,
মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, ধাতুগত জ্বর,
যকৃত ওদ্ম ও শোথে হবে হিতকর।

পুঠিয়া, রাজসাহী। } শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার,

উত্তাপহারক ঔষধ।

(এলোপ্যাথিক)

এণ্টিপাইরিণ, এণ্টিফেব্রিণ এবং ফিনাসিটীন জ্বরের ভোগকাল কমাইতে পারে না। অর্থাৎ যে সকল জ্বর নির্দ্দিষ্ট সময় গত না হইলে আরাম হয় না, এই সকল ঔষধ প্রয়োগে সে সময় কম করা যায় না। সবিরাম জ্বর ও টাইফয়েড জ্বর এই শ্রেণীর। কিন্তু কতকগুলি সামান্য সামান্য একজ্বর এই সকল ঔষধ প্রয়োগে একবারে ছাড়িয়া যায়। যথা, রৌদ্র বা হিম ভোগ করিয়া সামান্যাকারের জ্বর হইলে এক ডোজ পূরা মাত্রায় এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। আর কোনও প্রকার ঔষধের আবশ্যক হয় না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইলে অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং গাত্র বেদনা হয়। দেখা গিয়াছে এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগে এই সকল যন্ত্রণার নিবারণ হয়। যে কোন জ্বরে হউক, গাত্রদাহ, শিরঃপীড়া, হাত পা কামড়ানী প্রভৃতি নিরারণ করিতে এণ্টিফেব্রিণের তুল্য ঔষধ নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত গাত্র দাহ, পিপাসা, গাত্র বেদনা এবং শিরঃপীড়া হইলে ৫। ১০ গ্রেণ মাত্রায় এক ডোজ এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগ করিলে সমস্ত যাতনা যেন জল হইয়া যায়। জ্বর ব্যতীত স্নায়ুঘটিত শিরঃপীড়া, সর্দ্দি লাগিয়া মাথা ভার ও শিরঃপীড়া, হইলে এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়। আধকপালে মাথা ধরায় (হেমিক্রিণিয়া) এণ্টিফেব্রিণ উপকার করে। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এই তিনটী ঔষধের মধ্যে এণ্টিফেব্রিণই ভাল। কারণ, ইহা একবার প্রয়োগ করিলে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগী স্থির থাকে, ঐ সময় মধ্যে রোগী বোধ করে যেন তাহার কোনই অসুখ নাই। দৈবক্রমে মাত্রা কিঞ্চিৎ বেশী হইলে এণ্টিফেব্রিণে এণ্টিপাইরিণের ন্যায় ভয়ের কারণ নাই। একটী ৪ বৎর বয়স্কা বালিকার ১০৪ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া জ্বর হইয়াছিল। আমি ৩ গ্রেণ মাত্রায় দুইটী পুরিয়া তৈয়ার করিয়া রোগীর মাতাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে কেবলমাত্র, একটী এখন খাওয়াইবে এবং আর একটী রাখিয়া দিবে, কিন্তু রোগীর অবিভাবক ব্যস্ততাক্রমে একঘণ্টা পরে আর একটী খাওয়াইয়া ফেলে। কিয়ৎকাল মধ্যেই রোগীর অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হয় এবং রোগীর অবিভাবক ভয় পাইয়া আমাকে সম্বাদ দেন। আমি উপস্থিত

হইয়া দেখি, রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতেছে, কিন্তু রোগী উঠিয়া বসিয়াছে এবং তাহার ধাত বেশী দুর্ব্বল হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে এণ্টিপাইরিণ দেওয়া নিষেধ, সে সকল স্থানে অল্পমাত্রায় এণ্টিফেব্রিণ বা ফিনাসিটীন প্রয়োগে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। নিউমোনিয়া রোগীতে ডাক্তারগণ আজ কাল ফিনাসিটীন ব্যবহার করিতেছেন; কিন্তু ফিনাসিটীন উত্তাপ লাঘব করিলেও নিউমোনিয়ার বিশেষ কোন উপকার করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় নিউমোনিয়ায় এই সকল ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল নাই। সেইরূপ যে কোন প্রকারের প্রদাহজনিত জ্বরে (যেমন একুট্ মিটাইটিস্) ফিনাসিটীন বা এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগে বিশেষ কোন উপকার হইতে দেখা যায় না।

স্বল্পবিরাম জ্বরে এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উত্তাপ কম পড়িলে অনেক চিকিৎসক পুনঃ জ্বরাক্রমণ নিবারণোদ্দেশে কুইনাইন্ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই সকল কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ লাঘব করিয়া কুইনাইন্ প্রয়োগে কোন প্রকার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই স্থলে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, জ্বরের হ্রাস দেখিলেই কুইনাইন্ খাওয়ান ডাক্তারদিগের একটী রোগ। বলা বাহুল্য যে, প্রদাহজনিত জ্বরে, টাইফয়েড্ জ্বরে, হাম ও বসন্ত জ্বরে এবং কতকগুলি স্বল্পবিরাম জ্বরে কুইনাইন্ প্রয়োগে কোনই ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল এক মাত্র ম্যালেরিয়া উদ্ভূত জ্বরেই কুইনাইন্ প্রয়োগে উপকার করে। সকল প্রকার স্বল্পবিরাম জ্বরে বিরামাবস্থায় কুইনাইন্ প্রয়োগে উপকার হয় না। অথবা এণ্টিফেব্রিণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে জ্বর ছাড়াইয়া কুইনাইন্ দিলেও কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, আমাদিগের দেশে দুই প্রকারের স্বল্পবিরাম জ্বর আছে।

এক শ্রেণীর জ্বরে বিরামাবস্থায় নিয়ম পূর্ব্বক কুইনাইন্ প্রয়োগে ক্রমে ক্রমে জ্বরের ভোগকাল কম পড়িয়া অন্ততঃ ৩ সপ্তাহ গত না হইলে কোন ক্রমেই আরাম হয় না। প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ এই শেষোক্ত প্রকারের জ্বরেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, এই শ্রেণীর জ্বর ম্যালেরিয়া সম্ভূত নহে। আমাদিগের দেশে ডাক্তারদিগের মধ্যে ডাক্তার মূর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পুস্তকে (Clinical Researches into the Diseases of

India) এই জ্বরের বিশেষত্ব লিপিবদ্ধ করেন। মূরের গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়, মূর দুই শ্রেণীর স্বল্পবিরাম জ্বর স্বীকার করিয়াছেন। এক শ্রেণী ম্যালেরিয়া সম্ভূত———অপর শ্রেণী অন্য কারণ সম্ভূত। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ম্যালেরিয়াসম্ভূত স্বল্পবিরাম জ্বর হঠাৎ আরম্ভ হয়। শীতবোধ, বমন প্রভৃতি জ্বরের প্রারম্ভে প্রায়ই হইয়া থাকে। অথবা প্রথমে সবিরাম জ্বর হইয়া কয়েক দিবস পরে ক্রমে ক্রমে ঐ জ্বর স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। কিন্তু অন্য প্রকারের স্বল্পবিরাম জ্বর ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়। রোগী নিজেও বড় একটা বুঝিতে পারে না। দুই চারি দিন ছাড়িয়া ছাড়িয়া অল্প অল্প জ্বর হইয়া ক্রমে অধিক জ্বর হয়। এই জ্বরে কম্প হয় না। প্রথম যে দুই এক দিন ছাড়িয়া জ্বর হয়, দেখা গিয়াছে, সেই সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন্ প্রয়োগ করিলেও জ্বরের গতি রোধ হয় না। এই জ্বর সচরাচর গ্রীষ্মকালে হইয়া থাকে। অন্যান্য সময়েও না হয় এমত নহে। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার ততদূর প্রকোপ নাই, সেই সকল স্থানেই এই জ্বরের খাঁটী নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনাতন সময়ে, কলিকাতা সহরে এইরূপ ধরণের জ্বর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত প্রকারের জ্বরে কুইনাইন্ প্রয়োগে উপকার ত হয় না, বরঞ্চ কোন কোন স্থলে আরও শীঘ্র শীঘ্র প্রলাপ, প্রভৃতি উপসর্গ আনয়ন করে। অথচ কুইনাইনের এমনিই মোহিনীশক্তি যে, চিকিৎসকগণ কিছুতেই তাহার প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। অনেক ডাক্তারকে দেখা যায় তাঁহারা শীতল জল প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া অথবা উত্তাপহারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, উত্তাপ হ্রাস হইলে কুইনাইন্ প্রয়োগ করেন। কিন্তু এরূপ চিকিৎসা নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার। কারণ এই সকল কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃত পক্ষে জ্বরের বিরাম হয় না; কেবল কিয়ৎকালের জন্য উত্তাপ কম থাকে মাত্র। যাই হউক, এণ্টিফেব্রিণ প্রভৃতি জ্বর ছাড়াইতে না পারিলেও কিয়ৎকালের জন্য উত্তাপ কম রাখিয়া থাকে। ইহারা জ্বররোগীর নানারূপ উপকার সাধন করে। জ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি সহকারে যে সকল বৈধানিক পরিবর্ত্তন ঘটে; ঐ সকল পরিবর্ত্তন এই সকল ঔষধের প্রভাবে ততঠা হইতে পারে না। সুতরাং রোগী শীঘ্র দুর্ব্বল হইতে পারে না। আর উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া প্রলাপ প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাও ততদূর হইতে পারে না।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগের ১ ঘণ্টা বা আরও বিলম্বে উত্তাপ কম পড়িতে আরম্ভ হয়; কিন্তু কোন কোন রোগীতে এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগ করিবার ১০।১৫ মিনিট মধ্যে উত্তাপের হ্রাস হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি একটী পূর্ণবয়স্ক বলবান্ রোগীকে ৬ গ্রেণ এণ্টিফেব্রিণ প্রয়োগ করিলে ঠিক ১০ মিনিট পরেই ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীপুলীনচন্দ্র সান্যাল, এম্, বি।

প্রত্যক্ষফলপ্রদ—মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

১। প্রবল শ্বাস কাস অর্থাৎ হাঁপানির সুদারুণ যন্ত্রণায় যাঁহারা ভুগিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সে যন্ত্রণা কিরূপ। আর যাঁহারা অন্যকে ভুগিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরও অবশ্য কতকটা জানা আছে। আমরা নিম্নে সেই দুঃসহ যন্ত্রণার আশু প্রতীকারক একটী সামান্য মুষ্টিযোগ লিখিতেছি যথা;——খাঁটী ও অধিকদিনের পুরাতন ঘৃত এবং আমরুল শাকের পাতার নির্জ্জল রস তুল্যপরিমাণে লইয়া, একত্রে একখানি পাথরে মিশ্রিত করিয়া ফেণাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিবে। অনন্তর ভালরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা লইয়া হাঁপানি রোগীর বুকে ও কণ্ঠস্থানে উত্তমরূপে মালিশ করিতে থাকিবেক। ইহা দ্বারা মূল রোগের শান্তি হইবে না বটে, কিন্তু যন্ত্রণার যে আশু শান্তি হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

২। এমন অনেক অনেক রোগী আছেন, যাঁহাদের বাহ্যের বেগ দিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কাহারও বা বেগের সঙ্গে সঙ্গে অর্শের বলি বাহির হইয়া অতি ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত করে। আবার কাহারও বা ভয়ানক জোরের সহিত বেগ দিলেও হয়ত ওঁটলে মল সহজে বহির্গত হয় না। সেই সমস্ত স্থলে নিম্নলিখিত অতি তুচ্ছ মুষ্টিযোগ ঔষধটীর শরণ লওয়া উচিত। যথা——এরূপস্থলে বাহ্যে যাওয়ার অগ্রে রোগী একটা শর্ষপ তৈলের প্রদীপ জ্বালিবেন, তারপর নিজের বামহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ সেই প্রদীপস্থ তৈলে ডুবাইয়া প্রদীপের শিখাতে সহযত্ন উত্তপ্ত করিয়া সেই

অঙ্গুলির তৈলাক্ত অগ্রভাগ মল দ্বারের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইতে থাকিবেন। এইরূপে ৪।৫ বার দিলেই যথেষ্ট হইবেক। ইহার পরক্ষণেই তিনি বাহ্যে গেলেই জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার আর কোন যন্ত্রণাই নাই।

সম্পাদক।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১। কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ।——অর্থাৎ দেশীয় পণ্ডিতগণের বিশেষতঃ চিকিৎসকবর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়ে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত কবিরত্ন ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর L.R.C.P. মহাশয়ের কথোপকথন। ১২৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমরা উপোরক্ত গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পাইয়া, প্রকৃতই গভীর মনঃসংযোগ পূর্ব্বক একবার নয় দুইবার নয়, তিন চারিবার পড়িয়াছি। একবারের অধিক পড়িয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে, ব্যাপার বড় সহজ নহে, (অন্ততঃ আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে ত কোনমতেই নহে)। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ ছোট আকারের কেবল ৬২ পৃষ্ঠা সম্বলিত হইলেও এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে আমূল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যতগুলি গভীর উপদেশ পূর্ণ বাক্য আছে, প্রায় তাহার অধিকাংশই স্থান পাইয়াছে, তা ছাড়া ডাক্তারী ব্যাপারও অবশ্য কতকটা আছে। সুতরাং, যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একটী মাত্র সূত্র ধরিয়া বিচার বিতর্ক করিতে গেলে চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যখন সার সার কথা লইয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, তখন সে গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে যে, বড় একটা সহজ কথা নহে, সেকথা বলাই বাহুল্য। যাহাহউক, এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। কেননা চিকিৎসা সম্মিলনী গোড়াতে এই কবিরাজ-ডাক্তারের সম্বাদ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং যাহার মূলভিত্তিই কবিরাজ-ডাক্তার লইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ত এ শ্রেণীর গ্রন্থ যথার্থই আদরের সহিত আলোচনার বিষয় বটে। বলা

বাহুল্য, যে, সেই জন্যই আমরা উক্ত পুস্তক হইতে এবারে স্থানান্তরে কতটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এবং অবশিষ্ট অংশটুকুও অবসরমত আমাদের বক্তব্য সহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক রহিলাম। তবে দুঃখ ও কলঙ্কের কথা এই যে, বর্ত্তমান সমাজে এ শ্রেণীর গ্রন্থাদির পাঠক কিন্তু বড়ই কম। কম বলিয়াই আমাদের দুঃখ এই যে, আলোচ্য গ্রন্থখানি যেরূপ কৃতবিদ্য ও সুবিজ্ঞ লেখকের হাত হইতে বাহির হইয়াছে, বোধ হয় যে, কবিরাজ সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত অতি অল্পই আছেন।

২। ভিষক্‌দর্পণ—বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্র। ডাক্তার মৌলভি জহিরুদ্দিন আহ্‌মদ এল,এম,এস্, এফ্, সি, ইউ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথরায় এল,এম, এস্ সহকারী সম্পাদক। বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা। ১৪৮নং ওল্ডবৈটকখানা বাজার রোড হইতে প্রকাশিত।

ভিষক্‌দর্পণ ২য় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই ২য় খণ্ডেরই ১ম সংখ্যা আমরা সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকগণের নিকট ভিষক্‌দর্পণের পরিচয় বোধ হয় আর নূতন করিয়া অধিক কিছুই দিতে হইবে না। কেননা যদিও আমরা ইহার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ১ম বর্ষের কোন সংখ্যা পত্রিকা প্রাপ্ত হই নাই, তথাপি আমরা ইহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া ইহার প্রচার আরম্ভ হইতেই ইহা হইতে নানাবিধ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের চিকিৎসা-সম্মিলনীতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। ফলতঃ এলোপ্যাথি ডাক্তার বা শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ভিষক্‌দর্পণ যে সর্ব্বথা উপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এহেন উপকারী ভিষক্‌দর্পণের বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা দেখিয়া আমরা সুখী হইতে পারিলাম না। যেহেতু দরিদ্রদেশের অধিকাংশ নেটিব ডাক্তার ও হাতুড়ে ডাক্তারই ভিষক্‌দর্পণের গ্রাহক হইতে পারেন। কিন্তু বার্ষিক ৬৲ টাকা দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃতই কষ্টকর বলিয়া বোধকরি। এবং সেই জন্যই অমরা সম্পাদক মৌলভিসাহেবের নিকট অনুরোধ করি যে, তিনি যেন ইহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকার স্থলে অন্ততঃ ৩৷৵০ টাকা ধার্য্য করেন। আমাদের বিশ্বাস যে, তাহা হইলে উহার গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইবে এবং সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার দর্শিবে।

সম্পাদক।

৮ম বৎসর। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

—oo—

৮ম খণ্ড, ১২৯৮ সাল।

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭৫নং কটন ষ্ট্রীট্ বড়বাজার "নারায়ণ" যন্ত্রে

শ্রীরামনারায়ণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা। এই দুই সংখ্যার নগদ মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

এই দুই সংখ্যায় যাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ আছে।

ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি। ডাক্তার যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম্, বি। কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত। কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি। কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। ডাক্তার নীলরতন অধিকারী এম্, বি। ডাক্তার শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র এম্, বি। বাবু রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য। বাবু শরচ্চন্দ্র নিয়োগী। ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার এবং সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেশীয়স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে (আগে কি চাই?)	...	...	২৩১
ঐ (তৈলাভ্যঙ্গ)	...	...	২৩২
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	...	২৩৪
আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা	...	...	২৩৭
রক্তপিত্তরোগে বাসকের অসাধারণ ক্ষমতা	...	...	২৩৯
মূলেভুল (উপসংহার) (ডাক্তারী)	...	...	২৪১
বুঝিবার ভুল ঐ	...	...	২৪২
মূলেভুল কিপ্রকারে বলে? (কবিরাজী)	...	...	২৪৬
ভুল মূলে নয় তবে শাখাপ্রশাখায় বটে (কবিরাজী)	...		২৫০
নুনখাওয়ার গুণ (ডাক্তারী)	...	...	২৫৬
ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্য (কবিরাজী)	...	...	২৬০
স্পাইন্যাল কার্ডের পীড়া (ডাক্তারী)	...	...	২৬৩
ধাতুব্যাখ্যা (কবিরাজী)	...	...	২৬৬
বৈদ্য-চিকিৎসকের অসম্পূর্ণতা	...	...	২৬৯
উপদংশরোগের চিকিৎসায় পারদ ও আইওডিন্ ঘটিত ঔষধ-উপযোগিতা			২৭৩
অবলাবান্ধব (কবিরাজী)	...	...	২৭৯
রিউম্যাটিজ্‌ম্ (বাতরোগ) (ডাক্তারী	...	...	২৮২
চিকিৎসিত রোগী (হোমিওপ্যাথি)	...	...	২৮৪
ইহা কি মনোযোগের ত্রুটী, না বুঝিবারভ্রম?		...	২৮৬
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা	...	...	২৯০
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ—মুষ্টিযোগ (সম্পাদকীয়)	...	...	২৯৩
পদ্যপাচন	...	...	২৯৪

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে আগে কি চাই?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেবল যে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতাই সর্ব্বাগ্রে প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন লইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। ভারতবর্ষের প্রাচীন যে কোনও শাস্ত্রে হউক, সন্ধান লইলেই জানিতে পারা যায় যে, শরীরকে উপেক্ষা করিয়া এ সংসারের কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রকার প্রধানকর্ত্তব্য আর দ্বিতীয় নাই। কেন না ধর্ম্মসাধন বল, আর অর্থোপার্জ্জনই বল, কোনরূপ কামনার তৃপ্তি-সাধন বল, আর মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায়-চিন্তাই বল, প্রকৃত পক্ষে শরীর সম্যক্ সুস্থ না থাকিলে ঐ সকলের কিছুই সম্পন্ন হইতে পারে না। পারেনা বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ সেই সত্যযুগ হইতেই তারস্বরে ঘাষণা করিয়া আসিতেছেন যে;—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে শরীররক্ষা করাই নিশ্চয়

সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধন।

আবার কেবল যে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ শরীর-রক্ষার জন্য বার বার মাথার দিব্য দিয়াছেন, তাহা নহে। পৃথিবীস্থ ইয়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি যে কোন স্থানের যে কোন ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিবেন যে, হাঁ সর্ব্বাগ্রে শরীরানুপালনই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অথবা সদসৎবিবেকশীল মানব জতিকে বাদ দিয়াও যদি কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ ইতর-জন্তু পশু-পক্ষীগণের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলেও দিব্য সুন্দর শিক্ষা পাইবে যে, তাহারাও তাহাদের সাধ্যমত শরীররক্ষা করিয়া আজীবন চলিয়া থাকে।

কিন্তু দারুণ আক্ষেপ ও ঘোরতর পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সাধারণ জ্ঞান হইতে ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি প্রায় পৃথিবীর কোন জাতিই বঞ্চিত নহে, এমন কি পশুগণও যে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, এহেন সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইতে ভারতবাসী কিন্তু বহুকাল হইতেই বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছেন! কেন যে পড়িয়াছেন তাহা শুনুন।

এই যে ইতর হইতে মহানুভব নামধারী অসংখ্য ভারতবাসী অহোরহই বিচরণ করিতেছেন, সত্য বল দেখি, ইহার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শরীররক্ষার জন্য

রীতিমত যত্ন লইয়া থাকেন কয়জন ব্যক্তি? অথবা যত্ন লওয়া দূরে থাকুক, কেমন করিয়া কি কি উপায়ে যে শরীররক্ষা হইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই-বা আছে কয় জনের? কিংবা কোন্ কোন্ বিষয়ে বা শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিলে যে শরীররক্ষা-বিষয়ক জ্ঞান আসিতে পারে, তৎপ্রতিই বা দৃষ্টি রাখিতে ইচ্ছা করেন কত জন ব্যক্তি? বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এ শ্রেণীর লোক একজনও যে পাওয়া অসম্ভব, তাহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ও সকল বাচনিক কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কাজের কথা উল্লেখ করিয়া দেখা উচিৎ যে, প্রকৃতই উপরের কথাগুলি সত্য কি না? সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি জাতিগত কিংবা স্ত্রীপুরুষ গত ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের শরীররক্ষা সম্বন্ধেই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অতএব আগামীবারে তাহাই করিব।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে তৈলাভ্যঙ্গ।

যাহা কিছু সেকেলে, সকলেই কুসংস্কারমূলক, সকলই কুরুচিব্যঞ্জক, সুখস্বচ্ছন্দের বিঘ্নকারী এবং যাহাকিছু এ কেলে সকলই সভ্যতানুমোদিত, সুরুচিব্যঞ্জক এবং স্বাস্থ্য ও সদাচারের অনুকূল। দিন দিন এখনকার লোকের মনে এই সংস্কার দৃঢ়মূল হইতেছে এবং এই সংস্কার ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হওয়াতে নব্য সংস্কারাপন্ন সভ্যগণের যে কি পরিমাণে উৎকট চিন্তা, পরমায়ুহ্রাস, ও জীবন বিড়ম্বনাময় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে শতসহস্র উদাহরণ দেখাইতে পারি, শতসহস্র উদাহরণ দ্বারা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি, যে কি অল্প ব্যয়ে, অনায়াসে প্রাচীনগণ আপনাদের দেহ ও মন রক্ষা করিয়া মনুষ্যত্ব ও দীর্ঘায়ুর চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরন্তু এই প্রবন্ধে আমরা বাহুল্য উদাহরণের প্রস্তাবনা করা অসঙ্গত মনে করি।

আজ্‌কাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তৈলার্দ্রকলেবর হইতে ঘৃণা করেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতে গাত্র পরিষ্কার ও অপর কোন উপকার

হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে গাত্র ও বস্ত্র সকলি অপরিষ্কার হয় এবং দেহে দুর্গন্ধাদি বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এ কারণ তাঁহারা তৈলাভ্যঙ্গের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ সাবান মাখিতে অভ্যাস করিতেছেন। প্রাচীনের উপদেশ তৈলাভ্যঙ্গ, আর ইংরাজ গুরুর উপদেশ সাবান! কিন্তু তৈলাভ্যঙ্গ আমাদের পক্ষে যে কি পরিমাণে উপকারী ও উপযোগী, তাহা বলা যায় না। এসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদকার চরকের মত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ আমরা তৈলাভ্যঙ্গ ও সাবানমাখা, এই উভয়ের তারতম্য বিচার করিব। মহামতি চরক বলেন;—

মুখে তৈলগণ্ডূষ-ধারণ করিলে অর্থাৎ প্রত্যহ তৈল মুখের মধ্যে পূর্ণ করিয়া কুল্লী করিলে হনুদেশ সবল হয়, স্বর স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর হয়, মুখ পরিপুষ্ট হয়, জিহ্বার আস্বাদগ্রহণে শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং অন্নে উত্তম রুচি হয়। অপর ইহা দ্বারা মুখশোষ ও কণ্ঠশোষ নিবারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় ফাটেনা, দন্তের কখন ক্ষয় হয় না, দন্তসকল আজীবন দৃঢ়মূল হইয়া অবস্থিতি করে এবং দন্তসমূহে কখন বেদনা বা অম্ল ভক্ষণে পীড়িত হয় না, বিশেষতঃ অনায়াসেই কঠিন দ্রব্য সকল চর্ব্বন করিতে সমর্থ হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তৈলদ্বারা মস্তক আর্দ্র করেন, কিংবা মস্তকে উত্তম রূপে তৈল মর্দ্দন করেন, তাঁহার শিরঃশূল অর্থাৎ মাথার বেদনা হয় না, শীঘ্র শীঘ্র কেশের পতন কিংবা শুক্লতা হয় না, মস্তক এবং কপাল বলিষ্ঠ হয়, কেশ সমুদায় দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সবল হয়, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্নতা লাভ করে, ত্বক্ সুকোমল এবং পরিষ্কার হয়, মুখে কান্তি ও পুষ্টি লক্ষিত হয় এবং সুনিদ্রা ও সুখ হইয়া থাকে।

প্রতিরোজ কর্ণের মধ্যে তৈল প্রদান করিলে বাতজনিত কর্ণরোগ জন্মে না, মন্যাস্তম্ভ ও হনুগ্রহ নামক বাতব্যাধি হয় না, এবং শ্রুতি কাঠিন্য ও বধিরতা উপস্থিত হইতে পারেনা।

চাকায় তৈলপ্রদান করিলে যেমন চাকা অতি সহজে চলিয়া যায় এবং সবল থাকে, চর্ম্মকুম্ভে তৈলপ্রদান করিলে যেমন উহা বহুদিবস স্থায়ী হয়; সেইরূপ শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। চর্ম্ম উত্তম লাবণ্যময় হয়, বায়ুরোগের শান্তি হয় এবং শরীর ক্লেশ ও ব্যায়াম-সহিষ্ণু হইয়া থাকে।

বায়ুর প্রধান কার্য্য স্পর্শ, স্পর্শের আশ্রয় স্থান ত্বক্। তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বক্ ও স্পর্শশক্তি ভাল থাকে, সেই জন্য প্রত্যহ অতি যত্নের সহিত তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক।

যিনি প্রতিদিন তৈল মর্দ্দন করেন, আঘাত প্রাপ্ত হইলে সহসা তাঁহার শরীরের কোনও হানি হয় না এবং বলের কার্য্য করিলেও কোন প্রকার বিষম পীড়া জন্মে না।

তৈলদ্বারা প্রতিদিন অঙ্গ মর্দ্দিত হইলে শরীর কোমল হয়, অঙ্গ পুষ্ট হয়, বল হয়, লাবণ্য হয় এবং জরা অতি অল্পই হইয়া থাকে।

ত্বকের কর্কশতা, শরীরের শুষ্কতা এবং ঔষ্ণ্যভাব, শ্রান্তি এবং পাদসুপ্তি তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা সদ্যই উপশমিত হয়।

পাদদেশে প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সৌকুমার্য্য, বল, পাদস্থৈর্য্য, দৃষ্টি শক্তির প্রসন্নতা এবং বায়ুর শান্তি হয়; গৃধ্রসী বাতরোগ জন্মে না, পাদদ্বয় ফাটেনা এবং পায়ের শিরা ও স্নায়ুর সঙ্কোচ হয় না।

তৈল দ্বারা শরীর পরিমার্জ্জিত হইলে দৌর্গন্ধ্য, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, চুলকান, ময়লা, অরুচি, ঘর্ম্ম, এবং বীভৎসতার ধ্বংস হয়।

সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে ৮ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যার চিকিৎসা-সম্মিলনীতে রক্তপিত্ত রোগে তৈল প্রয়োগের বিষয় পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। রক্তপিত্ত রোগের কোন্ কোন্ অবস্থায় কিরূপে তৈল ব্যবহার্য্য, তাহাও লিখিতে ভুলিনাই। অতঃপর যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাস, ও কাসরোগে তৈলপ্রস্তুত ও প্রয়োগের বিষয় লিখিতেছি। কিন্তু এই রোগে কোন প্রকার তৈলের উল্লেখের পূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে, সাধারণতঃ যক্ষ্মা এবং কাসরোগে কবিরাজ মহাশয়েরা একই প্রকার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সত্যের অনুরোধে ইহা লিখিলে

অন্যায় হইবে না যে, একমাত্র চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহাই উক্ত উভয় রোগে চন্দনাদি, স্বল্পচন্দনাদি, সারচন্দনাদি, বাসাচন্দনাদি, বৃহৎচন্দনাদি, কাসচন্দনাদি ও মহাচন্দনাদি প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কবিরাজ মহাশয় কুঙ্কুমাদি তৈল বলিয়াও এই চন্দনাদি তৈলের ব্যবহার করেন। ফলতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা যে একই চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত ও একটি ভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত উভয় রোগে সেই তৈল নানাবিধ নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে অবশ্য কবিরাজ মহাশয়েরা ঐরূপ ব্যবহার করেন বলিয়া যে উপরোক্ত তৈলগুলি সমস্তই এক অর্থাৎ চন্দনাদি ও সারচন্দনাদি প্রভৃতি সমস্ত তৈলই যে ঠিক্ একই উপাদানে প্রস্তুত হয়, তাহা কিন্তু বলিতেছি না। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, উহাদের প্রস্তুতের উপাদান-গত কল্ক ও ক্বাথবিষয়ে অতি সামান্য মাত্র পার্থক্য আছে। কিরূপ পার্থক্য আছে, তাহা অবশ্যই ক্রমশঃ দেখাইব। আপাততঃ নিম্নে এক প্রকার চন্দনাদি তৈলের উল্লেখ করিতেছি।

যক্ষ্মা ও কাসরোগে চন্দনাদ্য তৈল।

প্রথমতঃ, ৮ আট সের খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল ইতি পূর্ব্ব লিখিত মতে কটা ও মূর্চ্ছা পাক দিয়া পরে মূর্চ্ছা দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদি, তৈল হইতে ভালরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া নিম্ন লিখিত কল্ক দ্রব্যের সহিত পাক করিবে যথা—শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ, অগুরু কাষ্ঠ, তালিশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্ম-কাষ্ঠ, মুথা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকে একপল অর্থাৎ ৮ আট তোলা ওজনে লইয়া একত্রে পূর্ব্ব দিবস রাত্রে আবশ্যকানুসারে জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবস প্রাতে উত্তমরূপে কুটিয়া তৈলের চতুর্গুণ জলের সহিত একত্রে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কিছুদিন রাখিয়া দিবে। তার পর কল্কদ্রব্য সহ তৈল কতকদিন পচিয়া আসিলে উক্ত কল্কদ্রব্য না ছাকিয়া নিম্ন লিখিত ক্বাথের সহ তৈলপাক করিবে যথা—বামনহাটী, বাকসছাল, কণ্টকারী, বেড়েলার মূল ও গুলঞ্চ এই সমস্ত দ্রব্য সমুদায়ে মিলিত ২৷৷০ সাড়েবার সের ওজনে লইয়া একত্রে উত্তমরূপে কুটিয়া ৬৪ চৌষট্টিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোল সের শেষ থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত পুনর্ব্বার তৈলপাক করিবেক। তার-

পর তৈল হইতে কল্ক দ্রব্যাদি উত্তমরূপে ছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া গন্ধ দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া তৈলের পাক শেষ করিবে। এবং শেষ পাক হওয়ার পর তৈল নামাইয়া শেষে গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদান করিবে। যথা—শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, মৃগনাভী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, ছোট এলাচি, ও লবঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য যথোপযুক্ত মাত্রায় তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। এই তৈল ব্যবহারে যক্ষ্মা ও কাসরোগের শান্তি হয় এবং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লেখকের মন্তব্য।

পাঠক! উপরে ত এক প্রকার চন্দনাদি তৈলের ফর্দ্দ দেখিলেন, সরলভাবে লিখিতেছি যে, এ উপাদানে প্রস্তুত উপরোক্ত চন্দনাদি তৈল আমি কখনও ব্যবহার করি নাই, এবং অন্য কোন কবিরাজ মহাশয়কেও আমি এই তৈল ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তবে আমি বিশ্বস্ত কোন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ক্বচিৎ দু একজন কবিরাজ মহাশয় নাকি যক্ষ্মা ও কাসাদি রোগে উপরোক্ত চন্দনাদি তৈল মাত্র প্রস্তুত রাখিয়া উহাই চন্দনাদি, স্বল্প চন্দনাদি, সার চন্দনাদি ও বাসাচন্দনাদি প্রভৃতি আবশ্যক মত নাম দিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাদ্বারা আশানুরূপ উপকারও দর্শিয়া থাকে। যাহা হউক, উপরে একটি মাত্র নমুনা দেখাইলাম, সুতরাং আগামীবারে বাসাচন্দনাদি প্রভৃতি অন্যান্য চন্দনাদি তৈলের পরস্পর উপাদান ও গুণগত পার্থক্য বিশেষতঃ আমরা সর্ব্বদা যে চন্দনাদি তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা সমস্তই বিশেষরূপে লিখিব। ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের সরলভাবে লিখিত চন্দনাদি তৈলের কাহিনী পাঠ করিয়া প্রকৃতই খুসী হইলাম। তিনি যে একই চন্দনাদি তৈলকে সারচন্দনাদি, স্বল্প-চন্দনাদি ও শত চন্দনাদি ইত্যাদি নানা নামে অলঙ্কৃত করিয়া কবিরাজ-কুলের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, ইহা বড়ই মিষ্ট লাগিল।

চি, স, স,

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্নুজ্যোতিরনেকাগ্রোদুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
রতিং ন লভতে যাতি পরলোকং সমান্তরে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মন্দাগ্নি, চিত্তচাঞ্চল্য এবং মনের দৌর্ব্বল্য এই সমুদায় দ্বারা অভিভূত হইয়া কোন বিষয়েই নিবিষ্ট থাকিতে পারে না; সে বৎসরের মধ্যেই পরলোক যাত্রা করিবে।

বলিং বলিভৃতো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।
লোকান্তরগতঃ পিণ্ডং ভুংক্তে সংবৎসরেণ সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়সাদি বলিভোজী প্রাণীদিগকে বলি প্রদান করিলে যদি তাহারা ঐ বলি ভক্ষণ না করে, তবে সে বৎসরের মধ্যেই লোকান্তর গমন করিয়া পিণ্ড ভোজন করে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীং।
সংবৎসরান্তে জন্তুঃ সঃ সম্পশ্যতি মহত্তমঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সপ্তর্ষি সকলের সমীপস্থ অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পায়, সে সেই বৎসরের মধ্যে ঘোরতর তম দর্শন করে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিকৃত্যা বিনিমিত্তং যঃ শোভামুপচয়ং ধনং।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং সমান্তং ন স জীবতি॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বাভাবিক রূপে অকারণ শোভা, উপচয়, ধন, অথবা অস্বাভাবিক রূপে বিভ্রংশ প্রাপ্ত হয়, সে বৎসরের শেষ দেখিতে পায়, অর্থাৎ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্বলমহৈতুকং।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়ভির্ম্মাসৈর্মরিষ্যতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিনা কারণেই ভক্তি, শীল, স্মৃতি, বদান্যতা, বুদ্ধি এবং

বল, এই ছয়টীর নিবৃত্তি হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছয় মাসের মধ্যে শমন-ভবনে গমন করিবে।

ধমনীনামপূর্ব্বানাং জালমত্যর্থশোভনং।
ললাটে দৃশ্যতে যস্য ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥

যে ব্যক্তির ললাটদেশে অপূর্ব্ব ধমনী সমূহে সুশোভিত জাল দেখিতে পাওয়া যায়, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

লেখাভিশ্চন্দ্রবক্রাভির্ললাটমুপচীয়তে।
যস্য তস্যায়ুষঃ ষড়্ভির্মাসৈরন্তং সমাদিশেৎ॥

যাহার ললাটদেশ বালচন্দ্রবৎ বক্র রেখা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, ছয় মাসের মধ্যে তাহার আয়ুঃশেষ হইবে।

শরীরকম্পঃ সংমোহগতির্ব্বচনমেব চ।
মত্তস্যেবোপলভ্যন্তে যস্য মাসং ন জীবতি॥

মত্তব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তির শরীর কম্প, মোহ, গতি ও বচনের উপলব্ধি হয়, সে এক মাসের অধিক কাল জীবিত থাকিবে না।

রেতোমূত্রপুরীষাণি যস্য মজ্জন্তি চাম্ভসি।
স মাসাৎ স্বজনদ্বেষ্টা মৃত্যুবারিণি মজ্জতি॥

যাহার শুক্র, মূত্র, ও পুরীষ (বিষ্ঠা) জলে নিমগ্ন এবং স্বজনের প্রতি দ্বেষ হয়, সে মৃত্যুরূপ জলে নিমগ্ন হইবে অর্থাৎ মরিবে।

হস্তপাদং মুখং চোভৌ বিশেষাদ্যস্য শুষ্যত।
শুষ্যতে বা বিনা দেহাৎ সচ মাসং ন জীবীত॥

দেহ ব্যতিরেকে যাহার হস্ত, পদ এবং মুখ বিশেষ রূপে শুষ্ক অথবা ঐরূপ দেহ ব্যতিরেকে শোথযুক্ত হয়, এক মাসের মধ্যেই তাহার বিনাশ হইবে।

ললাটে মূর্দ্ধ্নি বস্তৌ বা নীলা যস্য প্রকাশতে।
রাজীবালেন্দুকুটিলা ন স জীবিতুমর্হতি॥

যাহার ললাট, মস্তক, অথবা বস্তিদেশে নীলবর্ণ এবং বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

রক্তপিত্ত-রোগে বাসকের অসাধারণ ক্ষমতা।

রক্তপিত্তাদি রোগে একমাত্র বাসকের শক্তি কিরূপ অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য্য, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি, সুতরাং আমরা এসম্বন্ধে নিজে আর কিছু না বলিয়া নিম্নে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লিখিত পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

স্থান পচম্বা, ভায়া গিরিধি হইতে বাবু গয়ারাম নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে একটু মনোযোগের সহিত সেই পত্রখানি পড়িতে অনুরোধ করি। পত্রখানি এই-(হিন্দী হইতে অনুবাদিত) "কবিরাজ মহাশয়, অত্যল্প দিন হইল, আমার বৃদ্ধ পিতাঠাকুর মহাশয় সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ অবস্থায় উপনীত হইলে আমি তজ্জন্য যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, স্থানীয় চিকিৎসকগণের ব্যবহারে যে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম এবং অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় একটী যৎসামান্য ঔষধ সেবনে তিনি কিরূপ অত্যাশ্চর্য্যভাবে এযাত্রা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাহাই লিখিতেছি। প্রথম পিতৃদেবের হটাৎ একদিন বৈকালে ৪ টার সময় মুখদিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। ২।৩ বার রক্ত উঠিতেই আমি ডাক্তার আনাইয়া ঔষধ দিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রি ও পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করাইয়াও কিছু মাত্র উপকার দর্শিল না, অপরন্তু তিনি ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সকলের পরামর্শে এস্থলে কবিরাজী চিকিৎসা প্রশস্ত মনে করিয়া কবিরাজ ডাকান হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি আসিয়া "অমুক ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, এত টাকা লাগিবে ইত্যাদি বলিয়া লম্বা ফর্দ্দ করিয়া বিস্তর টাকার কথা বলিলেন।" বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এরূপ আড়ম্বরে আমাদের কিছুমাত্রই বিশ্বাস জন্মিল না। অগত্যা আমার পিতৃদেবকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া আপনার নিকট চিকিৎসা করাইব স্থির করিয়া বাটী হইতে রওনা হইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইত্যবসরে আমাদের গৃহস্থিত 'ভাবপ্রকাশ'

নামক আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে আমি রক্তপিত্ত রোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম বাসক (অন্য নাম বাকস) রক্তপিত্ত রোগের শান্তির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ বাকসের পাতা আনাইয়া রস করিয়া সেই রস অন্ততঃ অর্দ্ধছটাকেরও অধিক পান করাইলাম। বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে, সেই এক পানমাত্র বাকসপাতার রস উদরস্থ হওয়াতেই যেন তাঁহার রক্ত উঠার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইল, অনন্তর ২ ঘণ্টা বাদে আমি পুনর্ব্বার আর এক পান খাইতে দিলাম। এইরূপে তিন চারি পান সেবনেই তাঁহার রক্তউঠা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধ হওয়ার পরেও আমি ৪।৫ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রত্যহ ২ বার করিয়া উক্ত রস পান করিতে দিতাম। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রক্তপিত্ত রোগে এমন প্রত্যক্ষ আশুফলপ্রদ ও একান্তই সহজলভ্য ঔষধ বর্ত্তমান থাকিতেও কি জন্য কবিরাজ মহাশয় আসিয়া এত লম্বা চৌড়া ফর্দ্দ করিয়া আমার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ লওয়ার ফন্দী খাটাইয়াছিলেন? আর আমিই বা কি জন্য এমন ঔষধ থাকিতে ডাক্তারের হাতে রোগী দিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম। পরিশেষে আমার কথা এই যে, এক রক্তপিত্ত রোগের যখন বাকসপাতা দ্বারা শান্তি হইল, তখন আমার নিতান্তই বিশ্বাস যে, অন্যান্য রোগেও এইরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অথচ সহজ লভ্য ঔষধ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে, আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, সে সকল ঔষধ বাছিয়া লইতে পারি, আর এমন চিকিৎসকও পাই না, যাঁহার নিকট হইতে সরলভাবে এ সকল ঔষধ জানিতে পারি। উপায় কোন রূপ নাই দেখিয়াই আপনার ন্যায় বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়কে আদ্যোপান্ত জানাইলাম। আশা করি যে, আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন।" ইতি।

শ্রীগয়ারাম।

পাঠকগণ, শ্রীযুক্ত বাবু গয়ারামের সকল কথা শুনিলেন ত। বলা অধিকন্তু যে, এ সকল কথা আমাদের নিকট কিছুই নূতন নহে। পুরাতন বলিয়া আমরা আর এ সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিতে চাহি না। তথাপি রক্তপিত্ত, কাস ও যক্ষ্মারোগে একমাত্র বাসক দ্বারা যেরূপ প্রভূত উপকার দর্শে, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত রোগে ইহার তুলনা করিলে পৃথিবীর কোন স্থানেও এরূপ মহৌষধ

অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। জ্ঞানের সীমা তাদৃশ না থাকিলেও এ কথা বোধ হয় যে খুব্ স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়া রাখিতে পারি যে, শত শত এম্, ডি, ডাক্তার, সহস্র সহস্র ঔষধ প্রদান করিয়া এরোগে যেরূপ ফল দেখাইতে না পারেন, কিন্তু একা বাসকই সেস্থলে অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় উপকার দর্শাইবেই দর্শাইবে। বলা বাহুল্য যে, ঐ সমস্ত রোগে এইরূপ অসাধারণ ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়াই ঋষিগণ জোরপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে,——

"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াম্ জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি?"

অর্থাৎ এ জগতে বাসক বিদ্যমান থাকিতে এবং রক্তপিত্ত, কাস ও যক্ষ্মারোগীর জীবনের আশা বর্ত্তমান থাকিতে কেন তাহারা অবসন্ন হয়?

বাসকের গুণসম্বন্ধে ইহার উপর আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই?

চি, স, সম্পাদক।

মূলে ভুল।
(উপসংহার)

অঙ্গুষ্ঠমূলে অর্থাৎ তর্জ্জনীতে এবং তর্জ্জনী মধ্যমায় নাড়ীর স্পন্দন লোপ হইলেও যে সচরাচর রোগী বাঁচিয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। পৌষ মাঘ মাসের শীত সময়ে প্রাতঃকালে দুর্ব্বলকায় জীর্ণ জ্বর প্রাপ্ত রোগীর ধাত পরীক্ষা করিলে অনেক সময় অঙ্গুষ্ঠমূলে তর্জ্জনীতে অথবা তর্জ্জনী মধ্যমায় নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায় না। অথচ ঐ সকল রোগী সর্ব্বদাই বাঁচিয়া যাইতেছে। জ্বরকালীন প্রবল হিক্কা হইলে কখন কখন নাড়ী বসিয়া যায় বা নিতান্ত ক্ষীণ হয় অথবা তর্জ্জনীমূলে লোপ হয়, অথচ হিক্কা থামিলেই ধাত ভাল হইয়া যায়। আবার দুর্ব্বল ব্যক্তি বা সবল ব্যক্তি আহার জ্বর হউক বা না হউক, কোন কারণ বশতঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে তাহার নাড়ী ক্ষীণ হয় বা একবারেই লোপ হয়, অথবা মূর্চ্ছা

প্রাপ্ত শত শত রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে। অতএব ধাত দুর্ব্বল হইলে বা তর্জ্জনী মধ্যমায় ধাত উপলব্ধ না হইলে যে উহা মৃত্যুর লক্ষণ, তাহা নহে। সুতরাং কেবলমাত্র নাড়ীপরীক্ষা দ্বারা মৃত্যুকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

আর্য্যেরা চিকিৎসা-শাস্ত্র আবিষ্কার এবং তাহার অসাধারণ উন্নতি করিয়াছেন ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যার চরম উন্নতি করিয়াছেন, তাহার উপর আর উন্নতি হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতে পারি না। হৃদয় যে নাড়ীর মূল এবং ধাতের স্পন্দন যে, হৃদয়ের ক্রিয়া একথা আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাই। রক্ত যে হৃদয় হইতে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, যাহাকে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া (Circulation of blood) বলে, তাহা আমাদিগের আর্য্য-চিকিৎসা-গ্রন্থে নাই। ১৬০০ শত খ্রীষ্টাব্দ ইংলণ্ডের ডাক্তার হার্‌ভি রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার করেন। এবং তদবধি চিকিৎসা-শাস্ত্রের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

আগষ্ট, ১২৯২। } ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল, এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সত্য বলিতে গেলে কোন জ্ঞানবান্ কবিরাজ মহাশয়ই ডাক্তার পুলিন বাবুর প্রথম কথাগুলির যথার্থ খণ্ডন করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তবে অবশ্য শেষের কথায় আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।

চি, স, সম্পাদক।

বুঝিবার ভুল।

আমার "মূলে ভুল" নামক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহাতে কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রতিবাদ বাহির হইতেছে এবং সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায়ও বাহির হইয়াছে। এক্ষণে এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হওয়াতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি যে, কবিরাজ প্রসন্ন বাবু এবং সম্পাদক মহাশয়ও আমার "মূলে ভুল" প্রবন্ধের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। এক জনের প্রবন্ধের সমুদয় অংশ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে এইরূপ ভ্রমই হইয়া থাকে। উক্ত প্রবন্ধে আমার এরূপ দেখান উদ্দেশ্য নহে যে, হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল একবারেই অসার। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে মূলটাই ঝুটা, একথা বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। হিন্দুচিকিৎসা শাস্ত্রই আদিম এবং এই মূলের সাহায্য লইয়াই অন্যান্য বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে সম্পাদক মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, এই যে এই আসল সাচ্চা জিনিসের মধ্যে অনেক ঝুটা জিনিষ আছে, ইহাই আমার মত এবং তাহা দেখানই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত যিনি পড়িবেন, তিনিই বুঝিবেন যে প্রবন্ধটী কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্রের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা মাত্র। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যে, যে ভাবে আজকার দিনে কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন, সে ভাবে কার্য্য করিলে আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার বা উন্নতি হইবে না। এইরূপ চেষ্টার মূলে দোষ আছে, তাই প্রবন্ধের নাম "মূলে ভুল"। তাই দেখানই আমার উদ্দেশ্য; আয়ুর্ব্বেদের ঝুটা জিনিষ বাদ দিয়া এবং উহাতে আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে সার সংকলন করিয়া আমাদের হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রকে দেশ কাল পাত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক করিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক, প্রসন্ন বাবু দেখিতেছি ঘোরযুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন এবং সম্পাদক মহাশয় তাঁহার টিপ্পনীতে জয় পরাজয়ের কথাও বলিয়াছেন। পরন্তু তর্কে হার বা জিত আমার উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান করা এবং ভ্রমপ্রদর্শন করা। স্বদেশের জিনিষের হিত চেষ্টার ব্রতী হইলে জিনিষের দোষ গুণ দুইই দেখিতে হয়, নচেৎ উন্নতির আশা, বিড়ম্বনা মাত্র। নিজের জিনিষে মায়া থাকা ভাল কিন্তু ভাল বাসার খাতিরে মুগ্ধ হওয়া ভাল নহে। যে পথে কণ্টক আছে, সে পথে যাইতে নিষেধ করিলে বন্ধুর কাযই করা হয়।

কবিরাজ মহাশয় বলেন "শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে যাহা কিছু আছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবার যো নাই, যদি ডাক্তারি শাস্ত্রের সহিত তাহার

অমিল হয়, তবে এককালে ডাক্তারি শাস্ত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার সহিত ঐক্য হইবে"। এবং তৎপর ক্ষণেই বলেন যদি পুলিন বাবুর ন্যায় লোক আয়ুর্ব্বেদের অযথা নিন্দা না করিয়া বিদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে সার সংকলন করিয়া হিন্দু চিকিৎসার পুষ্টি বিধান করেন ইত্যাদি। ইহাতে বক্তব্য এই যে, যদি আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ভুল বেদ বাক্যই হইল, তবে আর তাহার উন্নতি পুলিন বাবুর ন্যায় লোক কেমন করিয়া করিবে! দোষের কথা বলিতে গেলেই কবিরাজ মহাশয়েরা রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইবেন তখন আর উপায় কি আছে। কবিরাজ মহাশয় হাঁও বলেন নাও বলেন। কিন্তু উন্নতি হওয়া প্রার্থনীয় স্বীকার করিতে গেলেই ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে।

পরন্তু যত দিন আয়ুর্ব্বেদ ব্যাবসায়ীদিগের মনে এই ভ্রমপূর্ণ ধারণা থাকিবে যে, আয়ুর্ব্বেদ ঈশ্বর-প্রণীত নির্ভুল ও নিত্য শাস্ত্র, ততদিন ইহার উন্নতির কোনই আশা নাই; এইরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণা থাকাতেই আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এবং এই বিশ্বাস বশতই বহুকাল হইতে হিন্দুগণ এই শাস্ত্রের উন্নতি করিতে বিরত হইয়াছেন। আমি আয়ুর্ব্বেদের অযথা নিন্দা করি নাই। লেখক বিশেষের ভ্রম প্রদর্শন করা এবং আয়ুর্ব্বেদে লিখিত ঝুটা অংশকে ঝুটা বলিলে যদি আয়ুর্ব্বেদের অযথা নিন্দা করা হয়, তবে আর হাত নাই। আয়ুর্ব্বেদ যে নিত্য নহে এবং উহার মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়াছে এবং আরও হইতে পারে, তাহা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সমুদয় হইতেই প্রমাণিত করা যাইতে পারে। যথা বাহ্বট তাঁহার অষ্টাঙ্গ-হৃদয় উত্তর স্থানে ৪০ শ অধ্যায়ে একটী শ্লোকে বলিয়াছেন তাহার অর্থ এইরূপ;—

তৈল ঘৃতাদি ঔষধ দ্রব্য ব্রহ্মাই বলুন আর ব্রহ্মার পুত্রই বলুন, কোন বক্তার বাক্যের বলে নির্ব্বাক জড়পদার্থের শক্তির উৎকর্ষ বা বৈলক্ষণ্য কখনও ঘটিতে পারে না। কেন না বস্তুশক্তি স্বভাব সিদ্ধ। যিনিই কেন না বলুন পদার্থের স্বতঃসিদ্ধ শক্তির অন্যথা হওয়া অসম্ভব। অতএব বক্তার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন কর্ত্তব্য। যদি ঋষি প্রণীত বলিয়াই অনুরাগ প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে চরক ও সুশ্রুত পরিত্যাগ করিয়া ভেল প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থনিচয় তাদৃশ আদর

পূর্ব্বক বৈদ্যগণ প্রায় পাঠ করেন না কেন? ভেলাদির গ্রন্থ সমূহ তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয় বলিয়াই বৈদ্য সমাজে তাহাদের পঠন ও পাঠন প্রায় প্রচলিত নাই বলিতে হইবে। যদি উৎকর্ষ বুঝাইয়া গৌরব বা আদর করিতে হয়, তাহা হইলে সদ্যুক্তি বা সদুপদেশ গ্রহণ করাই উচিত"। * দেখুন দেখি কেমন উদার ভাব!

কবিরাজ মহাশয় বলেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একটী উপসর্গ বা অব্যয় শব্দও বিনা কারণে লিখিত হয় নাই, সুতরাং তাহা হইতে কোন কথাই বাদ যাইতে পারে না, কিন্তু আমরা বিধিমতেই দেখাইতে পারি, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমুদায়ে বিস্তর অবৈজ্ঞানিক বিষয় আছে। সে শ্লোক গুলি প্রক্ষিপ্ত কি খাঁটি জিনিষ, তাহা ঈশ্বর জানেন। ভুলেভুল প্রবন্ধে কতক গুলি দেখানও হইয়াছে। ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে দ্রব্যগুণ অধ্যায়ে গন্ধকের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখা আছে যে, পার্ব্বতীর রজস্বলা হইলে সেই রক্তসিক্ত বস্ত্র ধৌত করাতে সেই রক্ত হইতে গন্ধকের উৎপত্তি হইয়াছে। এই গুলি কল্পনাও গল্প ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কবিরাজ মহাশয়েরা এই সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আমরা পারি না।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সুযোগ্য লেখক মহাশয় যখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের "মূলে ভুল" অস্বীকার করিয়া শাখা প্রশাখা লইয়া পড়িলেন, তখন ত আমাদের আর কোন কথাই বলিবার নাই। কেন না আমরাও যে, শাখা প্রশাখার ঘোরবিপক্ষ। সুতরাং শাখা প্রশাখা লইয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন, মূলে কিন্তু হাত না দেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

চি, স, সম্পাদক।

---

* কবিরাজ ডাক্তার সম্বাদ (কবিরাজ কালিপ্রসন্নসেন কবিরত্ন প্রণীত ২০ পাতা।

মূলেভুল কি প্রকারে বলি ?

আজ্ দেখিতেছি ঘোর বিপদ। এত ব্যঙ্গ—এত শ্লেষোক্তির উত্তর প্রদান আমা দ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি পুলিন বাবুর নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করি, আমার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে হইলে তিনি যদি ব্যঙ্গভাব পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব। আমি অধিক বাচালতা করিতে অক্ষম। বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দান, ব্রহ্মানাশক ঔষধ এবং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম, ইত্যাদি বাক্য যেন কর্কশ—সাতিশয় ব্যঙ্গভাবপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। কর্ণ যেন গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তা কি বলিব ? আজ তুলসীপত্র দানের অর্থ-মীমাংসা, শিব-সংগ্রামের মর্ম্মোৎঘাটন না করিলে ত নিস্তার নাই! সুতরাং তাহা করিতেই হইবে। এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা যাইতেছে যে, যিনি বায়ু, পিত্ত, কফের স্বরূপ অবগত নহেন, বায়ু কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তিনি কি প্রকারে লিখিলেন যে বায়ু প্রবল হইয়া উন্মাদ-রোগকে বায়ুর পীড়া বলিয়া সর্ব্বদা ঘোষণা করিয়া থাকে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন বাক্যের প্রতিবাদ বা কাহাকেও উপহাস করা পুলিন বাবুর উচিত হয় নাই। শরীরস্থ ক্লোন্ কোন্ পদার্থের ন্যূনধিক্য বা কার্য্য ব্যতিক্রম হইলে চিত্ত বাঞ্চল্য ও মোহোৎপাদন হয়, তাহা পুলিন বাবুর পূর্ব্বেই জানিয়া লওয়া উচিত ছিল। ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, পুলিন বাবু তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই অথবা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াও কেবল বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রাধান্য রক্ষার্থ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছেন। নতুবা পুলিন বাবুর ন্যায় শিক্ষিত লোকে এরূপ ব্যঙ্গ করিবেন কেন ? আমি বহুদিন হইতে জানি যে, ইংলণ্ডীয় লোকের দোষ উল্লেখ করিলে তদ্দেশবাসীগণ দুঃখিত হউন আর নাই হউন, এতদ্দেশবাসীগণের ক্রোধের পরিসীমা থাকে না, সুতরাং তাঁহারা ক্রোধের উত্তেজনায় অধীর হইয়া একবারে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়েন। তখন তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে থাকেন। সেই সকল কথার উত্তর দিতে হইলে অনেক সময় অনেকরূপ গ্লানি সহ্য করিতে হয়। হিন্দু-শাস্ত্র সমূহের মর্ম্মোৎঘাটন করা নিতান্ত দুরূহ। যাঁহারা একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে—

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাঁহাদের শাস্ত্রের অন্ত নাই—কর্ম্মের অন্ত নাই—কবিত্বের ইয়ত্তা নাই, যাঁহাদের সকলই অনন্ত এবং অসীম, লেখনীর সাহায্যে কেমন করিয়া তাঁহাদের সেই অনন্ত গূঢ় রহস্য ভেদ করিব ? যিনি স্বয়ং সরলভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে অনেকটা বুঝাইয়া দিতে পারা যায় (অতি সত্যকথা, চি, স, স,)। যিনি তাহা করিবেন না, বরং বিদ্বেষমদে সর্ব্বদা মাতিয়া বধির হইয়া থাকিলে তাঁহাকে কোনমতে বুঝাইতে পারা যাইবে না (ইহাও ঠিক্ কথা, চি, স, স,)। ইতিপূর্ব্বে বায়ু পিত্তকফ সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা অযৌক্তিক নয়। সেই কথায় উপহাস করিবার কিছুই নাই। এই যে, গ্রহ উপগ্রহ শোভিত—অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডিত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিমানমার্গে অবস্থিত চেতনাচেতন পদার্থ সমূহের উৎপত্তি হইল ? ইত্যাদি জটিল বিষয়ের সমালোচনা করা এই সামান্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে মূল প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি প্রভাবে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারই বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। কর্ম্ম দেখিলেই কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন। এই যে, বিশ্বরূপ অনন্ত কর্ম্ম অহরহঃ লক্ষিত হইতেছে, ইহার কি কেহই কর্ত্তা নাই ? অবশ্যই আছেন। যিনি এই বিশ্বের কর্ত্তা হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহাকে বিরাট-পুরুষ বা মহাবিষ্ণু বলে। তিনি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, এই জন্য মহাবিষ্ণু এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, এই জন্য বিরাট্-পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছাময় এবং কর্ম্মপুরুষ রূপে পরা প্রকৃতিসহ সংসারে বিচরণ করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যখন যেরূপ যে প্রকার কর্ম্ম করেন, তখন সেই রূপে তাহার ফলও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। তিনি আপনাকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে পারেন, এবং সেই সমস্ত অংশকে আবার একত্রিত করিতে পারেন। যে প্রকার ঔষধাভাবে কেবলমাত্র চিকিৎসক দ্বারা কখনও রোগ প্রশমিত হয় না, সেই প্রকার করণাভাবে একমাত্র বিরাট-পুরুষদ্বারা কখনও সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং করণ-ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আবির্ভাব হইয়াছে। সৃষ্টি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা বিরাট পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং সৃষ্টি-কার্য্য পর্য্যবসিত

হইলে আবার তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন। এই রূপে মহাবিষ্ণুকেও সময়ান্তরে বিলয় হইতে হয়। তিনিও নিত্য পদার্থ নহেন। তবে কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং কোথায়ই বা তাঁহার বিলয় হয়? স্থাবর জঙ্গম সহিত নিখিল জগতের বীজস্বরূপ আরও একটী পদার্থ আছে। সেই পদার্থকে কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ অনাদিপুরুষ এবং কেহ বা পরমাত্মা নামে অভিহিত করেন। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় অথচ চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আরও একটী অব্যক্ত আছে, সেই অব্যক্তকে মূলপ্রকৃতি কহে। মূলপ্রকৃতি প্রসব-ধর্ম্মিণী কিন্তু তাঁহার চেতনা নাই। অনাদি পুরুষ হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তিনি যাহা প্রসব করেন, অনাদি পুরুষের চেতনা যাইয়া তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হয়। এই মূল প্রকৃতি হইতে বিরাট্-দেহের উৎপত্তি হইয়াছে। পরা প্রকৃতি নাম্নী মূল প্রকৃতির অংশ বিশেষযোগে বিরাট্-দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, তপন প্রভৃতি দেবগণের আবির্ভাব হইয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। তাঁহাদের একের অভাব হইলে তৎকার্য্য সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সমস্ত দেবগণ, বিরাট পুরুষ, আদি পুরুষ, মূল প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি বাস্তবিক কি? কি প্রকারেই বা তাঁহাদিগকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? সামান্যজ্ঞান দ্বারা কখনই তাহা সুসিদ্ধ হয় না। এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে হয়। যে দ্রব্য হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সেই দ্রব্যেরই সদৃশ হইয়া থাকে। এই জন্য পিতা মাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এইজন্যই মানব হইতে মানব এবং কীট হইতে কীটের জন্ম হয়। কখনই তাহার অন্যথা হয় না। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন—আম্রের মধ্যে কীট হইলে তাহা আম্রের অনুরূপ হয় না কেন? আম্র কীটোৎপত্তির ক্ষেত্র। কীটশরীর নির্ম্মিত হইতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাহা আম্রফলে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা কীটের দেহটী নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আম্র অচেতন পদার্থ, তজ্জন্য তাহা দ্বারা কীটের চৈতন্য সঞ্চার হইতে পারে না। যে অব্যয় চেতন পদার্থ হইতে কীটের জীবসঞ্চার হয়, কীট তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে আকৃতিগত সাদৃশ্যের কোন কথা নাই, কার্য্য এবং উপকরণে

একতা হইলেই তাহাকে সাদৃশ্য বলা যায়। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এবং প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে বিরাট্ পুরুষ, পরাপ্রকৃতি, ব্রহ্মাদিদেবগণ এবং তাঁহাদের সহচারিণী শক্তিবৃন্দ (প্রকৃতি) একে একে সমুদ্ভূত হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহাদিগের দ্বারাই নিখিল জগৎ এবং জগতস্থ চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। সুতরাং সকলের সহিতই পরস্পর সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ আদি পুরুষ এবং মূল প্রকৃতির আদর্শ লইয়া মহাবিষ্ণু ও পরাপ্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই পুরুষে যাহা আছে, মহাবিষ্ণুতেও তাহাই আছে। তবে অধিক আর অল্প, এই মাত্র প্রভেদ। এস্থলে মহাবিষ্ণুর আকৃতির ন্যায় জগতের আকৃতি কি না, তৎসমুদায় বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যদ্দ্বারা জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহা না হইলে জগতের রক্ষাবিধান হয় না, তদ্দ্বারাই জীবদেহেরও উৎপত্তি হইয়াছে। তদভাবে জীব দেহও কখনও রক্ষিত হইতে পারে না। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি ক্ষুদ্রকায় অদূরদর্শী মানব, আমরা প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সামান্য অংশও একযোগে নয়ন-গোচর করিতে পারি না। তবে কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদক পদার্থ সমূহ দৃষ্টিপথে আনয়ন করিব? কি প্রকারেই বা বিশ্বনিয়ন্তার অনন্তশক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিব? তাহা আমাদিগের দ্বারা কখনই সুসিদ্ধি হইতে পারে না। তবে জানা যাইতেছে যে, সংসারের সকল বস্তুর সহিতই পরস্পর সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ একই উপকরণে সকল বস্তুই উৎপাদিত হইয়াছে এবং একই নিয়মানুসারে সকলেরই সাধারণ কার্য্যাদি যথাসময় সম্পন্ন হইতেছে। দিনের পর রাত্রি তাহার পর আবার দিন যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম, জন্মের পর মৃত্যু, তাহার পর আবার জন্ম এবং সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। ইহাই সাধারণ কার্য্য। অনন্তকাল হইতে এই কার্য্য একই নিয়মানুসারে যথাসময় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। মহাবিষ্ণু হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সকল পদার্থই এই নিয়মের অধীন। যে সকল উপকরণযোগে এবং যে প্রকার নিয়মানুসারে জগতের স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশ হইতেছে, সেই সকল উপকরণ এবং সেই প্রকার নিয়মেই জীব-দেহেরও যথাসময়ে উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ প্রাপ্তি হইতেছে। ইহার মধ্যে একমাত্র দেহতত্ত্বে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই সকল বিষয় সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

এই জন্যই পূর্ব্বতন ঋষিগণ অন্যান্য শাস্ত্রালোচনার পূর্ব্বে একমাত্র দেহতত্ত্ব লইয়া এক সময় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন,এই জন্যই তাঁহারা আত্মজ্ঞানী হইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগও করিতে পারিতেন। অধুনা বাবু সম্প্রদায় গুলিখোরী কথা বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিতে পারেন। কেন না তাঁহা-দিগের বিজ্ঞান-গুরু ভট্‌ভট্ সাহেব ইহার কোন উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা বিদ্যালয়ে যে ন্যায় (Logic) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এতৎ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা গুলিখোরী কথা ভিন্ন আর কি? কি প্রকারে একই উপকরণে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হয়? কেমন করিয়াই বা দেহমধ্যে জীব-সঞ্চার হয়? বাঁচিয়া থাকা বা মৃত্যু কাহাকে বলে? ইত্যাদি গুরুতর বিষয় মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা রসগন্ধক দ্বারা অহরহঃ হিঙ্গুল এবং কজ্জলী প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বলিতে পারেন না যে, কেমন করিয়া একই রসগন্ধকে বিভিন্ন গুণ এবং বর্ণ বিশিষ্ট হিঙ্গুল ও কজ্জলীর উৎপত্তি হয়? সে স্থানে তাঁহারা রাসায়নিক শক্তি বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন।

ক্রমশঃ—

দীনাবাজার,
জলপাইগুড়ি। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ সকল ঐশ্বরিক তত্ত্বের সম্বন্ধে কোনরূপ কথা বলি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। কেননা আমরা যে সামান্য তৃণাদির পর্য্যন্ত স্বরূপ-জ্ঞানেই অসমর্থ; তথাপি প্রবন্ধশেষে কথঞ্চিৎ বলিবার আশা থাকিল।

চি, স, সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখা-প্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তপোবলেই হউক, আর জ্ঞানবলেই হউক, বিদ্যাবলেই হউক, আর বুদ্ধিবলেই হউক, অথবা অন্য যে কোন শক্তিদ্বারাই হউক, ঋষিগণ যে

ভারতবর্ষের প্রত্যেক মূল বিষয় গুলি যথার্থই দৃঢ়রূপে গাঁথিয়াছিলেন, মূলে যে সত্যসত্যই ভ্রমপ্রমাদ অতি কমই ছিল, তাহা বহুলকারণ দর্শাইয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। রাজাধিরাজ হইতে ভিখারী, পণ্ডিত হইতে মূর্খ ও ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল প্রভৃতি যে কোন দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ প্রতিপন্ন হইবে যে, হিন্দুগণের মূল গাঁথুনী অতি সুন্দর, প্রকৃতই দৃঢ়, যথার্থই তাহাতে ভেলমাত্রও নাই। তবে কালবশে আমরা সকল বিষয়ই দোষাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। প্রকৃতই আমরা মণিমুক্তা সকলকে ভস্ম ও জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছি; অথবা কালধর্ম্মে পৃথিবীর চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে আপনাপনিই এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে শাস্ত্রকারগণ, যে ক্ষত্রিয়জাতিকে অসীম বলবিক্রম ও অসাধারণ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামে বিভূষিত দেখিয়া রাজোপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, আজ্ কিনা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ক্ষত্রিয় সন্তানগণ যারপর নাই ভীরু ও নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বিলাসিতায় দিন যাপন করিতেছেন! যে ব্রাহ্মণগণের তপস্যা, নিঃস্বার্থ-পরোপকারিতা ও অপরিসীম জ্ঞানানুশীলন এবং অসীম ব্রহ্মচর্য্যা দেখিয়া রাজাধিরাজকেও তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে হইত, আজ কিনা সেই ঋষিবংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ "ক" অক্ষরশূন্য হইয়া এক গাছিমাত্র সূত্রের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং তুচ্ছ অর্থলোভে চণ্ডালসদৃশ ধনীগণের পদলেহন করিতেছেন! সুতরাং হিন্দুগণের কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া নহে, যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাতেই দেখিতে পাইবে যে, মূলে কোন দোষই নাই, তবে শাখাপ্রশাতেই যত দোষ ঘটিয়াছে, এমন কি বর্ত্তমান ছিন্নভিন্ন ও শীর্ণ গলিত শাখাপ্রশখার অবস্থা দেখিলে ইহার মূল যে কোনও কালে খাঁটি ছিল, তাহাও বোধ হয় না। বলা বাহুল্য যে, এই জন্যই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রটা মোটের উপর পৃথিবীর অন্য সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও একমাত্র শাখাপ্রশাখার দুরবস্থাতেই আজ্ সকলের নিকট এতদূর হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে!

সে যাহা হউক, বৈদ্যশাস্ত্রের মূলভাগটা যে যথার্থই খাঁটী, আমরা তাহা ক্রমশঃ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইব; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার পূর্ব্বে সম্প্রতি কবিরাজ ডক্তার-সংবাদ নামক যে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বাহির হইয়াছে, আমরা অগ্রে সেই পুস্তক হইতে এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যথা—

কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কবিরাজ ;

হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বসমূহ অবগত হইলে আপনি আরও আনন্দিত হইবেন। আপনার কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হইবে। আপনি জানিতে পারিবেন, আধুনিক হিন্দুচরিত্রের সহিত ঋষিচরিত্রের কত প্রভেদ! তাঁহারা কিরূপ নিরপেক্ষ, সরল, পবিত্র, উদার ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন সময়েও তাঁহাদের বিপুল ও বিমল জ্ঞান জ্যোতিতে বিদ্যা-দেবীর মুখকমল কিরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিল। অধুনাতন ভট্টাচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহারা গতানুগতিক-ন্যায়ের অনুসরণ করিতেন না। প্রয়োজন দেখিলে সমুদায় বিষয়েরই পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা অন্যরূপ সংস্কণ করিতেন।

ডাক্তার ;

যখন কোন কোন সূত্রের ব্যভিচার আছে, তখন হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সবল ও অকাট্য শাস্ত্র বলিতে পরিতেছি না।

কবিরাজ ;—

হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্র কেন, আজ পর্য্যন্ত যতরূপ চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই এই দোষ আছে। হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্র জগতের সর্ব্বোপকারী। উপকারিতা-গুণে সর্ব্বোচ্চ হইয়াও এই দোষে শাস্ত্রীয়াংশে গণিতের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত নয়।

ডাক্তার ;—

তাহা না হউক, সৌত্রিক শিক্ষা অতি সুন্দর, ইহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় এই জন্যই হিন্দুগণ অনেক শাস্ত্রে সৌত্রিক শিক্ষার অবতারণ করিয়াছেন। তাঁহারা সূত্র কাহাকে বলেন, অতঃপর বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

কবিরাজ ;—

শাস্ত্রের প্রতিবাদ্য বিষয় যদ্দ্বারা গ্রথিত এবং যাহাতে সূক্ষ্মরূপে লীন থাকে, * যাহার সাহায্যে বিস্তীর্ণ বিষয় সঙ্ক্ষিপ্ত এবং সঙ্ক্ষিপ্ত বিষয়

* তত্র সূত্রণাৎ সীবনাৎ অর্থসন্ততের্ধারণাচ্চ সূত্রম্।
চক্রপাণি দত্ত।

বিস্তৃত করা যায় এবং অনুক্ত বিষয়ও যদ্দ্বারা উহ্য করিয়া লওয়া যায়, তাহাকে সূত্র বলে। মনে করুন, রাম+আদি=রামাদি ; এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংহিত পদ যাঁহার যানা আছে, তিনি এই নির্দ্দিষ্ট পদমাত্রের সন্ধি করিতে পারিবেন। পরন্তু এইরূপ উদাহরণসমূহের সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, যে ব্যক্তির সেই নিয়মের পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধিনিষ্পাদন করিতে পারেন। অনন্ত পদকে এক জাতি বা ভিন্ন জাতিতে গ্রন্থন করিতে পারেন। এইরূপ নিয়মের নামই "সূত্র"। "সূত্র"এই রূপ সংজ্ঞা ব্যবহারের আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কোন পক্ষীকে সূত্রে (রজ্জুতে) বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিলেও যদি আপনার হস্তে সূত্রের মূল দৃঢ়বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই পক্ষী যে কোন দিকে বা যে কোন স্থানে প্রস্থান করুক না কেন, যথা প্রণালীতে আকর্ষণ করুন, পূর্ব্বোক্ত পক্ষী পুনর্ব্বার আপনার হস্তের সন্নিকটে উপস্থিত হইবে এবং আপনার করতলস্থ হইবে। শাস্ত্রীয় সূত্রের শক্তিও অবিকল তদ্রূপ। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়সমূহকে সূত্রনিবদ্ধ করিতে পারিলে, উহা আর জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। জ্ঞানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তখন এক স্থানে বসিয়াই ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হয়। সঙ্ক্ষেপে বলিতে গেলে সূত্র দ্বারা শাস্ত্রের প্রণালী-বন্ধন হয়।

ডাক্তার ;—

সূত্রের বিষয় অবগত হইলাম। অতঃপর আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করি। অনেকে বলেন,"কস্মিন্ কালেও ছিল না, এমন অনেক রোগ নূতন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এদেশে উপস্থিত হইতেছে। বৈদ্যগণের সেই পুরাতন আর্ষগ্রন্থের পুরাতন বচনানুসারে সেই সকল নবাগত রোগের চিকিৎসা কি হইতে পারে?" এই বিষয়ে ঋষিগণের কোন সূত্র আছে কি না জানিতে কৌতূহল হইতেছে।

কবিরাজ ;—

বিষয়টী বিশদভাবে সঙ্ক্ষেপে বুঝান দুরূহ। কেননা ইহা বিশদ করিতে হইলে আনুষঙ্গিক অনেকগুলি শাস্ত্রীয় তর্ক উপস্থিত হয়। তবে ঋষিগণ বহু তর্ক দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, এস্থানে তাহাই সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। সাধারণ দৃষ্টিতে রোগসমূহ যে কোনরূপ নূতন মূর্ত্তিধারী বলি-

য়াই বিবেচিত হউক, সুচিকিৎসকের জ্ঞানচক্ষুর নিকটে তাহাদের নূতন লক্ষণ নাই। এই সকল নবাগত রোগও কতকগুলি পুরাতন ও পরিমিত লক্ষণে জড়িত। কখন সেই সকল লক্ষণের সমষ্টি কখনও বা ব্যষ্টিমাত্র। যেমন যতই সংখ্যার উল্লেখ করা যাউক, তৎসমুদায়ই এক হইতে নয় পর্য্যন্ত কতিপয় পরিমিত মূলরাশি ও শূন্যের সহযোগে প্রস্তুত হয়, কোন অভিনব সংখ্যাই মূলরাশি অতিক্রম করিতে পারে না। সেইরূপ রোগসমূহও যতই নূতন মূর্ত্তি-সমন্বিত হউক, কতকগুলি পুরাতন পরিমিত মূল লক্ষণ অতিক্রম করিতে পারে না। কথাটী বুঝাইবায় জন্য ঋষিগণ অন্যরূপ একটী সরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

"যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশং পরিপতন্নপি স্বাং ছায়াং নাতিবর্ত্ততে। তথা স্বধাতু-বৈষম্য-নিমিত্তাঃ সর্ব্বে বিকারা বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্ততে"* ইত্যাদি।

চরক, সূত্রস্থান, ১৯ অঃ।

এইরূপ স্থলে তাঁহারা রোগের কারণ, অধিষ্ঠান, দেশ, কাল প্রভৃতি বিচার করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমোদন করেন। এতদ্বিষয়ক কতিপয় সূত্র নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

"তস্মাদ্‌বিকারপ্রকৃতীরধিষ্ঠানান্তরাণি চ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

চরক, সূত্রস্থান, ১৮ অঃ।

"রোগা যেঽপ্যত্র নোদ্দিষ্টা বহুত্বান্নামরূপতঃ।
দোষদূষ্যনিদানানাং বিপরীতং হিতং ধ্রুবম্॥
তাননুক্তান্ গতান্ সর্ব্বান্ সম্যগ্‌যুক্তং নিষচ্ছতি।
দেশকালপ্রমাণানাং তথা সাত্ম্যস্য চৈব হি॥" †

চরক, চিকিৎসাস্থান, ৩০ অঃ।

---

* যেমন পক্ষী সর্ব্বদিক্ পরিভ্রমণ করিয়াও কোন প্রকারেই স্বকীয় ছায়া অতিক্রম করিতে পারে না, ছায়া তাহার অনুগামিনী হয়ই হয়; তেমনি স্বধাতু-বৈষম্য-জাত রোগসমূহও বাত, পিত্ত এবং কফ অতিক্রম করিতে পারে না, ইহারা সেই সকল রোগের অনুবর্ত্তী হয়ই হয়।

† সেই হেতু (রোগসমূহের নামস্থিরতা নাই বলিয়া) সমস্ত রোগেরই উপাদান, বিভিন্নরূপ বাহ্যকারণ ও আশ্রয়স্থান বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

পরন্তু সূত্রানুসারে নূতন নূতন স্থলে তদুপযোগী নূতন নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি কল্পনা করিতে চিকিৎসকের প্রচুর উদ্ভাবনীশক্তি এবং শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক; সুতরাং সাধারণের পক্ষে এই পদ্ধতি সরল নয়। অতঃপর আপনাদের মত জানিতে ইচ্ছা করি।

ডাক্তার;—

আমরাও প্রস্তাবিত বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সারগর্ভ কথা কিছুই জানি না। আপনার সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমি আয়ুর্ব্বেদের যে কয়েকটী সূত্র অবগত হইলাম, ইহাদের কোনটীই অল্প পরীক্ষা ও অল্প চিন্তার ফল বলিয়া বোধ হইল না। বহুতর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ এবং সুনির্ম্মল ও প্রগাঢ় শাস্ত্রীয় জ্ঞানের একত্র সমাবেশ ব্যতিরেকে এইরূপ সূত্র রচিত হইতে পারে না। যদি আয়ুর্ব্বেদের আদ্যন্ত এইরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা একটী অপূর্ব্ব কৌশলময় শাস্ত্র এবং ইহার রচয়িতা অসাধারণ শিল্পী সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এইরূপ সুন্দর সামগ্রী যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভাবেই রহিয়া গেল। না হইল ইহার পোষণ, না হইল অঙ্গ-সংস্করণ। তাহাও দূরে থাকুক, কিছুদিন পরে এই শাস্ত্র একবারে লয় পাইবে—হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, এইরূপ পূর্ব্ব চিহ্ন দেখিতেছি। বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা ইহার উন্নতির উপায় করিতে পারেন। উন্নতির উপায়ও অনেকরূপ আছে, তন্মধ্যে অনন্যাপেক্ষী হইয়া কেবল নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা উহার উন্নতি- সাধন প্রচুর শক্তি ও সৌভাগ্যের অপেক্ষা করে। সেই শক্তি ও সেই সৌভাগ্য হিন্দুদিগের পুনর্ব্বার আসিবে, এইক্ষণে এরূপ আশাও দুরাশা। অন্যে পরে কা কথা। যে ইংলণ্ড আজকাল জ্ঞানে, মানে, ধনে ও সভ্যতায় সমুন্নত বলিয়া গণ্য, সেই ইংলণ্ডের স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান কত? অধিকাংশই অন্যজাতি হইতে সংগৃহীত, ভিন্ন দেশের গ্রন্থনিচয় হইতে সঙ্কলিত। ইহাও কম ক্ষমতা নহে। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইংলণ্ডের কত শত ব্যক্তি কেবল জ্ঞানসংগ্রহাভিলাষে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া

এই গ্রন্থে বাহুল্যবশতঃ যে সমস্ত রোগের নামও স্বরূপ উল্লিখিত হয় নয় নাই, দোষ, দূষ্য এবং নিদানের বিপরীত ক্রিয়া এবং উপযুক্ত দেশ, কাল, পরিমাণ ও সাত্ম্যোপযোগই সেই সমস্ত রোগের নিশ্চয় উপকারক।

অপরাপর জাতির সহিত মিলিত হইতেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই সেই ভাষার গ্রন্থনিচয় অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহা বৈদ্যগণের নিকট কলিতবৎ বোধ হইবে। বৈদ্যগণ যদি তাঁহাদের হস্তসন্নিহিত কেবল ইংলণ্ডীয় গ্রন্থনিচয় অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও অনেক অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! তাঁহাদের আদৌ সে প্রবৃত্তিই নাই। যদিবা কাহারও প্রবৃত্তি হয়, তাহাও আবার গুরুর বচনেই লোপ পায়। শুনিয়াছি চরক বলেন;—

"চিকিৎসিতং বহ্নিবেশ স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নাস্তীহ ন তৎ ক্বচিত্॥"

চরক, সিদ্ধিস্থান, ১২ অঃ।

হতভাগ্য দেশের যেমন গুরু তেমন শিষ্য, অথবা যেমন শিষ্য তেমন গুরু।

ক্রমশঃ—

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার কর মহাশয় বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু এবারে আর এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার সময় নাই, সুতরাং আগামীবারে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিব।

চি, স, সম্পাদক।

লুন খাওয়ার গুণ।

"লবণ বিহনে ভোজন যেমন" হয়, তাহা মনুষ্যমাত্রেই জানেন। লবণ খাইয়া মানুষ এত খুসী হয় যে, "যে যাহার লুন্ খায় সে তাহার গুণ গায়"। তোমার পুরাতন ভৃত্য ত্রিশ বৎসর তোমার বাড়িতে কত দাইল, ভাত, সন্দেস, রুটী খাইয়াছে, তাহা কাহারও কাছে বলে না কিন্তু লোকের নিকট যখন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখায় "তখন বলে বাপ্‌রে এত কাল উহাঁর লুন্ খাইয়াছি, উহাঁর কি অবাধ্য হইতে পারি।" আরব প্রভৃতি অনার্য্য দেশেও লবণের প্রতি এত সম্মান দেখান হয় যে, নরহন্তা বর্ব্বরও যদি ভ্রমক্রমে অথবা অগত্যা শত্রুর লবণ খাইয়া ফেলে, তবে আর তাহাকে হত্যা করে না। কৃতঘ্নতার অন্য নাম 'নিমক্-হারামি'।

আয়ুর্ব্বেদে লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায় এবং এসিয়া খণ্ডের অন্যান্য স্থানেও ইহার চিরকালই আদর। পালেস্তাইনে উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বেও

লবণের বড় আদর ছিল, নহিলে যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্য বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া "তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ" বলিবেন কেন! তাঁহার বহু কাল পূর্ব্বে মুসা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন এবং হোমরের 'ইলিয়ড্' নামক অক্ষয় কাব্যে উহার উল্লেখ আছে।

মানুষের পক্ষে লবণ বড়ই প্রয়োজনীয়। ইহাতে খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু হয় এবং শরীরের রক্ত ভাল থাকে। রক্ত ভাল থাকে কি? হাঁ। মানুষের রক্তের ভিতর এই লবণ—যে লবণ আমরা খাই তাহা—অনেক পরিমাণে আছে। আছে বটে কিন্তু দাস্ত, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে। যেরূপ খরচ হইতেছে, তদুপযুক্ত জমা যাই, নতুবা শরীর দেউলিয়া হইবে, তাই লবণের প্রয়োজন। দেউলিয়া হইলে কি ভয়ঙ্কর ফল হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিই। ওলাউঠা রোগে জলের মত দাস্ত হয়। উহার সঙ্গে অনেক জল ও লবণ বাহির হইয়া যায়, তাহাতে রক্তও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনীর ভিতর শীঘ্র চলিতে পারে না, তাহাতে শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই জন্য অনেক ভাল ভাল ডাক্তার এই রোগে রোগীকে যথেষ্ট জলও পান করিতে এবং লবণ খাইতে দেন। যথা:—ডাক্তার ষ্টীবেন্‌স্ সাহেব বলেন যে "যখন দেখিবে যে রোগীর হাতে পায়ে খাল ধরিতেছে, শরীর শীতল হইয়াছে এবং নাড়ী বসিয়া যাইতেছে তখন—

লবণ	২০ গ্রেণ
কার্ব্বোনেট অব্ সোডা	৩০ গ্রেণ
ক্লোরেট অব্ পটাশ্	৭ গ্রেণ

১ আউন্স জলে গুলিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে"। যদি এই ঔষধটী পেটে থাকে, তবে বিলক্ষণ উপকারী হয়। চিকিৎসা-দর্শনের অনেক পাঠকই চিকিৎসক, এইটি তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?।

লবণ কম খাইলে অন্ত্র নালীর ভিতর এক প্রকার শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, তাহাতে নানা প্রকার কৃমি জন্মায়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখ। পূর্ব্বকালে হলাণ্ডে কঠিন রাজ দণ্ড দিতে হইলে দোষীকে কেবল রুটী খাইতে দিবার হুকুম ছিল। ঐ সকল কয়েদিরা কিছুমাত্র লবণ পাইত না; তাহাতে দিন কয়ের ভিতর তাহাদের পেটে ভয়ঙ্কর কৃমি জন্মিত, সেই কৃমির কামড়ে হতভাগারা মরিয়া যাইত। সাধারণতঃ দেখা যায় যাহারা লবণ কম খায়, তাহাদের বড়ই কৃমি জন্মায়।

সেই জন্যই কৃমি হইলে লবণ খওয়ায় উপকার আছে। এরূপ অবস্থায় অধিক মাত্রায় খাইতে দেওয়াই উচিত। যদি মল দ্বারের নিকটেই কৃমি জন্মে, এরূপ বুঝা যায়, তাহা হইলে ভাতের গরম মাড় অথবা বার্লি সিদ্ধ জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া পিচ্‌কারি করিলে আশু প্রতীকার হয়। সহসা মল দ্বারে জোঁক প্রবেশ করিলে লবণ জলের পিচকারী দিয়া বাহির করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

নাইট্রেট অব্ সিলভার (ইহাকে সাধারণ লোকে কাষ্টকি বলে) যদি কোন প্রকারে উদরসাৎ হয় ও তাহাতে বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা বিষাক্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে জলে লবণ গুলিয়া অতি শীঘ্র খাওয়াইয়া দিতে হইবে। কষ্টিকের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত হইলে, কষ্টিকে যে রৌপ্য আছে, তাহা লবণের কোরিন্ নামক পদার্থের সঙ্গে মিলিয়া যায় এবং উভয়ে মিলিয়া একটি নির্দ্দোষ পদার্থ হয়, সুতরাং রোগীও বাঁচিয়া যায়।

বদ্ হজ্‌মি হইলে আদা, লুন, ও জোয়ান একত্রে মিশাইয়া বোধ করি অনেক পাঠকই খাইয়া থাকিবেন। পাঠক মহাশয়ের যদি এ জীবনে বদ্-হজমি না হইয়া থাকে, তবে তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান্, কিন্তু যদি কখন হইয়া থাকে এবং এই তিনটী পদার্থ তিনি খাইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই বলিবেন যে, ইহাদের দ্বারায় প্রথমাবস্থায় বিলক্ষণ উপকার হয়।

ছেলে বেলায় দৌড়াদৌড়ি করিতে পড়িয়া গিয়া আঘাত লাগিলে বৃদ্ধ পিতামহী (তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না) লুন হলুদ গরম করিয়া দিবার প্রেস্‌কৃপশন্ দিতেন। বলিতে কি, তাহাতে অনেক সময়েই এক আধ দিনের ভিতর আবার পূর্ব্ববৎ দৌড়িতে পারিতাম।

পুরাতন জ্বরের রোগীকে অধিক মাত্রায় লবণ খাইতে দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ডাক্তার উইলেমিন্ বলেন "লুন খাইলে পুরাতন জ্বর সারে; দামস্‌কাস্ বাসিদের পুরাতন জ্বরে অধিক মাত্রায় লবণ খাইতে দেওয়াতে সাত জনের মধ্যে ছয়জনের আরোগ্য লাভ করিত। ৫ তোলা হইতে ১০ তোলা লবণ একপোয়া জলে গুলিয়া একটু একটু করিয়া খাওয়ানতেও অনেকের উপকার হইত। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীগুলিরও এই ঔষধে বিশেষ উপকার হইত।" লবণ যে প্রকার সুলভ পদার্থ, তাহাতে প্রত্যেক চিকিৎসকই এই ঔষধ অবস্থাবিশেষে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ক্ষয়কাশে যখন রক্ত উঠিতে থাকে, তখন লবণ মিশ্রিত জল খাওয়াইলে এক এক সময় রক্ত থামিয়া যায়। যদি নিকটে ভাল চিকিৎসক পাওয়া না যায়, এবং অন্য উপায় না দেখা যায়, তাহা হইলে লেবুর রস ও লবণ একত্রে মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়। উদরাময় ও আমাশয় রোগেও ইহা অল্প পরিমাণে দিলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু যদি চিকিৎসক নিকটে থাকেন, তবে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করাই উচিত।

বারসের জলে অর্দ্ধসের লবণ গুলিয়া ঐ জলে স্নান করিলে সমুদ্র জলে স্নান করার তুল্য অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। গাঁইটের পীড়া হইলে এবং গলা প্রভৃতি স্থানের গুল্লি ফুলিলে অল্প পরিমাণে জলে যত লবণ গুলিতে পারা যায়, তাহা গুলিয়া ঐ জল দিয়া ফুলা স্থান গুলি মালিস করিলে বিশেষ উপকারক হয়।

বিট্‌লবণ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে আদৃত। এই লবণ আমাদের অনেক কার্য্যে লাগে। কিন্তু পুরাতন প্লীহাও যকৃৎ রোগেই ইহা অধিক উপকারী। ডাক্তার টোয়াইনিং ও ডাক্তার ওয়ারিং বলেন যে, তাঁহারাও এই রোগে এই লবণ দ্বারা বিশেষ উপকার হয় বলিয়া জানেন।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবগণের পক্ষেও লবণ বড় উপকারী পদার্থ। গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তু খাদ্য পদার্থের সঙ্গে একটু একটু লবণ পাইলে বড়ই তৃপ্ত হইয়া আহার করে এবং তাহাদের শরীরও বিলক্ষণ সুস্থ থাকে। লবণ না পাইলে নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত হয়, জনৈক অধ্যাপক এক মেষ পালকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "বিক্রয়ের জন্য জন্তুগুলিকে যখন দূর দেশে লইয়া যাইত, তখন যাত্রা কালে ঐ ব্যক্তি অধিক পরিমাণে লবণ সঙ্গে লইত। সমস্ত দিন হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম কালে মেষগুলিকে আহার দিতে গিয়া যদি দেখিত যে, দুই একটী মেষ আহার করিতে চাহে না অমনি তাহাদের মুখের ভিতর খানিকটা লবণ ফেলিয়া দিত। লবণ খাইয়া তাহারা সতেজ হইত এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আহার করিত এবং পুনরায় যাত্রা কালে বেশ পথ হাঁটিত।"

ডোসিমেট্রি নামক নূতন চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার বুর গ্রেডের নাম ইতিপূর্ব্বে এই পত্রের পাঠকগণ জানিয়াছেন। ঐ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এক পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে,

তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে একশত বৎসর জীবিত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। তিনি বলেন "সকল রোগেরই প্রধান ঔষধ লবণ, যে কেহ বিবেচনা পূর্ব্বক লবণ খাইতে পারিবেন, তিনিই দীর্ঘজীবী হইবেন। সুস্থশরীর ও দীর্ঘ জীবন অদৃষ্ট বশতঃ হয় না, পরন্তু যাঁহারা শরীর রক্ষণ ও বর্দ্ধনের নিয়মগুলি উত্তমরূপ প্রতিপালন করেন, তাঁহারই দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়েন।" তাঁহার মতে "শরীরের রক্ত ভাল রাখিতে লবণ যেমন পারে, অমন আর কোন পদার্থই পারে না। রক্ত যদি অতিশয় ঘন হইয়া থাকে, লবণ খাইলে তাহা তরল হইবে, রক্ত যদি অতিশয় তরল হইয়া থাকে লবণ খাইলে তাহা সুস্থ শরীরের উপযুক্ত মাত্রায় ঘন হইবে। লবণ খাইতে না পাইলে মানুষ শীঘ্রই মরিয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাক্ষনী রাজ্যে লবণের অভাব বশতঃ মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেক লোকের প্রাণবিনাশ করিয়াছিল"। তিনি বলেন "এই পদার্থে ওলাউঠা ও ক্ষয়কাশ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।" তাঁহার মতে প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যহ অন্ততঃ দুই তোলা ওজনের লবণ সর্ব্বপ্রকারে ভক্ষণ করা বড়ই প্রয়োজনীয়।

উপসংহারে বঙ্গীয় দাতা মহাশয়দিগের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে যখন চাউল দান করেন, তৎসঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণও বিতরণ করেন, তাহা হইলে ঐ সকল লোকের সমূহ উপকার করা হয়। তাঁহাদিগের লবণ খাইয়া এই চির দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশের শতসহস্র নরনারী জীবিত রহিয়াছে ইহা অপেক্ষা তাঁহাদের আত্ম প্রসাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? চিকিৎসা-দর্শন।

ডাক্তার শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, এম্, বি, সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কৃতবিদ্য ও বিচক্ষণ ডাক্তার যদু বাবু নিজের মুখেই নিজে ধরা পড়িয়াছেন, কেন না লুন খাইয়াই যদি গুণ গাওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে ত তাঁহার আর এক মিনিটও ডাক্তারী চিকিৎসা করা উচিত নহে। বিশেষতঃ তাঁহার লিখিত কৃতঘ্নতার অন্য নাম "নিমকহারামী" শব্দটী দ্বারা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই অলঙ্কৃত করিতে পারি। কিন্তু কেন তিনি কৃতঘ্ন বা নিমকহারাম, তাহা একে একে খুব সংক্ষেপে বলিতেছি। কৃতঘ্নতা বা নিমকহারামী শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে;—কৃত×প্রাপ্ত কোনরূপ

উপকারাদিকে ঘ্ন×নষ্ট বা অস্বীকার করার নামই কৃতঘ্নতা বা নিমক্-হারামী। অর্থাৎ উপকারকের অপকারক অথবা কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহা অস্বীকার করা ইত্যাদি। তবেই এই হইল যে, তুমি যাহার খাইবে, যাহার নিকট কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইবে, তোমার সে স্থলে অবশ্য-কর্ত্তব্য এইযে, উপকারীর প্রতি বিরোধী ত হইবেই না, অপরন্তু উপকারী ব্যক্তি প্রত্যুপকারের কিছুমাত্র আশা না করিলেও তোমাকে কিন্তু তাঁহার প্রত্যুপকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি সে নিয়মে না চলিয়া এক জনের খাইবে, এক স্থানের জল বায়ু ও খাদ্যাদি দ্বারা প্রাণ ধারণ করিবে, অথচ দোহাই দিবে অন্য জনের! গুণ গাইবে অন্যদেশের! প্রাতে উঠিয়াই মুখটীপর্য্যন্ত ধুইবে ভারতের নিমেরডালে, স্নান করিবে দেশের পুকুরে, খাইবে দেশের পুঁইশাক ও সজিনার ডাঁটা, না হয় একটু দুধ, কথা বার্ত্তা বলিবে দেশীয় লোকের সঙ্গে, মোটকথা সবই দেশের, কিন্তু ঔষধটীর বেলায় বেলেডোনা না হইলে তোমার কোনমতেই চলিবে না। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ কৃতঘ্নতার চিহ্ন বৈ আর কি বলিতে পারি?

বলা বাহুল্য যে, এই জন্যই এই স্বাভাবিক চিরপ্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করিয়াই আমরা সর্ব্বপ্রথমে লেখক যদু বাবুকে ঐরূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে অন্যায় বিবেচনা করি নাই। কেন না তিনিও যে জন্মিয়াছেন ভারতে, খাদ্য তাঁহার খেঁসারীর ডাউল, পরিধানে ধুতি চাদর, শয়ন, উপবেশন যাহা কিছু মানবীয় ধর্ম্ম, তৎসমস্তই ভারতীয়; আর দোহাই দেওয়ার সময় তিনি সেই সাত সমুদ্র তেরনদী পারস্থ ইংলণ্ডের কুইনাইনের মত ঔষধ আর নাই, কড্‌লিবরই অদ্বিতীয় বলকারক ঔষধ ইত্যাদি! অতএব ইহা-পেক্ষা এ জগতে চূড়ান্ত নিমকহারামী আর যে কি হইতে পারে, সে প্রশ্নের উত্তর আমার যদু বাবুর নিকটেই আশা করিতে পারি। অতএব যদু বাবু আমাদের এ অনুরোধ রাখিবেন কি?

কিন্তু কেবল কি একমাত্র যদু বাবুই কৃতঘ্ন? তা ত নয়, ভারতের আগা গোড়াই এই নিমকহারামের দলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতই ভারতের টিক্‌টিকি হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সমস্তই নিমকহারামের দলভুক্ত। ইতি-হাসে দৃষ্টিপাত করিলে পাতায় পাতায় দেখিতে পাইবে, যেন অসংখ্য নিমক্-হারামীর দল লইয়াই ভারত-ইতিহাস রচিত হইয়াছে। পলাশিক্ষেত্রে গমন

কর, দেখিবে, নিমক্‌হারামী সে স্থানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে! মোট-কথা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের যে কোন স্থানের আভ্যন্তরিক খবর লইলেই দেখিতে পাইবে যে, যেন নিমক্‌হারামী-রূপ অস্থি-মাংস দ্বারাই ভারত গঠিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, যদু বাবুর লিখিত এক নিমক্‌হারামীর কথা তুলিয়া উপরে আমরা বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি, এজন্য অপরাধ হইয়া থাকিলে পাঠকগণ বিশেষতঃ যদু বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অতঃপর লবণসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা কিঞ্চিৎ বলিতেছি। চরক বলেন—"সৈন্ধবাদি সর্ব্বপ্রকার লবণই পাচক, ক্লেদজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, ভেদক,বায়ুনাশক, দেহের জড়তা ও কাঠিন্যনাশক, লালা-নিঃসারক, কফের তরলতা জনক, শিরা সমূহের বিশোধক, সর্ব্ব শরীরের মৃদুতাকারক, আহারে রুচি জনক এবং আহারের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী" এতদ্ভিন্ন সৈন্ধব ও সামুদ্র আদি পঞ্চবিধ লবণের পৃথক পৃথক গুণের বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু বিস্তারভয়ের এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। সুতরাং স্থানান্তরে উল্লেখ করা যাইবেক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ডাক্তার যদু বাবু ত প্রাণ ভরিয়াই লবণের গুণ গান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু ভয় হয়, পাছে বা লবণের এতাদৃশ গুণের পরিচয় পাইয়া লবণপ্রিয় পাঠকগণ কেবল আকণ্ঠলবণ খাইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যেমন পরিমিত মাত্রায় লবণ অসীম উপকারী হয়, আবার অধিক মাত্রায় সেইরূপ বিষের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। চরক বলেন—"লবণরস মাত্রেই সমূহ উপকারী হইলেও প্রতিদিন অধিক মাত্রায় লবণ ব্যবহার করিলে পিত্ত প্রকুপিত হয়, রক্তের অযথাবৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণা জন্মায়, কুষ্ঠরোগ থাকিলে উহা গলিত করে, বিষের শক্তি বৃদ্ধি করে, পুরুষত্বের অত্যন্ত হানি করে, অসময়ে চর্ম্মের শিথিলতা, কেশের পক্কতা ও টাক উৎপাদন করে। অপর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত এবং বাত রক্তাদি রোগও অধিক লবণ সেবন জন্য হইয়া থাকে" অতএব সাবধান, যেন কেহ অধিক লবণ ব্যবহার না করেন। অথবা কেবল লবণ বলিয়া কেন, অতি মাত্রায় হইলে অমৃতও বিষের ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

চি, স, সম্পাদক।

স্পাইন্যাল কর্ডের পীড়া।

পলিওমাইলাইটিস্। এণ্টিরিয়া একুটা বা কর্ডের সম্মুখভাগের ধূসর পদার্থের প্রদাহ।

(এলোপ্যাথিক)

অধিকাংশস্থলেই ইহা শিশুদিগের মধ্যে দেখা যায় এবং ইহার পরিণাম ফলে তাহারা চিরজীবন খঞ্জ হইয়া থাকে বলিয়া ইহার আর একটী নাম শৈশবাবস্থায় পক্ষাঘাত। শিশুদের দন্তোদ্গমনকালে এই ব্যাধি উৎপত্তির প্রধান সময়। কখন কখন পৃষ্টদেশে আঘাত, শৈত্য লাগান, উচ্চস্থান হইতে পতন প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থকায় শিশুকেও অনেক স্থলে ইহার গ্রাসে পতিত হইতে দেখা যায়। শৈশবাবস্থার ভিন্ন যৌবনেও কখন কখন ইহার প্রকোপ লক্ষিত হয়।

কর্ডের সম্মুখভাগস্থ ধূসর পদার্থের অন্তর্দ্দেশে যে সকল বৃহৎ কোষ সংস্থিত আছে, তাহারাই এ পীড়ায় বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন তদ্দেশীয় স্নায়ুসূত্র এবং স্নায়ুমূলসমূহ ইহাতে অল্প বা অধিক মাত্রায় জড়িত থাকে।

লক্ষণ।—অনেক সময় এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ: (অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অবশতা।) অতি অল্প সময়ের মধ্যে বা হঠাৎ একবারে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

পীড়ার প্রারম্ভে শিশুদের মধ্যেই আক্ষেপ (convulsion) দেখিতে পাওয়া যায়। বয়স্ক ব্যক্তির এই ব্যাধিতে আক্ষেপ বা অন্য অন্য স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় না। জ্বর, শিরোবেদনা, পৃষ্ঠদেশে অল্প বা অধিক বেদনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অবশতা ইহার প্রধান লক্ষণ। এই এই অবশতা প্রথমে শরীরের নিম্নদেশে লক্ষিত হয়, পরে বাহুদ্বয় ও অন্যান্য ভাগে ব্যাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগীর তত্তস্থানের স্পর্শশক্তির বিলোপ বা ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। কেবল পরিচালনাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত স্থান সকল স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। যে সকল পেশীগুচ্ছ পীড়াভিভূত হয়, তাহারা ক্রমে বিশুষ্ক ও শিথিল হইয়া পড়ে। রোগী মল

মূত্র ত্যাগে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না। কিছুকাল পরে শিশুর হস্ত পদাদির সন্ধিসমূহের শিথিলতা জন্মে। কোমল অস্থিসমূহ উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আমরা যত খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ মনুষ্য দেখিতে পাই, তাহাদের অধিকাংশই শৈশবাবস্থায় এই পীড়ার হস্তে পতিত হওয়াতে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যৌবনে যখন অস্থি ও সন্ধিসমূহ সুদৃঢ় হয়, যখন আর তাহাদের বর্দ্ধন শেষ হইয়া আইসে, সেই সময় এই পীড়াগ্রস্ত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ খঞ্জতা বা অঙ্গের বিকলতা হইবার সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু হস্তপদাদির পরিচালনাশক্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেক রোগী অল্প বা অধিক দিনের মধ্যে রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সম্যক্ বা আংশিকরূপে সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।—রোগীকে স্থিরভাবে শায়িত রাখা বিধেয়। মেরুদণ্ডের উপর ব্লিষ্টার প্রয়োগ, পীড়াগ্রস্ত পেশীসমূহকে উত্তমরূপে মর্দ্দন ও ঘর্ষণ এবং তদুপরি উষ্ণ জল প্রয়োগ, তাড়িৎ সংযোগে তাহাদিগকে উত্তেজনা করা, অতি অল্পমাত্রায় হাইপোডার্মিক্ সিরিঞ্জের দ্বারায় তাহাদের অভ্যন্তরে ষ্ট্রীক্নিয়া প্রয়োগ। রোগের পুরাতন অবস্থায় ষ্ট্রীক্নিয়া, লৌহঘটিত ঔষধ, ফস্ফরাশ, আর্সেনিক, কড্‌লিভার অইল প্রভৃতি বলকারী ঔষধ উপকারী। অন্যান্য উপায়ে রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতি বিধেয়।

পুরাতন পলিওমাইলাইটিস্।

শৈত্যসেবন, মেরুদণ্ডে আঘাত, কন্‌কাশন্, নানা কারণে অপরিমিত বলক্ষয় প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া উক্ত হয়। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় এই পীড়ার আধিক্য দেখা যায়।

লক্ষণ।—পক্ষাঘাত, অল্প বা অধিক পরিমাণে শরীরের নিম্নশাখাদ্বয়ে লক্ষিত হয়। ক্রমে হস্তদ্বয়ও আক্রান্ত হয়, কখন কখন সার্‌ভাইকেল্ দেশও মেডালা পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু উপস্থিত করে, স্পর্শানুভব-শক্তি কোন সময়ে নষ্ট হয় না; এই পীড়াতে শয্যাক্ষতও লক্ষিত হয় না এবং মূত্রাশয়ের বা রেক্টমের কোন প্রকার দোষ জন্মে না; পুরুষত্ব স্বাভাবিক থাকে। আক্রান্ত পেশীবৃন্দ ক্রমে শুষ্ক হইয়া আইসে।

চিকিৎসা।—পুষ্টিকর খাদ্য, বলকারক ঔষধ, মেরুদণ্ডের উপর ব্লিষ্টার, তাড়িত প্রয়োগ ইত্যাদি।

লণ্ড্রিস্ প্যারালিসিস্।

ইহাতে অবশতা শরীরের নিম্নশাখা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; অবশেষে মেডালা অব্‌লঙ্গেটা ইহাতে অভিভূত ও জড়িত হওয়াতে রোগীর প্রাণ নষ্ট হয়।

কিসে যে এই ব্যায়ামের উৎপত্তি হয়, তাহা এখনও স্থির করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। শৈত্য লাগান, মেরুদণ্ডের উপর আঘাত, শরীরের অনিয়মিত ক্ষয়, উপদংশ প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

রোগী প্রথমে পদদ্বয় হীনবল অনুভব করে। পরে সমস্ত নিম্নাঙ্গই উক্ত ভাবাপন্ন হয় এবং অবশ হইয়া পড়ে। অবশতা ক্রমে কটিদেশ হইতে বক্ষঃ ও পৃষ্ঠদেশে, পরে হস্তদ্বয়, গ্রীবাদেশ এবং মুখমণ্ডল প্রভৃতিতে অগ্রসর হয়; তখন এই সমস্ত স্থানের সঞ্চালনাশক্তি থাকে না, পেশীসমূহ শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু স্পর্শানুভবশক্তি কোন সময়েই নষ্ট বা ন্যূন হয় না। মূত্রাশয়ের শক্তির বিলোপ ঘটে, রোগীর মলত্যাগে কষ্ট উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ রোগ যখন কর্ডের অত্যুচ্চভাগে ও মেডালায় উত্থিত হয়, তখন সুস্পষ্ট বাক্য স্ফুরণ হয় না, রোগীর শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে; রোগী এইরূপে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখন কখন রোগ কর্ডের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া যাপ্য থাকে, হয় ত আরোগ্য হইয়া যায়; কিন্তু এ ঘটনা অতি বিরল। যদি এই প্রকারে রোগ উপশম হয়, তাহা হইলে রোগ যে স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত থাকে, সেইস্থান হইতেই অবশতা প্রথমে আরোগ্য হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে পদাদিতে পুনরায় চলৎশক্তি জন্মে। কদাচ রোগ মেডালা হইতে ক্রমে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হওতঃ পদাদিতে দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—লঘুপাক পুষ্টিকর পথ্য সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ, স্থানিক সংঘর্ষণ, সংমর্দ্দন ও তাড়িৎ প্রয়োগ, ফস্ফরাশ, লৌহ ও আর্সেনিক্ ঘটিত ঔষধ ইত্যাদি।

ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীনীলরতন অধিকারী এম্, ডি।

———

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধটী কাজের হইলেও ভাষাটা যেন বড়ই খটমট বোধ হইল। "অবশেষে মেডালা অব্ লঙ্গেটা ইহাতে অভিভূত হয়" এসব কথা আরও পরিস্কার করিয়া লেখা উচিত ছিল। আশা করি, ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

চি, স, সম্পাদক।

ধাতুব্যাখ্যা।

(কবিরাজী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে আলোচ্য বিষয় এই যে, রোগীর নিকট কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল নাড়ী টিপিয়া এই সকল অবস্থা নিঃসন্দেহরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে কি না? ইতি পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আমি সরল ভাবে আমার মত প্রকাশ করিতেছি। যদিও হিন্দু-চিকিৎসা তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ী স্পন্দনের বিভিন্নতা বর্ণিত আছে, তথাপি সেই সকল বিভিন্নতা এক সময়ে মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া রোগ-নির্ব্বাচন করা আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি চিকিৎসক দ্বারা সকল সময় সুসিদ্ধ হয় না। মানসিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী স্পন্দনের ও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। আবার দুই তিনপ্রকার পীড়াতেও নাড়ীর অবস্থা একইরূপ হইতে পারে। সুতরাং সেই সকল কথা রোগীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া না লইলে কখনই সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া একমাত্র নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা সকল সময় আমি রোগ-নির্ণয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি না। কিন্তু আমি পারি না বলিয়া ভারতে এখনও যে এমন লোক নাই, তাহা নহে। প্রায় দুইবৎসর হইল আমি বরিশালের অন্তর্গত বার্ত্তি নামক কোন পল্লিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই গ্রামে ভৈরব কবিরাজ নামে একজন অতি বৃদ্ধ চিকিৎসক বাস করেন। আমার সমক্ষে তিনি একটী উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোককে পরীক্ষা করিলেন। রোগীর সহিত যে একটী ভদ্রলোক

ছিলেন, তিনি আদ্যন্ত অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিলে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন——"আপনাকে কিছুই বলিতে হবে না, নাড়ী পরীক্ষা করিলেই আমি সমস্ত বুঝিতে পারিব। তবে প্রথমে যাহা হইয়াছিল, তাহাই আপনাকে বলিতে হইবে।" সর্ব্ব প্রথম রোগীর যেরূপ হইয়াছিল, সেই অবস্থাজ্ঞাপক কেবল একটী শব্দ শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর একটী দীর্ঘ বচন আবৃত্তি করিলেন। কোন্ পীড়ায় কি রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে এবং কি কি নিয়মে আহার বিহার করিলে কোন্ সময় রোগীর কি রূপ অবস্থা হইতে পারে, তাহা সেই বচনের মধ্যে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। বচনটী আবৃত্তি হইলে কবিরাজ মহাশয় কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেন এবং পরে রোগীর অতীত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা যাহা কহিলেন, সমস্তই ঐক্য হইয়া গেল। ভাবীফল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি, ঠিক হইয়াছে। সেই সময় ঐ বচনটী পুনরাবৃত্তির জন্য আমি বারম্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া ছিলাম, কিন্তু উহাই তাঁহাদিগের গুপ্তবিদ্যা, সুতরাং অপ্রকাশ্য ইত্যাদি বলিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এখনও কোন কোন স্থানে দুই একজন বিচক্ষণ নাড়ীপরীক্ষক বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে আর্য্যর্ষিগণ নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধে যতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কোন কোন স্থানে তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ বচনপ্রমাণই লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী, দীনাবাজার } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবীণ লেখক মহাশয় নাড়ী-পরীক্ষাসম্বন্ধে সরলভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আর থাকিতে না পারিয়া সম্পাদক মহাশয়ও প্রাণের কপাট খুলিয়া সকল কথাই খোলসা করিয়া লিখিতেছেন।

(১) তাঁহার লিখিত "হিন্দু চিকিৎসা তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে নাড়ী স্পন্দনের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়," ইহা হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত

কোন্ তন্ত্র বা গ্রন্থ? উত্তরে লেখক মহাশয় নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে, এ নাড়ীকাহিনী অবশ্যই চরক সুশ্রুতাদি কোন বৈদিক গ্রন্থের নহে, তবে তান্ত্রিক দুই একখানি যৎসামান্য গ্রন্থের কথা মাত্র। বলা বাহুল্য যে, তান্ত্রিক" চিকিৎসা গ্রন্থের অনেকাংশই বহ্বাড়ম্বর-পূর্ণ এবং সকল কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে একথা নিশ্চিত যে, একমাত্র নাড়ী দেখিয়া কোনমতেই কোন বুদ্ধিতেই কোন জ্ঞানেই সর্ব্বপ্রকার পীড়া নির্দ্দেশ করিতে এপর্য্যন্ত কেহ সক্ষম হন্ নাই, এবং কখনও হইবেন বলিয়াও আশা করা যাইতে পারে না। কেননা দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার রোগ নির্দ্দেশ করা প্রকৃত-পক্ষেই যে ভয়ানক অসম্ভব, তাহা কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

(২) কেবলমাত্র হাত ধরার প্রতি নির্ভর করিয়া, যে সর্ব্বপ্রকার রোগ জ্ঞান আসিতে পারে না, এ কথা লেখক মহাশয়ের নিজের জ্ঞানে কিন্তু স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়াই লিখিয়াছেন যে, "আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির দ্বারা সকল সময় সুসিদ্ধ হয় না।" উত্তরে জোর করিয়া বলিতেছি যে, এই হাতধরা সম্বন্ধে আপনার আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষেও যে কথা, আর অগাধবুদ্ধি বা প্রকাণ্ড মাথাওয়ালার পক্ষেও ঠিক্ তথৈবচ। সুতরাং এসম্বন্ধে নিজকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিয়া আক্ষেপ করিবার কোন কথাই নাই।

(৩) তারপর লেখক, বরিশাল বার্ত্তা তুলিয়া নাড়ী পরীক্ষার যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সে কথাটা ত কোন কাজেরই নহে। কেন যে অকাজের, সে কথা আজ তাঁহাকে বুঝাইতে গেলে অন্ততঃ এস্থলে দশ বিশপাতা না লিখিলে চলেনা। কিন্তু এরূপ মন্তব্যস্থলে তাহা লেখা অসঙ্গত। তবে যদি প্রয়োজন হয় এবং আমার এবারকার লিখিত কথায় কে কি বলেন, দেখিয়া তখন অবশ্যই হয় ত হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া সকলকে দেখাইয়া দিব।

(৪) লেখক বলিয়াছেন—"আর্য্যর্ষিগণ নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে চরম উন্নতি করিয়াছিলেন।" জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ কোন্ আর্য্য ঋষি কোন্ কোন্ গ্রন্থে এ নাড়ী কাহিনী বর্ণন করিয়া গিয়াছেন? বলাবাহুল্য যে, হিন্দুগণ প্রকৃত আর্য্য ঋষি বলিয়া যাঁহাদের নামেই মস্তক অবনত করে

সে সকল ঋষির মধ্যে বোধ হয় কেহই একমাত্র নাড়ী পরীক্ষার প্রতি সম্যক্ নির্ভর করিয়া রোগনির্দ্দেশের কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৫) পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মস্তকহীন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেমন অসংখ্য অজ্ঞানতা সদর্পে ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া এখনও পর্য্যন্ত যথেচ্ছভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ "হাত ধরিয়াই সকল রোগ বলা যায়" এইরূপ একটা অতি জাঁকাল সম্পূর্ণ মূলহীন প্রবাদবাক্যও সাধারণের মধ্যে মহা-স্পর্দ্ধার সহিত অকুতোভয়ে চলিয়া আসিতেছে। জানিনা আর কতদিন এসব অসত্যরূপিণী মহারাক্ষসীর হাত হইতে ভারতবর্ষ পরিত্রাণ পাইবে?

চি, স, সম্পাদক।

বৈদ্য-চিকিৎসকের অসম্পূর্ণতা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "চিকিৎসা-সম্মিলনী"

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যে কোন মতের চিকিৎসক হউন না কেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শবচ্ছেদ ক্রিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। আলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিতে শব-চ্ছেদ (Dessection) করা একান্ত আবশ্যক। শারীরতত্ত্ব (Anatomy) এবং শারীর-বিধানতত্ত্ব (Physiology) না জানিলে ভালরূপে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা করা কখনই যাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসক এ বিষয় বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের এ বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। মৃত শরীর স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হইবে, এই আধুনিক মতই সর্ব্বনাশের কারণ। এমন কি যদি দৈবাৎ সরস মনুষ্যাস্থি কাহা কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে স্নান করিতে হইবে ও দিবসত্রয় অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে। এইমত রঘুনন্দনের সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এ বিশ্বাস ছিলনা, পশ্চাৎ ইহা প্রদর্শিত হইবে। প্রথমে যখন কলি-কাতা মেডিকেলকলেজে ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত শব-চ্ছেদ করেন, তখন কলি-

কাতা দুর্গ (Fort William) হইতে তোপ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে শব-চ্ছেদ ক্রিয়া প্রচার ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান্ ধন্বন্তরি সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিকুমারদিগকে বলিলেন বৎস সুশ্রুতঃ——

"ত্বক্ পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানদৃতেনৈব বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্তা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ——উপরবর্ত্তী ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে যে কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গত পদার্থের নির্ণয় আছে, তাহা তোমাকে বলিলাম। এ সকল শল্য-জ্ঞান ব্যতীত বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অতএব যিনি এ বিষয়ের নিঃসংশয় জ্ঞানলাভের বাঞ্ছা করিবেন এবং শল্য-কার্য্যে অর্থাৎ চ্ছেদ ভেদাদি কার্য্যে দক্ষ হইতে ইচ্ছা করিবেন। তিনি মৃতদেহ লইয়া তাহা উত্তমরূপে শোধিত করিবেন। অনন্তর শাস্ত্র-নির্ণীত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করিবেন।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সুশ্রুত মতে আর্য্য চিকিৎসকগণ শবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরস্থানের উপদেশ দিতেন। যাহারা শব-চ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাঁহারা কৃতান্তস্বরূপ। ডাক্তার ওয়াইজ তৎকৃত "Hindu system of Medecine" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরস্থানে যথা-নিয়মে শব-চ্ছেদব্যবস্থা করিয়া লিখিত হইয়াছে। আর্য্যগণ অস্ত্র চিকিৎসায় (Surgery) পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালে ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল ও তাঁহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতে পারিতেন। বসন্ত-রোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।"

(দ্রষ্টব্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রদত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৫১ পৃষ্ঠা)

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেই স্বীকার করেন যে, শব-চ্ছেদ এ দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ("The Brahmans did not sprink from dissecting the dead bodies" See Brief History of the Indian People by W. W. Hunter C. S. I. L. L. D, SeventhEd. p 56.)

আর ডাক্তার হণ্টার সাহেবের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদের পর এ দেশে আবার যখন আধুনিক হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, সেই সময় হইতে শব-চ্ছেদ করা উঠিয়া যায়, ("As Buddhism passed into modern Hinduism (600—1000 A. D.) and the shackels of caste were reimposed the Brahmans avoided contact with blood and deseased matter they left the medical profession to Vaidas" Vede De. p 57.) হণ্টার সাহেবের মতে আমাদের দেশে ৬০০ হইতে ১০০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে শব-চ্ছেদ ক্রিয়া উঠিয়া যায় ও ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করা ত্যাগ করেন এবং বৈদ্যদিগের দ্বারা চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ-গণ যে, চিকিৎসা করিতেন, হণ্টার সাহেবের এ যুক্তি অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না ; কারণ সুশ্রুতগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ——"যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়,বৈশ্য যদি সদ্বংশোৎপন্ন হয়,তবে ভিষক্ তাহাকে শিষ্য করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত করিবেন।" সুশ্রুত গ্রন্থ অত্যন্ত পুরাতন, এমন কি মহাভার-তের পূর্ব্বে লিখিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান পুস্তক বলিয়া গৃহীত। তখন সুশ্রুতের মতে চিকিৎসা করিতে হইলে শবচ্ছেদ করা আবশ্যক হইত। যাহারা দেশীয় শাস্ত্রের উন্নতি ইচ্ছা করেন, এমত মহোদয়গণ ও বিজ্ঞ বিজ্ঞ বৈদ্য মহাশয়েরা এবং আপনার ন্যায় উন্নতমনা সম্পাদক সকলে একত্রিত হইয়া শবচ্ছেদ আবার যাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা আর্য্য শাস্ত্রেরই পতন হইবে। বৈদ্য চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ফল না হওয়ার কারণই শারীর-বিধান তত্ত্ব না জানাই। শবচ্ছেদ ভেদ করিলে রঘুনন্দনের স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের অমান্য করা হয়। কিন্তু, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত বিধি রক্ষা করিয়া আজ কালকার সময় চলা এক রকম দুঃসাধ্য। দেখুন ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছের দাস (Cleark) হইতেছেন, ইংরাজের সহিত এক আসনে উপ-বেশন করিতে হইতেছে, ইহাতে কি হিন্দুশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করা হয় না? স্মৃতিতে বিশেষ বিশেষ তিথিতে নিম্বাদি তক্ষণ নিষেধ, এমন কি গোমাংস ভক্ষণের তুল্য পাতক বলিয়াই উল্লেখ আছে ; বোধ হয় শতের মধ্যে এক জন কি দুই জন এমত রক্ষা করেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণে সুরা পান করিলে তুষানলে প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, কয় জন

আজ এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন, আবার যখন হিন্দুদিগের মধ্যে সমুদ্র যাত্রা ("Sea Voyage") প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তখন আপনারা কেন শবচ্ছেদ করা প্রচলনের চেষ্টা করিবেন না? শবচ্ছেদ বৈদ্য মতের চিকিৎসক দিগের মধ্যে প্রচলন হইলে, দেশীয় চিকিৎসার আরও উন্নতি ও ভারতের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা হইবে।

একান্ত বশম্বদ

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক।

কলিকাতা
নং ৫১ গড়পার রোড।
তাং ইং ২২ জুলাই
১৮৯২।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যেমন একদিকের একখানি পাখা না থাকিলে পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হয় না, যেমন এক চক্ষুর অভাবে জীবগণ কানা বলিয়া অভিহিত হয়, যেমন পদযুগলের মধ্যে একখানি পায়ের শক্তির অভাবে সে খোঁড়া বলিয়া কথিত ও তাহাকে লাঠি ভরদিয়া অতিকষ্টে হেঁচড়াইয়া হেঁচাড়াইয়া চলিতে হয়, সেইরূপ চিকিৎসাশাস্ত্র বলিয়া নহে, কিন্তু এ পৃথিবীতে যে কোন পদার্থেরই হউক, কোনরূপ অঙ্গহানি দেখিলেই নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকে। সুতরাং একটা যে সে তুচ্ছবিষয়ের অঙ্গ হানিতেই যখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না, তখন ভারতবর্ষের ন্যায় এমন একটা মহা প্রদেশের অসংখ্য ব্যক্তির নিত্য ব্যবহার্য্য এমত একটা প্রকাণ্ড আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের শরীর ও অস্ত্রবিজ্ঞানরূপ অর্দ্ধাঙ্গের অভাব দেখিয়া ডাক্তার শশী বাবু যে ২।১০টা কথা বলিয়া টিট্‌কারী দিবেন, ইহাতে সর্ব্বাংশেই সঙ্গত বলিয়া বোধ করিতে পারি।

তবে কথা এই যে, তিনি ঐ টিট্‌কারী দেন্ কাহাকে? স্বীকার করিলাম যে, আধুনিক বৈদ্যচিকিৎসক সম্প্রদায় অর্দ্ধাঙ্গ-হীন হইয়া কোনমতে কষ্টে সৃষ্টে কেবল তৈল বটীকার সাহায্যে যেন তেন প্রকারে ব্যবসাদারী ভাবে দিন যাপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি,

সে দোষ কি কেবল বৈদ্য-চিকিৎসকগণেরই? কিন্তু তাত নয়; দেশের যাঁহারা গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত, যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক বলিয়া বিখ্যাত ও সর্ব্বতোভাবেই লক্ষ্মীমন্ত, বলা বাহুল্য যে, সেই অগাধবুদ্ধির দলের ষোল আনার মধ্যে প্রায় পৌনে ষোল আনা রকমের লোকই যে স্বদেশ ও স্বজন প্রেমে ঘোর উদাসীন থাকিয়া কেবল অহোরহই বৈদেশিক প্রেমে উন্মত্ত সে কথা কি লেখক ভাবিয়াছেন? যদি তাহাই না হইবে, তবে ২।৪ বৎসর যাইতে না যাইতেই হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশীয় লোকের সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটা অতি অকাজের লেডি ফণ্ড দ্বারা এত বড় ভারতবর্ষটা ছাইয়া ফেলিল, আর ভারতীয় লোকের প্রকৃতই প্রাণস্বরূপ এমন প্রকৃত প্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটার সম্বন্ধে প্রাণভরিয়া দুই দশটা কথা বলে, এমন লোক নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ইহা দেশের সম্পূর্ণ দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

চি, স, সম্পাদক।

উপদংশ রোগের-চিকিৎসায় পারদ ও আই-ওডিন্‌ঘটিত ঔষধের উপযোগিতা।

(On the relative Value of Mercury and Iodine Compounds in the treatmeut of Syphilis.)

নিউইয়র্ক নগরের ডাক্তার এস্ ডন্‌ক্যান বক্‌লি M. D. সাহেবের মত।

উপদংশ রোগের চিকিৎসা, এই বিষ বিনষ্টকরণ ও যাহাতে ইহা অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত না হইতে পারে কিম্বা এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিগণ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইতে না পারে, এই বিষয়ে অধুনাতন সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিসিৎসকগণ বহু গবেষণার পর একবাক্য স্থির করিয়াছেন

যে, কেবলমাত্র পারদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে কিন্তু আইওডিন্ বা এতদ্ঘটিত ঔষধ সকল দ্বারা তাহা কদাচিৎ সাধিত হয়; অর্থাৎ তরুণ রোগে, উপদংশ বিষ সংক্রামণ কালে কেবল মাত্র যদি আইওডিন্ বা আইওডিন্ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে এই রোগের গতি রুদ্ধ কিম্বা প্রশমিত কিম্বা ইহার সংক্রামক গুণের হ্রাস করিতে পারে না; পক্ষান্তরে পারদের এই ক্ষমতা নিঃসংশয়িতরূপে না হউক আশ্চর্য্যরূপে লক্ষিত হয়।

উপদংশ রোগের চিকিৎসায় বিশেষতঃ রোগের শেষাবস্থায় এই উভয় ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে যদিও আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি ও প্রশংসা করি, কিন্তু ইহাও আমি স্বীকার করি যে, এই রোগের এমন ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবস্থা আছে, যাহাতে এই উভয় ঔষধের প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহারে সুফল দর্শিয়া থাকে। সেই সেই অবস্থা কি, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উপদংশ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আইওডিন্ ও এতদ্ঘটিত ঔষধ দ্বারা কদাচিৎ সামান্য উপকার হয়, পক্ষান্তরে এই অবস্থায় পারদ দ্বারা সর্ব্বদাই অতি আশ্চর্য্যজনক ও প্রীতিকর উপকার দর্শিয়া থাকে।

উপদংশ-রোগজ প্রকৃত কঠিনাকারের ক্ষত বা পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত রোগবিষের সংক্রামণ বা শরীরোপরি প্রকৃত রোগজ কণ্ডু বহির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা রোগবিষ শরীরস্থ হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে অবিলম্বে পারদ বা পারদঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এই অবস্থায় আইওডিন্ঘটিত ঔষধ প্রয়োগের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, বরং এতদ্ঘটিত ঔষধ দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হয়; অনেকের এরূপ বিশ্বাস। পারদ ও খটিকা সহ মিশ্রণে গ্রে পাউডার নামে ঔষধ প্রস্তুত হয়, ১ গ্রেণ মাত্রায় তাহা বটিকাকারে প্রয়োগ করণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক। এই বটিকা ২ঘণ্টা অন্তর ১টী বা প্রয়োজন মতে প্রতিবারে ২টী মাত্রায়, স্যাংকার ক্ষত আরোগ্য কিম্বা অন্যান্য লক্ষণ সকল অন্তর্হিত কিম্বা মুখ হইতে লালা নিঃসৃত না হওন পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে; তৎপরে মাত্রা হ্রাস করিয়া ৩ বা ৪ঘণ্টা অন্তর ১টী বটিকা সেব্য। ধাতু বিশেষে কোন শরীরে যদি ঔষধের

উপকার দর্শিতে বিলম্ব হয়, তবে প্রযুক্ত পারদের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা পারদে বাষ্পাভিষেক প্রদান করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা বলা অত্যুক্তি যে, লালাস্রাব হইতে আরম্ভ হইবামাত্র কিম্বা দন্তমূল কোমল হইবামাত্র অথবা লালা অধিক মাত্রায় নিঃসৃত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইলে পারদের মাত্রা হ্রাস করিয়া অর্দ্ধমাত্রায় দিতে থাকিবে, পরে পুনরায় কয়েক দিবস মধ্যে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। অত্যধিক মাত্রায় লালাস্রাব হইতে থাকিলে প্রকৃত চিকিৎসার ব্যাঘাত জন্মে। মুখবিবরের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, এবং ক্লোরেট্-অব্-পটাশ্ সহ কুল্লি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মুখ ধৌত করিতে দিবে। কেহ কেহ বলেন এই অবস্থায় দন্ত-চিকিৎসক আনাইয়া দন্ত সকল পরীক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমি এই মতের পোষকতা করি না, যেহেতু দন্তমূলস্থ ক্ষতে প্রাথমিক উপদংশ বিষের অংশ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ঐ বিষ অপর ব্যক্তির সংস্রবে আনা যুক্তিসঙ্গত নহে।

উপদংশ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পারদের স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী; ক্ষতোপরি ক্যালমেল্ চূর্ণ প্রয়োগ কিম্বা ব্ল্যাক্ওয়াস দ্বারা ক্ষত সিক্তাবস্থায় সংরক্ষণ কিম্বা স্যাংকার ক্ষতোপরি পারদের পলস্তা প্রয়োগ করিলে সত্বরে ক্ষত আরোগ্য ও রোগের গতিরুদ্ধ হয়।

উপদংশ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পারদ আরও বিবিধ আকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুনঃপুনঃ পারদ বাষ্পাভিষেক বা পারদের মলম মর্দ্দন দ্বারা শরীরে পারদের ক্রিয়া দর্শাইতে পারা যায়; পারদ ও তৈল একত্রে মর্দ্দন করিয়া তাহার কিম্বা পারদের বিবিধ লবণের অধঃত্বাচ্ প্রয়োগ দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, অনেকে এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্যতঃ সেবন দ্বারা যেমত সুফল দর্শে, এবং গ্রে পাউডার প্রয়োগে আমি যেমত উপকার হইতে দেখিয়াছি, তেমত আর কিছুতেই হয় না; বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরিও সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলতা জন্মিবারই সমধিক সম্ভাবনা।

পারদ সেবন দ্বারা যদি স্যাংকার ক্ষত সত্বরে আরোগ্য হইয়া যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে পায় না, না হয় সত্বরে নিবারিত হয়, তবে আইওডিন্ বা আইওডিন্ঘটিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবার

কোনই প্রয়োজন হয় না, তথাপিও কেহ কেহ শেষাবস্থায় পারদের রেড্ বা গ্রিন্ লবণের সহিত আইওডিন্ প্রয়োগ করিতে ভালবাসেন; আধুনিক চিকিৎসক গণের মতে এই চিকিৎসা ২বৎসরকাল অথবা বিরক্তিকর লক্ষণ সকল তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত চলিবে।

উপদংশ রোগের কোন্ অবস্থায় আইওডিন্ ও এতদ্ঘটিত ঔষধ সকল প্রকৃত প্রস্তাবে উপযোগী, এক্ষণে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ইত্যগ্রে উপদংশ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে কদাচিৎ রোগীর দুর্ভাভ্যবশতঃ তাহাতে উপকার হয় না। কোন না কোন কারণে উপদংশ রোগাক্রান্ত অধিকাংশ লোকেই উল্লিখিত নিয়মানুসারে চিকিৎসা করায় না বা চিকিৎসার নিয়ম রক্ষা করে না, সুতরাং বহুসময়ে চর্ম্ম অস্থি আবরক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, পেশী,স্নায়ুমণ্ডলী, উদরগহ্বরস্থ বিবিধ যন্ত্র ও শরীরের অন্যান্য গঠন বিবিধপ্রকার উৎকট উৎকট উপসর্গে কষ্ট পায়, কখন কখন পারদ দ্বারা উল্লিখিত নিয়ম মতে চিকিৎসাকালে কিম্বা রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন শরীরে রোগ কঠিন ও দুর্দ্দম্য লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠে, চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না। এই অবস্থায় পুনঃ পারদ প্রয়োগ ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেই নিয়মে চিকিৎসা করিলে কি ফল দর্শে? উত্তরঃ— রোগের লক্ষণগুলি ক্রমশঃ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ও সমধিক স্থান অধিকার করে এবং কোন অংশে উপকার না হইয়া বরং বিলক্ষণ অপকার হইতে থাকে ও রোগ দুর্দ্দম্য হইয়া উঠে।

এই অবস্থায় আইওডিন্ প্রয়োগের উপযুক্ত সময়, ইহা দ্বারা এই সময়ে অতি আশ্চর্য্যজনক ফল দর্শে; যে সকল লক্ষণ দীর্ঘকাল কষ্ট প্রদান করিতেছিল কিম্বা ক্রমশঃ দুর্দ্দম্য হইয়া উঠিতেছিল, তাহারা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়, যে রোগ দুরারোগ্য বিবেচিত হইতেছিল, তাহা আরোগ্য হইয়া উঠে, এবং এবং যে রোগ জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল, আইওডিন্ বা আইওডিন্-ঘটিত ঔষধ দ্বারা তাহা সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া যায়।

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে আইওডিন্ঘটিত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পারদ ব্যবস্থা করা উচিত নহে, এবং তাঁহারা এরূপ অধিক মাত্রায় ইহা ব্যবস্থা করেন যে, সাধারণতঃ যে সকল চিকিৎসক অল্প মাত্রায় আইওডিন্ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবেন। কোন

কোন সময়ে দেখা গিয়াছে উপদংশ রোগবশতঃ স্নায়ুমণ্ডলী পীড়িত হইয়া জীবন নাশের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, এমত অবস্থায় বহুশত গ্রেন্ মাত্রায় আইওডাইড্ অব্ পটাশিয়ম্ জীবন রক্ষা করিয়াছে এবং আরও অধিক মাত্রায় প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে; এমত অবস্থায় নিশ্চয়ই আরও বর্দ্ধিত মাত্রায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু পক্ষান্তরে, বহুসংখ্যক উপদংশ ব্যাধিগ্রস্ত রোগী দেখিয়া ও আসন্ন দশাগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এই বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে যে, অন্যান্য উপায় যদিই ব্যর্থ হয়, তবে এরূপ অসাধারণ মাত্রায় কদাচিৎ ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, ইহা আমার বিশ্বাস যে, উপদংশ রোগের শেষাবস্থায় এবং যতই কেন গুরুতর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকুক না, কিয়ৎ-পরিমাণে পারদ দ্বারা নিশ্চয়ই রোগের প্রতিকার হইয়া লক্ষণ সকল অন্তর্হিত হইবে। আমি ভালরূপ জানি যে, কোন কোন রোগীতে এবং কোন কোন সময়ে পারদ সহ্য হয় না, বরং পারদ দ্বারা অনিষ্ট হয়; কিন্তু কোন কোন রোগীতে লৌহ ও তিক্ত বলকারক ঔষধের সহিত পারদ ব্যবহার করিলে সহ্য হয় এবং তাহা দ্বারা উপদংশ রোগের সকল অবস্থার প্রতিকার হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে স্বভাব ও ধাতু বিকৃত থাকিলে, বিশেষ সতর্কতার সহিত ও বিবেচনা-পূর্ব্বক পারদ ব্যবহার করিবে ও প্রয়োজন মতে অন্যান্য ঔষধ এবং মিনারাল্ এসিড্ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

উপদংশ রোগের শেষ উপসর্গ সকলে আমি সাধারণতঃ সাবেক নিয়মে চিকিৎসা করিয়া থাকি, অর্থাৎ অল্প মাত্রায় পারদঘটিত ঔষধের সহিত আইওডিন্ঘটিত কোন ঔষধ ও তৎসঙ্গে লৌহের কোন প্রকার প্রয়োগরূপ এবং কোন তিক্ত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তাহাতে সত্বরে উপকার না দর্শিলে কার্য্যকারী ঔষধ সকলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকি। এই ঔষধে পারদের মাত্রা অল্প অল্প বৃদ্ধি করিয়া দেই, ১এর ৩২ গ্রেণ বাই ক্লোরাইড্ অব্ মার্করি প্রথমে দিয়া পরে তাহা ১এর ২৪, ১এর ১৬, ১এর ১২ গ্রেণ বা প্রয়োজন মতে ততোধিক মাত্রাতেই দেই। রোগ-লক্ষণ প্রকাশের ২ বৎসর পরে বা পুনরায় দুইবার রোগ হইবার পরে উক্ত মাত্রায় প্রযুজ্য। রোগাক্রামণের আরও বিলম্বে লক্ষণ সকল প্রকাশিত

হইলে বা অন্যান্য উপায় সকল ব্যর্থ হইলে, অন্যান্য ঔষধ সকল সাবেক মাত্রায় রাখিয়া আইওডাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকি।

উল্লিখিত ঔষধ প্রতিবার আহারান্তে সেবন করিতে দিয়া, আইওডাইড অব্ পটাসিয়ম্ সোডিয়ম্ বা এমোনিয়ম্ ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ভিকীওয়াটরে দ্রব করিয়া উভয় আহারের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রত্যহ ৩ বার নিয়মে সেবন করিতে দিবে, এবং রোগ-লক্ষণ সকল সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে; কোন কোন স্থলে সিরপ্ অব্ হাইড্রিয়ডিক্ এসিড্ উক্ত সময়ে সেবনে উপকার হয়, কিম্বা লাইকর আইওডাইড্ অব্ ষ্টার্চ্চ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

যদ্যপি রোগের প্রথমাবস্থায় পারদঘটিত ঔষধের সঙ্গে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তবে পারদের বাষ্পাবগাহ বা ইনংসন্ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি স্বয়ং এরূপ চিকিৎসায় কোন সন্তোষজনক ফল পাই নাই, ও পারদ এবং আইওডিন্‌ঘটিত ঔষধ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যবহারের অনুমোদন করি না। আমি বিবেচনা করি পারদ ও আইওডিন্‌ঘটিত ঔষধ একসঙ্গে প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়, এবং প্রয়োজনানুসারে উভয় ঔষধ বা অন্যতরটীর মাত্রা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। চিকিৎসা-দর্শন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

সকল ডাক্তারের পক্ষেই যে উপরোক্ত প্রবন্ধটী প্রকৃতই উপযোগী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তা ছাড়া অন্য যে সকল হাতুড়ে চিকিৎসক, যে সে স্থলে উপদংশের নামেই যথেচ্ছ পারা ব্যবহার করাইয়া রোগীকে চরম দুর্দ্দশাপন্ন এমন কি, মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত নিঃক্ষিপ্ত করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এ প্রবন্ধ বড়ই উপকারী বলিয়া স্বীকার করি। আর আজকালকার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যেও যাঁহারা উপদংশ চিকিৎসায় অথবা অন্য রকমের রক্তদোষে সালসার মধ্যে গোপন ভাবে আইওডিন্ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এ প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য। চি, স, সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

তৃতীয় অধ্যায়—জরায়ুরোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জয়া। শুনিতে পাই মেয়ে দিগের জরায়ুতে (যাহাকে চলিত ভাষায় সন্তানের নাড়ী কহে) বহু যন্ত্রণাপ্রদ পীড়কা অথবা ক্ষত হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? এক্ষণে এই সকল কথা বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। যাহারা প্রতি বৎসরেই এক একবার করিয়া গর্ভিণী হয় এবং ৩।৪ মাসের মধ্যেই সেই গর্ভ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগের জরায়ুতে ক্ষত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। দিবা রাত্রি অতিরিক্ত পুরুষ সংসর্গ করিলেও ক্ষত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ঔপসর্গিক উপদংশ রোগ হইতে অথবা ঔপসর্গিক মেহাক্রান্ত পুরুষের সহিত সঙ্গম করিলে জরায়ুতে ক্ষত এবং নানা প্রকার পীড়কা হইয়া থাকে।

জয়া। ঔপসর্গিক উপদংশ এবং মেহ কাহাকে বলে? তাহাত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বিজয়া। বহু মৈথুন অথবা ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা উপগত হইলে, স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ে অতিশয় কষ্টপ্রদ এবং বহু রোগজনক পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা সংক্রামক পীড়া। একজনের হইলে তাহার ঔরসজাত সকলেই এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাকে ঔপসর্গিক উপদংশ কহে। এই রোগাক্রান্ত মেয়েলোক দিগের সহিত নিরন্তর সঙ্গম করিলে যদি পুরুষের মূত্রনালীর অভ্যন্তরে ক্ষত হইয়া সর্ব্বদা পূঁয়াদি নির্গত হয় এবং ঘন ঘন মূত্রবেগ ও লিঙ্গোত্থান হইয়া যদি অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে, তবে তাহাকেই ঔপসর্গিক মেহ কহা যায়। এই পীড়ায় মূত্র ত্যাগ কালে কখন কখন রক্তস্রাব হইতে ও দেখা যায়। মূত্ররন্ধ্র ক্লেদ সঞ্চিত হইলে দুই ধারেও মূত্র ত্যাগ হইতে পারে। ইহাতে যে ক্লেদ নির্গত হয়, তাহা শুকাইলে হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়। এই পীড়া উপেক্ষিত হইলে পরিণামে আমবাত ও চক্ষুরোগ জন্মে।

জয়া। তবে জরায়ুতে পীড়া হইলে কেমন করিয়া তাহা জানা যাইতে পারে? এই রোগের লক্ষণাদির বিষয় বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। এই রোগে সর্ব্বদাই জ্বর বিদ্যমান থাকে। যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহা কখনও সুন্দররূপে পরিপাক হয় না মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়। পৃষ্ঠ বংশের নিম্নস্থ সন্ধিস্থানে এবং নিম্নোদরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটে সাতিশয় গরম এবং ভার ভার বলিয়া বোধ হয়। বারম্বার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এবং যোনিদ্বার হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। প্রথমে কিছুদিন উদরের পীড়া অর্থাৎ অত্যন্ত মলভেদ হইয়া পরিশেষে কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মলত্যাগ করিবার সময় গুহ্যদ্বারে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে; এমন কি, অর্শরোগের ন্যায় সেই সময় গুদাংশ বাহির হইয়াও পড়িতে পারে। কিন্তু পীড়ার প্রথমাবস্থায় কখনও এরূপ হইতে দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন শরীরের দুর্ব্বলতা, বমি এবং মস্তকের বেদনা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।

জয়া। আচ্ছা, অন্য কোন রোগে কি এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না?

বিজয়া। অন্য কোন পীড়ায় একযোগে সমস্তগুলি লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না। তবে সূতিকা রোগের সহিত এই পীড়ায় অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রসবের পর যে কোন পীড়া হয়, তাহাকেই সূতিকা রোগ কহে। তাহাতেও জরায়ুর বিকার হয়, এই পীড়ায়ও তাহাই হইয়া থাকে। নিদান, লক্ষণ সকলই একরূপ বলিয়া চিকিৎসাতেও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রসবের পর ভিন্ন অন্য সময়েও অন্য কারণে এই পীড়া হইতে পারে, কেবল ইহাই একমাত্র প্রভেদ।

জয়া। কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে এই পীড়ার উপশম হয়? এক্ষণে তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। জরায়ুরোগে মল সঞ্চিত থাকিলে হরীতকীচূর্ণ, এরণ্ড তৈল প্রভৃতি স্নিগ্ধ বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ করিবে। ইহাতে গরম জলের পিচকারী দিয়া জরায়ু পরিষ্কার করা নিতান্ত প্রয়োজন। ঈষদুষ্ণ মসিনার তৈল দ্বারা পিচকারী দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে পারে। এই পীড়ায় কোন পাত্রে উষ্ণজল পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে কটিপর্য্যন্ত ডুবাইয়া কিছুকাল বসিয়া থাকিলে অনেক আরাম বোধ হয়। প্রত্যহ এইরূপ বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ মসিনা ভাজা ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া অগ্নি সন্তাপে গরম করিয়া লইবে। পরে তলপেটে কোন বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ গরম মসিনার প্রলেপ কিছু পুরু করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিশেষে আর এক খণ্ড বস্ত্রদ্বারা তলপেটে বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ দিনের মধ্যে দুইবার করিয়া পুটলেপ প্রদান করিলে পীড়ার অনেক উপশম হইয়া থাকে। যদি প্রত্যহ দুইবেলা নারিকেল তৈলের সহিত দুইরতি করিয়া রসসিন্দূর সেবন করা যায়, তাহা হইলে সহজেই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু আহার বিহার সম্বন্ধে বিশেষ রূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

জয়া। এই পীড়ায় কিপ্রকার আহার বিহার একান্ত হিতকর?

বিজয়া। তীক্ষ্ণ অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য, সকলপ্রকার উগ্রবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। যাহাতে অধিক মল সঞ্চয় হয়, এমন কোন বস্তু আহার করা উচিত নহে। বেগুণ, অলাবু প্রভৃতি তরকারী এবং দুগ্ধ দ্বারা পীড়ার উপশম হইতে দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুই আহার করা যাইতে পারে। এই পীড়ায় পতি-সহবাস একবারে নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলেও পীড়ার লাঘব হয় না। পীড়া দীর্ঘকালের হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। অনন্তমূল, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, শতমূলী, বেড়েলা, শুল্‌ফা, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, সচিক্ষার, সোহাগা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। এবং ।০ চারি আনা মাত্রায় সুরামণ্ডের সহিত (অভাবে আধুনিক বিলাতি মদ্যের সহিত) প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র উপকার হয়। প্রমদানন্দ রস জরায়ুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ত্রিফলার জলের সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিলে দীর্ঘকালোত্থিত পীড়ার উপশম হইয়া অচিরে রূপলাবণ্য সম্পন্ন হয়। লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক এবং শিলাজতু সমভাগে চিতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ এক একটী বটী করিতে হয়।

ক্রমশঃ—

জলপাইগুড়ী, দীনাবাজার } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এ প্রবন্ধের উপযোগিতা বার বার আর কি বলিব?

চি, স, সম্পাদক।

রিউম্যাটিজ্‌ম্।

(এলোপ্যাথিমতে)

রিউম্যাটিজ্‌ম্‌কে সচরাচর বাত বলে। রিউম্যাটিজ্‌ম্ দুইপ্রকারের হইয়া থাকে। তরুণ এবং পুরাতন। রিউম্যাটিজ্‌ম্ সচরাচর তরুণ রোগ হইতেই হইয়া থাকে। তরুণ রোগ ক্রমে পুরাতন আকার ধারণ করে। কিন্তু কখন কখন পুরাতন রিউম্যাটিজ্‌ম্ আপনা হইতেই হইয়া থাকে।

শরীরের নানাস্থানে যথা হস্ত পদ প্রভৃতিতে যে সকল গাঁইট বা গ্রন্থি আছে, ঐ সকল গ্রন্থির প্রদাহকেই রিউম্যাটিজ্‌ম্ বলা যায়। এই রোগ গ্রন্থি সকলে প্রদাহের প্রায় সমুদায় লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে, উত্তপ্ত হয় এবং তাহাতে বেদনা হয়। যে সকল সূত্রময় পদার্থ দ্বারা শরীরের গাঁইট সকল জোড়া থাকে, এই রোগে ঐ সূত্রময় পদার্থ গুলি আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদিগের প্রদাহ হইয়া থাকে। গাঁইট ব্যতীত সচরাচর অন্য যে কোন স্থানে সূত্রময় পদার্থ আছে, রিউম্যাটিজ্‌ম্ রোগে কখন কখন তাহাদিগেরও প্রদাহ হইয়া থাকে। যথা, আমাদিগের হৃদয় যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে যে সূত্রময় আবরণ আছে, বাত রোগে কখন কখন ঐ আবরণ আক্রান্ত হইয়া হৃদয়ের পীড়া উৎপন্ন হয়। ঐ আবরণের নাম পেরিকার্ডিয়ম্ বা হৃদাবরণ এবং তাহার প্রদাহকে পেরিকার্ডাইটিস্ বলা যায়। বাত বা রিউম্যাটিজ্‌ম্ হইলে সচরাচরের পেরিকার্ডাইটিস্ হইয়া থাকে, বাতের বেদনার একটা ধরণ এই যে, উহা এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থিতে চলিয়া বেড়ায়। অর্থাৎ বেদনা ও প্রদাহ এক গ্রন্থি ছাড়িয়া আর

এক গ্রন্থি ধরে। কখনও কেবল একটী মাত্র গ্রন্থি আক্রান্ত হয়, কখনও দুই বা ততোধিক গ্রন্থি কখনও বা প্রায় সমুদায় গ্রন্থিতে প্রদাহ জন্মায়। সচরাচর হাত ও পায়ের গাঁইটেই বাত ধরিয়া থাকে। কনুই, স্কন্ধ, সন্ধি, কব্জা, হাঁটু এবং অঙ্গুলি সকলের গ্রন্থিতে বাত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থি প্রদাহের আর একটা বিশেষ এই যে, উহাতে প্রদাহের সমুদয় লক্ষণ হয় অর্থাৎ সাধারণ প্রদাহের ন্যায় গাঁইট সকল পাকিয়া উঠে না অর্থাৎ পূঁজের সঞ্চার হয় না। উত্তপ্ত, লাল ও বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে।

কখন কখন রিউম্যাটিজ্‌মে চোয়ালের গ্রন্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং রোগী হাঁ করিতে কষ্ট বোধ করে। কিন্তু রিউম্যাটিজ্‌মের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক উপসর্গ হৃদয়ের পীড়া অর্থাৎ পেরিকার্ডাইটিস (হৃদাবরণ প্রদাহ) অথবা মাইওকার্ডাইটিস্ বা হৃদয়ের পেশীর প্রদাহ।

তরুণ রিউম্যাটিজ্‌ম্ একরূপ রক্তের পীড়া। অর্থাৎ রক্ত দূষিত হইয়াই এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

তরুণ বাত প্রদাহ ঘটিত পীড়া। সুতরাং এই পীড়া হইলে ইহার সহিত প্রদাহ ঘটিত জ্বর দেখা দিয়া থাকে। এই জ্বরে নাড়ী মোটা, দ্রুত এবং লম্ফনশীল হয় অর্থাৎ যেন নাড়ী লাফাইতে থাকে। শিরঃপীড়া ও গাত্রদাহ হয় এবং সময় সময় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। এই ঘর্ম্ম জিহ্বায় দিলে উহার স্বাদ অম্ল বলিয়া বোধ হয়। জ্বরের সহিত ঘর্ম্ম হওয়া বাতজ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। জিহ্বা সাদা এবং ময়লা হয়। এই জ্বরে অত্যন্ত উত্তাপবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইহাতে প্রলাপ উপস্থিত হয় না। এও একটা এই জ্বরের বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু যখন হৃদয় আক্রান্ত হয়, তখন প্রলাপ উপস্থিত হইতে পারে।

এই এক ঘটনা ব্যতীত, হৃদয়ের পীড়া ব্যতীত বাতজ্বরে প্রলাপ হইতে দেখা যায় না। এই জ্বরে রোগীর বুদ্ধি বরাবর স্থির থাকে। অচেতনাবস্থা, উদরাময় বমন বা বমনোদ্বেগ প্রভৃতি উপস্থিত হয় না। টাইফয়েড জ্বরে বা গুরুতর আকারের স্বল্পবিরাম জ্বরে যেমন দাঁতের কনে কনে ময়লা পড়ে এ জ্বরে সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

রোগীর গাঁইট সকল অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয়; এবং ঐ সকল গ্রন্থি স্পর্শ করিলে বা চাপ দিলে রোগী যাতনা বোধ করে। রোগী সহজে হাত

পা নাড়িতে পারে না। যেহেতু অঙ্গ সঞ্চালন করিতে যাইলেই গ্রন্থি সকল বেদনা বোধ হয়, এজন্য রোগী নিশ্চেষ্ট ভাবে স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

আগষ্ট ১২৯২। } ডাক্তার শ্রীপুলিসচন্দ্র সান্যাল এম্, ডি।

চিকিৎসিত রোগী।

হোমিওপ্যাথিক মতে।

(৩)। হিন্দু স্ত্রীলোক, বয়স ১২ বৎসর। ২ মাস প্রসূতা; প্রসবের পর বাতরোগ, এখন তাহা বিদ্যমান; ২ দিবস অবধি জ্বর।

১১।১২।৮৫ সাল।—অদ্য বেলা ৯টার সময় জ্বর আইসে; শরীরে ও নিম্নশাখাঙ্গে কামড়ানি; হস্ত ও চরণ হইতে কম্পের উদ্ভূতি; তাপকালীন অল্প অল্প বিবমিষা। নক্স ভমিকা (২০০) প্রয়োগে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম। রাত্রিতে জ্বরত্যাগ।

১২।১২।৮৫।—অদ্য আবার প্রাতে ৯টায় জ্বর আইসে। নক্স (২০০) দেওয়ায় কোন উপশম পাওয়া গেল না। সন্ধ্যায় এই সকল লক্ষণ ঃ—

চর্ম্ম, উষ্ণ ও শুষ্ক; সমস্ত শরীরের চুল্‌কান; পর্য্যায়ক্রমে কম্প ও উষ্ণতা বোধ; উদরে মধ্যে মধ্যে শূলবেদনার উদ্রেক; উদর চাপিলে বেদনার কখন বৃদ্ধি কখন বা উপশম; রোগী কখন কখন উপুড় হইয়া শুইতেছেন; উদরের সমস্ত দক্ষিণ পার্শ্বে এত বেদনা যে স্পর্শ সহ্য হয় না; যকৃৎ কিঞ্চিৎ পরিমানে বিবৃদ্ধ, স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; সর্ব্বদা শুষ্ক, কষ্টকর ও খক্‌খকানি কাসি; প্রস্রাবনিঃসরণে জ্বালা বোধ; মল, অল্প-পরিমিত, কঠিন ও ডেলা ডেলা; শরীরে অত্যন্ত রক্তাল্পতা; শারীরিক উত্তাপ ১০১০।

কেলিকার্ব্ব, (৩০) ৩ঘণ্টা অন্তর।

১৩।১২।৮৫, প্রাতে ৭টা। রাত্রি ১টায় উত্তাপ ৯৮।৪০। বেদনার মধ্যে

মধ্যে আতিশয্য হেতু সমস্তরাত্রি নিদ্রা হয় নাই; খক্‌খকানি কাসি পূর্ব্বের ন্যায় কষ্টদায়ক নহে; দাস্ত হয় নাই; চাপ দিলে উদরে পূর্ব্বের ন্যায় বেদনা বোধ হয় না; মুখের ভাবে স্পষ্টই বোধ হয়, যে নিদ্রা না হওয়ায়, এখনও পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ। প্রাতে ৭টায় তাপ ৯৯-১০। বেলা ১১ টায় কেলিকার্ব্ব (২০০) এক মাত্রা।

অপরাহ্ন ৩টা।—তাপ ৯৯০; নাড়ীতে জ্বরবেগ বোধ হয় না; রোগিনী প্রফুল্লচিত্তা; উদরে অল্প বেদনা; পাকস্থলীর উপরে মাত্র যকৃতের বৃদ্ধি, ও তথায়ই কেবল বেদনা অনুভূত হয়। একবার দাস্ত, মল-পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমিত ও নরম।

১৪।১২।৮৫।—রাত্রিতে সুনিদ্রা; জ্বর নাই; উদরে কিছু মাত্র বেদনা অনুভূত হয় না। কেলিকার্ব্ব, (২০০) এক মাত্র।

চারি দিবস পরে তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় কঠিন মল আরম্ভ হইবামাত্রে আর এক মাত্রা (২০) ক্রম দেওয়া হইল। ইহার পর আর বেদনার উপদ্রব হয় নাই। (গ্রন্থকার)

(৪)। পীড়িত শিশুর সেবায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ও ঠাণ্ডি লাগিয়া মাতার কম্প, তাপ, শিরঃপীড়া, তৃষ্ণা ও বিবমিষা। শিরঃপীড়াসহ শীত-বোধ; মস্তকের সম্মুখাংশে ও শঙ্খদ্বয়ে চাপ ও সূচীবেধ বোধ, চক্ষু পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি; প্রায় দেখিতে না পাওয়া, চক্ষু বুজিয়া থাকিতে হয়; শিরোঘূর্ণন; বিবমিষা; অক্ষিপুটের, বামগণ্ডের ঊর্দ্ধৌষ্ঠের স্ফীতি এবং তৎসহ জ্বলন, তৃষ্ণা ও তাপবোধ।

কেলি কার্ব্ব, (২০০); দুই দিবসে আরোগ্য। (আং)

কলিকাতা। } ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র, এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু কলিকাতা সহরের মধ্যে হোমিওপ্যাথিতে খ্যাত-নামা ডাক্তার। সুতরাং তাঁহার লিখিত এরোগ বিবরণ পাঠ করিয়া হোমিও প্যাথি মতের চিকিৎসক-সম্প্রদায় যে প্রকৃতই সুখী হইতে পারিবেন, সেরূপ আশা করিতে পারি। চি, স, সম্পাদক।

ইহা কি মনোযোগের ত্রুটী, না বুঝিবার ভ্রম ?

মান্যবর শ্রীযুক্ত চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক।

মহাশয়! অনেক দিন হইতে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে নিয়মিত রূপে প্রবন্ধ লিখিবার বাসনা করিতেছি; যখন সম্মিলনীর কোন একটী প্রবন্ধ পাঠ করি, তখনই কোন কোন বিষয় লিখিবার বাসনা হয়, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। যাহা হউক, অদ্য নিম্নে একটী চিকিৎসিত-রোগীর বিবরণ লিখিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন। চিকিৎসকদিগের অমনোযোগে কিম্বা বুঝিবার ত্রুটীতে সময় সময় যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে; এমন কি, কত হতভাগ্য যে পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ আভাস আমার এই রোগীর বিবরণ পাঠে পাওয়া যাইবে। রোগীর প্রতি বিশেষরূপ মনোনিবেশ না করিলে চিকিৎসকের অন্তঃকরণে যে সময় সময় অযথাভীতি সঞ্চার হইতে পারে এবং অতি যৎসামান্য রোগও বৃহদাকারে চিকিৎসকের মন আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এইরূপ ভীরুতায় চিকিৎসকের রোগ নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মিয়া কত যে, মহদনিষ্ট সংসাধিত হইতে পারে ও হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কিম্বা আমার নিজের প্রতিপত্তি দেখাইবার জন্য যে আমি এই বিবরণ লিখিতেছি, পাঠক যেন তাহা মনে না করেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকায় এই রূপ ধরণের দুই দশটা প্রবন্ধ লিখিত হইলে শিক্ষিত বিশেষতঃ চিকিৎসক সম্প্রদায়দিগের জ্ঞানবৃদ্ধি ও ভ্রম সংশোধন হইতে পারে। চিকিৎসকগণ যাহাতে রোগীর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হন—তাঁহাদের অমনোযোগিতায় প্রকৃত রোগ নির্ব্বাচনে যাহাতে ভ্রম না জন্মে, মাত্র তাহা দর্শানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সংসারে কেহই অভ্রান্ত নহেন সত্য; কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি এইরূপ দুই দশটা ভ্রম আলোচনা করিয়া দর্শাইয়া দেওয়া যায়, তবে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই যে মহৎ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বার বার না ঠেকিলে কোন কার্য্যই শিক্ষা হয় না;

আবার ঐ ঠেকা-কার্য্যগুলি সংশোধন না করিয়া দিলে শিক্ষার চরমোৎকর্ষতা লাভ হয় না। যাহা হউক, আমার চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ এই:—

রোগীণী বিধবা, ৩০ বৎসর বয়স্কা, স্থূলাঙ্গী, কৃষ্ণবর্ণা, কফ প্রধান ধাতু (Phlegmatic temperament), নিয়ত কয়েক দিবস শৈত্যভোগ করায় সর্দ্দি লাগে। হাঁচি, নাসিকায় জলপড়া, মস্তকের সম্মুখ ভাগে অল্প বিস্তর বেদনা ও অত্যন্ত ভারবোধ, চক্ষু ঈষৎ লাল, উভয় নাসারন্ধ্রে নিয়ত সুড়-সুড়ি বোধ; এই সুড়সুড়ি এত অসহনীয় যে অঙ্গুলী দ্বারা সর্ব্বদা না রগড়াইলে তিষ্টিতে পারে না। ক্রমান্বয় চারি দিবস এই রূপ অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। ৫ম দিবস প্রাতঃকাল হইতে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া নিয়ত ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তস্রাব হইতে থাকে। নানাবিধ মুষ্টিযোগ ঔষধ ব্যবহারেও সমস্ত দিবসে যখন রক্তস্রাব বন্ধ হইল না, তখন রোগীণীর অভিভাবক ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিকাল বেলায় একজন কবিরাজ (ইনি প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন) ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ মহাশয় ইহা "রক্তপিত্ত" রোগ ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন, "এ রোগ বড় কঠিন, ইহার চিকিৎসায় মূল্যবান্ ঔষধের দরকার। সে সমস্ত ঔষধ এক্ষণ আমার নিকট প্রস্তুত নাই, টাকা দিলে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি; যাহা হউক, সম্প্রতি যে ঔষধ দিতেছি, তাহাতেই রক্তস্রাব রুদ্ধ হইবে, পরে ঐ সমস্ত ভাল ভাল ঔষধ সেবন করিলেই চলিবে।" এই বলিয়া কিছু ঔষধ দিয়া কবিরাজ মহাশয় বিদায় হইলেন। দুই দিবস ঐ ঔষধ ব্যবহার করা হইল। ৬ষ্ঠ দিবস শেষ রাত্রি রোগীণীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। ৭ম দিবস অতি প্রত্যুষে রোগীণীর অভিভাবক পুনরায় কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন। কবিরাজ মহাশয়, রোগীনীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন "যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছি, তাহাতে যখন বিন্দু-মাত্রও উপকার দর্শে নাই, তখন রোগটী যে কতদূর কঠিন, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি রক্তপিত্ত রোগে মূল্যবান্ ঔষধের দরকার। তখন তুমি সে কথা গ্রাহ্যই করিলে না। আমার নিকটেও ঔষধ প্রস্তুত নাই যে, এখনই দিব, সুতরাং আর এখন কি করিতে পারি। যাহা হউক, এখনও সময় আছে, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" এই বলিয়া আরও দুই রকম ঔষধ দিয়া কবিরাজ

মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন রোগীণীর অভিভাবক আমার জন্য আসিল। কয়েকটা রক্তরোধক ঔষধ ও একটা কাচের পিচকারী সঙ্গে নিয়া চলিলাম। আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীণী ডাইন পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছে, বিছানার প্রায় দুই হাত পরিমাণ স্থান রক্তে চাপ বাঁধিয়া (clot) গিয়াছে। রোগীণীর পরিধেয় বস্ত্রখানা যেন রক্ত দ্বারা রং করা হইয়াছে। রোগীণীর অভিভাবক বলিল "যে রক্ত দেখিতেছেন উহা কেবল গত রাত্রি ও অদ্যকার এই বেলা টুকের মধ্যে পড়িয়াছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কয়দিনও প্রায় ঐ পরিমাণই পড়িয়াছে।" সমস্ত শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। নাড়ী সবিরাম, (Intermittent) অতি সূক্ষ্ম প্রায় অনুভবই হয় না। রোগীণী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কথা বলিবার শক্তি একেবারেই নাই কেবল ইঙ্গিত ইসারায় আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে রোগীণী হস্ত দ্বারা দেখাইল, যেন ভ্রূর উপর সুড় সুড় করিয়া রক্ত নাকের ভিতর আইসে। আমার প্রথমে অস্থানিক ঋতু (Vicarious Menstruation) বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু রোগীণীর ইতিহাস শুনিয়া অবিলম্বেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ফিটকিরির জলে ১০।১২টা পিচকারী করিলাম, তাহাতে নাকের ভিতর টা বেশ পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু রক্তস্রাব বন্ধ হইল না। তখন নিরূপায় ও অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার দৃষ্টি কিন্তু নাকের ভিতর রহিয়াছে। প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে হঠাৎ দেখি কি উভয় নাসিকা বিভাজক উপাস্থির (Septum) নিম্নভাগের একটী স্থান হইতে ছিড়িক ছিড়িক করিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে। যে স্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে, ঐ স্থানটা অনায়াসেই দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। তখন আমি এতদূর আনন্দিত হইলাম, যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। বাস্তবিক আমার তখনকার সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কথা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। যাহা হউক; টিংচার ষ্টিলে (Tincture Ferry Muriatis) একটু তুলা ভিজাইয়া ঐ স্থানে অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট রাখিয়া আস্তে আস্তে অঙ্গুলী উঠাইয়া আনিলাম। যখন দেখা গেল, আর রক্ত নির্গত হইতেছে না, তখন পার্শ্ববর্ত্তী ৮।১০ জন লোককে বলিলাম, তোমারা দেখিতে পার এখন আর রক্ত

পড়িতেছে না—বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলে দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। এত শীঘ্র ও সহজেই যে রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা সহসা তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল না। পরে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেও যখন রক্ত পড়িতেছে না দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। আমি রোগীণীর অবস্থান ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ১০ ফোঁটা মাত্রা টিংচার ষ্টিল দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিয়া বিদায় হইলাম। পর দিন সংবাদ পাইলাম, রোগীণী বেশ ভাল আছে, রক্ত আর পড়ে নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সবলও হইয়াছে, কথাবার্ত্তাও কহিতে পারে। ঐ ঔষধই চলিতে থাকিল। এক সপ্তাহ পরে জানিতে পারিলাম, রোগীণীর অবস্থা অনেক ভাল। ইহার পরের এক সপ্তাহ চায়না ১+ ক্রম (China 1+) এক ফোঁটা মাত্রায় দিনে দুইবার সেবন করিতে দিয়া ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রায় একমাস পর অন্য একটী রোগী দেখিতে ঐ রাস্তায় যাইবার সময় দেখিলাম, রোগীণীর তাহার গৃহ কার্য্য করিতেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। রোগীণীর মুখে শুনিলাম, টিংচার ষ্টিলের সেই পটীটা কয়েকদিন পর আপনা হইতেই পড়িয়া গিয়াছিল।

পাঠক মহাশয়, বুঝিতে পারিলেন কি, ঘটনাটী কতদূর বিস্ময়জনক! কোথায় রক্তপিত্ত, আর কোথায় নাকের ভিতরের একটী ক্ষুদ্র ধমনী (Artery) ছিন্ন হওয়া। আমার বোধ হয়, নাকের ভিতর সুড়সুড়ি থাকার দরুণ রোগীণী যে নিয়ত আঙ্গুল দিয়া রগড়াইত, তাহাতেই হঠাৎ একটী ক্ষুদ্র আর্টারী ছিন্ন হইয়া এই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং উহাকেই কবিরাজ মহাশয় "রক্তপিত্ত" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, কবিরাজ মহাশয়ের ইহা কি মনোযোগের ত্রুটী, না বুঝিবার ভ্রম?

চাপুরিয়া,
ময়মনসিংহ—মুক্তাগাছা
১৫ই ভাদ্র, ১২৯৯ লাল।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য,
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

লেখক মহাশয়ের অবস্থিতি নিতান্ত পাড়াগ্রামে হইলেও তাঁহার লেখার হাতটা কিন্তু সহরে অপেক্ষা বড় কম নহে। বস্তুতই তাঁহার লিখিবার শক্তির

পরিচয়ে আমরা সুখী হইলাম। আর তিনি যে সত্যের অপলাপ না করিয়া এ ঘটনাটী লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের বিশ্বাস জন্মিল। তবে কথা এই যে, তিনি কিন্তু এখনও বালক; যদি তাহাই না হইবেন, তবে যে ভ্রমপ্রমাদ হইতে কোনশ্রেণীর কোন চিকিৎসকেরই অব্যাহতি নাই, সেই ক্ষেত্রে একজন সামান্য হাতুড়ে কবিরাজের ভ্রম দেখিয়া এত বাড়াবাড়ি করিবেন কেন?

চি, স, সম্পাদক।

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১। অনিদ্রাদূরীকরণের ঔষধি।

(ক) শতমূলী,—
বেড়ালা।
তেলাকুচার শিকড়।
কৃষ্ণতিল বাটা।
রক্তচন্দন।
চাটীমকলা ১টা।

এই সকল আন্দাজ মত একত্রিত করিয়া প্রাতে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রলেপের মত ১। ১৷৷০ এক কিম্বা দেড়ঘণ্টা রাখিলে অনিদ্রা দূর হইবেক।

(খ) শতমূলীর রস।
তেলাকুচার শিকড়ের রস।
উত্তম চামোল তৈল।

এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া শিশিতে পুরিবে ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বৈকালে মস্তকে ও কপালে মালিস করিবে। এইরূপও কিছুদিন করিলে অনিদ্রা নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেক।

(গ) কাকমাছি গাছের শিকড় মস্তকে বান্ধিলে নিদ্রা হয়।

"মূলন্তু কাকমাচ্যা বদ্ধং সূত্রেণ মস্তকে নিয়তং।
বিদধাতি নষ্টনিদ্রে নিদ্রালাশ্বেব সিদ্ধমিদং॥"

মধুমতী।

কাকমাছি গাছকে চলিত ভাষায় গুড়কামাই গাছ কহে। ইহা দেখিতে ঠিক লঙ্কাগাছের ন্যায়, ঐরূপ ফুলও হয়, তবে প্রভেদ এই যে, ইহার থলো থলো কৃষ্ণবর্ণ গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল হয়। পল্লীগ্রামে পুষ্করীর ধারে যথেষ্ট জন্মিতে দেখা যায়। ইহার এমনি অসাধারণ গুণ যে, কিয়দংশ শিকড় সূত্রে বান্ধিয়া কিয়ৎকাল মস্তকে বন্ধন করিয়া রাখিলে আশু নিদ্রাকর্ষণ হয়। সায়ংকালেই মস্তকে ধারণ করিবার উপযুক্ত সময়। শিকড় প্রতিদিন পরিবর্ত্তন করা উচিত। ইহার আশ্চর্য্য গুণ আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

(১২) পিপাসা নিবারণোপায়।

কল্মীশাকের গাঁইট ২১টী একুশটী ২৷৷০ আড়াইটী গোলমরিচ দিয়া বাঁটিয়া খাইলে ভয়ানক জ্বরকালীন বা অন্য পিপাসার আশু উপশম হয়।

(১৩) বমি ও হিক্কা নিবারণৌষধি।

অশথ বৃক্ষের শুষ্কছাল অগ্নিতে পোড়াইয়া জলে ফেলিবে, পরে সেই জল পান করিলে প্রবল বমি ও হিক্কা নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। ইহাতে পিপাসাও বন্ধ হয়।

(১৪) বিস্ফোটকের ঔষধ।

বিস্ফোটক উঠিবার প্রথমাবস্থায় গোলমরিচ শিজপাতার রসে বাটিয়া স্ফোটকের মুখে দিলে উহা উঠিতে পারে না। যদি উঠে, তবে ছাগী ঘৃত, অভাবে গব্যঘৃত দিবসে ৩।৪ বার দিবেক, তাহাতে না সারিলে শিমুলের কাঁটা নির্জ্জল দধির সহিত ঘর্ষণ করিয়া দিলে বিস্ফোটক ভাল হয়

(১৫) প্রদরের পাঁচন। (বাধকপীড়ার ঔষধি)।

ওলট কম্বলের সরু শিকড় ... ৩২ রতি।
উহার ছাল ... ... ১ তোলা।

বেড়েলার ছাল	...	...	১ তোলা।
রক্তকুম্বনের মূল	...	...	৩২ রতি।
এরণ্ড মূল	...	...	৩২ রতি।

এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া একসের জলে সিদ্ধ করিবে ও অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া একছটাক পরিমাণে ঋতুকালীন তিন দিবস দুইবার ও ঋতুর পর দুই দিবস প্রাতে কেবল একবার সেব্য।

(১৬) অজীর্ণ রোগের ঔষধি।

অত্যন্ত অজীর্ণ হইলে পলাশ বৃক্ষের শিকড়ের ছাল আন্দাজ মত জলে সিদ্ধ করিয়া সপ্তাহ পান করিলে অজীর্ণ ভাল হয়।

(১৭) পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট পাঁচন।

বিল্বছাল	।০
চিরতা	।০
মুতা	৶০
ক্ষেতপাপড়া	।০
পল্‌তা	।০
গুলঞ্চ	।০
নিমছাল	৶০
নাটার ডগা	৶০
ধনে	৶০

২ তোলা পাকার্থ জল ৷৷৵ দেড় পুয়া শেষ ৵১০ দেড় ছটাক।

প্রক্ষেপ মধু ৵১০ পিপুল চূর্ণ ৵০

এইরূপ নিয়মে পূর্ব্বোক্ত পাঁচন কিছুদিন সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

(১৮) ফুলা ও বেদনা।

মনসার ক্ষার, অর্কক্ষীর, দন্তীর শিকড়, চিতার শিকড়, গুড়, ভেলা,

হিরাকশ, এই সকল সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফুলা ও বেদনা আশু নিবারণ হয়। ইহা মনুষ্য ও জন্তু উভয়কেই ব্যবহার করা যায়। ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা। } শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর লিখিত মুষ্টিযোগ ঔষধ গুলি খুব ভাল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি যে, সাধারণে এ সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে ফলাফল লিখিয়া পাঠাইবেন। চি, স, সম্পাদক।

প্রত্যক্ষফলপ্রদ—মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

(বিশ্বস্তবন্ধুলোকের নিকট জ্ঞাত)

১। শ্বাস কাস অর্থাৎ হাঁপানি——এই প্রাণান্তকারী রোগের সুদারুণ যন্ত্রণার বিষয় উল্লেখ করিয়া গতবারে আমরা ইহার আশু প্রতীকারক একটী মুষ্টিযোগ ঔষধের বিষয় উল্লেখ করি। আহ্লাদের বিষয় এই যে, আমাদের একজন অতি বিশ্বস্ত সম্ভ্রান্ত মাননীয় বন্ধু হাঁপানি রোগের আশু শান্তিকারক একটী মুষ্টিযোগের বিষয় আমাদিগকে বলিয়াছেন, যথা——হরীতকী (আঠী বাদে) ও তেজপাতা উভয়ে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তুল্যাংশে লইয়া কলিকায় সাজিয়া হাঁপের সময় তাহাতে অগ্নি দিয়া তামাকের ন্যায় টানিতে হইবে। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, অল্পদিনের হাঁপ হইলে এই ঔষধেই আরাম হইবেন, কিন্তু বহুকালের হইলে নির্দ্দোষ আরাম না হউক, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই যন্ত্রণার শান্তি হইবে। আমরা আশা করি ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে হাঁপানি রোগীর অভাব নাই, সুতরাং যে কোন রোগী এই সহজ লভ্য ঔষধটী ব্যবহার করিয়া অথবা কোন চিকিৎসক কোনও হাঁপানী রোগীকে এই ঔষধটী ব্যবহার করাইয়া আমাদিগকে ফলাফল লিখিলে আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইব।

২। বাঘি বসাইবার, পাকাইবার এবং বেদনা ও যন্ত্রণাদি কমাইবার অব্যর্থ মহৌষধ——এই ঔষধটীও আমরা অপর একজন বন্ধুর নিকট অবগত

হইয়ছি। ঔষধটী এই—ঘৃতকুমারীর শাঁস বাহির করিয়া ঐ শাঁশ বাযির উপর দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবেক। দুই ঘণ্টান্তর তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপর নূতন শাঁস দিয়া বাঁধিতে হইবে, এইরূপ ৫।৭ বার বাঁধিলে এক দিনেই উপশম জানিতে পারিবে। অমরা আশা করি যে, এই ঔষধটীও ব্যবহার করিয়া ইহার ফলাফল জ্ঞাত করাইতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

চি, স, সম্পাদক।

পদ্যপাঁচন।

১১। দাস্কাদিপাঁচন।

নিলঝিণ্টি, দেবদারু, শুঁট, শ্যামলতা,
ইন্দ্রযব, শটি, গজপিপুল, চিরতা;
মঞ্জিষ্ঠা, বালা ডুমুর, ধনের চাউল,
আক নিদি, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁট, বেণামূল;
গুলঞ্চ, সরলকাষ্ঠ, কুশ, কুশমূল,
কটকী, সজিনা ছাল ও অনন্তমূল;
ক্ষেৎপাঁপড়া, হাড়জোরা, বালা, কণ্টিকারী,
মুথা সহ সমভাগে যে ক্বাথ করি।
সকল উৎকট জ্বর ইহাতে নাশিবে।
কান্তির কমনীয়তা অবশ্য বাড়িবে॥

১২। উশীরাদি-পাঁচন।

বালা, শুঁট, লোধ, বেলশুঁট, ধাইফুল,
মুথা, বরাক্রান্তা, ধনে ও বেণার মূল;
একত্র করিয়া ক্বাথ করিবে তইয়ার,
ইহাতে নাশিবে জ্বর, রক্ত অতিসার।

১৩। পর্পটাদিপাঁচন।

ক্ষেৎপাঁপড়া, শুঁট, বালা ও রক্তচন্দন,
একাথে পিত্তের জ্বর হয় নিবারণ। ক্রমশঃ—

পুঠিয়া রাজসাহী। } শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

৮ম বৎসর। মাঘ, ফাল্গুন, ও চৈত্র। ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্রিকা।

—oo—

৮ম খণ্ড,

(টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী

অনুবাদক এবং প্রকাশক

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৭৫নং কটন ষ্ট্রীট্ বড়বাজার "নারায়ণ" যন্ত্রে

শ্রীরামনারায়ণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা। এই তিন সংখ্যার
নগদ মূল্য ১৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে (প্রাণই আগে চাই)	...	...	২৯৫
বদ্দিমতে কি জোলাপের ওষুধ আছে ?	...	...	২৯৮
হিক্কারোগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিঔষধের সহিত দেশীয় শুঁঠিপিপুলের তুলনা	...	...	৩০২
দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে (স্নানবিধি)	...	...	৩০৮
আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরীক্ষা	...	...	৩১০
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশচিকিৎসা	...	...	৩১১
বুঝিবার ভুল	...	...	৩১৫
মূলে ভুল কি প্রকারে বলি ?	...	...	৩১৯
ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে	...	...	৩২৪
অবলাবান্ধব	...	...	৩২৬
তোকমারী	...	...	৩৩৩
চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ (এলোপ্যাথি)	...	...	৩৩৭
গৃহ চিকিৎসা	...	...	৩৪০
ক্যাটালেপ্‌সি (ভাবলাগা)	...	...	৩৪৩
বৈদ্যক ঔষধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা	...	...	৩৫৩
চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ (হোমিওপ্যাথি)	...	...	৩৫৫
প্রতিবাদ	...	...	৩৫৭
নূতন ঔষধ (এলোপ্যাথি)	...	...	৩৫৯
ধাতুব্যাখ্যা	...	...	৩৬২
মৃতবৎশিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জীবন রক্ষার উপায়		...	৩৬৪
প্রসবান্তে শোণিতস্রাবের কারণ ও চিকিৎসা	...	...	৩৬৭
হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধের গুণ	...	...	৩৬৮
ঐ দন্তশূল	...	...	৩৭০
চিকিৎসা-ব্যবসায়	...	...	৩৭৩
তৈলপাক ও প্রয়োগপ্রণালী	...	...	৩৮২
দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা (কবিরাজী)	...	...	৩৮৪
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ (সম্পাদকীয়)	...	...	৩৮৬
প্রত্যক্ষফল মুষ্টিযোগ	...	...	৩৮৭
পদ্যপাঁচন	...	...	৩৯০

দেশীয়-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাণই আগে চাই।

কেন যে সর্ব্বাগ্রে প্রাণেরই প্রয়োজন, শরীরকে উপেক্ষা করিয়া এ জগতে যে অগ্রে কিছুই কর্ত্তব্য নাই, সে কথা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপেই বলিয়াছি। বিধিমতেই বুঝাইয়াছি যে, যাঁহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি যেন সেই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার প্রথমতঃ নিজের জীবনটার সম্বন্ধেই করেন। নিজে বলিয়াছি, আবার চরকাদি গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি। তথাপি প্রাণজিনিষটা প্রকৃতপক্ষে এতই প্রয়োজনীয়, এই প্রাণের সম্বন্ধে জানিবার, শুনিবার, বলিবার, বুঝাইবার ও লিখিবার এত অসংখ্য কথা আছে যে, বুঝিবা আজীবন বসিয়া বলিলেও সর্ব্বাগ্রে প্রাণরক্ষার উপকারিতা ও উপযোগিতার বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

মখমল-বিনির্ম্মিত মণি-মুক্তাখচিত সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়া মহারাজাধিরাজ পৃথিবীপতিরও প্রাণের প্রয়োজন যে পরিমাণে, পক্ষান্তরে পর্ণকুটীরনিবাসী দীনহীনজনেরও প্রাণানুপালনসম্বন্ধে প্রয়োজন ঠিক্ সেইরূপ। দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই পক্ষে প্রাণরক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা শরীর সম্যক্ সুস্থ না থাকিলে এ জগতে যে সমস্তই বিড়ম্বনাময়, সবই বৃথা। অধিক কি, শরীর সুস্থ না থাকিলে বিলাসীর বিলাসবাসনা, ধনাভিলাষীর ধনোপার্জ্জনের ইচ্ছা ও ধর্ম্মপিপাসুর ধর্ম্মালোচন প্রভৃতি কিছুই সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং যাহার অভাবে এ জগতে কাহার কোনরূপ বাসনাই পূর্ণ হইতে পারে না; যাহার কিঞ্চিৎ অশান্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবই ভয়ানক অশান্তি বোধ করে; যাহার লয়ে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়, এহেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের সম্বন্ধে আর অধিক কি জানাইব?

এই যে পূর্ব্বকালীয় মুনি ঋষিগণ জীবগণের মঙ্গলের জন্য এত কঠোর ভাবে অবস্থিতি করিয়া বেদবেদান্ত শাস্ত্রাদির সৃষ্টি করিয়াগিয়াছেন;—এই যে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ সাত সমুদ্র তের নদী পারস্থ এই সুদূরস্থিত

ভারতে আসিয়া এত হুলস্থূল বাধাইয়াছেন,—এই যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু অহোরহ লোড়াদৌড়ি করিতেছে;—এ সকলের মূল লক্ষ্য কি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কি জানা যায়? বলা অনাবশ্যক যে, প্রাণের জন্যই এত গণ্ডগোল, প্রাণের শান্তির জন্যই এত হুলস্থূল ব্যাপার। প্রাণের জন্যই পৃথিবী, প্রাণের জন্যই বেদবেদান্তাদি, প্রাণের জন্যই শিল্প-সাহিত্য, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তেরই সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং যেদিকে যাইবে, এ পৃথিবীর যে কোনও বিষয় লইয়া ভাবিবে, ভাবিলেই দেখিবে, মূল উদ্দেশ্য-হয় ত প্রাণরক্ষা, নয় ত প্রাণেরই তুষ্টিসাধন জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রাণ জিনিষটা কি, অর্থাৎ মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি কি কি উপাদানে প্রাণ গঠিত হইয়াছে এবং প্রাণ রাখিতে হইলেই বা সেই প্রাণের আধার রূপরসাদি কোন্ কোন্ পদার্থের প্রয়োজন, এই সকল কথা লইয়াই জগতের যাহা কিছু কথাবার্ত্তা। ইহাই বিজ্ঞান, ইহাই আত্মজ্ঞান, ইহাই জগৎজ্ঞান, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই অর্থ, ইহাই কাম, আর ইহাই মোক্ষ বা মুক্তি। সুতরাং এই প্রাণের বিষয় সম্যক্ জানিতে পারিলেই জগতের সকল বিষয় জানা যায়, প্রাণকে ঠিক্ রাখিতে পারিলেই জগৎকে ঠিক্ রাখা যায় এবং প্রাণকে ঠিক্ বুঝিতে পারিলেই জগৎকেও ঠিক্ বুঝিতে পারা যায়। অধিক কি, প্রাণ জ্ঞানের নামই আত্মজ্ঞান, আর আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর ঈশ্বরজ্ঞান বা চরমমুক্তি।

গভীর দুঃখ ও দারুণ কলঙ্কের বিষয় এই যে, এ হেন অমূল্য ও অতুলনীয় প্রাণধনকে নিজেদের বুদ্ধিদোষে ভারতবাসীগণ অনেকদিন হইতেই তুচ্ছ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর এই প্রাণের প্রতি এত অনাদরজন্যই আজ্ ভারতবাসী, বিদেশীয়গণের নিকট এত অধিক হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। হওয়ারই কথা বটে, কেননা আমরা যে এখন প্রকৃতই প্রাণহীন অবস্থায় জড়বৎ পড়িয়া আছি, যাহা প্রকৃত প্রাণশব্দে বাচ্য, তাহা আমাদের মধ্য হইতে অনেকদিন পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে, দেহে প্রাণ আর নাই, তবে ধড়টী মাত্র জড়বৎ পড়িয়া আছে!

কিন্তু কেন এমন হইল? এই সুবিশাল ও সুপ্রাচীন এবং জ্ঞানের আকরভূমি ভারত বর্ষের কোটী কোটী ব্যক্তি এমন প্রাণহীন অবস্থায় পরিণত হইল কেন? বলা বাহুল্য যে, একমাত্র অজ্ঞানতাই ভারতবাসীকে

প্রাণহীন, ধনহীন, রত্নহীন, বলহীন প্রভৃতি সমস্ত শক্তি হইতেই হীনাবস্থায় পরিণত করিয়াছে। নচেৎ যে জ্ঞানের মূল লইয়া ভারতবাসীর প্রাণধনাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই মূল জ্ঞান ধরিয়া চলিলে আজ্ কি ভারতবাসী প্রাণহীন হইতে পারিত? কখনই নহে।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চক্ষুদিয়া শতধারে জল আইসে যে, প্রাণরক্ষার মূল বাঁধুনী-সম্বন্ধে এ পতিত জাতির যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই দেখিবে, প্রাণের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব কোথাও নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্র বল, আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই বল, প্রাণ প্রাণ করিয়া চীৎকার করিতে কেহই ত্রুটী করেন নাই। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন:—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্নিঘ্নতা কিন্ন হতং রক্ষতা কিন্ন রক্ষিতম্?"

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের পক্ষে প্রাণই একমাত্র হেতু। সুতরাং সেই প্রাণকে যিনি হনন অর্থাৎ নষ্ট করেন, এ জগতে তাঁহার কিনা নষ্ট করা হয়? আর প্রাণকে যিনি সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহারও এ জগতে কি না রক্ষা করা হয়?

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও ঠিক্ ঐ কথাই বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়ই আরোগ্য। রোগ সেই আরোগ্যকে এবং মঙ্গলময় প্রাণকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া থাকে।

সে যাহাহউক, প্রাণের এতাদৃশ অসাধারণ উপযোগিতা বুঝিয়াই তখনকার কালে ব্রাহ্মণগণ নিজের ও সাধারণের নির্ব্বিঘ্নে প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণের জ্ঞাপক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজা বা তৎসদৃশ ধনশালী ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার জন্য আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন এবং বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসাদারগণ ব্যবসা করিয়া ধনোপার্জ্জনের জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতেন। আর শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞানাধম জাতির পক্ষে তসকল বিষেয়ই অনধিকার ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

কিন্তু হায়, সে দিন আর নাই! সে ব্রাহ্মণ আর নাই! সে ক্ষত্রিয় বা

ধনশালীগণের অস্তিত্বও ভারত হইতে একবারেই লোপ পাইয়াছে! ব্যবসায়ী বৈশ্যগণও এখন প্রায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের স্থান অধিকার করিয়াছে! তবে থাকিবার মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের লোকগুলিই এখন শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞানাধম অবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই চণ্ডালাধম, শূদ্রাধমবর্ত্তমান ভারতবাসীগণই এখন ভারতের ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই এখন ক্ষত্রিয়, তাঁহারাই এখন বৈশ্য-পরিচয়ে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। সুতরাং যে দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শূদ্র হইতেও নীচ, চণ্ডাল হইতেও অধম, চর্ম্মকার হইতেও অস্পৃশ্য, সে দেশের দুর্ভাগ্য যে কতদূর অসীম, সে বিচারে আত্মজ্ঞানীই একমাত্র অধিকারী। আর সে দেশের লোকের নিকট প্রাণের কথা বলিতে যাওয়া যে কতদূর ঝক্‌মারী, তাহা আমাদের ন্যায় অপদার্থ আহম্মুখ পাঠকগণকেই একটু ধীরভাবে বিচার করিতে অনুরোধ করি। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

বদ্দিমতে কি জোলাপের ওষুধ আছে?

কপাল যখন পোড়ে, তখন দেখিবে, যেন চারিদিকেই আগুণ লাগিয়াছে। উন্নতির স্রোত যখন বহিতে আরম্ভ হয়, তখন সহস্র বাধা বিঘ্ন দিয়াও সে তীব্র স্রোতের গোতিরোধ কেহ করিতে পারে না। আবার যখন অবনতির ভাটা আরম্ভ হয়, মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাহাতেও বাধা দিতে পারে না। সেইরূপ আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে ভারতেরও এখন অবনতির ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতই কপালে আগুণ লাগিয়াছে, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধনরত্ন, শিল্প, বাণিজ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু রূপ রসাদি ভারতীয় দ্রব্য, তৎসমস্তেরই যেন এখন ভাটার টান ধরিয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে দেশ অজ্ঞানতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ধন রত্নাদি কেবল শব্দমাত্রেই অবস্থিতি করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদিদ্রব্য এখন কেবল বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে!

এ সর্ব্বগ্রাসি-ভাটার টান ভারতের ভাগ্যে আর কখনও ফিরিবে কি না তাহা ভগবান্ জানেন। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, টান কখনও চিরকাল সমভাবে থাকে না; যেহেতু স্বভাবের নিয়মই এই যে, যেখানে ভাটা সেইখানেই জোয়ার; যেখানে জোয়ার সেইখানেই ভাটা; ইহাই জগতের সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম। কোন কালেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে না; তবে অবশ্য স্রোত বর্ষাকালের ন্যায় একটানা হইলে জোয়ারের টান ফিরিতে অনেক দিন বিলম্ব লাগে। বলা বাহুল্য যে ভারতের দুর্ভাগ্যরূপ ভাটা এখন একটানেই বহিতেছে। সুতরাং এ একটানা ভাটার টান ফিরিতে যে আর কত বিলম্ব লাগিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

বড় দুঃখে আজ এস্থলে একথা তুলিলাম। এত ক্ষুদ্র বিষয় ধরিয়া একথা তুলিয়াছি যে, যাহা শুনিলে পাঠকগণ হয়ত হো হো করিয়া না হাসিয়াই থাকিতে পারিবেন না। অতি অল্পদিনের কথা হইবে, এই কলিকাতাসহরের কোন একটী সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রের জ্বরচিকিৎসা উপলক্ষে আমি বালকটীকে দাস্ত হওয়ার জন্য হরিতকী ও কটকী প্রভৃতি দ্বারা একটী পাঁচন দিই। সেই পাচন দুই তিন দিন ব্যবহারেই তাহার প্রত্যহ আট দশ বার দাস্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্য ফলদর্শে। যে জ্বর ইতিপূর্ব্বে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী ঔষধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেবন করিয়াও যায় নাই, ডিগুপ্তের বোতলেও যে জ্বর নড়ে নাই, এক পাঁচনের দ্বারা দাস্ত হইয়া এ হেন জ্বরের চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই শান্তি হইয়া গেল।

উপরোক্ত চিকিৎসা ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সেই বালকের একটী নিকট আত্মীয় নবীন যুবক যিনি বি, এল পাঠ করিতেছেন, যাঁহার ইউরোপ আমেরিকার তৃণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নদ, নদী, পর্ব্বত, শিল্প, বাণিজ্য, কুইনাইন্, বেকন বায়রণ ইত্যাদি কোন খবরই প্রায় জানিতে বাঁকি নাই, এহেন সুদূরদর্শী যুবক আশ্চর্য্যের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আপনাদের বদ্দিমতে কি জোলাপের ওষুধ আছে? যেহেতু আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী মতে কোন রূপ জোলাপের ওষুধ নাই এবং সেই সংস্কারেই আমি মনে করিয়াছি যে, থোকার আমাদের আপনার ঔষধে কিছু করুক্ না করুক্ কিন্তু স্বাভাবিক কয়েকবার ভেদ হওয়াতেই হয় ত জ্বরের শান্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে

আত্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও ধরতত্ত্বে প্রচুর বিজ্ঞ তরুণ যুবকের এহেন স্বদেশীয়জ্ঞানের অভাব দেখিয়া সে সময় আমি প্রকৃতই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। এবং বৈদেশিক জ্ঞানের প্রচলনে আমাদের ভারতবাসী যে দিন দিন এতদূর আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়াছেন, ইহা মনে চিন্তা করিয়া তখন আমার চক্ষুদিয়া জল আসিবার উপক্রম হইয়াছিল।

সে যাহাহউক, বদ্দিমতে জোলাপের ওষুদ আছে কিনা, ইহা যুবককে এবং যুবকের ন্যায় অন্যান্য আত্মজ্ঞানহীন ভারত সন্তানকে জানাইবার জন্য নিম্নে বিরেচক ঔষধের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

১। যুবকের ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপধিধারী ব্যক্তির হয়ত জানা না থাকিতে পারে, কিন্তু দেশীয় চাসা ভুসা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই জানেন যে, পটলের গেঁড় অর্থাৎ যে, পটল আমরা প্রত্যহ ভক্ষণ করি, সেই পটলের মৃত্তিকা মধ্যস্থ মূল ভাগ কতকটা ভক্ষণ করিলে দাস্ত হওয়া ত দুরের কথা, পরন্তু পেটের নাড়ি ভুড়ি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাইতে পারে। কোন কোন অজ্ঞ লোকের এই পটলের মূল খাইয়া এত অধিক দাস্ত হইয়াছে যে শেষটা তাহার জীবন পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।

২। বিলাতি ক্যাষ্ট্ররঅয়েল বলিয়া আমরা যে ওষুধটী বড়ই আদরের সহিত ব্যবহার করি, উহাও এই ভারতেরই বদ্দিমতের জোলাপের ওষুধ। সংস্কৃতে উহার নাম এরণ্ড এবং সাধারণ কথায় ভেরেণ্ডা কহে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদআচার্য্যগণও উহাকে শ্রেষ্ঠ বিরেচক বলিয়া গিয়াছেন। এবং কবিরাজেরাও অনেক রোগে উহার প্রয়োগ করিয়া অসাধারণ ফল পাইয়া থাকেন।

৩। বিলাতি ক্রোটন অয়েল বলিয়া ডাক্তারেরা যে ঔষধটীর দ্বারা তীক্ষ্ণ বিরেচন করাইয়া থাকেন, বদ্দিমতে তাহাই জয়পাল নামে অভিহিত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের অনেক গো-বদ্দির হাতেই জয়পালের ভীম পরাক্রম দ্বারা প্রতিবৎসর অসংখ্য ব্যাক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া থাকে।

৪। ত্রিবৃৎ অর্থাৎ তেউড়ীলতার মূলনামে বদ্দিমতে এমন একটী অসাধারণ অত্যাশ্চর্য্য বিরেচক ঔষধ আছে, যাহা ইংরাজী শিক্ষিত যুবক! তুমি তোমার শিক্ষাগুরু ইয়ুরোপ আমেরিকার কোথায়ও খুঁজিয়া পাইবে না। কোন ইউরোপ আমেরিকাবাসী অদ্যাপি এমন উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ

বাহির করিতে পারেন নাই। বিরেচক ঔষধের মধ্যে তেউড়ীলতার মূল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়াই চরক তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন;—

"ত্রিবৃদ্বিরেচনানাং।"

অর্থাৎ বিরেচক ঔষধের মধ্যে তেউড়ীলতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেবল যে চরকই এই কথা বলিয়াছেন, তাহা নয়; আমরাও প্রতিনিয়ত এই মূলের অসীম গুণের বিষয় পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। এবং যদি অবিশ্বাস না করেন, তবে সত্যই বলিতেছি যে, ইহার ন্যায় নিরাপদ ও সুখবিরেচক ঔষধ এ জগতে অদ্যাপিও আর কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের কথা শুনে কে? আমরা ত আর বেকন নহি, বায়রণও নহি, ইউরোপেও বাস করিনা এবং আমেরিকায় ত্রিসীমাতেও কখন পদার্পণ করিনাই। সুতরাং আমাদের ন্যায় নেটিব বদ্দির কথা আপনি কি শুনিবেন, না তাহাতে সাহস করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন?

অথবা আপনি কেন, আপনি ত নব্য নধর যুবক, সবে ইংরাজীরাজ্যে এই প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এ পথের পাকা পথিক, যাঁহাদের দেশী-বিলাতী উভয়রাজ্যের পরস্পর তুল্য তুলনা করিতে অধিকার জন্মিয়াছে। কলঙ্কের কথা এই যে, সেই শুভ্রকেশ লোলচর্ম্ম অশীতিপর বৃদ্ধগণকেও বুঝাইতে গেলে পাগল বলিয়া উপহাস করেন। বাস্তবিকই কেহই শুনে না, আবার জোর করিয়া শুনাইতে গেলেও বিশ্বাস করে না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে চুপ্ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাই বা পারি কৈ? মনে ভাবি এ সকল বেদবাক্য সদৃশ সত্যকথা আজ হউক আর দুই দশ দিন পরেই হউক, কিংবা যুগযুগান্তর পরেই হউক, এমন দিন আবার অসিবেই আসিবে, যখন দেশের লোক আবার এ সকল কথাই শুনিতে মহা আগ্রহ প্রকাশ করিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সে দিন কিন্তু এখনও বহুদূরে অবস্থিত। তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, এখন অবনতির ভাটার টান; এখন ভারতে অজ্ঞানতার স্রোতই খরবেগে বহিতেছে।

সে যাহাহউক, উপরে মাত্র চারি প্রকার বিরেচক ঔষধের কথা বলিলাম। কিন্তু আমাদের একদেশদর্শী যুবক শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ ৬০০ ছয়শত প্রকার বিরেচক ঔষধের কল্পনা আছে। বৃদ্ধকে,

বালককে, আপনার ন্যায় যুবককে, স্ত্রীকে, গর্ভিণীকে, রোগীকে; অরোগীকে যাহাকে বলিবেন, সকলেরই জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অতি আশ্চর্য্যরূপেই বিরেচন ঔষধের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে, আপনার যখন মূলেই ভুল, যখন প্রথমেই গলদ, যখন বদ্দি মতে বিরেচক ঔষধের অস্তিত্বেই সন্দেহ, তখন কি আর সে সকল ঔষধে আপনার জোলাপ ধরিবে? তথাপি কিন্তু বদ্দিমতে আপনার জোলাপের ঔষধ জ্ঞানসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রস্তুত থাকিলাম।

উপসংহারে আপনি জানিবেন যে, চরকের এই ছয়শত প্রকার বিরেচন কল্পনা পাঠ করিয়া আপনার ইয়ুরোপ আমেরিকার ইংরাজগুরুগণ কিন্তু অবাক্ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের অসাধারণ শক্তির প্রশংসা করিয়া অগন্য ধন্যবাদের সহিত আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। যদি অবিশ্বাস করেন, তবে একবার অসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাউন, ইহাই এস্থলে প্রার্থনীয়। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

হিক্কারোগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধের সহিত দেশীয় শুঁঠ পিপুলের তুলনা।

আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলভাগ অতি দৃঢ় ও সর্ব্বাংশেই খাঁটী হইলেও বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী যে অতি হেয়, প্রকৃতই অসার এবং এই মতের আধুনিক চিকিৎসক-সম্প্রদায়ও যে তথৈবচ, একথা কিন্তু আদৌ অস্বীকার করিতে পারিব না। আর আমাদের নিজেদের ঘরের বাঁধুনী এইরূপ আলগা হওয়াতেই যে, বিদেশীয় সাত সমুদ্র তেরনদী পারস্থ এলোপ্যাথিও হোমিওপ্যাথিক প্রভুগণ এখানে আসিয়া এতদূর প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, ইহাও যে বেদবাক্য সদৃশ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বাক্য, তাহাও নিঃসন্দেহ।

সব্‌ই সত্য, সমস্তই অভ্রান্ত, নিজের দোষে আমরা নিজে মরিয়াছি, নিজের ঘরে নিজেরা হাতে করিয়া আগুণ লাগাইয়াছি, সত্য সত্যই ভারতবাসীর দোষেই ভারতবর্ষ মজিয়াছে, ভারতীয় বৈদ্য-চিকিৎসকদিগের দোষেই বৈদ্য-চিকিৎসা অধঃপাতের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে; এসমস্ত সত্যকথাই মস্তক পাতিয়া মানিয়া লইয়াও বর্ত্তমান দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর অপদার্থতা ও অযোগ্যতার বিষয় প্রাণভরিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও কিন্তু সময় সময় এমন সমস্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যাহা দেখিয়া অমনি যেন প্রাণ আর সেসব্ কথা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহে না, মন যেন তখনই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতে থাকে, রে অবোধ ভারত সন্তানগণ! রে স্বদেশ, স্বজন ও স্বধর্ম্মে বিতৃষ্ণ এবং পরদেশ, পরজন ও পরধর্ম্মে আসক্ত; সুতরাং স্বাভাবিক বা ঐশ্বরিক সনাতন ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত অতএব যারপর নাই নির্ব্বোধ হইতেও নির্ব্বোধতম, বালক হইতে বালকতম পাষণ্ড নিমকহারাম ভারতবাসীগণ! হউক না কেন তোর বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী অঙ্গহীন! নাই থাকুক্ তোর অস্ত্রশস্ত্র, চিকিৎসাপ্রণালী! মোটকথা তোর কিছুই না থাকিলেও তোর জননী সুবিশাল ভারতমাতা তোদের মঙ্গলের জন্য আজ্‌ও পর্য্যন্ত যাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ ও সম্যক্ অপহৃত সিন্ধুক বাক্সের মধ্যে শুঁঠ পিপুলরূপ যে সকল অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের নিকট পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার মণিমুক্তাদিও পরাজিত হয়! অথবা এতই আস্পর্দ্ধার সহিত এত বাড়াবাড়ি করিয়া আজ্ কেন এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহাই বলি।

প্রায় এক মাসের বড় অধিক হইবে না, কলিকাতার বাহির শিমলা নিবাসী সদ্গোপজাতীয় গঙ্গারাম ঘোষ নামক অতি বলশালী এক ব্যক্তি সুদারুণ হিক্কা পীড়িত হইয়া যেরূপ শোচনীয়ভাবে আমাদের নিকট আসিয়াছিল এবং পূর্ব্বাপর তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠক বেশ অবহিতচিত্তে শুনুন। প্রথমতঃ গঙ্গারামের সামান্য সর্দ্দিজ্বরভাব হয়, তাহাতে এক জন সামান্য হাতুড়ে গোচের বৈদ্যের নিকট ঔষধাদি খায়, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র উপশম না হওয়াতে সে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভের আশায় একজন অতি অজ্ঞান হাতুড়ে ডাক্তার নামধারী ব্যক্তির

পরামর্শে কতকটা কুইনাইন্ ও আফিং একত্রে সেবন করে। উদ্দেশ্য কুইনাইন্ দ্বারা জ্বরের ত উপশম হইবেই, অপরন্তু আফিং থাকাতে সর্দ্দিরও শীঘ্র শীঘ্র শান্তি হইতে পারিবে।

প্রথম দিন প্রাতে সে এইরূপ আফিং ও কুইনাইন্ একত্রে সেবন করিল, বৈকালে কিন্তু তাহার আর স্পষ্ট জ্বর আসিল না, কিন্তু ভিতরে অবশ্য উত্তাপ থাকিল। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে সর্দ্দির জন্য তাহার যে ভয়ানক কষ্ট বোধ হইত, তাহা আর সে দিন তাদৃশ হইল না, ইহাতেই সে কতকটা সন্তুষ্ট হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার সে আনন্দ স্থায়ী হইল না, সমস্ত রাত্রিতেই তাহার যেন কেমন কেমন গা জ্বালা প্রভৃতি অশান্তিভাবে কাটিয়া গেল, পরদিবস প্রাতে সেই ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শে আবার উপরোক্ত আফিং ও কুইনাইন্ একত্রে সেবন করিল এবং এইদিন বৈকাল হইতেই তাহার অল্প অল্প হিক্কা আরম্ভ হইল। কিন্তু রাত্রি প্রায় ১টার সময় নিদ্রা আসাতে তখন হিক্কা বন্ধ হইয়া সে নিদ্রিত হইল।

পরদিন প্রাতে সে অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিল, যেহেতু তখন জ্বর বা হিক্কা তাহার কিছুই ছিলনা। তথাপি সেই ডাক্তারের উপদেশ মতে সে দিন সে আফিং ব্যতিরেকে কেবল কুইনাইন্ একটু অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া দুগ্ধসাগু ইত্যাদি পথ্য করিল। কিন্তু এই দিন বৈকাল হইতে তাহার এত প্রবল হিক্কা আরম্ভ হইল যে, সে একবারে অস্থির হইয়া পড়িল এবং যাতনায় তখন অবশ্য অপেক্ষাকৃত বড় এলোপ্যাথ ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিল, ডাক্তার মহাশয় ক্রমান্বয়ে ৩ দিন পর্য্যন্ত নানাবিধ ঔষধ দিয়াও হিক্কার বেগ কিছুমাত্র নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহাপেক্ষা আর একজন প্রাচীন ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া তাঁহার অঙ্গে ব্লিষ্টার লাগাইয়া ভয়ানক ফোস্কা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, তখন গঙ্গারামের বিষম দায় ঘটিল, একেই ত হিক্কার চোটে অস্থির, তার উপর আবার ব্লিষ্টারের জ্বালা, প্রকৃতই গঙ্গারামের পক্ষে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘাঁ পড়িল।

এইরূপে ক্রমাগত সাতদিন পর্য্যন্ত এলোপ্যাথি চিকিৎসা হওয়ার পর তখন গঙ্গারাম আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে একজন উপযুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের উপর আত্মসমর্পণ করিল। বলা বাহুল্য যে, ক্রমান্বয়ে ৫ দিনের মধ্যেও হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহারে গঙ্গারামের বিন্দুমাত্রও উপকার দর্শিল না। অপরন্তু সে তখন জীবনে হতাশ ও এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য নাই বলিলেই হয়।

ঠিক্ এইরূপ অবস্থাতেই গঙ্গারাম আমাদের এই দেশীয় অধম বর্দ্দিপেথীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে সময় গঙ্গারামের সেই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া বিশেষতঃ তাহার আদ্যোপান্ত চিকিৎসা ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাহাকে ঔষধ দেওয়া দূরে থাকুক্, ব্যাপার শুনিয়াই ত আমি অবাক্ হইলাম এবং ভাবিলাম যে এ অবস্থায় আর ইহার বাঁচিবার কিছুমাত্রই আশা নাই। এ হিক্কা যে আর বন্ধ হইবে, ইহা মনেও স্থান দেওয়া উচিত নহে। মনের ধারণা এরূপ হইলেও সর্ব্বত্র ত আর মনের ধারণার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা চলে না; সুতরাং শুধু এই মনে করিয়াই আমি তখন গঙ্গারামের জন্য নিম্নলিখিত হিক্কানাশক মুষ্টিযোগ ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম, যথা—পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাই পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে উপদেশ দিয়া তখন বিদায় করিলাম। অবশ্য রোগীর বিশ্বাসের জন্য তাহার সহিত কয়েকটা যে সে বড়ীঔষধও দিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বড়ীঔষধ কিছুই নহে, কেবল উপরোক্ত ত্রিবিধ চূর্ণই সে স্থলে ঔষধরূপে গণ্য। যখন এই ঔষধ দেওয়া হইল, তখন বৈকালে ৩টা আন্দাজ বাজিয়াছে, রোগী তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিল।

পাঠক! শুনিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিবেন যে, যে রোগী তাহার পূর্ব্বে ১২।১৪ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করিয়া কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, অপরন্তু জীবনে একপ্রকার হতাশ হইয়া গিয়াছিল। দেশীয় এই যৎসামান্য শুঁঠ, পিপুল প্রভৃতি মাত্র তিনটী দ্রব্য দ্বারা ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার সেই অত দিনের স্থায়ী অসীম যন্ত্রণাদায়ক ও প্রাণনাশক হিক্কার অনেকাংশ উপশমিত হইল! বলিতে প্রকৃতই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে, রাত্রি ঠিক্ ২টার সময়ে তাহার হিক্কার সম্যক্ নিবৃত্তি হইল, এবং সে নিদ্রাভিভূত হইল।

পরদিন ৮৷৷০টার সময় রোগীর আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার আর কোন অসুখই নাই, অপরন্তু তাহার বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আমি তাহাকে পূর্ব্বদিনের সেই নগণ্যের মধ্যে সেইরূপ গুটি তিনেক বড়ী

দিয়া বলিয়া দিলাম যে, ঠিক্ পূর্ব্বদিনের মত এই বড়ী সেইরূপ শুঁঠাদি ত্রিবিধ চূর্ণের দ্বারা সেবন করিতে দিবে। এবং আহারের জন্য মাগুর মৎস্যের ঝোল দ্বারা খুব্ পুরাতন চাউলের অন্ন খাইতে দিবে। এইরূপে সে দিন পথ্যাদি করিয়া রোগী প্রায় ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভালই ছিল, কিন্তু বৈকালে ৪টা বাজিতে না বাজিতেই আবার তাহার পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও গুরুতর বেগে হিক্কা হইতে আরম্ভ করিল। রোগীর অভিভাবক আসিয়া আমাকে সংবাদ জানাইবামাত্র তখন আমার অন্তঃকরণটা যে সহসা কেমন করিয়া উঠিল, তাহা আর বলিবার ও বুঝাইবার নহে। যাহা হউক, তথাপি আমি হতাশ্বাস না হইয়া পূর্ব্বদিনের শুঁঠ পিপ্পলাদি ঔষধ ত থাকিলই, পরন্তু নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগটী ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলাম। যথা—স্তনদুগ্ধে আল্‌তা গুলিয়া তদ্বারা পুনঃ পুনঃ নস্য লইতে বলিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ নস্য ৪।৫ বার টানিবামাত্রেই তৎক্ষণাৎ হিক্কার শান্তি হইল। সে দিন সমস্ত রাত্রি এবং তাহার পরদিনেও দিবারাত্রি তাহার আর কোন উদ্বেগই রহিল না। কিন্তু তৃতীয় দিবস প্রাতে ১১ টার সময় সে যেমন আহার করিয়া উঠিয়াছে, অমনি অতি ভয়ানক বেগের সহিত আবার তাহার হিক্কা আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে জানাগেল যে, গুরুতররূপে নূতন চাউলের ভাত এবং ছোলার ডাউল খাওয়াতেই তাহার এইরূপ হইয়াছে। সুতরাং অগত্যা আর অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে দিন ঐ রূপই ঔষধাদি খাইতে ও নস্য লইতে বলিয়া দিলাম। কিন্তু তখনও মধ্যে মধ্যে হিক্কা হইতেছিল, ইহাতে আমি রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দিলাম, যথা—তেউড়ীলতার মূলের চূর্ণ ।০ আনা ওজনে লইয়া চারি আনা ইক্ষুচিনি ও একটু গরম দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিলাম। ইহাতে বেলা ১২টার মধ্যে তাহার ৫ বার খুব্ দাস্ত হইয়া গেল, সে দিন রোগীকে একটু দুগ্ধবার্লি খাইতে দিয়া ছিলাম। পরদিনও ভাত দিই নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দিন হইতে তাহার সম্পূর্ণরূপ হিক্কার শান্তি হইয়া গেল এবং সে ক্রমশঃ সম্যক্ সুস্থ হইয়া উঠিল।

মন্তব্য।

এই রোগীর সম্বন্ধে এবং এই উপলক্ষে আরও কিছু বলিবার আছে।

১। রোগী যদি মধ্যে ওরূপ নূতন চাউলের অন্ন ভোজন না করিত, তাহা হইলে সে পুনরাক্রান্ত হইত না। আর ইহাও আমার বিশ্বাস যে, যতদূর সুপথ্যে তাহার থাকা উচিত ছিল, সে আদৌ তত পরিমাণে থাকিতে পারে নাই বলিয়াই তাহার আরোগ্যলাভপক্ষে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

২। প্রথমোক্ত শুঁঠ, পিপুল ও আমলকী চূর্ণ, হিক্কারোগ শান্তির পক্ষে যে বড়ই অশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ, ইহা কেবল গঙ্গারামের দৃষ্টান্তেই বলিতেছি না। অত্যল্পদিন হইল বঙ্গনিবাসীর স্বত্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহসা হিক্কা হইতে আরম্ভ হওয়াতে উপরোক্ত শুঁঠাদির চূর্ণ সেবনেই তিনি একদিনেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

৩। অধিক দিনের কথা নয়, একজন খ্যাতনামা প্রাচীন এলোপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসার অধীনের একটী জ্বরবিকারগ্রস্ত যুবকের ভয়ানক হিক্কা হইতে আরম্ভ হয়, বলা বাহুল্য যে, ব্লিষ্টার দেওয়া প্রভৃতি ডাক্তার মহাশয়ের বিধিমত চেষ্টার দ্বারাও তাহার হিক্কার বেগ কমিল না, অপরন্তু রোগী হিক্কাজন্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতে লাগিল। ঠিক্ এই অবস্থাতেই আমি দেখি। আমার আগ্রহসত্ত্বেও জ্বরবিকারের রোগীর চিকিৎসায় দেশীয় চিকিৎসক অসমর্থ ভাবিয়া আত্মীয়গণ কোন মতেই সে অবস্থায় ঔষধাদি খাওয়াইতে মত করিলেন না। অবশেষে আমি নিতান্তই তাঁহাদের মত করিতে না পারিয়া বলিলাম যে, আমার ঔষধ না খাওয়ান, কিন্তু একটা ঔষধের নস্য লইতে ত আর আপত্তি নাই, এই বলিয়া নিম্নলিখিত দুই রকমের দুইটী নস্য পর্য্যায়ক্রমে টানিতে দিলাম। প্রথম স্তনদুগ্ধে আল্‌তা গুলিয়া তদ্দ্বারা নস্য।০ দ্বিতীয় স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া তদ্দ্বারা নস্য। পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে, দুই ঘণ্টা কাল এইরূপ উভয় নস্য পর্য্যায়ক্রমে টানিতে টানিতেই রোগীর সম্পূর্ণরূপে হিক্কার শান্তি হইয়া গেল!

এতদ্ভিন্ন হিক্কা শান্তির জন্য অন্যান্য আশুফলপ্রদ মুষ্টিযোগের বিষয় ইতি পূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে বর্ণিত হইয়াছে।

অধঃপতিত ভারতের চরম দুর্দ্দশা-গ্রস্ত বর্ত্তমান বৈদ্য-চিকিৎসা-প্রণালী সাধারণের নিকট প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বতোভাবে ঘৃণার্হ হইলেও কেবল ভৈষজ্য-

তত্ত্বে এখনও এমন সকল অসাধারণ বাহাদুরী আছে, যাহা তুমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাইবে না।

সম্পাদক।

দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে।

স্নানবিধি।

ইতি পূর্ব্বে পাঠকগণকে তৈল মাখাইয়া রাখিয়াছি। কথায় বলে "তৈল মাখিয়া অনেক্ষণ থাকিলে নানাবিধ অসুখ করে" সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এবারে শীঘ্র শীঘ্রই স্নানের ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু স্নানসম্বন্ধে আমাদের নিজের কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে ঋষিবাক্যেরই শরণ লওয়া যাউক। আয়ুর্ব্বেদ বলেন;—"সুস্থশরীরে প্রত্যহ যথারীতি স্নান করিলে শরীর পবিত্র থাকে, শরীরের রসরক্তাদি ধাতুর বৃদ্ধি হয়, দীর্ঘায়ু লাভ হয়। পরিশ্রমজন্য ক্লান্তি, ঘর্ম্ম ও শরীরের ময়লা নষ্ট হয়, বল বৃদ্ধি হয় এবং ওজ ধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স্নানের সাধারণ গুণ এইরূপ অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ যথারীতি স্নান দ্বারা উপরোক্ত অত্যাশ্চর্য্য গুণ দর্শিলেও শরীরের অবস্থা ও দেশকাল ভেদে এই স্নানের এত পার্থক্য আছে যে, একমাত্র স্নানবিধি লইয়াই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, কিন্তু সে অবসর আমাদের নাই, বিশেষতঃ সম্মিলনীতেও স্থানাভাব, সুতরাং স্নানবিধিসম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

শীতল জলে স্নান।

যাঁহারা সুস্থকায় অথচ বলিষ্ঠ, যাঁহাদের শরীরে কফকাসির সংস্রব নাই, এরূপ শ্রেণীস্থ শারীরিক পরিশ্রমবিহীন অর্থাৎ নিয়ত লেখাপড়া বা তৎসদৃশ অন্য কোন কার্য্যের দরুণ যাঁহারা সর্ব্বদা বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যহ প্রাতে একবার অবগাহন পূর্ব্বক অর্থাৎ ডুবদিয়া স্নান করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহাকে প্রত্যহ দুইবেলা রীতিমত শারীরিকে পরিশ্রম করিতে

হয়, অথবা যিনি প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক যথারীতি ব্যায়াম করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইবারই স্নান প্রশস্ত। অপরন্তু যাঁহারা একাহারী-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী, তাঁহাদের পক্ষেও দুইবার স্নান অবশ্যকর্ত্তব্য, তবে ইচ্ছা করিলে বা অসুবিধা বোধ হইলে শীতকালে প্রাতে একবার মাত্র স্নান করিতে পারেন।

গরমজলে স্নান।

যেমন সুস্থব্যক্তির শীতল জলে স্নান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তেমনি অধিকাংশ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে উষ্ণজলে স্নান করা সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। দুর্ব্বল, কাসশ্বাসগ্রস্ত ও কফাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি রোগে যেমন শীতলজলে স্নান করিলে মহান্ অনিষ্ট সাধিত হয়, সেইরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে উষ্ণজলে স্নান করিলেও মহান্ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের শাস্ত্রে এ সকল স্নানের নিয়ম রীতিমত বিধিবদ্ধ থাকিলেও অজ্ঞতা-জন্য সে সকল নিয়ম প্রায় কেহই জানেন না। অথবা কাহারও একটু আধটু জানা থাকিলেও তাহা প্রতিপালন করেন না। কেহ শুনিয়াছে গরমজলে স্নান করা উচিত, 'আচ্ছা তাহাই হউক, এই ভাবিয়া কতকটা গরমজল লইয়া আপাদমস্তকে ঢালিয়া স্নান করিল। কিন্তু সে ব্যক্তির জানা উচিত যে, এই উষ্ণজল মস্তকে দেওয়াতে তাহাদ্বারা বিষের ন্যায় ফল ফলে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত উষ্ণজল মস্তকে দিলে তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ভয়ানক অনিষ্ট সকল ঘটিয়া থাকে। যথা——

"উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈব তূত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষোঃ॥"

অর্থাৎ উষ্ণজল দ্বারা শরীরের অধঃকায় সেচন করিলে শরীরের বলাধান হইয়া থাকে, আর সেই উষ্ণজল মস্তকে দিলে তদ্দ্বারা শরীরের বলহানি হয় এবং কেশ ও চক্ষুর দোষ ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক ডাক্তারগণ যে, বর্ত্তমান সময়ে দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ স্নানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাহা উক্ত আর্য্য ঋষি বাক্যেরই অনুকরণ মাত্র। অতএব যাহা দেশী বিলাতী উভয় মতেই ব্যবস্থেয়, তাহা প্রতিপালন করিতে

ত কাহারই ঔদাসীন্য দেখান কর্ত্তব্য নহে। স্নানসম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার আছে, বিশেষতঃ কোন্ কোন্ রোগে কিরূপ ভাবে স্নান করা কর্ত্তব্য, তাহাও বলিতে ত্রুটী করিব না। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদে রোগ ও মৃত্যুপরিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবালগুটিকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপাদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ যাহার শরীরে প্রবালসদৃশ মসূরিকা উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎই বিলীন হইয়া যায়, সেব্যক্তি অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গ্রীবাবমর্দ্দো বলবান্ জিহ্বাশ্বয়থুরেব চ।
ব্রধ্নস্য গলপাকশ্চ যস্য পক্বন্তমাদিশেৎ॥

অর্থাৎ যাহার গ্রীবাতে প্রবল বেদনা, জিহ্বাতে শোথ ও ব্রধ্ন এবং মুখ ও গলদেশ পাকিয়া উঠে, সে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে অর্থাৎ মরিবে।

সভ্রমোহতি প্রলাপোহতি ভেদোস্থ্নামতিদারুণঃ।
কালপাশপরীতস্য ত্রয়মেতৎ প্রবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়া জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার অত্যন্ত ভ্রান্তি,প্রলাপ এবং নিদারুণ অস্থিভেদ, এই তিনটী লক্ষণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

প্রমুহ্যন্ লুঞ্চয়েৎ কেশান্ প্রতিগৃহ্লাত্যতীব চ।
নরঃ স্বস্থবদাহারমবলঃ কালচোদিতঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্য কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মোহ প্রাপ্ত হয় এবং কেশ সকল উৎপাটন ও গ্রহণ করিতে থাকে। আরও সুস্থাবস্থার ন্যায় আহার-শক্তি ও বচন-শক্তি হয়। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

আয়র্ব্বেদীয় সদৃশ-চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শূল।—বিসূচিকা রোগে পেটে, তলপেটে এবং নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তত্তৎ স্থানেশচাপ ধরিয়া সেই চাপ অবিরত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বোধ হয়, যেন কেহ এক যোগে সহস্র সহস্র সূচাগ্র দ্বারা মুহুর্মুহু ঐ সকল স্থান পীড়ন করিতেছে এবং বক্ষ, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মসমূহও যেন একবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহা বহু যন্ত্রনা-প্রদ। শরীরস্থ শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাশয়ে যাইবার সময় এবং ক্রিমিদোষ-জন্য এইরূপ বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকে শূল কহে। প্রথমোক্ত বেদনা নিবারণের জন্য অর্দ্ধতোলা শ্বেত আপামার্গ মূলের রস সহ সার্ষপ পরিমিত ভস্মীকৃত শঙ্খবিষ সেবন করিতে দিবে। ২।৩ বার সেবন করাইলে বেদনা উপশমিত হয়। শোধিত কুচিলা এক আনা এবং কমলাগুঁড়ী এক আনা একত্রে পেষণ করিয়া এক ছটাক চূণের জলমধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে। কিছু-কাল পরে সেই জল ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে ক্রিমিদোষ-জনিত বেদনা নিবারিত হয়।

ঘর্ম্ম ও তৃষ্ণা।—শরীরস্থ যে সকল জলীয়াংশ লোম-কূপ দ্বারা নির্গত হয়, তাহাকে ঘর্ম্ম কহে। মলদ্বার দিয়াও ঐ সকল জলীয়াংশ নির্গত হইয়া থাকে কিন্তু তাহাকে আর ঘর্ম্ম বলা যায় না। যে কোন প্রকারেই কেন না হউক, শরীর হইতে জল নিঃসরণ আরম্ভ হইলেই প্রথমে অত্যন্ত পিপাসা হয় এবং পরিশেষে অঙ্গসমূহ ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। এই দুইটী উপদ্রব নিতান্ত ভয়াবহ। এতদ্দ্বারা শীঘ্রই মোহ উপস্থিত হইয়া জীবনান্ত হইতে পারে। এরূপাবস্থায় কখনও জলপান করিতে নিষেধ করা উচিত নহে। যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করিলে প্রকৃতপক্ষে পীড়ার কোন উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু সেই রূপ অপকার হইলেও আশু জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে পরিস্কৃত শীতল জল অথবা বরফজল সেবন করিতে

দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে হেতু নিবারণের জন্য অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। যে প্রকার শক্তিপ্রভাবে শরীর হইতে যে জাতীয় বস্তু নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, সেই প্রকার শক্তিবিশিষ্ট অন্যজাতীয় বস্তু প্রয়োগ না করিলে কখনও সেই নিঃসারণ ক্রিয়া রোধ হইতে পারে না। সুপক্ক নীরস সুপারী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৩।৪ বার সেবন করাইলে ঘর্ম্ম, পিপাসা এবং মোহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অথবা ষড়ঙ্গপানীয়ের নিয়মানুসারে সুপারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়াও মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অস্মদ্দেশে এক প্রকার চিকিৎসক আছে, তাহাদিগকে ওঝা কহে। বিসূচিকা রোগে তাহারা একটী গোটা সুপারী মন্ত্রঃপূত করিয়া রোগীর অঙ্গে ধারণ করিতে দেয়। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় সুপারী ভক্ষণ করিলে যে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, শরীরের অস্থিরতা এবং বুকে পীঠে খালিধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

উদ্বেষ্টন।—যখন শরীরে রক্তের অল্পতা হইতে আরম্ভ হয় এবং মর্ম্মগ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মারাশি ক্রমশঃ তরল হইয়া স্খলিত হইতে থাকে, সেই সময়ে এক এক স্থানে এক এক বার ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রনা প্রদান করে। নিল—গেল—অমুকস্থান একবারে ভাঙ্গিয়া গেল, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা রোগী সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এইরূপ বেদনাকে উদ্বেষ্টন কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে খালিধরা বা টাঁসলাগা ও বলা যায়। সদৃশ মতে ইহার কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে কিনা তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে প্রকার বিষাণু দ্বারা শরীরস্থ রক্ত এবং শ্লেষ্মা রূপান্তরিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হয়, কোন প্রকারে সেই বিষাণু বিনষ্ট হইয়া গেলেই এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে।

শিরঃশূল।—রক্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে মস্তকে অতিশয় বেদনা এবং চক্ষু লাল হইয়া উঠে। প্রবল বাতশ্লেষ্মার প্রকোপজন্যও মস্তকে বেদনা থাকে। এরূপাবস্থায় মস্তকে শীতল জল সেচন করিলে উপকার হয়।

মূত্রাবরোধ।—ইহা বিসূচিকা রোগের একটী প্রধান লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মূত্র ত্যাগ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই জীবনের আশা করা যায় না।

রক্ত হইতেই মূত্রের উৎপত্তি। বিসূচিকা রোগে সেই রক্তই প্রথমে রূপান্তরিত হইয়া যায়, সুতরাং মূত্রও প্রস্তুত হইতে পারে না। আবার মূত্রাশয়ের পথ অবরুদ্ধ হইলেও মূত্র নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। শীতল জল উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। নীলমাটী, সোরা এবং জলাশয়স্থিত পচা আম্রপত্র একত্রে বাঁটিয়া নাভি ও বস্তিতে প্রলেপ দিলে মূত্রস্রাব হয়।

উদর স্ফীতি।—প্রায় শেষাবস্থায় এই লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদরস্ফীত হইতে আরম্ভ হইলে কদাচিৎ কাহারও জীবন রক্ষা হয়। এই সময় পথ্য বা ঔষধ পরিপাক করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তদ্দ্বারা কোনও উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না। তবে স্বভাবের বলে কেহ কেহ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এক্ষণে এই রোগ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না।

অলসিকা।

অজীর্ণসত্ত্বে ক্রমাগত ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে করিতে যদি কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কুক্ষিদেশে কখনও বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। ঐ বায়ু হৃদয় এবং কণ্ঠদেশেই সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। এই রূপ অবস্থায় শরীরের অধোভাগস্থ বায়ু একবারে নিরুদ্ধ হয় এবং কোষ্ঠপ্রকোষ্ঠে যে সকল অপক্ক বা অর্দ্ধপক্ক মল সঞ্চিত থাকে, তাহাও কবারে অলসীভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই ইহাকে অলসিকা নামে অভিহিত করা যায়। রোগের সম্পূর্ণ প্রকোপাবস্থায় উদরাধ্মান, উদ্গার-বাহুল্য, শ্বাস প্রশ্বাস করিতে অতিশয় যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হয়। তীব্র যন্ত্রণায় রোগী সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ইহাও বিসূচিকা রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। তবে এইরূপ অবস্থায় বমি ও অতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং সর্ব্বাঙ্গে সূচিবিদ্ধের ন্যায় বেদনাও অনুভূত হয় না। দোষ সকল অত্যন্ত কুঞ্চিত হইয়া উদরে তীব্রশূল, স্নায়ু সমস্তের নিরোধ এবং সমুদায় শরীরকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করিলে তাহাকে দণ্ডালসক বলা যায়। দণ্ডালসক পীড়ায় অনতিকাল মধ্যেই জীবন ধ্বংস হয়। ক্রমশঃ—

দীনবাজার,
জলপাইগুঁড়ি। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

যাঁহাদের ধারণা-হোমিওপ্যাথিই ওলাউঠা রোগের একমাত্র মহৌষধ, আমরা তাঁহাদিগকে কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধ বিশেষতঃ ঔষধগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ ও ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে অনুরোধ করি। কেননা কলিকাতায় অবশ্য দেখিতে পাই না, তবে পল্লী-গ্রামে অনেক স্থলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, ওলাউঠাগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকে এলো ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার জবাব দিয়াছেন, অথচ সেই রোগীই বৈদ্যক ঔষধ দ্বারা অত্যাশ্চর্য্যরূপে জীবন দান পাইয়াছে। সুতরাং এসকল প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর আর অধিক কিছু না বলাই ভাল।

তারপর কবিরাজ মহাশয় যে কিছুদিন হইতে হোমিওপ্যাথি অর্থাৎ সদৃশ চিকিৎসাকে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ত সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কেন পারে তাহা শুনুন;—চিকিৎসকমাত্রেই জানেন যে; স্থাবর অমৃত বা মিঠাবিষ (Aconit) জ্বর শান্তির পক্ষে অদ্বিতীয় মহৌষধ। এমন কি, নূতন জ্বরের পক্ষে অমৃতবিষের ন্যায় এমন ঔষধ যে এজগতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহা প্রকৃতই সর্ব্ববাদী-সম্মত। অতএব দেখুন, সেই অমৃতবিষকে কবিরাজ মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথি মতে ব্যবহার করেন কি না? চরক বলেন;—

"স্থাবরং তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহং।
ফেণবম্যরুচিশ্বাসমূর্চ্ছাশ্চ জনয়েদ্বিষম্॥"

অর্থাৎ স্থাবরবিষ-জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ (দাঁত শিড়শিড় করা) গলদেশে বেদনা, মুখ হইতে ফেণাওঠা, বমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা জন্মায়।

এইত চরকের কথা; এখন দেখুন হোমিওপ্যাথি ব্যাপারটা কি? এইমতের চিকিৎসকেরা বলেন যে, "যে ঔষধ অধিক মাত্রায় উদরস্থ হইলে শরীরে যে সকল উপদ্রব বা লক্ষণ অর্থাৎ গ্লানি জন্মে, সেই ঔষধই আবার খুব্ অল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে তত্তৎ উপদ্রব বা গ্লানির শান্তি হইয়া থাকে। কেমন মতলবটা এই বৈত অন্য আর কিছুই নহে! ইহাই ত তাঁহাদের চিকিৎসা রাজ্যের মূলভিত্তি? তবেই দেখুন-যে অমৃত বা মিঠাবিষ একটু অধিক মাত্রায় উদরস্থ হইলেই শরীরে জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ আনয়ন করে, আবার

সেই মিঠাবিষই কিঞ্চিৎ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা প্রতিনিয়তই ঐ সকল জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি করিতেছেন। সুতরাং ইহাপেক্ষা যে হোমিওপ্যাথিতে আর নূতনত্ব কি থাকিতে পারে, যে বিচার সুবিজ্ঞপাঠকমণ্ডলীই করিবেন। চি, স, সম্পাদক,

---

বুঝিবার ভুল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, প্রসন্নবাবু ডিম্বধারণ ও গর্ভধারণকে এক বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সম্পাদক মহাশয়ও গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং হংসীর ডিম্ব প্রসব ব্যাপারকে ভ্রূণ বলিয়া বুঝিয়াছেন। স্বপ্নসংসর্গ অথবা কামাসক্ত স্ত্রীলোকের পরস্পর সংসর্গে রমণীর গর্ভ হয়, একথা স্বীকার করিলে মেয়ে হাঁসেরও স্বপ্নসংসর্গ অথবা অন্য মেয়ে হাঁস সংসর্গ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু হংসীর তাহা ঘটে না, তবে ডিম্ব প্রসব করে কেন?

পরন্তু ডিম্ব ও সন্তান একপদার্থ নহে। কেবল হংস বলিয়া নহে, অনেক পক্ষীই ঐরূপ বাওয়া ডিম্ব প্রসব করে। তদ্ব্যতীত ডিম্বধারী কীট পতঙ্গেও করে। কতকগুলি স্ত্রী রেশম কীট (গুটি পোকা) রাখিয়া দিলে দেখা যায়, যে পুংসংসর্গ ব্যতীতও ঐ স্ত্রীকীটগুলি কাল সহকারে ডিম্ব পরিত্যাগ করে কিন্তু ঐ ডিম্বে ছানা বাহির হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঋতুর সময়ে ওভেরি (ডিম্ব কোশ) হইতে ডিম্ব নির্গত হয়। পুরুষ সহবাস হইলে ঐ ডিম্বে পুংবীর্য্য যোগ হইয়া সন্তান উৎপন্ন হয়, আর পুংসর্গ না হইলে ঐ ডিম্ব আপনা হইতে মরিয়া যায় এবং নির্গত হইয়া যায়। ঐ সকল মনুষ্য ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে, অনুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, প্রভৃতিরও ঐরূপ প্রতি ঋতুর সময় ডিম্ব পরিপক্ক ও নির্গত হয়। মনুষ্য স্ত্রীতে এই ডিম্ব অসংখ্য পরিমাণে থাকে। এই সকল ডিম্ব বালিকা বয়সেই সৃষ্ট হয়। পরে যৌবন বয়স আগত হইলে

প্রতি ঋতুতে দুই একটী ডিম্ব পরিপক্ক হয় এবং সেই সময়ে উহাতে পুংবীর্য্যের সংযোগ হইলে উহা হইতে সন্তান উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। যে সকল জীব জন্তুর সংঙ্গম যন্ত্র আছে, তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ সংযুক্ত না হইলে কখনই সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না। পুষ্পধারী বৃক্ষ লতাদিরও ডিম্ব আছে। ফুলের মধ্যে স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল আছে। স্ত্রীফুলের নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র ফলের মত দেখা যায় ঐটীই ডিম্ব। ঐ ক্ষুদ্র ফলের সহিত পুংপুষ্পের রেণু যোগ হইলে ঐ ফল ক্রমে বড় হইয়া বৃহৎ ফলে পরিণত হয়, নচেৎ স্ত্রীফুল শুখাইয়া ঝরিয়া পড়ে। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতির স্ত্রীফুলগুলি একবারে ক্ষুদ্রফল সহ প্রস্ফুটিত হয়। ইহা কবিরাজ মহাশয় প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন। ঐ ফলকে ডিম্ব বলা যায়। যদি ঐ ফলযুক্ত বা ডিম্বযুক্ত ফুলের উপর ভ্রমর, মৌমাছি প্রভৃতিদিগকে বসিতে না দেওয়া যায়, তবে ঐ স্ত্রীফুল ডিম্বসহিত বোঁটা খসিয়া পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হয় না। যে হেতু ভ্রমরগণ পুংপুষ্প হইতে রেণু আনিয়া স্ত্রীফুলগুলিকে ফলোৎপত্তির ক্ষমতা প্রদান করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য। ডিম্ব প্রসব ও সন্তান প্রসব এক জিনিষ নহে। মেয়ে হাঁসের ডিম্ব আপনিই উহার শরীরে জন্মাইয়া আছে। যদি পুংহাঁসের সংসর্গ হয়, তবেই ঐ ডিম্ব হইতে সন্তান নির্গত হয়। নচেৎ ঐ ডিম্ব আপনা হইতে নির্গত হইয়া যায়। এবং তাহাতে আর সন্তান হয় না।

তার পর কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি নিস্‌মান প্লেফেয়ার প্রভৃতিতে কিরূপ উপদেশ আছে না আছে, তাহা জানেন না, তবে ডাক্তার-দিগের কল্পনা যে সময় সময় বিফল হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় বিজ্ঞ, তাঁহার জানা উচিত যে ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। পাঁচ ও তিন এই দুই অঙ্ক যোগ করিলে ৮ আট হয়, ইহা অঙ্কশাস্ত্রের একটী সত্য মীমাংসা কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঠিক্ ভুলিয়া দশ নামায়,তবে সে কাহার দোষ ? অঙ্কশাস্ত্রের না, ঠিক্‌দাতার ? পাবনার শাঁড়াসিগ্রামের যে ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহার সম্বন্ধেও এই কথা বলিতে পারা যায়। এমন কি সম্ভব নয় যে শাঁড়াসিগ্রামের ডাক্তর বাবু গর্ভিনী স্ত্রীলোকটীকে রীতিমত পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। তবে কি না সচরাচর ছেলের মাথা আটকাইয়া প্রসব

কার্য্যে বিলম্ব হয়, এই জন্য হয় ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার বাবু মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে সচরাচর লোকে স্ত্রীলোককে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে রাজী হয় না, সুতরাং ডাক্তারদিগকে অনেক স্থলে অনুমানে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি ডাক্তার বাবুর ভুলই স্বীকার করা যায়, তাহাতে ডাক্তারিশাস্ত্রের উপর অথবা লিস্‌ম্যান্ ও প্লেফেয়ারের উপর কোন দোষ আসিতে পারে না। কারণ শাঁড়াসীগ্রামের ডাক্তারটী ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ না হইতে পারেন। পরন্তু কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত শাঁড়াসীগ্রামের ঘটনাটী সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। মূল তর্কের সহিত উক্ত ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। অমুক কবিরাজ বা অমুক ডাক্তার একটা ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রের উপর দোষ স্পর্শিতে পারে না। আর যে অশিক্ষিত ধাত্রীর বাহাদুরীর কথা লেখা আছে, সে স্থানে এইমাত্র বক্তব্য, যে, কানা বিরালে কখনও কখনও ইন্দুর ধরিতে পারিলেও কেহ কখন কানা বিরাল দ্বারা ইদুর ধরাইতে যায় না। যদি না শিখিয়া না পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায়, তবে আর প্রসন্ন বাবুর অত পরিশ্রম করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী-বিদ্যা লিখিবার প্রয়োজন কি ?

অশিক্ষিত হাতুড়ের হাতে ভাগ্যক্রমে দুই একটা রোগ আরাম হইলেও যে হাতুড়ের হাতে প্রাণ সমর্পণ করা বিষম বিপজ্জনক, একথা কে না স্বীকার করিবেন ? আমাদের দেশীয় ধাত্রীরা কতকটা সাধারণ বুদ্ধির বশে, কখনও বা পূর্ব্ব শিক্ষার সংস্কার বশে, বা বহুদর্শনজনিত জ্ঞানবশে কখন কখন প্রসব করাইতে সমর্থ হয়। সর্ব্বনাশ ঘটায় অনেক স্থলে, কৃতকার্য্য হয় অল্প স্থলে, বর্ণিত ধাত্রী এখনকার কোন কথার বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু কৌশল ক্রমে প্রসব করাইতে পারে, একথার এইই বলা যাইতে পারে, যে চিকিৎসাবিজ্ঞান বহুদর্শন-জনিত লব্ধফল সমূহের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ধাত্রীটী যদি এই মাত্র বলে যে, আমি হাত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া এইরূপ ভাবে ছেলে ঘুরাইয়া বাহির করিলাম ; তবে তাহা অবশ্যই বিজ্ঞান-সম্মত উত্তর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের (Practical paort) এইরূপে বহুদর্শনজনিত জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। উপরোক্ত ধাত্রী অবশ্যই হাত বাহির হইলে কেমন কৌশলে ছেলে প্রসব করাইতে হয়, তাহা জানিত।

কিন্তু এই একটীমাত্র কৌশল অবগত ছিল বলিয়া সে কখনও শিক্ষিতা

ধাত্রী শব্দে বাচ্য হইতে পারে না, এবং সকল যায়গায় তাহার দ্বারা কার্য্য হয় না অথবা বিপরীত ফলও ফলিতে পারে। কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধেতে ঠিক্ ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। অল্প বয়স্ক শিশু কলম কটিতে জানিলেও তাহার হাতে ছুরিকা দেওয়া বিষম বিপদের কথা। এনাটমি অর্থাৎ ধমনী, স্নায়ু, শিরা প্রভৃতির যথাযথ সংস্থান না জানিলে অস্ত্র চিকিৎসায় ব্রতী হওয়ায় বিলক্ষণ বিপদ আছে; এই জন্যই কঠোর রাজদণ্ডের ব্যবস্থা, সভ্য সমাজে মনুষ্যের প্রাণ খেলাইবার সামগ্রী নহে। লোকে কথায় বলে "আটে কাঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়" ক্রমশঃ—

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিনবাবুর গভীর-চিন্তাপ্রসূত এপ্রবন্ধে দোষ ও গুণ দুইই বলিতে পারি। দোষের কথা এই যে, ইতি পূর্ব্বে কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধে যে উভয় স্ত্রীতে পরস্পর সংসর্গ জন্য গর্ভোৎপত্তির কথা লিখিত হয়, তাহাতে যে হাত পা আদি অঙ্গ সম্পন্ন সন্তান জন্মিবে, এমন কোন কথাই বলা হয় নাই, অর্থাৎ ইহা দ্বারা মাংসপিণ্ডের ন্যায় একটা পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে এই মাত্র। সুতরাং যদি পক্ষিগণের আর্ত্তবশোণিত দ্বারা স্পষ্ট ডিম্ব জন্মিতে পারে, তবে যে পুংসংসর্গ অভাবেও স্ত্রীজাতির আর্ত্তবশোণিত দ্বারা একটা পিণ্ডাকার পদার্থ জন্মান নিতান্ত অসম্ভব, এ কথা স্বীকার করিতে পারি কৈ? ফলকথা এ জগতে যে অসম্ভব কিছুই নাই। তাহা ডাক্তার বাবুর প্রসিদ্ধ ইংরাজ গুরুই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন যে, "বাপু হে, এজগতে এমন পদার্থই অধিক, যেখানে তোমার গর্ব্বিত বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রবেশমাত্রও করিতে পারে নাই" সুতরাং এস্থলে কেবল মাত্র এই কথা বলিয়াই আমরা ডাক্তার বাবুকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিই।

"পুলিনবাবুর ২য় কথায় অবশ্যই প্রাণ ভরিয়া সমর্থন করিতে পারি। যেহেতু অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে ধাই দৈবাৎ একটা ভালরূপ প্রসব করাইল বলিয়াই যে সে খুব্ যোগ্য, একথা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কেননা প্রাণ যায়, সেও ভাল, তথাপি কিন্তু কোন রোগের কোন অবস্থাতেই অশিক্ষিতের শরণাপন্ন হওয়া উচিত নহে। ইহাই হিন্দু চিকিৎসা-প্রণালীর চরম বিধান, সুতরাং এ চরম কথা মানিতে হইলে কোন মতেই প্রসন্ন বাবুর কথায় প্রশ্রয় দিতে সমর্থ নহি এবং সেইজন্যই ডাক্তার পুলিন বাবুর এ সকল কথায় এতদূর আনন্দিত হইয়াছি।

এত আহ্লাদেও কিন্তু পুলিন বাবুর শেষ কথাটায় আবার কথা না বলিয়াও পারিতেছি না। যেহেতু তিনি উপরে অশিক্ষিতের দোষ ঘোষণার পরেই বলিতেছেন যে, "চিকিৎসা-বিজ্ঞান বহু-দর্শন-জনিত লব্ধফল সমূহেরই সমষ্টি মাত্র।" বেশ কথা, বাস্তবিকই এ কথাটা অতি উচ্চদরের ও নিতান্ত সার এবং বড়ই পাকা কথা। অতএব যদি ইহাই ঠিক্ হয়, তবে ত সমগ্রপৃথিবীর মধ্যে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র যত অধিক প্রাচীন, যত বহুদর্শন-জন্য এই শাস্ত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ইউরোপ আমেরিকার কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই তত অধিক প্রাচীন নহে। এমন কি, চরম উন্নতি প্রাপ্ত হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিকট বর্ত্তমান উন্নতিশীল পাশ্চাত্য-চিকিৎসা শাস্ত্রকে এখন বালক বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

কথাটা শুনিয়াই হয়ত পাশ্চাত্য-প্রেমিক, আমাদিগকে উপহাস করিবেন, কিন্তু সত্যসত্যই তাহা পারিবেন না। কেন যে পারিবেন না, তাহা সম্মিলনীর কবিরাজ-ডাক্তার-সম্বাদ নামক প্রবন্ধটী ক্রমশঃ পাঠ করিলেই ঠিক্ বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে আর কোন কথা না বলিয়া সেই প্রবন্ধের উপরেই পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রার্থনা করি।

চি, স, সম্পাদক;

মূলেভুল কি প্রকারে বলি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতি বৎসর শীতকালে মেডিকেল কলেজে শবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তারগণ দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমধিক বিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন এবং সকল বিষয়েরই নির্ভুল মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইতেছেন। এই কথার সমুদায় অংশ স্বীকার

করিতে পারি না। ডাক্তারগণ রাজার সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে এক সময় তাঁহারা কবিরাজ-দিগের অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারিবেন, কেবল ইহাই স্বীকার করিতে পারি। ডাক্তারগণ মুখে যাহাই কেন না বলুন, প্রকৃতপক্ষে কবিরাজী-শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাঁহারা এখনও শরীরের মূলভিত্তি এবং রোগের প্রকৃত নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মরা মানুষ কাটিয়া শরীরস্থ যন্ত্র, অস্থি এবং শিরাগুলিরই কেবল সংখ্যা গণনা করিতে পারা যায়। তৎসমুদায় একবার দেখিলেও যাহা, প্রত্যহ দেখিলেও তাহাই থাকিবে, কিছুই পরিবর্ত্তিত হইবে না। শরীরস্থ কোন্ কোন্ পদার্থের ন্যূনাধিক্যে কোন্ যন্ত্র কোন্ সময় কি প্রকারে পরিচালিত হয় এবং তদ্দ্বারা কি প্রকার রোগেরই বা উৎপত্তি হয়? সেই রোগের বাহ্যাভ্যন্তরিক লক্ষণ এবং ভাবী ফল সম্বন্ধে ডাক্তারগণ যাহা অনুমান করেন, অনেক সময় তাহা ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কার করিতে কিছুতেই ত্রুটি করেন না। কবিরাজ অপেক্ষা তাঁহাদিগের বিজ্ঞতাই যে অধিক, তাঁহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝেন, ইহা সর্ব্বদাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্লোম রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্লোমযন্ত্র ব্যাধি প্রভাবে কিঞ্চিৎ স্ফীত, লম্বিত অথবা অধিক দূর বিস্তৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে যদি সেই মৃতদেহ ছেদন করা যায়,তাহা হইলে সেই যন্ত্রের আকৃতিরও ভাবান্তর লক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আমরা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। যোনি-সম্বরণ নামা রোগে অপত্যপথ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রোগাক্রান্তা কোন গর্ভিণীর মৃত্যু হইলে যদি সেই মৃতদেহ বিদীর্ণ করা যায়, তাহা হইলে সন্তানের মস্তক অপেক্ষা প্রসব-দ্বার অবশ্যই ছোট দেখা যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্য সত্যই যে প্রসব-দ্বার ক্ষুদ্র, তাহা কখনও বলা যাইতে পারে না। কেন না ব্যাধিপ্রভাবে যাহা সঙ্কুচিত হইয়াছে, ঔষধ দ্বারা তাহার প্রসারণীশক্তিও বৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ডাক্তারদিগের নির্ভুল মীমাংসার খণ্ডন করা যাইতে পারে। এক্ষণে আর এই সম্বন্ধে অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

যিনি সনাতন আদি পুরুষ যোগ-নিদ্রা-রূপিণী মূলপ্রকৃতি যাঁহাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টিবিস্তারের জন্য সময় সময় আবির্ভূতা হইয়া ত্রিলোকপতি মহাবিষ্ণুকে প্রসব করেন, যিনি চৈতন্য-স্বরূপ পরমব্রহ্ম, তিনিই জীব-শরীরে (মানব-দেহে) মানব কর্ত্তৃক পরমাত্মা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা কিরূপ? কেনই বা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না? তৎসমুদায় বুঝাইয়া দেওয়া আমার ন্যায় ক্ষীণবুদ্ধি ভাবগ্রহণাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, বহু পরিশ্রম করিয়াও যাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই, ভগবান্ কপিল এবং শুকদেব বহু অধ্যবসায়ের পর যাঁহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসরকাল মেডিকেল্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এবং পাঁচটী মাত্র মরা মানুষ কাটিয়া তাহার বিষয়ে কতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা আমি অবগত নহি। সে যাহা হউক, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানে তিনি নিয়ত বাস করেন। তাঁহার অভাব হইলে কাহারও চৈতন্য থাকে না। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার অভাবে যখন কাহারও চৈতন্য থাকে না, তখন নিদ্রিতাবস্থায় তিনি কোথায় থাকেন? তখন ত সকলেই অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে মহাবিষ্ণু বা বিরাট-দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই জীবদেহে জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই পঞ্চভূতাত্মক দেহে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের ফলও তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়। পরমাত্মা কখনও দেহ পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্লিপ্তভাবে সাক্ষীস্বরূপ হইয়া নিয়ত আপনার স্থানেই আপনি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। প্রকৃতিবশতঃ জীবাত্মা যখন পরমাত্মার অভিমুখ হয়, তখনই বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া লোপ হইয়া থাকে। লোকে তাহাকেই নিদ্রা কহে। জীবাত্মা যখন শরীর-ধারক পদার্থ সমূহ আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তখনই পরমাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু কহে। আবার মহাবিষ্ণু হইতে সত্বরজো তমোগুণাত্মক বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং শিবের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, তপন, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণও তাঁহাদেরই সহকারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মা-

করিতে পারি না। ডাক্তারগণ রাজার সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া যে প্রকার অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে এক সময় তাঁহারা কবিরাজ-দিগের অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে পারিবেন, কেবল ইহাই স্বীকার করিতে পারি। ডাক্তারগণ মুখে যাহাই কেন না বলুন, প্রকৃতপক্ষে কবিরাজী-শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাঁহারা এখনও শরীরের মূলভিত্তি এবং রোগের প্রকৃত নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মরা মানুষ কাটিয়া শরীরস্থ যন্ত্র, অস্থি এবং শিরাগুলিরই কেবল সংখ্যা গণনা করিতে পারা যায়। তৎসমুদায় একবার দেখিলেও যাহা, প্রত্যহ দেখিলেও তাহাই থাকিবে, কিছুই পরিবর্ত্তিত হইবে না। শরীরস্থ কোন্ কোন্ পদার্থের ন্যূনাধিক্যে কোন্ যন্ত্র কোন্ সময় কি প্রকারে পরিচালিত হয় এবং তদ্দ্বারা কি প্রকার রোগেরই বা উৎপত্তি হয়? সেই রোগের বাহ্যাভ্যন্তরিক লক্ষণ এবং ভাবী ফল সম্বন্ধে ডাক্তারগণ যাহা অনুমান করেন, অনেক সময় তাহা ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কার করিতে কিছুতেই ত্রুটি করেন না। কবিরাজ অপেক্ষা তাঁহাদিগের বিজ্ঞতাই যে অধিক, তাঁহারাই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝেন, ইহা সর্ব্বদাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্লোম রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্লোমযন্ত্র ব্যাধি প্রভাবে কিঞ্চিৎ স্ফীত, লম্বিত অথবা অধিক দূর বিস্তৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে যদি সেই মৃতদেহ ছেদন করা যায়,তাহা হইলে সেই যন্ত্রের আকৃতিরও ভাবান্তর লক্ষিত হইতে পারে। এইরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আমরা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। যোনি-সম্বরণ নামা রোগে অপত্যপথ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রোগাক্রান্তা কোন গর্ভিণীর মৃত্যু হইলে যদি সেই মৃতদেহ বিদীর্ণ করা যায়, তাহা হইলে সন্তানের মস্তক অপেক্ষা প্রসব-দ্বার অবশ্যই ছোট দেখা যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্য সত্যই যে প্রসব-দ্বার ক্ষুদ্র, তাহা কখনও বলা যাইতে পারে না। কেন না ব্যাধিপ্রভাবে যাহা সঙ্কুচিত হইয়াছে, ঔষধ দ্বারা তাহার প্রসারণীশক্তিও বৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ আরও শত সহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ডাক্তারদিগের নির্ভুল মীমাংসার খণ্ডন করা যাইতে পারে। এক্ষণে আর এই সম্বন্ধে অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

যিনি সনাতন আদি পুরুষ যোগ-নিদ্রা-রূপিণী মূলপ্রকৃতি যাঁহাকে সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টিবিস্তারের জন্য সময় সময় আবির্ভূতা হইয়া ত্রিলোকপতি মহাবিষ্ণুকে প্রসব করেন, যিনি চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম, তিনিই জীব-শরীরে (মানব-দেহে) মানব কর্ত্তৃক পরমাত্মা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা কিরূপ? কেনই বা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না? তৎসমুদায় বুঝাইয়া দেওয়া আমার ন্যায় ক্ষীণবুদ্ধি ভাবগ্রহণাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, বহু পরিশ্রম করিয়াও যাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই, ভগবান্ কপিল এবং শুকদেব বহু অধ্যবসায়ের পর যাঁহার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসরকাল মেডিকেল্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এবং পাঁচটী মাত্র মরা মানুষ কাটিয়া তাহার বিষয়ে কতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা আমি অবগত নহি। সে যাহা হউক, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানে তিনি নিয়ত বাস করেন। তাঁহার অভাব হইলে কাহারও চৈতন্য থাকে না। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার অভাবে যখন কাহারও চৈতন্য থাকে না, তখন নিদ্রিতাবস্থায় তিনি কোথায় থাকেন? তখন ত সকলেই অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে মহাবিষ্ণু বা বিরাট-দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই জীবদেহে জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনিই পঞ্চভূতাত্মক দেহে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের ফলও তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়। পরমাত্মা কখনও দেহ পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্লিপ্তভাবে সাক্ষীস্বরূপ হইয়া নিয়ত আপনার স্থানেই আপনি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। প্রকৃতিবশতঃ জীবাত্মা যখন পরমাত্মার অভিমুখ হয়, তখনই বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া লোপ হইয়া থাকে। লোকে তাহাকেই নিদ্রা কহে। জীবাত্মা যখন শরীর-ধারক পদার্থ সমূহ আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তখনই পরমাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু কহে। আবার মহাবিষ্ণু হইতে সত্বরজো তমোগুণাত্মক বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং শিবের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, তপন, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণও তাঁহাদেরই সহকারী রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মা-

ণ্ডের শোষণ ,পোষণ, বিস্তারণ এবং সঙ্কোচন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবই যে জীব দেহে বায়ু, পিত্ত, কফ নামে পরিচিত, তাহাই ধাতুব্যাখা নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। শরীরস্থ কোন্ কোন্ পদার্থকে ইন্দ্রাদি দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাঁহাদের কার্য্যই বা কি রূপ? তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। বুদ্ধি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের অধিপতিকে ইন্দ্র কহে। ইন্দ্র সকল বস্তুকেই আমার বলিয়া ভ্রম জন্মায়, এইজন্য শরীর-তত্ত্বতে পণ্ডিতগণ তাহাকে অহঙ্কার নামে নির্দ্দেশ করেন। যে চন্দ্র, নক্ষত্র মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া জগতের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে, সেই চন্দ্রই সোম নামে অভিহিত হইয়া জীবদিগের মস্তকে অবস্থিতি করে। তাহাতে মস্তিষ্ক এবং সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ থাকে। যে বরুণ জলাধিপতি হইয়া ভূমণ্ডলের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করে, সেই বরুণ দেবই শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা শরীরের সজীবতা সম্পাদন করে। যে মার্ত্তণ্ডদেব (তপন) সর্ব্বোচ্চ-স্থানে আসন করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করেন, তিনিই আবার শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া জীবদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। প্রজাপতি দ্বারা কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বত যেমন জগতের মূলভিত্তি, নদী সমূহ যেমন ভূখণ্ডের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিনী, তেমনি ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য দেহমধ্যেও পর্ব্বত এবং নদী সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটী নামে তাহাদিগকে কখনও নির্দ্দেশ করা যায় না। দৈহিক পর্ব্বতকে অস্থি এবং নদীকে শিরা কহে। কার্য্যতায় তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এরূপ বলা যায়। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ধাতুত্রয় ও বিষ্ণু প্রভৃতির নামান্তর মাত্র। কিন্তু বায়ু পিত্ত কফ না বলিয়া যদি ঐ তিনটী নামোল্লেখ করা যায়,তাহা হইলে কেহই তাহাদিগকে শরীরের উপাদান বলিয়া জানিতে পারেন না। এই সকল বিষয়ে সুন্দর রূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে আত্মজ্ঞানী হওয়া যায়। যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনিই সংসারে ধন্য। মহাবিষ্ণু হইতে সমস্তই তিনি নখ-দর্পণে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে পারেন। এই যে উপরে যে সকল পদার্থের নামোল্লেখ করা হইল, ইহার মধ্যে সমস্ত গুলিই শরীরের পক্ষে একান্ত উপযোগী। যদি ইহারা সর্ব্বদা সমভাবে থাকে, তবেই শরীর সুস্থ এবং ন্যূনাধিক্য হইলে রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে হয়। কাহাকেও নষ্ট করা যায় না।

যাহা শরীরের প্রধান অবলম্বন, যাহা না হইলে দেহ কখনও সজীব থাকিতে পারে না, তাহা বিনষ্ট করা কখনও বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না। শরীরাভ্যন্তরে যে বায়ু পিত্ত কফ আছে, তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অংশানুঅংশ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, আবার মহাবিষ্ণুর অংশ। অংশের বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিলে সমস্তের বিষয়ও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্তের নামোল্লেখ করিলে অংশ অথবা অংশের কথা বলিলে কখনও সমস্ত বুঝায় না। যিনি অংশানুঅংশ অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু পিত্ত কফের বিনাশ বাসনায় তৈল ঔষধের নামোল্লেখ করিতে পারেন, তিনি হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু অথবা রাবণ কুম্ভকর্ণের ন্যায় সমস্তেরও (অর্থাৎ মহাবিষ্ণুরও) বিনাশ করিতে পারেন। বিষ্ণু বলিলে কখনও শরীরস্থ বায়ু বুঝায় না, তদ্দ্বারা বহিঃস্থ জাগতিক বায়ু বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বিষ্ণুনাশক তৈল এবং ব্রহ্মা নাশক ঔষধ কখনই হইতে পারে না। বায়ু প্রশমক তৈল, পিত্ত প্রশমক ঔষধ ইহাই আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত বাক্য। সকল দেশীয় সকল জাতীয় প্রাণীর শরীরই একই উপকরণে সংগঠিত। তৎসমুদায় সাম্যভাবে থাকিয়া আপন আপন কার্য্য যথা সময় সুসম্পন্ন করিলে সকলেরই শরীর সুস্থ এবং বিষমভাবাপন্ন হইয়া যদি কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সকলেরই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং চিকিৎসাবিষয়ে সকলের পক্ষেই একই নিয়ম। যে যে উপকরণে শরীর সংগঠিত, যাহাতে সর্ব্বদা শরীরের সজীবতা সম্পাদিত হয়, ইতর প্রাণীগণ তাহা কখনও জানিতে পারে না। তাই বলিয়া তাহাদিগের শরীরে তৎসমুদয় নাই, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। অধুনা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আত্মতত্ত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক সময় হিন্দুগণ এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া যে সমুদায় সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা হতভাগ্য বলিয়া তৎসমুদায় ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছি এবং তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহও বদ্ধ-মূল হইতেছে।

ক্রমশঃ—

দীনাবাজার
জলপাইগুড়ি } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত প্রথম অংশের কথাগুলি সম্পূর্ণই যুক্তি-যুক্ত ও সারগর্ভ বলিয়া সমর্থন করিতে পারি। তবে তাঁহার দ্বিতীয় অংশের লিখিত বাক্যের কোন রূপ সমালোচনা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। কেননা আত্মা-পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞানে যে আমরা এক-বারেই অজ্ঞ। সুতরাং "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" ইতি বাক্যে এস্থলে আমাদিগকে একবারেই চুপ্ করিতে হইল। চি, স, সম্পাদক।

ভুল মূলে নয়, তবে শাখাপ্রশাখায় বটে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাক্তার কর সাহেবের

যেমন গুরু তেমনি শিষ্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর L. R. C. P. London সাহেব; কলি-কাতার সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের সহিত একত্রে কথোপকথনচ্ছলে "কবিরাজ-ডাক্তার-সংবাদ" নামক যে একখানি অতিগভীর-গবেষণা-পূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন, সে পরিচয় সম্মিলনীর পাঠকগণ ইত্যগ্রেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেহেতু উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা ইতি পূর্ব্বে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও উদ্ধৃত করিব বলিয়া প্রস্তুত আছি। সুতরাং উক্ত গ্রন্থসম্বন্ধে আপাততঃ আর কিছুই বলিবার নাই। তবে আজ্ কিঞ্চিৎ বলিব ডাক্তার করসাহেবের সম্বন্ধে।

তিনি উক্ত গ্রন্থে চরকের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এ হতভাগ্য দেশের যেমন গুরু তেমনি শিষ্য" অর্থাৎ বর্ত্তমান হতভাগ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীয় গুরুগণ (ঋষিগণ) যেমন হতভাগার একশেষ ছিলেন, আমাদের ন্যায় বর্ত্তমান শিষ্যগণও তেমনি তারেবাড়া হতভাগা

অথবা আমরা যেমন হতভাগা শিষ্য, গুরুগণও (ঋষিগণও) তেমনি হতভাগা ছিলেন। ডাক্তার কর সাহেবের একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভারত-বর্ষের বৈদ্যগণ কেন ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা না করেন? আর তাঁহার বিশ্বাস যে, যদিও ভারতীয় কোন কোন বৈদ্যের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাও আবার সেকেলে হতভাগ্য অপদার্থ গুরু (ঋষি) বাক্যেই লোপ পায়। তাই তিনি চরকের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, "যদি বা কাহারও ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্তি হয়, তাহাও আবার গুরুর বচনেই লোপ পায়। শুনিয়াছি চরক বলেন;——

"চিকিৎসিতং বহ্নিবেশ! স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নাস্তীহ ন তৎ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ—"হে অগ্নিবেশ! সুস্থ বা রুগ্নব্যক্তির হিতকর চিকিৎসা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যাহা আছে, অন্যত্রও তাই। এই গ্রন্থে যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই।"

এই বলিয়া কর সাহেব, সনাতন অভ্রান্ত ও ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবাক্যে প্রভূত দোষারোপ করিয়া তাঁহার শিক্ষাগুরু ইয়ুরোপীয়গণকে স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করাইয়াছেন! যাহা হউক, তাঁহার এইরূপ উক্তিতে আমরা কয়েকটী কথা বলিতে চাহি। ১ম, কথা তিনি যে এই অধঃ-পাতের চরম সীমায় উপনীত আমাদের ন্যায় সত্যসত্যই হতভাগ্য শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া দুই চারি কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতু অধঃপতনের সময় যিনি দোষ দেখাইয়া ২।৪ টা কথা বুঝাইয়া বলেন, তিনি প্রকৃতই বন্ধুপদ-বাচ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাকে পরমো-পকারী বন্ধু বলিয়াই মানিয়া লইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি দেশীয় বৈদ্যসম্প্রদায়কে ডাক্তারী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন কিরূপ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া?

কবিরাজেরা ডাক্তারী পড়িলে তাহাতে তাঁহাদের যে জাতি বা মান যাইবে, অথবা ধর্ম্মহানি হইবে, সে কথা কিন্তু বলিতেছি না, তবে বলিতেছি যে, যাহার নিজের ঘরে মুষ্টিমাত্র চাউলের অভাবে নিজেরই প্রাণ লইয়া

টানাটানি,সে ব্যক্তি আবার অন্য লোককে অন্নদান করিবে কিরূপে ? ফলতঃ যে ব্যক্তি নিজগৃহের কোন খবরই রাখেন না,তাঁহার পক্ষে অপর গৃহের খবর লইতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনার বিষয়, ডাক্তার কর সাহেবের মতে দেশীয় চিকিৎসকগণের পক্ষে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসার খবর লইতে যাওয়াও কি ঠিক্ তথৈবচ নয় ? যেহেতু তিনি কি জানেন না যে, দেশীয় চিকিৎসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রের ধার খুব্ কমই ধারেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সে অস্ত্র চিকিৎসা আর প্রচলিত নাই,শারীরতত্ত্বে তাঁহারা এক বারেই নিরক্ষর,শবচ্ছেদসম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই ; আর ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেকটা অন্ধকারময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোটকথা শাস্ত্র-সঙ্গত কিছুই নাই বলিলেই চলে। তবে থাকিবার মধ্যে কেবল দোকানদারী গোচের ব্যবসাদারীটারই কিঞ্চিৎ চলন আছে এই মাত্র। সুতরাং যাঁহারা নিজেদের কি অস্ত্রশস্ত্র-জ্ঞান, কি শারীর-জ্ঞান অথবা কি ভৈষজ্য-জ্ঞান প্রভৃতি চিকিৎ-সাঙ্গের সর্ব্বপ্রকারজ্ঞানে একবারেই অজ্ঞান ; এইরূপ সর্ব্বজ্ঞান-বর্জ্জিত কবিরাজ মহাশয়দিগের সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ শাস্ত্রের খবরটা ভাল করিয়া লইয়া তদনুসারে চলাই শ্রেয়ঃ ; কি নিজের ঘরখানি অন্ধকার রাখিয়া নিজে ঘোরতর অন্ধকারে থাকিয়া সর্ব্বাগ্রে ইয়ুরোপীয় আলোকে আলোকিত হওয়াই উচিত, "এ কথার যথার্থ সদুত্তর কর সাহেব দিতে পারেন কি ?

তাঁহার ২য়, কথা হতভাগ্য গুরু (ঋষি) গণের সম্বন্ধে। যদিও সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার সাহেবের মুখের মত প্রকৃত সদুত্তর দিয়াছেন, যদিও কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়া আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব সকল অতি সুন্দররূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন, তথাপি আমাদের কিন্তু তাহাতে আশা মিটেনাই, সুতরাং আমরাও তাঁহার এই অতি অসঙ্গত বাক্যে কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। কিন্তু এবারেও আমাদের স্থানাভাব ; সুতরাং আগামী বারে ডাক্তার কর সাহেবের কথার যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

অবলা-বান্ধব।

চতুর্থ অধ্যায়—রক্তগুল্ম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জয়া। প্রিয়ভগ্নি! কয়েক মাস হইল একটা নূতন ঘটনা দেখিয়া মন বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা ইতি পূর্ব্বে কখনও নয়ন-গোচর হয় নাই।

বিজয়া। ঘটনাটীর কথা কি স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইব না ?

জয়া। ভাই বলিবার জন্যই আজ তোমার নিকট আসিয়াছি এবং স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। ইতি মধ্যে কোন ভদ্র মহিলার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছিল। হতভাগিনী অচিরে পুত্র-মুখ দর্শন করিবে বলিয়া প্রথমতঃ কতই আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সাতমাস অতিবাহিত হইল এবং একে একে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ হইয়া পড়িল। পঞ্চামৃত ও সাধভক্ষণ প্রভৃতি মেয়েলোক-দিগের যে সমস্ত আমোদ আহ্লাদের পর্ব্বাহ ছিল, তাহাও যথাসময় সম্পন্ন হইয়া গেল এবং প্রসবের জন্য অবশেষে একখান কুঁড়ে ঘরও নির্ম্মাণ করা হইল। কিন্তু বিধাতার কি অদ্ভুত খেলা! পরিশেষে এই সকল আমোদ আহ্লাদের কিছুই কার্য্যে পরিণত হইল না। কেবল সাধভক্ষণ আর কুঁড়ে নির্ম্মাণই সার হইল। যখন দশম মাস অতীত হইলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না, তখন গর্ভিণী ও তাহার পরিবারস্থ সকলেই সাতিশয় চিন্তিত ও বিস্ময়া-বিষ্ট হইতে লাগিল ; পরে দ্বাদশমাস উপস্থিত হইলে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল এবং সেই সময় গর্ভিণী আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই কৌতুকাবহ ঐন্দ্রজালিক গর্ভের বিষয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহা কি কোন ব্যারাম, না প্রকৃতই গর্ভ ?

বিজয়া। প্রিয়সখি! আজ ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিও

তোমাকে এই ঐন্দ্রজালিক গর্ভের কথা এক দিন বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। একবার ভাবিয়া দেখ, এই বিশাল জগতে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টী বিস্ময়জনক নহে? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জগতের প্রত্যেক কার্য্যই ঐন্দ্রজালিক ভেল্কী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জলের মধ্যে যেমন সহসা বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া ক্ষণকাল পরেই আবার তাহা জলের সহিত মিশিয়া যায়, তেমনি জরায়ুস্থ আকাশ মধ্যেও ক্রমশঃ গর্ভ প্রকাশ পাইয়া কিছু দিন পরে তাহা আবার শরীরস্থ আকাশে মিশিয়া যাইতে পারে। ইহা অসম্ভব নয়। এক্ষণে গর্ভ অন্তর্হিত হইবার কারণ বলা যাইতেছে। জরায়ু-কোষস্থিত শুক্রশোণিত ক্রমশঃ ঘণীভূত হইয়া গর্ভোৎপাদন করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যদি সন্তানের অঙ্গাদি সংগঠিত হইবার পরে কোন কারণ বশতঃ গর্ভিণীর শরীরস্থ বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠে, তাহা লইলে সেই বায়ু কুপিত হইবার পর হইতে গর্ভের কোন কোন লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায়। অর্থাৎ ছয় বা সাত মাস পর্য্যন্ত গর্ভ নিয়মিতরূপে বিবৃদ্ধ হইয়া পরে ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কখনও নির্দ্ধারিত সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। ঔষধ দ্বারা গর্ভ পরিপুষ্ট না করিলে অথবা গর্ভিণী আপনা হইতে অজ্ঞাতসারে কোনপ্রকার বৃংহণ বস্তু (গর্ভপুষ্টিকর বস্তু) সেবন না করিলে কখনও সন্তান প্রসূত হয় না। সময় সময় সন্তানকে চতুর্দ্দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। আবার গর্ভসঞ্চার হইবার পর তিন চারিমাস মধ্যে যদি শুক্র শোণিত বায়ুদ্বারা সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সহসা বিশুষ্ক (কঠিন) হয়, তাহা হইলে কখনও সন্তানের অঙ্গাদি সংগঠন অথবা জীবসঞ্চার হইতে পারে না। কেবল স্বভাবসিদ্ধ শক্তিপ্রভাবে গর্ভ ক্রমশঃ পিণ্ডাকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাতে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়, পরিশেষে শারীরিক উষ্ণতা এবং বায়ুর ভাবান্তর বশতঃ সহসা সেই পিণ্ড (ঘনীভূত শুক্রশোণিত) তরল হইলে গর্ভ অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তখন গর্ভিণী আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত ঐন্দ্রজালিক গর্ভ। এতদ্ভিন্ন আরও এক প্রকার গর্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। এই প্রকার গর্ভ অধিক স্থূল হয় না এবং লঘুভাবে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। কদাচিৎ ইহার স্পন্দন অনুভূত হয়। মধ্যম বল কুটিল বায়ু দ্বারাই এরূপ

ঘটনা হইয়া থাকে। এই যে তিন প্রকার গর্ভের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত গর্ভ ভিন্ন শেষোক্ত দুই প্রকার গর্ভ হইতে কখনও সন্তান প্রসব হয় না। প্রথমোক্ত গর্ভ হইতেও বহু বিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। আবার রক্তগুল্ম নামে আরও এক প্রকার পীড়া আছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ গর্ভ লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।

জয়া। এই যে কহিলে "ঔষধ প্রয়োগ না করিলে অথবা গর্ভিণী আপনা হইতে কোন প্রকার গর্ভ পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে প্রথমোক্ত গর্ভ হইতে কখনও সন্তান প্রসূত হয় না," এক্ষণে সেই ঔষধের কথা এবং শেষোক্ত দুই প্রকার গর্ভের প্রতীকারের উপায় শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। বায়ু দ্বারা গর্ভ ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে থাকিলে সদ্য আনূপ মাংসের যূষ প্রস্তুত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে। ঈদৃশ অবস্থায় হংসাদির মাংস একান্ত উপযোগী। গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু এবং চিনির সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ পান করিলে গর্ভ পরিপুষ্ট হয়। উদুখলে ধান্যাদি কুট্টিত করিলে শেষোক্ত দুই প্রকারের গর্ভ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং গর্ভিণীও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জয়া। আবার যে রক্তগুল্মের কথা কহিলে তাহাই বা কিরূপ?

বিজয়া। সে কথাও তোমাকে কহিতেছি। মেয়েলোকদিগের ঋতু সময়ে অপত্য-পথ হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে আর্ত্তব কহে। কুপিত বায়ু দ্বারা সেই আর্ত্তব ক্রমশঃ সংগৃহীত হইয়া যদি পিণ্ডকার ধারণ করে এবং গর্ভের ন্যায় মাসে মাসে পরিবর্দ্ধিত হয়, তবে তাহাকেই আর্ত্তবজাত বা রক্তগুল্ম কহে। এতদ্ভিন্ন আরও পাঁচ প্রকার গুল্মরোগ আছে, তাহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই হইতে পারে। কিন্তু এই পীড়া কেবল মেয়েলোকদিগেরই হইয়া থাকে।

জয়া। কোন্ সময় কেমন করিয়া এই রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা বিশেষ রূপে না বলিলে আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

বিজয়া। প্রসবের পর, অসম্পন্ন গর্ভ নির্গত হইবার পর এবং ঋতু সময়ে বায়ু-প্রকোপক আহার বিহার করিলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। বাধকের পীড়া অর্থাৎ যোনিদোষ বিদ্যমান থাকিলেও এই পীড়া জন্মিতে পারে। কোন সময় কোন রূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত না হয়, এই জন্যই পণ্ডিতগণ

পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া আহার বিহার করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ আহার বিহার করিবার নিয়ম আছে। প্রসবান্তে প্রসূতির পক্ষে যাহা একান্ত হিতকর, তাহা ধাত্রীবিদ্যায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে ঋতু সময়ের কথা বলা যাইতেছে। ঋতুকাল উপস্থিত হইলে মেয়েলোকদিগকে কখনও অধিক পরিশ্রম বা রাত্রীজাগরণ করিতে দিবে না। অতিরিক্ত রৌদ্র বা অগ্নিসন্তাপ দ্বারা ও বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। ঋতুবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীর সর্ব্বদা অশুচি থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কোন পুরুষের সমক্ষে উপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। অথবা তাহাদিগের দ্বারা কোন আহারীয় বস্তু প্রস্তুত করাও নিতান্ত অনুচিত। ঋতু সময়ে স্ত্রীলোকগণ কেবল স্নেহসংযুক্ত পেয়া বা অন্ন সেবন করিয়া ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় পুরুষোত্তম বিষ্ণু মূর্ত্তিই মনে মনে ধ্যান করিবে। কিন্তু রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে স্বয়ং কোন ক্রিয়ার অনুসন্ধান করিবে না।

জয়া। আচ্ছা, রক্তগুল্ম হইলে কেমন করিয়া তাহা জানা যাইতে পারে? এবং এই রোগের লক্ষণই বা কি?

বিজয়া। পীড়া উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ গর্ভাশয়ে চিমি চিমি বেদনা ও দাহ হয়। তাহার পর সঞ্চিত আর্ত্তব ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে। প্রকৃত গর্ভ হইলে, একমাস বা দেড়মাস পরে গর্ভিণী যেমন সর্ব্বদাই অসুখে থাকে অর্থাৎ আলস্য, তন্দ্রা, বমন এবং বমনোদ্রেক দ্বারা মুহুর্মুহু আক্রান্ত হয়, ইহাতেও ঠিক্ সেই সময় ঐ সকল লক্ষণ দ্বারাই রোগিণী সর্ব্বদা নিপীড়িতা হয়। গর্ভাবস্থায় রমণীদিগের যে সময় যে প্রকার আহারীয় বস্তুতে অভিলাষ হয়, ইহাতেও ঠিক্ সেই সময় সেই প্রকার বস্তুর জন্যই মন-ব্যগ্র হইয়া পড়ে। গর্ভ হইলে যেমন সকলেরই ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এই পীড়াতেও সেই প্রকার কাহারও ঋতুকালে রক্তস্রাব হয় না। কিন্তু সেই রক্ত জরায়ুস্থ পিণ্ডের সহিত সংলগ্ন হইয়া পিণ্ডকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। তাহাতে গর্ভের ন্যায় তলপেট মাসে মাসে স্ফীত হইয়া উঠে। পরিশেষে আর্ত্তব আরও ঊর্দ্ধগামী হইলে স্তনদ্বয় আয়ত হইয়া পড়ে। সেই সময় স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পীতবর্ণ ধারণ করে।

জয়া। এই যে তুমি যে সকল কথা কহিলে, ইহাও অবিকল গর্ভ লক্ষণ।

তবে গর্ভ হইল কি গুল্ম হইল, তাহা জানিবার ত কোনও উপায় দেখিতেছি না?

বিজয়া। তাহাও বিলক্ষণ আছে। প্রকৃত গর্ভ হইলে তন্মধ্যস্থিত সন্তান যখন অঙ্গ সঞ্চালন করে, তখন সন্তানের হস্ত পদাদির আঘাত বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সময় যে গর্ভ স্পন্দিত হয়, তাহাতে উদর মধ্যে অধিক বেদনা হয় না। গুল্মরোগে গর্ভাশয় অনেক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করে। যখন পিণ্ডটী বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হয় তখন সমুদায় গর্ভাশয় একবারে আলোড়িত হইয়া পড়ে এবং তীব্র বেদনায় রোগীণী সাতিশয় নিপীড়িতা হয়। ইহাতেই প্রকৃত গর্ভ কি গুল্মরোগ তাহা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চারি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যে কিছুই নির্ব্বাচন করা যায় না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

জয়া। এক্ষণে এই রোগের চিকিৎসার বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। ইহা নিতান্ত কষ্টসাধ্য পীড়া। এই পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে সাতিশয় চিন্তশীলতার পরিচয় দিতে হয়। বিশেষতঃ রোগীণী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তাহা হইলে কখনও উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না। পণ্ডিতগণ দশমাস অতীত করিয়া এই রোগের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কেন না প্রকৃত গর্ভ হইলে যে সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময় অতীত হইলে পীড়া অপেক্ষাকৃত সুখ-সাধ্য হয়। সুতরাং তখন যাহা কিছু প্রয়োগ করা যায়, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে প্রকৃত গর্ভ হইল কি গুল্ম হইল, তাহা নিশ্চয়-রূপে মীমাংসা করার জন্যই দশমাস অতীত করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। কেন না গর্ভ ও গুল্ম-রোগে যে ভাবে উদর স্পন্দিত হইয়া থাকে, তাহাতেই উহা মীমাংসা হইতে পারে। গুল্মরোগে কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন হইলে এরণ্ড তৈল, হরীতকীচূর্ণ এবং গব্যদুগ্ধ একত্রে সেবন করা কর্ত্তব্য। গুল্মস্থানে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। শলুফা, ডহরকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, ভামোটের ছাল এবং পিপুল সমভাগে পেষণ করিয়া কৃষ্ণতিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম নষ্ট হয়। প্রত্যহ আমলকীর রস সহ মরিচ চূর্ণ অথবা মধুর সহিত কমলাগুঁড়ী চূর্ণ সেবন

করিলে এপীড়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পিপুল, মরিচ, শুঁঠ এবং ভামোট (ভার্গী) সমভাগে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও কৃষ্ণতিলের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব হইয়া গুল্মরোগ উপশমিত হয়। যবক্ষার, পিপুল, মরিচ এবং শুঁট সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত সেবন করিলেও রক্তস্রাব হইয়া দোষের শান্তি হয়। এক ছটাক পলাশের ক্ষার এক পোয়া জলের সহিত গুলিয়া এক ছটাক গব্য ঘৃতের সহিত পাক করিবে। ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তস্রাব হইয়া বহু যন্ত্রণাপ্রদ অতি প্রবৃদ্ধ রক্তগুল্মও উপশমিত হয়। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়ায় রোগীণী একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রক্তপিত্ত বা রক্তাতীসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। রাধাপদ্ম ফুলের মূল ৪।৫ টা গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে রক্তগুল্ম পীড়ায় একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টফল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁট, বচ, তেউড়ীমূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত মুলতানী হিঙ্গু ৬ তোলা, যবক্ষার ও অম্লবেতস প্রত্যেক ৪ তোলা, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মরিচ এবং ধনিয়া প্রত্যেকে ॥ তোলা। এই সকল দ্রব্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ ও বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। পরিশেষে উপরোক্ত পরিমাণে প্রত্যেক দ্রব্য ওজন করিয়া জলের সহিত মাড়িয়া ॥ তোলা মাত্রায় এক একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ একবেলা অথবা প্রয়োজন হইলে দুইবেলাই কিঞ্চিৎ গরম জলের সহিত গুলিয়া ইহার একটী করিয়া বটী সেবন করিলে অতিকঠিন রক্তগুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, হৃল্লাস এবং শোথ উপশমিত হইয়া অচিরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সপ্তাহ মাত্র সেবন করিলেই তদ্দ্বারা সবিশেষ ফল হয়। পরিশেষে আবশ্যকানুসারে আরও এক বা দুই সপ্তাহ সেবন করিতে হয়।

জয়া। আচ্ছা, গুল্মরোগাক্রান্ত মেয়েলোকদিগকে কি প্রকার বস্তু আহার করিতে দেওয়া যায়?

বিজয়া। শুষ্কমাংস, মৎস্য, মূলা, শুষ্কশাক এবং সকল প্রকার দাইল গুল্মরোগের পক্ষে নিতান্ত অপকারী। সুতরাং এই সকল বস্তু ভিন্ন আর

সকলই আহার করিতে দেওয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মাষকলায় এবং কুলত্থ কলায় আহার করিলেও গুল্মরোগের অপকার হয় না।

জয়া। এক্ষণে অসাধ্য গুল্মরোগের কথাও শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিজয়া। যে গুল্মরোগে রোগীণীর জ্বর, শ্বাস, বমি, অতিসার, অরুচি, পিপাসা, তন্দ্রা এবং প্রতিশ্যায় প্রভৃতি লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হয়, অথবা সেই সঙ্গে যদি হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কখনও জীবনের আশা করা যায় না। যে গুল্ম সহসা অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় অবিরত রক্তস্রাব হওয়ায় শ্বাস, শূল, অন্নবিদ্বেষ ও শরীরের দুর্ব্বলতা দ্বারা রোগীণী একবারে অবসন্ন হইয়া যায়, তাহাকেও প্রায় বাঁচিতে দেখা যায় না।

ক্রমশঃ

জলপাইগুড়ী, দীনবাজার। } শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কি ডাক্তার, কি কবিরাজ অথবা সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই এ প্রবন্ধের উপকারিতা ও উপযোগিতার বিষয় আমরা শতমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারি না। এমন কি, ইহার প্রত্যেক কথাই সম্পূর্ণ সত্য ও সারবত্তাপূর্ণ।

চি, স, সম্পাদক।

তোকমারী।

এই আশ্চর্য্য গুণযুক্ত বীজের কার্য্যসমূহ অতি অল্প লোকেই জানেন। সর্ব্বসাধারণে ইহার ক্রিয়ার বিষয় বিশেষ রকম অবগত হইলে এই দ্রব্য একটী বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যদিও মুসলমান চিকিৎসকগণ ইহার তথ্য পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন, তথাচ প্রদাহে ও শঠিত ক্ষতে ইহার বেদনানিবারক এবং ক্ষতারোগ্যকারক ক্ষমতা অতি অল্পদিনই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার এই ক্রিয়া পরমেশ্বরের অপার দয়ার পরিচায়ক। আমরা তোকমারীর এই ক্রিয়া একটী দেশীয় উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে

অবগত হইয়াছি। প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, একটি রোগী পায়ের শঠিত ক্ষত চিকিৎসার জন্য শ্রীযুক্ত মৌলভী জহিরুদ্দিন আহমদ ডাক্তার সাহেবের নিকট আইসে, প্রচলিত মতের সকল উপায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বিত হয় কিন্তু কোন ঔষধেই উপকার না হওয়ায় পরিশেষে ঐ স্ত্রীলোকটী আসিয়া তোকমারীর পুল্‌টিশ প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেয়, তোকমারীর পুল্‌টিশ প্রয়োগ করায় অতি অল্প সময় মধ্যেই বেদনা আরোগ্য এবং ক্ষতের শঠিত অংশসমূহ (Slough) পৃথক্ হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইয়াছিল। তদবধি হস্পিটালে এবং বাহিরের চিকিৎসায় তোকমারী স্নিগ্ধকারক পুল্‌টিশরূপে অত্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে।

তোকমারী ঔষধি জাতীয় গাছের বীজ; পাঞ্জাব প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং সমতল ভূমিতে জন্মে। বিহারেও ইহার চাষ হয়, এমত শুনিয়াছি কিন্তু এবিষয়ে আমি বিশ্বাস যোগ্য সংবাদ পাই নাই। জেস্থ (Jusieu) প্রভৃতি উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ মহোদয়গণ ইহাকে লেবিয়েটি (Labiatæ) উপশ্রেণীভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তোকমারী ফুলের যে সমস্ত পাপড়ী হয়, তাহা ওষ্ঠের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ল্যাবেণ্ডার, মিণ্ট সেজ এবং হাঙ্গেরী ওয়াটার, ফ্রেঞ্চ, ভিনিগার ও ইউডিকলোন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আবশ্যক হয়, তৎসমস্তই এই শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্বে এই গাছ ড্রাকোকেফালম (Dracocephalum) শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন কিন্তু ল্যালোমেনসিয়া (Lallemantia) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তোকমারী গাছের বর্ত্তমান উদ্ভিদ্য (Botanical) নাম ল্যালেমেনসিয়া রয়লিয়ানা (Royleana); ইহার পারস্য নাম তোকবলঙ্গার অপভ্রংশে তোকমারী হইয়াছে। তোকমারীর সংস্কৃত কোন নামও নাই এবং সংস্কৃত কোন চিকিৎসা গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তায়েফ-শরিফ প্রভৃতি হাকিমী গ্রন্থে এই ঔষধের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, মুসলমান রাজত্বের উন্নতাবস্থার সময় হইতে এই বীজের ব্যবহার সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমান সম্রাটগণ ইহার স্নিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

তোকমারী জলে ভিজিলে স্ফীত এবং লাল্‌সে হইয়া উঠে। এই অবস্থায় মুসলমানগণ ইহা সরবতরূপে ব্যবহার করেন। তাঁহারা গ্রীষ্মকালে তোকমারী

সরবত বিশেষ স্নিগ্ধকারক বলিয়া জ্ঞান করেন। কখন কখন ঐ সরবত পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া জল মিশ্রিত করতঃ পান করা হইয়া থাকে, ইহাতে বীজ পৃথক হইয়া কেবল লাল্‌সে পদার্থই (Jelly) উদরস্থ হয়। তোকমারীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া—শ্বাসযন্ত্র, অন্ত্র এবং মূত্রাশয়স্থ শৈষ্মিক ঝিল্লির অবসাদক। মূত্রোৎপাদক গ্রন্থিস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলী সমূহের কোষ সমুদায় (Tubuli uriniferii) উত্তেজিত হইয়া মূত্রোৎপাদন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। এতদ্ব্যতীত অল্প পরিমাণ সঙ্কোচকক্রিয়াও আছে। দেশীয় চিকিৎসকগণ কাস, সর্দ্দি, উদরাময়, আমাশয় এবং মূত্রনালীর পীড়াসমূহে ব্যবহার করেন। হৃৎবেপন ও প্রসবান্তে বেদনার উপশম করে।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং সাধারণের মধ্যে তোকমারীর বাহ্য প্রয়োগের ফল প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাহ্য প্রয়োগের জন্য পুলটিশ-রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক খণ্ড বস্ত্রের উপর সিক্ত তোকমারী বিস্তৃত করিয়া দিলেই ইহার পুলটিশ প্রস্তুত হয়। এই উষ্ণদেশেও তিসি এবং রুটী প্রভৃতির পুলটিশের ন্যায় এই পুলটিশ ১২ ঘণ্টার মধ্যে পচিয়া যায় না। সুতরাং ঐ সময় মধ্যে পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন। অক্ষত স্থানাপেক্ষা ক্ষত এবং প্রদাহযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই স্নিগ্ধকারক ক্রিয়া প্রকাশ করে। স্ফোটক, বিস্ফোটক এবং বেদনাবিশিষ্ট স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে স্নিগ্ধকারক হইয়া উপকার সাধন করে। স্ফীততা অন্তর্হিত হয়, স্ফোটক মধ্যস্থ পূয় বহির্গত হওয়ার সহায়তা করে। মুখমণ্ডল, বিটপী প্রদেশ এবং অন্যান্য যে সকল কোমল স্থানে অস্ত্রোপচার করিতে রোগী শঙ্কাযুক্ত হয়, তদ্রূপ স্থলে তোকমারীর পুলটিশ প্রয়োগ করিলে স্ফোটক ইত্যাদি আপনা হইতে বিদীর্ণ হইতে পারে। ইহার পুলটিশ ব্যবহারে আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, অন্যান্য পুলটীশের ন্যায় ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিতে হয় না। কেন না তোকমারী সিক্ত করিয়া কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে আঠার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া থাকে। বেদনাযুক্ত শঠিত ক্ষতে তোকমারীর পুলটিশ প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থ বেদনা নিবারণ, শোণিত সঞ্চালন বর্দ্ধিত, স্লফ্‌সমূহ সত্বরে পৃথক্ হয়, আমি শত শত রোগীতে ইহার এই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক স্ফোটক উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহারা সহজে অস্ত্র করিতে সম্মত না হইলে তোকমারীর পুলটিশ দ্বারা উপ-

কার সাধিত হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকায় শ্রীমতী সুশীলা দেবী যে রোগীর বিষয় লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক, বহুকাল হইতে মুখে একটী অর্ব্বুদ হইয়াছিল, ঐ অর্ব্বুদ জন্য কয়েক বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কলিকাতাস্থ ক্যাম্বেল হস্পিটালে চিকিৎসার্থে আইসে, ক্লোরাইড অফজিঙ্ক পেষ্ট এবং তোকমারী পুলটিশ প্রয়োগে অতি অল্পদিন মধ্যে ঐ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়া যায়। তোকমারীর গুণ মসিনা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, মূল্যও কম, মসিনার পুলটিশ তৈলাক্ত, তোকমারীর পুলটিশ লাল্‌সে মতন অথচ সাধারণেও ইহাই প্রার্থনা করে, এত গুণসত্ত্বেও তোকমারী অপরিজ্ঞাত এবং তিসির বিস্তৃত ব্যবহার হওয়াই আশ্চর্য্য।

বর্ত্তমান সময়ে এই দ্রব্য নিয়মিত রূপে আনীত হইতেছে না। প্রতি বৎসর অল্প পরিমাণে কলিকাতায় আইসে এবং ৫।৬ টাকা মণে বিক্রয় হয়, ইহার গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য নমুনা স্বরূপ ইউরোপে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ভিষক্-দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ এম, বি,।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

তোকমারী, যে মন্দ ঔষধ, একথা কিন্তু বলিতেছি না, তবে উহাকে যে লেখক মহাশয় মসিনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে অনেক লোকের ফোড়া ইত্যাদিতে আমরা উক্ত উভয় ঔষধেরই ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে, আকাশ ও পাতালে যত পার্থক্য, তোকমারী ও তিসিতেও ঠিক্ সেইরূপ পার্থক্য। ফলতঃ মসিনার ন্যায় ঔষধ এসকল ক্ষেত্রে আর নাই বলিলেই চলে। তবে কি জানেন, বালকের ন্যায় দেশের লোক গুলি বড়ই নিত্য নূতন-প্রার্থী, যে কোন বিষয়েই হউক, একটু নূতনত্ব দেখিলেই দলে দলে লোকসকল সেই দিকেই ধায়। তোকমারীও তিসি অপেক্ষা একটা নূতন ধরণের জিনিষ এইমাত্র, নচেৎ গুণে নূতনত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়।

চি, স, সম্পাদক।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনস্)

Tetanus.

ধনুষ্টঙ্কারে ঐচ্ছিক পেশী সকলের পুনঃপুনঃ আক্ষেপ জন্মে, শরীর ধনুকাকারে বক্র হয়। দুই প্রকারে এই রোগ জন্মে, স্বয়ং জাত ও আঘাতজ। স্বয়ং জাত ধনুষ্টঙ্কারের পরিণাম অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু আঘাতজ ধনুষ্টঙ্কারের পরিণাম প্রায়ই অশুভজনক হয়।

সংপ্রতি, একটী আঘাতজ ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। বয়ঃক্রম ৭ বৎসর, বালক। খেলাকরিতে করিতে বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলের মূলের অনুমান ২ ইঞ্চ উপরে কাটিয়া অযথা শোণিতপাত হয়। আঘাত লাগার অনুমান এক ঘণ্টা পরে একটী সামান্য দেশীয় ঔষধ প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। তৎ পরদিবস বালকটীর অত্যন্ত জ্বর হয়। জ্বর অন্তে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন্ প্রয়োগে জ্বর আরোগ্য হয়। এই ভাবে সপ্তাহ অতীত হয়। ক্ষতটীও প্রায় আরোগ্যোন্মুখ হয়।

৮ম দিবসের প্রাতে সংবাদ পাইলাম রোগীর গ্রীবাদেশ বেদনাযুক্ত হইয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় জলপূর্ণ হইয়াছে, গলাধঃকরণে কষ্ট জন্মিতেছে। কিন্তু সর্দ্দিলাগা ভাবও হইয়াছে। গলাধঃকরণে কষ্ট জন্মিতেছে শুনিয়া টংকার হইবে বলিয়া আমার অনুমান হইল। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রোগীকে দেখিলাম। পরিচয়ে জানিলাম গত ৩।৪ দিবস হইতে রোগীর কোষ্ঠ পরিস্কার হয় নাই। ক্ষতটীর মুখ প্রায় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময় রোগীকে কোষ্ঠ পরিস্কার করণ জন্য, একমাত্রা ক্যাষ্টর্ অয়েল দেওয়া হইল, কিন্তু কয়েক মিনিট মধ্যে তাহা সমস্ত উঠিয়া গেল। সুতরাং একবারও দাস্ত হইল না।

সেদিবস ঐভাবে কাটিল। রাত্রিতে ২ গ্রেণ্ ক্যালমেল, $\frac{১}{৪}$ পডফিলিন্ ও ৫ গ্রেণ্ সোডা বাইকার্ব্বনেট্ একটী পুরিয়া করিয়া সেবন করিতে

দেওয়া হইল। প্রাতে দুই বার পরিষ্কার দাস্ত হইল, অনেক পরিমাণ কঠিন মল নিঃসৃত হইল।

তৎপরদিবসেও ঐ ভাবে চলিল, এই দিন রাত্রে অঙ্গাপেক্ষ টংকারের প্রকৃত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রাতে যখন রোগীকে দেখিলাম, তখন লক্ষণ সকল পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অবিশ্রান্তরূপে আক্ষেপ হইতেছে, নিম্নে পদ দুখানির গোড়ালি ও উর্দ্ধে মস্তকের নিম্নাংশ শয্যায় আছে, শরীরের অপরাংশ ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে আছে।

এই সময়ে মুখ মণ্ডল অতি বিকৃত, হস্তপদ কঠিন ও সমস্ত শরীরের পেশী সকলের আক্ষেপ হইতেছে। বিন্দুমাত্রও জল গলাধঃকরণের ক্ষমতা নাই। রোগীর আত্মীয় স্বজন রোগীর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হা হুতাশ করিতেছেন। অপর কোন প্রক্রিয়া না করিয়া পদমূলে ফোমেণ্টশন করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। ৩।৪ ঘণ্টা পরে একবার আক্ষেপ নিবারিত হইল। তখন কিছু দুগ্ধ পথ্য দেওয়া হইল। কিন্তু এ অবস্থাতেও প্রতিবার দুগ্ধ গিলিবার কালে আক্ষেপ জন্মিতে লাগিল। সুতরাং অতি অল্প পরিমাণ পান করান হইতে লাগিল। এই সময়ে ৫ গ্রেণ্ মাত্রায় ক্লোরাল্ ও ৫গ্রেণ্ মাত্রায় ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ্ এককাঁচ্চা শীতল জল সহ সেবনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পূর্ণ একমাত্রাও রোগী সেবন করিতে পারিল না। এ অবস্থায় রোগীর বাক্যস্ফুরণ ছিলনা, কিন্তু উক্ত ঔষধ সেবনের অনিচ্ছা ভাবগতিকে প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রোগী যেটুকু মুখব্যাদন করিতে পারিত (কারণ মুখব্যাদন করিবার ক্ষমতা অদৌ ছিলনা) তাহাতে দেখা গেল, দন্ত সংঘর্ষণ কালে জিহ্বার অনেক স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্লোরাল্ওপটাশ্ সংশ্রাব ঐ ক্ষত স্থানে জ্বালা করায় রোগী ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ঐ দিবস ঐ ভাবে চলে।

ক্রমে লক্ষণ গুলি উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিল। অথচ ঔষধ ও পথ্য চলা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তখন একষ্ট্রাক্ট্ ক্যালাবার্বিন্ $\frac{১}{২০}$ গ্রেণ্ মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া হয়। ও প্রতি ৪ ঘণ্টায় পাইলোকার্পিন্ নাইট্রাস্ $\frac{১}{৬০}$ গ্রেণ্ মাত্রায় বটিকাকারে সেবন

করিতে দেওয়া হয়। এইমত ৭।৮ দিবসে আক্ষেপের উগ্রতা প্রশমিত হইল। তখন যদিও অবিরত ভাবে আক্ষেপ হইতে ছিল, কিন্তু এখন দুগ্ধ, মাংসের ক্বাথাদি পথ্য কিছু কিছু গ্রহণের ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

প্রথম হইতে ৩০শ দিবস পর্য্যন্ত কোন দিবসে বিনা বিরেচক ঔষধে একদিনেও দাস্ত হয় নাই। প্রায় প্রতি তিনদিবস অন্তে পূর্ব্বোল্লিখিত বিরেচক ঔষধটী সেবনে দুই তিনবার দাস্ত হয় ও প্রতিবার দাস্তের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি নির্গত হয়। ২৪শ দিবস পর্য্যন্ত ক্যালাবারবিন্ ও পাইলোকার্পিন্ একই নিয়মে সেবন করান চলে। ২৫শ দিবস হইতে দিবা রাত্রে ৪।৫ বার মাত্র ঐ ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হইতে লাগিল। ২৮শ দিবস হইতে পা দুখানি গুটাইবার ক্ষমতা একটু একটু দেখা গেল। ৩০শ দিবসে মুখব্যাদন করিবার ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত হয়। এই দিবস হইতে দুগ্ধ ও অন্নের মণ্ড পথ্য দেওয়া হয়। ক্রমে আরও ২।১ দিবস মধ্যে ঔষধ আরও কমাইয়া ২।৩ বার করিয়া প্রত্যহ দেওয়া হইতে লাগিল।

প্রথম হইতে রোগীকে নির্জ্জনস্থানে রাখিবার চেষ্টা বিবিধপ্রকারে করা হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর বাড়ীতে নির্জ্জন স্থান পাওয়া দুষ্কর। একটু নূতনতর কোন ঘটনা ঘটিলে দলে দলে লোক আসিয়া রোগিকে দেখিয়া রোগীর আত্মীয়গণের সঙ্গে লোকে আত্মীয়তা বাড়াইতে চেষ্টা করে—এটী পল্লীগ্রামের স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ। তাহাতেও শেষ হয় না, দলে দলে লোক আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বিবিধ রূপ রোগের গল্প, ভূতে পাওয়ার গল্প আওড়াইতে থাকে। এরূপ রোগীকে কোথায় নির্জ্জন স্থানে রাখিতে হইবে, তাহা না হইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্ব একটী প্রকৃত মজ্‌লিস হইয়া উঠে। অথচ এরূপ কার্য্যে গৃহস্থ বিরক্ত হইলে লোকে দোষ বিবেচনা করে। সুতরাং গৃহস্থকে নির্বাক্ থাকিতে হয়। অনেক সময় চিকিৎসককেও হারি মানিতে হয়।

রোগীটীর চিকিৎসার আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিলে দেখাযায় যে, বিরেচক পূরিয়া এবং ক্যালাবার্বিন ও পাইলোকার্পিন্ নামক ঔষধ দ্বয় এবং দুগ্ধ ও মাংসের ক্বাথ পথ্য ব্যতীত অপর কোন ঔষধ বা পথ্যের প্রয়োজন হয় নাই।

এখন রোগী রোগশূন্য হইয়াছে বসিতে পারে, একটু উঠিবার চেষ্টাও করিতেছে। প্রথমে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত হওয়ায় আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু

এখন দেখা যাইতেছে, তাহা হইবে না। সম্ভবতঃ আর একমাস বা দুইমাস মধ্যে রোগী হাঁটিতে ও বেড়াইতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইবে। ঠিক্ দেড়মাস হইল প্রথম আঘাত লাগিয়াছিল।

মোল্লাবিলিয়া,
সুবর্ণপুর, নদীয়া,

ডাক্তার শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক চিকিৎসা-দর্শন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

চিকিৎসা-দর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার রজনী বাবু স্বহস্তে চিকিৎসা-সম্মিলনীর জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা সম্মিলনী-সম্পাদকের পক্ষে প্রকৃতই আনন্দ ও গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই; পক্ষান্তরে চিকিৎসা-দর্শনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে কিন্তু বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে। প্রসিদ্ধ হিন্দীকবি গাইয়াছেন;—

"মালী আয়ত দেখি কৈ কলিয়াং করো পুকার।
ফুলে ফুলে চুনি লিয়ে কালি হমারো বার॥"

অর্থাৎ "কোনও বাগানে মালীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া পুষ্পের কলিকা সকল এই বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে, হায়! অদ্য মালী প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল চয়ন করিতেছে, আগামী কল্য আমাদিগকেও আবার ঐরূপ চয়ন করিবে"। চিকিৎসা-সম্মিলনী, চিকিৎসা-দর্শনের তুলনায় বয়সে কলিকা না হইলেও সর্ব্বগ্রাসী দুরন্ত কালের বিষয় মনে হইলে সত্যসত্যই ভয়ে অস্থির হইতে হয়!

চি, স, সম্পাদক।

গৃহচিকিৎসা।

সর্দ্দি সচরাচর সামান্য পীড়া। সর্দ্দি হইলে, হয় টানিয়া গেলে সারে, নয় ঝরিয়া গেলে সারে। সর্দ্দি বুকে বসিয়া যাওয়াই নানাবিধ রোগের মূল এবং ছোট শিশুর পক্ষে অনেক সময়ে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। সর্দ্দি টানিয়া যাওয়ার অর্থাৎ সর্দ্দির উপক্রমেই আরাম হওয়ার আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

১। কুমীরিকা গাছের শিকড় * ২।৩ টী গোলমরীচ দিয়া বাটিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়।

২। একটু হরিদ্রা গুঁড় ও একটু আদা বাটিয়া বড়ি করিয়া সকালে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ রতি। শিশুদিগকে সিকি মাত্রা দিতে হইবে।

৩। (১) দুলল ফুলের পাতার রস হাত পায়ের তেলোয় ও দুই রগে দিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

সর্দ্দি ঝরিয়া পড়াই উত্তম। সর্দ্দি ঝরাইবার আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান ও মিছরির জল পান করা বিধেয়।

সর্দ্দি হইলে অত্যাচার করিলে, (শীতল দুধ পান, শীতল বায়ুতে বেড়ান, ভিজাবস্ত্রে থাকা প্রভৃতি) সর্দ্দি বুকে বসিয়া নানাবিধ কাশির উৎপত্তি ও দুশ্চিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। অতএব সর্দ্দি হইলে সাবধানে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জল-কাশী হইলে, আদা গোল গোল করিয়া কাটিয়া সৈন্ধব বা লবণ মাখাইয়া জ্বলন্ত সলিতায় পোড়াইয়া খাইবে। ২।৩ দিন খাইলে আরাম হইবে।

সর্দ্দিতে গলায় যদি বেদনা হয়, তবে পানে করিয়া সরিষা তৈল গরম করিয়া গলায় লাগাইবে। ঐ বেদনায় যদি গলার স্বর বসিয়া যায়, তবে আমের পাতায় ঐ তৈল গরম করিয়া দিবে।

গলায় যদি এমন বেদনা হয় যে ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, তাহা হইলে একটী বড় পান ঠোঙার মত করিয়া তাহাতে প্রদীপের শিষে জল গরম করিয়া ৩।৪ ঢোক খাইলে আরাম হইয়া যায়।

১। কাশী যদি হাঁপানির মত হয়, তবে শ্বেত আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া রোগীর গলায় মালিস করিবে।

---

* কুমীরিকা লতাবিশেষ। এই লতা পল্লীগ্রামে সূতিকা গৃহেও দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পাকা শিকড় শিলে ঘসিলে চন্দনের মত বাহির হয়, তাহাই লইবে।

(১) এটী কেবল শিশুদিগের জন্য।

২। উক্ত রোগীর শ্লেষ্মা উঠাইবার আবশ্যক হইলে একটা পাত্রে ধুতুরা ছাড়াইয়া তাহাতে আগুণ দিয়া সে ধূম রোগীকে আঘ্রাণ করাইবে, তাহা হইলে শ্লেষ্মা উঠিয়া পড়িবে।

৩। তিত বেগুণ (বৃহতী) ভাজিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

৪। বিছুটী পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও এ রোগ উপশম হয়।

৫। খানকত তেজপাতা কলিকায় রাখিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া রোগীকে সেই ধূম পান করিতে দিবে।

সর্দ্দি হইলে অনেকের বুকে বেদনা হইয়া থাকে *। এরূপ হইলে গৃহ-চিকিৎসার উপর নির্ভর না করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

সর্দ্দিবশতঃ কান কামড়ানি বা ফটকটানি হইলে একটা রশুন ছাড়াইয়া কানের ভিতর রাখিলে আরাম হয়।

বনমরীচ নামক লতার পাতা সরিষা তৈল দিয়া গরম করিয়া কানের ভিতর ঐ তৈল দিলে আরাম হইবেক।

সর্দ্দি হইলে প্রায়ই জ্বর হইয়া থাকে, সে জ্বর সর্দ্দির আরামের সঙ্গেই আরাম হয়। যদি চিকিৎসা আবশ্যক হয়, তবে প্রথমে জোলাপ লওয়া বিধেয়। বিল্বপত্রের রস একরূপ জোলাপ। অথবা ২।৩টী লবঙ্গের সহিত ৩।৪টী হরীতকী বাটিয়া গরম জলে গুলিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে খুব খানিকটা গরম জল খাইলে জোলাপ খুলিবে। জোলাপ খুলিলে সর্দ্দি টানিবার ঔষধ সেবন করিলে আরাম হইতে পারিবে।

জ্বরে পথ্য খই, মিছরি, রুটী ও সাগুদানা। জ্বর না থাকিলে একবেলা রুটী ও একবেলা ভাত খাইতে পারে। বামাবোধিনী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ সকল মুষ্টিযোগ ঔষধের উপকারিতা বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই।

চি, স, সম্পাদক।

---

* সর্দ্দিতে বুকে বেদনা হইলে বুকে আকন্দের পাতার সেক দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা কালিকাসিন্দা গাছের পাতা ইক্ষুচিনি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হইতে পারে।

ক্যাটালেপ্সি।

(Catalepsy)

"ভাবলাগা"

* * * মানব-শরীরে স্নায়ুযন্ত্র নামক অদ্ভুত পদার্থ আছে, তাহার ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে আমাদের দেহে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। স্নায়ুযন্ত্রের বিকৃতিতে এমন অনেক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, যাহাদিগের স্বরূপনির্ণয়ে চিকিৎসকগণ অদ্যাবধি এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং এমন কোন উপায় ও ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদিগের সাহায্যে উক্ত প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে। বর্ণিত প্রকার ব্যাধির মধ্যে হিষ্টিরিয়া, ক্যাটালেপ্সি, ট্রান্স (Trance), এক্সটেসি (Ecstacy) প্রভৃতিকে গণ্য করা যাইতে পারে। এইগুলি সমস্তই একই নিদানোৎপন্ন ব্যাধির প্রকারভেদ মাত্র। এই হিষ্টিরিয়া এবং ক্যাটালেপ্সি যে কতরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া রোগীকে আক্রমণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং মানব-বুদ্ধি ঐ সকল ব্যাধির স্বরূপনির্ণয়ে অপারগ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। সাধে কি আর লোকে এই সকল রোগীকে "ভূতে পাওয়া" বলে? এবম্বিধ রোগী দেখিলে আমাদিগের দেশের অশিক্ষিত লোকে বলে যে, ঐ ব্যক্তির "উপরিভাব হইয়াছে" অর্থাৎ উপদেবতায় বা ভূতে পাইয়াছে। তাহা শুনিয়া ফিজিওলজি, কেমিষ্ট্রী বিশারদ এম্, ডি, টাইটেলগ্রস্ত বিলাতি ফিজিসিয়ান উচ্চৈস্বরে হাস্য করিতে থাকেন। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, নরদেহের সমস্ত কার্য্যকারণঘটিত ব্যাপার নির্ণয়ে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বড় একটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

হিষ্টিরিয়া, ক্যাটালেপ্সি, এক্সটেসি প্রভৃতি কথাগুলি কতকগুলি সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল নামে ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় হয় না। উহারা যে সকল ঘটনা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অন্য নামে অভিহিত করিলেও দোষ হয় না। এই সকল ঘটনা একই ব্যাধির প্রকারভেদ মাত্র। কি উহারা বিশেষ বিশেষ ব্যাধি, তাহা ঠিক্ করিয়া কিছুই বলিবার যো নাই।

পাঠকগণ! আপনাদিগের মধ্যে বোধ হয়, অনেকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনলীলা পাঠ করিয়াছেন অথবা ষ্টার থিয়েটারে নিমাই সন্ন্যাসের অভিনয় দেখিয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঈশ্বরাবতার কিনা সে বিচারে প্রয়োজন নাই কিন্তু নিমাই যে একজন মহাপুরুষ এবং পরম বৈষ্ণবাবতার ছিলেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। মহাপ্রভু সর্ব্বদা হরিনামামৃত পানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার মনে রাধার ভাবোদয় হইত। তাঁহার সর্ব্বশরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া আসিত এবং তিনি অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইতেন। এইরূপ অবস্থাকে লোকে সচরাচর "ভাবলাগা" বলে। কথিত আছে, এইরূপ "ভাবে" অচেতন হইয়া নিমাই নানারূপ ধারণ করিতেন। কখন কচ্ছপ, কখন কুম্ভীর এবং কখন কুষ্মাণ্ড আকার ধারণ করিতেন। কখন হাস্য এবং কখনও রোদন করিতেন। এইরূপ অবস্থায় গভীর জলে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার শরীর ভাসিয়া থাকিত। তাঁহার লোমকূপ সকল দিয়া রক্ত নির্গত হইত। এইরূপ অচেতন অবস্থায় নিমাই তিন চারি দিন অবস্থিতি করিতেন। শৈশবাবস্থায় নিমাই এইরূপ অচেতনাবস্থায় উপস্থিত হইয়া ঢুলিয়া পড়িলে নিমাইয়ের মাতা "কি হল হায় কি হল" বলিয়া রোদন করিতেন। ক্রমাগত হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিমাইয়ের চেতনা প্রাপ্তি হইত।

বর্ণিত প্রকারের অবস্থাটী সামান্যাকারে অস্মদ্দেশীয় ভাবুক লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। হরিসংকীর্ত্তন বা যাত্রা শ্রবণ কালে অনেক ভাবুক লোক ভাবগ্রস্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলে এবং অতিরিক্ত ভাব উপস্থিত হইলে ঐ সকল লোকের দেহ মন ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসে এবং ক্রমে চেতনা বিলুপ্ত হয়। তখন জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, প্রেম, শোক প্রভৃতি মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রস্ফুটিত হইয়া এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপ "ভাব লাগা" আমাদিগের দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার স্বরূপ নির্ণয়ে এপর্য্যন্ত কোন চিকিৎসক তাদৃশ মনোযোগ প্রকাশ করেন নাই এবং কোনও ইংরাজী বা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই।

অস্মদ্দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভাবুক ব্যক্তি ভক্তি বা করুণা-

রসাত্মক গান শ্রবণ করিতে করিতে অতি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ ভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রথমে স্থিরদৃষ্টি হয়, পরে চক্ষু হইতে জল ঝরিতে থাকে। তৎপরে দুই চারিবার শরীর ঝাঁকিয়া নাড়িয়া উঠে এবং ক্রন্দন করিয়া ফেলে। পরে প্রকৃত ফিট, কন্‌ভল্‌শন্‌স্ উপস্থিত হয়; তখন সজোরে হস্তপদ নড়িতে থাকে। শরীরের মাংসপেশী ক্রমে শক্ত হইয়া উঠে এবং অবশেষে অচেতন হইয়া ধরাতলশায়ী হয়। এইরূপ ভাবগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। এমনিয়া, ব্লিষ্টার, জ্ঞান আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিলেও সংজ্ঞালাভ হয় না, যেন মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। হস্ত ও পদ যেরূপ অবস্থায় রাখ, প্রায় সেইরূপ অবস্থায় থাকে। হাত দুইটি উত্তোলন করিয়া ছাড়িয়া দেও, দেখিবে সেইরূপ ভাবেই থাকিয়া গেল। আবার রোগীকে উঠাইয়া বসাও, বসিয়া থাকিবে। দাঁড় করাও, স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, চক্ষুদ্বয় নিষ্কম্প ও স্থির। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বিলুপ্ত অথবা অতি ধীর ও মৃদু। কিন্তু পল্‌স্ বিলুপ্ত হয় না, রোগী বাক্যরহিত, অচেতন, স্তম্ভিত এবং জড়বৎ প্রতীয়মান হয়। ভাবলাগার এই শেষোক্ত জড়বৎ অবস্থাকে চিকিৎসকগণ ট্রান্স (Trance) বলিয়া থাকেন। এই ট্রান্সের নানারূপ প্রকার ভেদ আছে।

আমি গত কয়েক বৎসরাবধি "ভাবলাগা" প্রকৃতির বিষয় অনুসন্ধান করিতেছি এবং এইরূপ ধরণের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু ইহার স্বরূপ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছি। এইগুলি প্রকৃত রোগপদবাচ্য কি না, কি শরীরের আকস্মিক ভাবান্তর মাত্র, তৎপক্ষে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। আমি যে সকল ঘটনার বিষয় স্বয়ং জানি, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) ক—ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, ইনি অতি শৈশব অবস্থা হইতে হরিগুণানুবাদ ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাঙ্গের গীত বিশেষ শ্রবণ করিলেই ভাবগ্রস্ত হইতেন। যখন ইহার বয়ঃক্রম কি ৬ বৎসর, তখন ইনি কোন স্থানে হরিসংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ অচেতন হইয়া ঢুলিয়া পড়েন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তিনি মৃগীরোগগ্রস্ত বা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া নানাবিধ শুশ্রূষা করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার চেতনা হয় না। পরে

তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ ভাণ করিয়াছেন বলিয়া পাড়ার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে জ্বলন্ত টিকা (অঙ্গার) ছোঁয়াইয়া দেয়, তাহাতে তাঁহার চেতনা হইল না। পরিশেষে দর্শকদিগের মধ্য হইতে একজন ভক্ত বৈষ্ণব বলিলেন যে, তোমরা ব্যস্ত হইও না, ঐ ছেলেটীর ভাব লাগিয়াছে। তিনি কহিলেন, তোমরা ক্রমাগত মৃদঙ্গধ্বনি ও গান করিতে থাক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ গান করিতে করিতে ঠিক যে গানটীতে উক্ত বালকটীর ভাব লাগিয়াছিল, সেই গানটী আরম্ভ করিবামাত্র উক্ত বালকটীর শরীর নড়িয়া উঠিল এবং কেবলমাত্র সেই গানটী পুনঃ পুনঃ গাহিতে গাহিতে বালকটী চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) খ—কোন জেলার কোন এক পল্লিগ্রামে হরিসংকীর্ত্তন হইবে। অনেক শ্রোতা ও দর্শক উপস্থিত। একজন অল্পবয়স্ক যুবক একটী উচ্চ স্থানে বসিয়া গান শুনিতেছে। কোন একটী গান শুনিতে শুনিতে ঐ যুবকটী ক্রমে কাঁদিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই অচেতন হইয়া ঐ উচ্চ স্থান হইতে সজোরে ধরাশায়ী হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৮।১০ হাত উচ্চ স্থান হইতে পড়িলেও উহার গায়ে আঘাত মাত্র লাগিল না। এই ঘটনা হওয়াতে লোকে মনে করিল, ঐ যুবকটীর কোন ব্যাধি আছে। কয়েকটী লোক ধরাধরি করিয়া তাহাকে অপর একটা বাটীতে লইয়া গিয়া নানাবিধ শুশ্রূষা করিতে লাগিল। একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমনিয়া নাকে ধরা, ঘাড়ে ব্লিষ্টার, শিরঃমুণ্ডন ও মাথায় ক্রমাগত জল ঢালা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বিত ও পরিত্যক্ত হইল কিন্তু কিছুতেই জ্ঞানোদয় হইল না। এইরূপ অবস্থায় ২ দিন অতিবাহিত হইল। পরে একজন বৈষ্ণব উহাকে দেখিতে গিয়া উহার প্রকৃতি দেখিয়া এবং আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া বলিল, লোকটী ভাবুক, উহার ভাব লাগিয়াছে, দেখ আমি আরাম করিতেছি। এই বলিয়া সেই কীর্ত্তনওয়ালাদিগকে ডাকিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল, অনেক গান করা হইল, কিন্তু চেতনা হইল না; পরে তিনি কীর্ত্তনওয়ালাদিগকে কহিলেন যে, আপনাদিগের কি মনে আছে যে, কোন গান গাহিবার সময় ঐ লোকটী পড়িয়া গিয়াছিল, কেহ একজন বলিল, অমুক গান। তখন সেই গানটী দুই একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া গাইতে গাইতে যুবকটী চেতনা প্রাপ্ত হইল।

(৩) গ—কোন এক বাড়ীতে কৃষ্ণযাত্রা হইতেছে। প্রভাসযজ্ঞের পালা হইতেছে। আমি এবং অনেক লোক গান শুনিতেছি। একটী লোক আমার পশ্চাতে বেঞ্চেতে বসিয়া গান শুনিতেছি। বেশ গান লাগিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় রাজা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মাতা কৃষ্ণদর্শনে লালায়িত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। দ্বারবানেরা কৃষ্ণের জননীকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। জননী "গোপাল রে, একবার এসে দেখা দে রে" বলিয়া রোদন করিতেছেন। সে সময় এমনিই করুণস্বরে কৃষ্ণের জননী রোদন করিতেছেন যে, তচ্ছ্রবণে অনেকেরই চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া উঠিতেছে। আমি যে এমন পাষণ্ড নিষ্ঠুর আচারভ্রষ্ট ডাক্তার, আমারও চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। ঠিক্ এই সময় আমার পশ্চাতে উপবিষ্ট ব্যক্তিটী উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া উঠিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় স্থির হইয়া আসিল এবং বার কতক কন্‌ভল্‌শন্ উপস্থিত হইয়া ঐ লোকটী সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ঠিক যেন মৃত জড়বৎ পড়িয়া থাকিল। পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল তথাপি উহার চেতনা লাভ হইল না। আমরা নিজে অনেক চেষ্টা করিলাম, লোকটীর সংজ্ঞামাত্র হইল না। আমি পূর্ব্বে ভাবলাগা কেমন করিয়া আরাম হয়, তাহা জানিতাম। এই জন্য যাত্রাওয়ালাদিগকে কহিলাম যে, লোকটীর ভাব লাগিয়াছে। তোমরা কিয়ৎকাল উহাকে ঘেরিয়া কীর্ত্তনাঙ্গের গান কর, তাহা হইলে উহার চেতনা হইবে। তাহারা লোকটীকে আসরের মধ্যে আনাইয়া শয়ন করাইয়া দিল এবং নানারূপ গান করিয়া ক্লান্ত হইল কিন্তু কিছুতেই সংজ্ঞালাভ না হওয়ায় সকলেই যেন বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে আমি বলিলাম "মহাশয়েরা গোপাল রে, একবার দেখা দে রে" বলিয়া করুণস্বরে যে গানটী গাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে ও সেই সুরে এবং উপযুক্ত তানলয় সহ সেই গানটি করুন দেখি। তাঁহারা "গোপাল রে, একবার আয় রে" এই কথা দুই একবার উচ্চৈস্বরে বলিবামাত্র উক্ত ভাবযুক্ত জড়বৎ রোগীটী দুই একবার নড়িয়া উঠিল। ঐ সময় দেখা গেল যে, তাহার নাক মুখ দিয়া সফেন রক্ত নির্গত হইতেছে। পরে দুই একবার ঐ গানটী গাহিতে গাহিতে উহার সম্পূর্ণ চেতনা লাভ হইল। এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঠিক যে গানটীতে ঐরূপ ভাব লাগে আবার ঠিক সেই গানটী গাইবামাত্র ভাব ছাড়িয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ গানে ভাব ছোটে না।

আমি অনেক ইংরাজি পুস্তক অনুসন্ধান করিতে করিতে একখানি গ্রন্থে এইরূপ ক্যাটালেপ্সীগ্রস্ত একটী রোগীর অদ্ভুত বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। ডাক্তার স্যামুয়েল ওয়ারেণ (Dr. Samuel Waren) প্রণীত ডায়েরী অব্ এ লেট ফিজিশিয়ান (Diary of a Late Physician) নামক গ্রন্থে দি থাণ্ডার ষ্ট্রাক (The thunder struck) নামক প্রবন্ধে এইরূপ রোগীর একটী গল্প আছে।

স্যামুএল্ অব্ ওয়ারেণ্ প্রণীত "ডায়েরী অব্ এ লেট্ ফিজিসিয়ান" (Diary of a late physician) নামক গ্রন্থে একটী এই ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত আছে। লেখক বলেন, তাঁহার লণ্ডন নগরের বাড়ীতে এক জন বন্ধুর একটী কন্যা বাস করিত। তাঁহার নাম এলিস্। এলিস্কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কন্যাটী অবিবাহিতা এবং পরমা সুন্দরী। কিন্তু দেশে তাহার এক জন প্রণয়ী ছিল, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া একরূপ স্থির হইয়াছিল। একদিন লণ্ডন নগরে ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনের সহিত বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ মুহুর্মুহুঃ ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এলিস্ ঐ সময়ে উপরকার ঘরে তাহার নিজের প্রকোষ্ঠে ছিল। লেখক তাঁহার বাটীর নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত একবার মেঘ গর্জ্জন হইল, বিদ্যুতের আলোকও সেই কড় মড় ধ্বনিতে তিনি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। গর্জ্জন থামিয়া গেলে তিনি কে কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা অবস্থায় রহিয়াছেন। বাটীর চাকরটী ভয়বিহ্বল চিত্তে ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সত্বর এক ডোজ উত্তেজক ঔষধ খাইতে দিলেন, তাহাতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তার পর এলিস্ কোথায়? বাটীর ঐ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তখন তিনি দৌড়িয়া উপরকার ঘরে গিয়া তাহার নিজের কুঠরির দ্বারে দাঁড়াইয়া এলিস্! এলিস্! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঘরের দুয়ার দেওয়া আছে কিন্তু অর্গল বদ্ধ নহে। তিনি দুই তিন বার ডাকিয়া কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। অথচ হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করা অযুক্তি বিবেচনায় পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কহিলেন "এলিস্! তুমি যদি উত্তর

না দেও আমি তোমার ঘরে প্রবেশ করিতেছি।" কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। তখন মনে ঘোর সন্দেহ হওয়াতে, যেমন কপাট খুলিয়া এলিসের ঘরে প্রবেশ করিবেন, কি সর্ব্বনাশ! এলিস্ চুল এলো করে, দুই বাহু বিস্তৃত করে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া আছে। হাত দুইটী এইরূপ ভাবে বিস্তৃত করা আছে যেন দ্বার খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। চক্ষু দুইটী স্থির, নিস্পন্দ, চুলগুলি পশ্চাতে ঝুলিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস নাই বলিলেই হয়, শরীর অর্দ্ধনমিত অর্থাৎ পা তুলিয়া যেন দ্বারের দিকে চলিয়া আসিতেছে। অজ্ঞান অচেতন, জড়বৎ হইয়া এলিস্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি এলিস্কে ধরাধরী করিয়া শয্যার উপর লইয়া গেলেন। দেখিলেন, জীবনের চিহ্নের মধ্যে কেবল নাড়ী পাওয়া যাইতেছে এবং গাত্র উষ্ণ আছে। এখন রোগীকে তুলিয়া ছাড়িয়া দেও, রোগী সেই অবস্থাতেই রহিয়া যাইবে। বাহু দুইটী লইয়া তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দেও, সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। আবার নামাইয়া ধর, নামানই থাকিবে। এইরূপ অদ্ভুত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ কিছু জল বা দুধ পান করাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহা বৃথা হইল। পরে তিনি স্নায়ু যন্ত্র উত্তেজিত করিবার মানসে পৃষ্ঠদেশে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে ব্লিষ্টার প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। যত প্রকার উপায় ছিল, সমস্ত একে একে পরীক্ষা করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেদিন এইরূপ ভাবেই গেল। পর দিন আর এক-জন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া ইলেক্ট্রিসিটীপ্রয়োগ করা হইল। কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। এলিসের এইরূপ ভয়ঙ্কর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওয়ার পরই পল্লিগ্রামে তাহার আত্মীয় বন্ধুকে খবর দেওয়া হয়। এলিসের প্রণয়ী এই সম্বাদ পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহার হঠাৎ দর্শনে যদি এলিসের মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়। এই মানসে এলিসের প্রণয়ী যুবকটিকে একবারই এলিসের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়, তিনি এলিসের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে এলিস! এলিস্! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে এলিসের চেতনা মাত্র হইল না। এলিস্ সেইরূপ জড়বৎ ও নিস্পন্দ। পরে একজন পাদরিকে (ধর্ম্মযাজক) উক্ত বিষয় বর্ণনা করাতে তিনি কহিলেন, সঙ্গীত শ্রবণ করাইলে উপকার হইতে পারে। এমতে পর দিবস উক্ত পাদরী ও তাঁহারা দুই ডাক্তারে মিলিয়া এলিসের নিকট গিয়া তানলয় সহকারে এলি

সের কর্ণ কুহরে সুমধুর সঙ্গীত সুধা ঢালিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও রোগের প্রতিকার হইল না। অনেকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঈশ্বর বিষয়ক গান গীত হইল। পরে এলিস্ যে সকল গান ভাল বাসিত, তাহারও দুই একটী গীত হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরে তাঁহারা একরূপ হতাশ হইলেন। তার পর দিবস অর্থাৎ চতুর্থ দিনের দিন হঠাৎ এলিসের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। এই তিন দিবস এলিস্ একটু জল পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ না করিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিল এই আশ্চর্য্য।

বর্ণিত প্রকারের অবস্থাকে ট্রান্স (Trance) কহা যায়। ইহা ক্যাটালেপ্সির প্রকার ভেদ মাত্র। ঈশ্বরভক্ত লোকদিগের যে সচরাচর ভাবাবেশ হয়, তাহাকে একস্ট্যাসি কহে। ইহাও ক্যাটালেপ্সির প্রকার ভেদ মাত্র। এইরূপ প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া লোকে আশ্চর্য্য রকমের অভিনয় করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ লোক একস্থানে বসিয়া স্থানান্তরের বা ভিন্ন দেশের বিবরণ বলিতে পারে এবং ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা সকল অবিকল বলিয়া দিতে পারে। ইহাকে স্পিরিচুয়াজম্ (Spirtualis) বা মেস্‌মেরিজিমের প্রকার ভেদ বলা যাইতে পারে।

এই সকল রোগীকেই সচরাচর লোকে ভূতাবেশ হইয়াছে বলে। এরূপ ভাবাবেশগ্রস্ত লোকের সম্বন্ধে আর একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কোন কোন লোকের বুদ্ধিবৃত্তি মস্তক হইতে নামিয়া, উদর ও হস্ত পদে আসিয়া যেন সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ উদরে ও অঙ্গুলিতে মস্তকের ক্রিয়া পরিচালিত হয়। এই সকল লোকের উদরের বা পদতলের উপর কোন পুস্তক বা সম্বাদ পত্র ধরিলে তাহারা পড়িয়া দিতে পারে। এই সকল ব্যক্তিকে যে কোন রকমের প্রশ্ন করিলে তাহার সদুত্তর করিতে পারে। ইংরেজ লেখকগণ এইরূপ অবস্থাকে রোগ না বলিয়া বর্ণনা করেন*। কিন্তু ইহাকে রোগ না বলিয়া এরূপ সাধনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাকে

---

*Dr. Copland mentions a curious fact in connexion with this subject, He says that many of the Italian Improvisatori are in possession of their peculiar faculty only while they are in a state of ecstatic trance and that few of them enjoy good health, or consider their gift as otherwise than morbid.

রোগ বলিলে যোগশাস্ত্র বিশারদ যোগীগণকেও ব্যাধিগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। এক্সট্যাসিকে রোগই বল, আর যাই কেন বল না, ইহা একটী অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক বিপর্য্যয় তাহার আর ভুল নাই। এবং ইহার প্যাথলজি ও চিকিৎসাসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত চিকিৎসকদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। † যাহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের (mental philosophy) নিগূঢ় তমসাচ্ছন্ন তত্ত্ব সকলের মীমাংসা করিতে সমর্থ, তাঁহারাই এই সকল ব্যধির প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেও পারিতে পারেন।

ভাবুক লোকের যে গানটী শুনিয়া ভাব লাগে, ঠিক্ আবার সেই গানটী শুনিবামাত্র কেন ভাব ছাড়িয়া যায়, ইহার রহস্য বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন। আমি একটী ভাবুক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তিনি ভাব লগিয়া অচেতন হইলে কিরূপ বোধ করেন। তাহাতে তিনি কহেন যে, যে গানটী শুনিয়া ভাব লাগে, অচেতনাবস্থাতেও যেন তাঁহার কর্ণ কুহরে সেই গানের সুরটী বরাবর লাগিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাহ্য বস্তুর সহিত তাঁহার মনের আর কোন সম্বন্ধ থাকেনা। এইরূপ অচেতনাবস্থায় তাঁহাকে আঘাত করিলে তিনি বুঝিতে পারেন কি না? এ প্রশ্নে তিনি বলেন যে, তাঁহাকে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিলেও তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। অনেকে বলেন যে, এই সকল রোগীর ভিতর ভিতর জ্ঞান থাকে এবং সকল বিষয় বুঝিতে পারে, কেবল প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। এইরূপ অবস্থায় শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, মন সম্পূর্ণ একত্রীভূত হইয়া এক স্থানে মাত্র স্থিত হয়। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, এক্সটাসিগ্রস্ত রোগীর মন ও বুদ্ধি মস্তিষ্ক ছাড়িয়া হস্তে বা উদরে আসিয়া সঞ্চিত হয়। সাধারণ ভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরও মন ও বুদ্ধি একত্রীভূত হইয়া সেই

---

† I repeat that I can add nothing respecting the pathology or the management of these diseases, to whaf I have already said in reference to the whole class to which they belong.

Lectures on the practice of physic
By THOMAS WATSON M. D.,
Vol I, page 703, 3rd Edition.

সঙ্গিতটীতেই অসিয়া সঞ্চিত হয়। অর্থাৎ একবারে তন্ময় হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ভাবুক লোকের যে সময় ভাব লাগিতে আরম্ভ হয়, সেই সময় মস্তকের উপর থাবা মারিলে অথবা তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিলে আর ভাব লাগে না। যে সময় দৃষ্টি স্থির হইয়া আইসে, সেই সময়ে এই কৌশল খাটে কিন্তু হস্তপদের আক্ষেপ উপস্থিত হইলে আর এরূপ উপায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

এই সকল অত্যাশ্চর্য্য মানসিক অবস্থা পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। ভাবুক পিতার পুত্র সচরাচর ভাবুক হইয়া থাকে। এইরূপ মানসিক প্রকৃতি অতি শৈশবে প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল মানসিক বিকৃতির নিদান বুঝিয়া উঠা একরূপ কঠিন ব্যাপার। আমি সেই জন্য লেখক ও পাঠক মহোদয়গণকে এই প্রবন্ধটী উপহার দিলাম। এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত জানিতে নিতান্ত উৎসুক থাকিলাম। আমি এ বিষয় আরও যাহা সংগ্রহ করিতে পারিব, সুবিধামতে প্রকাশ করিব। ভিষক্-দর্পণ। ক্রমশঃ—

ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবু প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, "আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, নরদেহের সমস্ত কার্য্যকারণ-ঘটিত ব্যাপার নির্ণয়ে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বড় একটা অগ্রসর হইতে পারে নাই।" সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দিব্যি করিয়া ধর্ম্মতঃ বলিতে পারি যে, আধুনিকই হউন, আর পুরাতনই হউন, শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্যকারণ-ঘটিত ব্যাপারে সকলই প্রায় সমান পণ্ডিত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া ধরা পড়িয়াছেন ইণ্ডিয়া। বোধ হয় বুদ্ধিমান্ পাঠকের নিকট এ কথার উত্তরে ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে হইবে না।

চি, স, সম্পাদক।

বৈদ্যক-ঔষধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রকাশিত ভৈষজ্যরত্নাবলী নামক গ্রন্থের পরিচয় বোধ হয় পাঠকগণকে আর অধিক করিয়া দিতে হইবে না। যেহেতু আজকালকার কালে অনভিজ্ঞ বা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের জন্য বৈদ্যক ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিনোদ বাবুর ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থখানি বড় মন্দ নহে। ভাল বলিয়াই এ গ্রন্থখানির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। ভক্তি আছে বলিয়াই অনেক সময় আমরা অনেক হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজকে বিনোদ বাবুর ভৈষজ্যরত্নাবলী ক্রয় করিয়া তদনুসারে ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগের পরামর্শ দিয়া থাকি। পক্ষান্তরে গ্রন্থখানি যে একবারেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সে কথাও বলিতেছি না। ফলতঃ গ্রন্থের কোন রূপ সমালোচনার কথা এ স্থলে আজ্ না তুলিয়া যাহা আমার জিজ্ঞাস্য, নিম্নে তাহাই লিখিতেছি।

সকলেই জানেন যে, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কোষ্ঠগত রোগে বিশেষতঃ প্লীহা রোগে "অভয়ালবণ" নামক ঔষধটী অতি আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইয়া থাকে। শত শত ডি গুপ্তের বোতল উদরস্থ হইলে যে প্লীহার কিছুমাত্র শান্তি হয় না, বড় বড় এম্ ডি এলোপ্যাথি ডাক্তারের ব্যবস্থিত নানা প্রকার এলোপ্যাথি ঔষধ সেবনেও যে প্লীহার কিছুমাত্র উপকার দর্শে না, বড় বড় নামজাদা হোমিওপ্যাথির সহস্র সহস্র ডাইলিশন্ জল বিন্দু পানেও যে প্লীহা কমে না। এ হেন দুর্দ্দম্য প্লীহা কিন্তু বৈদ্যক ভৈষজ্যের অভয়ালবণ দ্বারা অতি শীঘ্র নরম হইয়া পড়ে। ফলতঃ প্লীহা রোগের শান্তির জন্য অভয়ালবণের তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ আর কিছু আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

এ হেন উপকারী অভয়ালবণ ঔষধটী যে আমার সদা সর্ব্বদাই প্লীহারোগে ব্যবহার করিয়া থাকি, সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন কথা এই যে, আমাদের ব্যবহৃত অভয়ালবণ আমরা যে নিয়মে প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিয়া থাকি, সে কথা সময়ান্তরে বলিব। তবে মধ্য হইতে এই টুকু এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আমরা আকন্দ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষার করিয়া সেই ক্ষার /২ দুই সের মাত্রায় লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া পরে ছাঁকা ক্ষার ঐ ১৬ সের জলে ২১ বার ধৌত করিয়া লইয়া এই ক্ষারগুলি

ফেলিয়া দিই। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত আকন্দাদি দ্রব্যের নূতন ক্ষার ভস্ম /২ দুই সের, গোমূত্র ১৬ সের, উক্ত ক্ষার জল ষোল সের, ও সৈন্ধব এবং হরীতকী চূর্ণ প্রভৃতি সহ পাক করি। এই ত আমাদের ব্যবহার্য্য ঔষধের প্রস্তুত নিয়ম, কিন্তু অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কবিরাজ বিনোদ বাবুর ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই নিয়মের সম্পূর্ণ অন্যথাভাব দৃষ্ট হইতেছে। কি রূপ পার্থক্য, তাহা দেখুন।

১। প্রথমতঃ প্রথম কথা এই যে, বিনোদ বাবুর ভৈষজ্যরত্নাবলীর বাঙ্গালাতে লেখা আছে যে "আকন্দ প্রভৃতির ক্ষার দুই সের লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া গোমূত্র ও সৈন্ধবাদির চূর্ণ সহ পাক করিবে" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্থলে তিনি কেবল ক্ষার জল ১৬ সের লইয়া নূতন ক্ষার ভস্মের চূর্ণ পৃথক /২ সের দিতে উপদেশ দেন নাই কেন? যেহেতু ঔষধটীতে যদি পৃথক্ নূতন ক্ষার চূর্ণ না পড়ে, তবে ত উহার দ্বারা আশানুরূপ উপকার লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। কেবল তাহাই নহে, এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ১৬ সের ক্ষার জল নামাইয়া যে ২১ বার ধৌত করিয়া লওয়া উচিত, তাহাও তাঁহার গ্রন্থে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। সুতরাং ভৈষজ্যরত্নাবলীর ন্যায় এহেন প্রয়োজনীয় গ্রন্থে অভয়ালবণের ন্যায় এমন একটী অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী ঔষধের তালিকার মধ্যে এমন সকল গোলযোগ-পূর্ণ কথা পাঠ করিয়া সাধারণের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়াই আমি এ প্রশ্নটীর উত্থাপন করিলাম। এক্ষণে চিকিৎসা-সম্মিলনীর সুবিজ্ঞ বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বিশেষতঃ ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রকাশক শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিনোদ বাবুর নিকট আমার সানুনয় জিজ্ঞাস্য এই যে, এ কি ভৈষজ্যরত্নাবল্লীরই ভুল? না, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ভুল? অতএব আশা করি যে সম্মিলনীর কোন বিজ্ঞ পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার যথার্থ মীমাংসা লিখিয়া সাধারণের সন্দেহ দূর করিয়া বাধিত করিবেন। আর বিনোদ বাবুর নিকট আমরা সে আশা বিলক্ষণরূপেই করিতে পারি।

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ঔষধাদির সম্বন্ধে এসকল কথার যতই আন্দোলন আলোচনা হয়, ততই মঙ্গলজনক বোধ করিয়া আনন্দিত হই। চি, স, সম্পাদক।

চিকিৎসিত রোগবিবরণ।

হোমিওপ্যাথি মতে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন।

(১)। ৫।৮।৮৬। হিন্দু, ১৮ বৎরের স্ত্রীলোক। ৩।৮।৮৬ তারিখে জ্বর হইয়া অদ্য প্রাতে বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্ম হইয়া প্রায় ছাড়িয়াছে; কটিদেশে ও অঙ্গে কামড়ানি, টিপিলে তাহার উপশম; কোষ্ঠবদ্ধ; নাড়ী, কিঞ্চিৎ পুষ্ট।

রস্ ট (৩-) বেলা ১১টায় এক মাত্রা। আরোগ্য। (গ্রং)

(২) ২৫ বৎসরের পুরুষ। বৃষ্টিতে ভিজিয়া কম্প; এক দিনান্তর জ্বর। দিবসে দ্বিপ্রহরে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কম্প ও তৃষ্ণার অভাব; তাপ কালে সামান্য তৃষ্ণা, অত্যন্ত অস্থিরতা, সমস্ত দিবস স্থায়ী প্রবল শিড়ঃপীড়া, অঙ্গে চিড়িক মারা বেদনা; অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম। রস্ ট, ব্যবস্থা।

বেদনার লোপ এবং তৎপরে সামান্য মাত্র একটী কম্প। তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার ঐ প্রকার পীড়া হয়, এবং য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় একবৎসর কষ্ট পায়েন। (আং)

(৩)। মুসলমান, ৫০ বৎসরের পুরুষ, ২০ দিবসাবধি জ্বরভোগ। এখন বিকারাবস্থা;—নাড়ী দুর্ব্বল ও কোমল; তৃষ্ণা; জিহ্বা, শুষ্ক, পাটল ও ফাটা; কোষ্টবদ্ধ; রাত্রিকালীন অস্থিরতা ও প্রলাপ; বহিষ্করণে জিহ্বার কম্পন; তাপ ১০৪০। [রস্‌টক্স, (৬) প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর]। দুই দিবস ব্যবহারে প্রলাপের হ্রাস, নাড়ীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবলতা, ও জিহ্বার কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃততা; এখন রোগী, সর্ব্বগাত্রে ও নাড়িতে চড়িতে বেদনা বলায়। ব্রাইওনিয়ার তিন দিবস ব্যবহার হয়; বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে রাত্রিকালীন অস্থিরতা এখনও বিদ্যমান। [আবার রস্‌টক্স]। তিন দিবস ব্যবহারে ক্রমশঃ তাপের হ্রাস, নাড়ীর সবলতা, রাত্রিকালীন অস্থিরতা ও প্রলাপের বিলোপ, এবং জিহ্বার পরিষ্কৃততা হইল; অধিক কি আমার চিকিৎসাধীন হওয়ায় অষ্টম দিবসে পীড়ার আরোগ্য।

মন্তব্যঃ—ব্রাইওনিয়ার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত; রোগীর বেদনা লক্ষণ বলা,

প্রলাপ মাত্র। য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় থাকায়, ইহার জন্য বিকারাবস্থায়, আন্টিপাইরিন, কুইনাইন ও ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা হইয়াছিল। (গ্রং)

(৪)। ৩০।৯।৮৮। হিন্দু, ১৬ বৎসরের পুরুষ। ৪ দিবসাবধি জ্বর ভোগ।

গত কল্য প্রাতে জ্বর আসে, এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান! বর্ত্তমান লক্ষণঃ—পদদ্বয়ে কামড়ানি, তৃষ্ণা, মস্তকের ভার; বিবমিষা ও গাত্রদাহের অভাব, উদর কল্ কল্ করা; দিবসে ১।২ বার পাতলা দাস্ত।

রস্ টক্স, (২০০) একবার।

১।১০।৮৮। জ্বর নাই, সামান্য মাথাভার, রাত্রিতে দুইবার পাতলাদাস্ত। পল্‌সে (২০০)

২।১০।৮৮। আর অসুখ নাই। (গ্রঃ)

(৫)। হিন্দু, ৩০ বৎসরের পুরুষ, মাসাবধি জ্বরভোগ; বিকারাবস্থা, উদরাময়, ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম নাড়ী, কথার আড়াইয়া যাওয়া, জিহ্বায় পাটলবর্ণের লেপ, জিহ্বার বহিঃকরণে কম্পন; মাংসপেশীর স্পন্দন; অর্দ্ধ চৈতন্য; কাসি, আকর্ণনে পৃষ্ঠদেশে শ্বাস প্রশ্বাসে উভয় ফুস্‌ফুসে কুর্ কুর্ শব্দ; তাপ ১০৩০, সন্ধ্যায় তাহার বৃদ্ধি; সমস্ত রাত্রি প্রলাপ ও ছট্‌ফটানি; অত্যন্ত তৃষ্ণা। চিকিৎসক তাঁহাকে অন্যান্য ঔষধের পর ফুস্‌ফুসের অবস্থা দৃষ্টে ফস্ফোরস্ দিতেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হইতেছিল না। আমি তাঁহাকে রস্ টক্স (৬) প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। সপ্তাহ ইহার ব্যবহার হয়; ক্রমশঃ তাপের হ্রাস, উদরাময়ের বিলোপ, নাড়ীর সবলতা, জিহ্বার পরিষ্কৃততা, সম্পূর্ণ চৈতন্য প্রাপ্তি, ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি এবং সর্ব্বশেষে পীড়ার আরোগ্য। (গ্রং)

(৬)। ৬৪ বৎসরের পুরুষ। বেলা ১০টায় তাঁহাকে দেখি; এক ঘণ্টা কাল কম্প, তৎপরে উন্মত্ততা, শয্যায় বারম্বার অবস্থান পরিবর্ত্তন, গোঁঙ্গান, অধিক অঙ্গগ্রহ এবং নিম্ন শাখাঙ্গের পদডিম্ব পর্য্যন্ত গ্রাহ। প্রবল তাপ, নাড়ীর দ্রুতগতি, কিন্তু দুর্ব্বলতা; মুখমণ্ডল ও সর্ব্ব শরীরের আরক্ততা; কম্প ও তাপ কালে সামান্য তৃষ্ণা, বিশেষতঃ কম্প কালে; তাপান্তে ঘর্ম্ম ও শিরঃপীড়া। যন্ত্রণার আধিক্য হেতু তিনি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন নাই, কেবল দাবনার বেদনা সম্বন্ধে বলিলেন, অগ্রে কষ্ট নিবারণ না হইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। দাবনাদ্বয়ে কামড়ানি, ছেদ ও খাল ধরা বোধ হেতু,

আমি তৎক্ষণাৎ রস্ টক্স (২০০) দিলাম। ১০।১৫ মিনিটে যন্ত্রনার উপশম, অর্দ্ধ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়া নিদ্রা ও ঘর্ম্ম।

পর দিবস ঐ সময়ে সামান্য কম্পবোধ; দাবনায় সামান্য বেদনা; তৃষ্ণা যৎসামান্য বা কিছুই নহে, জ্বর নাই; দুগ্ধ সর্করা।

আর ছয় দিবস পরে লক্ষণ সমূহের পুনরুদ্রেক, কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রবল নহে। রস্ (১৭০০ ফিঙ্কের) কয়েকটী বটিকা, জিহ্বায় একবার। আরোগ্য। (আং)

ক্রমশঃ—

কলিকাতা } ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র, এম্, বি।
হোমিওপ্যাথি-প্রাক্‌টীসনার।

প্রতিবাদ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার পত্রিকার ৭ম খণ্ড ৩৫৫ পৃষ্ঠায় জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ-চিকিৎসাবিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিত হয় ও পরখণ্ডে (৮ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা) ব্যবস্থাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, ভারতীয় সদৃশ চিকিৎসা, ম্লেচ্ছ হানিমানের পূর্ব্বে এদেশে প্রচার হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক (দ্রষ্টব্য ৭ম খণ্ড পৃ ৩৫৮ ও ৩৫৯) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার নাম আদৌ উল্লেখ করেন নাই। আজ কাল সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই শাস্ত্র হইতে তোলা হইয়াছে ও দেববাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। মৈত্র মহাশয়ের ন্যায় বিপরীতাত্মিকা ও সদৃশ মতের আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজ নাই বলিলেও হয়, এই মহানগর কলিকাতার বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিত ও চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্নের কৃত কবিরাজ ও ডাক্তার সংবাদ নামক পুস্তকে ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে; আয়ুর্ব্বেদীয় মত যথা ঃ—"উপশয়ঃ পুনর্হেতুব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থকারিনাঞ্চৌষধাহারবিহারাণামুপযোগঃ

সুখাঁনুবন্ধঃ” বিপরীতাত্মিক অর্থাৎ Contraries are cured by means of contraries, অতএব উক্ত বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের মতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিসদৃশ, মৈত্র মহাশয়ের মত, ডাক্তার কেন বোধ হয় অনেক কবিরাজের পক্ষেও নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় মত শুনিলেন, আর ৮ম খণ্ড ২০৭—২১০ পৃঃ সদৃশ মতে বিসূচিকা চিকিৎসার বিসূচিকা বিধ্বংস রস ও তেলা পোকার দ্বারায় হিক্কা ও বমন নিবারণের ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়াছেন, ও কোন্ মূল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা লেখেন নাই। গ্রন্থের নাম ও অধ্যায় উল্লেখ করিয়া সাধারণকে জ্ঞাত করান উচিত। হানিমানের মতে সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করিয়া যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগে সেই ঔষধ প্রভৃতি ঔষধি বলিয়া পরিগণিত হয়। আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে হানিমানের ন্যায় ঔষধ পরিক্ষিত করিতেন কি না তাহা আমরা শুনি নাই, মৈত্র কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারায় আমরা অনেক অনেক নূতন কথা শুনিতেছি ঃ———গর্ভোৎপত্তি প্রবন্ধে দুইটী স্ত্রীলোক দ্বারা গর্ভোৎপত্তি, (দ্রঃ ৮ম খঃ ১০ পৃষ্ঠা) কবিরাজদিগের মধ্যে মৈত্র কবিরাজ মহাশয়ের ন্যায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ও গভীরতত্ত্ব সকল উদ্ধৃতকারি পণ্ডিত নাই বলিলেও চলে, বোধ হয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল, মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ইঁহা দ্বারাই উদ্ধৃত হইবে।

একান্তবশম্বদ

কলিকাতা—৫১ নং গড়পার।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

আশা করি, মৈত্রেয় কবিরাজ মহাশয় ডাক্তার শশী বাবুর প্রবন্ধের উত্তর খুব্ সংক্ষেপেই দিবেন ; কেন না এসকল কথা লইয়া আর বাড়াবাড়ি করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত না করাই ভাল।

চি, স, সম্পাদক।

নূতন ঔষধ।

(এলোপ্যাথি)

ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্।

১৮৯২ সালের জুলাই মাসের “প্রাক্‌টিসনার” নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় ডাক্তার গ্লুস্‌টো করোনেডাই ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ নামক ঔষধের বিবরণ লিখিয়াছেন।

ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ একটী নূতন ঔষধ। ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ নামক ধাতু হইতে প্রস্তুত। ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ও ব্রোমিন্ এই দুই দ্রব্যে ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ প্রস্তুত হয়। ষ্ট্রনসিয়ম্ পূর্ব্বে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত না। সর্ব্ব প্রথম লেবর্‌ডি নামক একজন পণ্ডিত পরীক্ষান্তে সপ্রমাণ করান যে, ষ্ট্রন্‌সিয়া নামক ধাতুর কোনরূপ বিষাক্ত গুণ নাই। লেবর্‌ডি বলেন (১) বিশুদ্ধ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ঘটিত লবণ সকল সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্দোষ ; এমন কি অধিক মাত্রায় প্রয়োগেও বিষ ক্রিয়া করে না। (২) ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ঘটিত ঔষধি সাধারণ পোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি করে। ইহাতে মনুষ্য এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণিস্থ জন্তুর ক্ষুধাবৃদ্ধি করে এবং শরীরের ভার বৃদ্ধি করে। (৩) ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ পুষ্টি কারক ঔষধ (৪) ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ঘটিত ঔষধ, বিশেষতঃ ল্যাক্‌টেট্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ প্রস্রাব বৃদ্ধি করে।

ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ বমন নিবারণের পক্ষে একটী মহৌষধ। ডাক্তার করোনেডাই বলেন্ যে, বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে একটী অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকের বমন রোগ হওয়ায় তিনি নানা প্রকার উপায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার শিক্ষক ডাক্তার বুকালিনিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন্। ডাক্তার বুকালিনি তাঁহাকে ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ নামক ঔষধ পরীক্ষা করিতে বলেন। তাঁহার পরামর্শ মতে ঐ ঔষধ ব্যবহারে ঐ স্ত্রীলোকের পাকস্থলীর যন্ত্রনা এবং বমন নিবারিত হয়। ইহা দেখিয়া ডাক্তার কারানেড়াই অন্যান্য বমনগ্রস্ত রোগীরও ইহার পরীক্ষা করেন। তিনি স্নায়ু প্রধান ধাতু রোগীদিগের পাকস্থলীর গোলযোগ বশতঃ সচরাচর যে বমন হইয়া থাকে, সেই সকল রোগীতে ইহার পরীক্ষা করেন্। সেই সকল পরীক্ষার ফল নিম্নে লিখিত হইল।

(১) ক—নামক পঁচিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক। তিন মাস গর্ভবতী। উদর প্রদেশে ভার বোধ, বমনোদ্বেগ ও বমন। পাকস্থলীর কোন যান্ত্রিক পীড়া বর্ত্তমান নাই। ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দুই বার আহারের সময় প্রদান করা হয়। বমন তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হয়। এক মাস যাবৎ চিকিৎসা করা হয়, যে সময় ঔষধ খাইত ভাল থাকিত, ঔষধ বন্ধ করিলেই বমন হইত। তৎপর কিছু দিবস পরে বমন ভাল হইয়া যায় এবং ঔষধ বন্ধকরা হয়।

(২) খ—বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর। ওমেন্‌টম্ ও যকৃতে ক্যান্‌সার হইয়া দুর্দ্দমনীয় বমন রোগ হয়। ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ৬০ গ্রেণ মাত্রায় এক সপ্তাহ প্রদান করাতে সামান্যরূপ উপকার হইয়াছিল।

(৩) গ—২৭ বৎসর বয়ঃক্রম। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক। গ্রন্থি বাত রোগে ভুগিতেছে। পাকস্থলীর ক্যাটার্ এবং দুর্দ্দমনীয় বমন। প্রত্যহ সাড়ে সাত গ্রেণ মাত্রায় মেন্‌থল্ নামক ঔষধি কোনই উপকার হয় না। ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় অহিফেণ ও বেলেডোনার সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংসের ঝোল পথ্য দেওয়া হয়। তাহাতে কোনই ফল হয় না। পরে কেবল মাত্র ১৫ গ্রেণ মাত্রায় শুদ্ধ ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ আহারের পূর্ব্বে দিন দুই বার দেওয়া হয়। প্রথম দুই বার করিয়া পরে তিন বার করিয়া দেওয়া হয়। চারি দিন পরে রোগের বিশেষ হইতে আরম্ভ হয়। তার পর রোগীর অজ্ঞাতে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম্ দেওয়া হয়, তাহাতে পুনর্ব্বার বমন আরম্ভ হয়। তৎপরে ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দেওয়াতেই পুনর্ব্বার বমন বন্ধ হয়। পর দিন সেবন করাতেই বমন বন্ধ হইয়া যায়।

(৪) ঘ—বয়ক্রম ৭১ বৎসর, অত্যন্ত বমন, তাহার সহিত অন্যান্য উপদ্রব। ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় দুই দিন দেওয়া হয় এবং তাহাতেই বমন বন্ধ হয়। এই রোগীটির পুরাতন গ্ল্যান্‌ডুনার গ্যাষ্ট্রাইটিস্ রোগ ছিল।

(৫) ঙ—রোগীনী ৪৫ বৎসর বয়স্কা। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত। এটনিক্ ডাইটেসন অব্ ষ্টিষ্টমাক্। থাকিয়া থাকিয়া বমন। তিন দিন পর্য্যন্ত ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দেওয়াতে বমি থামিয়া যায়।

(৬) চ—বয়ঃক্রম ১৯বৎসর। বমন ষ্ট্রন্‌সিয়ম দ্বারা আরোগ্য।

(৭) ছ—৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমের স্ত্রীলোক। গর্ভস্রাব হইয়া সেপ্টিসিমিয়া উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বমন হয়, ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় একবার মাত্র দেওয়াতে বমন নিবারণ হয়।

(৮) জ—রোগিণী হিষ্টিরীয়া পীড়াগ্রস্ত এবং তজ্জন্যই বমন। বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। ১১ দিবস যাবৎ প্রত্যহ ৩০ গ্রেণ পরিমাণ ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দেওয়া হয় এবং রোগের উপকার হয়। পরে রোগীর অজ্ঞাতে ব্রোমাইড্ অব্ সোডিয়ম দেওয়া এবং বমন পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়। পরে আবার ব্রোমাইড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দেওয়াতে বমন নিবারণ হয় এবং এক বারেই ভাল হয়। রোগী হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায়।

(৯) ঝ—বায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগী। হৃদয়ের পীড়া। একদিন কোন কারণ ব্যতীত হঠাৎ অত্যন্ত বমন আরম্ভ হয়, ব্রোমাড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দিন ৪৫ গ্রেণ মাত্রায় দেড়দিন খাওনাই বমন বন্ধ হয়।

(১০) ঞ—বয়ক্রম ২০বৎসর। হিষ্টিরিয়া। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইয়া বমন হয়। ব্রোমাড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ দেওয়ায় বমন বন্ধ হয়।

উপরোক্ত রোগীদিগের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ব্রোমাড্ অব্ ষ্ট্রন্‌সিয়ম্ পাকস্থলীর পীড়াঘটিত বমন রোগে একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দমনীয় বমনে ইহা অমোঘ ঔষধ। যেকোন কারণে হউক, পাকস্থলীর পীড়া হইয়া বমন হইলে ইহাতে নিবারিত হইতে পারে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং স্নায়ু দুর্ব্বল রোগীদিগের বমন রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঔষধটী সম্পূর্ণ নূতন। পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ডাক্তার শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ডাক্তার পুলিন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আমাদের ডাক্তার পাঠকগণকে এ নূতন ঔষধটীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

চি, স, সম্পাদক।

ধাতু-ব্যাখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন্ রোগে কি প্রকারে নাড়ীস্পন্দন হয়? কেমন করিয়াই বা রোগের অসাধ্যত্ব এবং মৃত্যুকাল নির্ণয় করা যায়? তৎসম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সেই সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু মীমাংসা হইতে পারে না। তন্মধ্যে আবার আরও কতকগুলি বিশেষ অবস্থা আছে। এক্ষণে সেই সকল অবস্থার কথাই বলা যাইতেছে।

ভারপ্রবাহ-মূর্চ্ছা-ভয়-শোক-প্রমুখ-কারণান্নাড়ী।
সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে ॥

যদি অধিককাল পর্য্যন্ত অতিশয় গুরুতর ভারবহন করা যায়, যদি সহসা কোন কারণে ভয় বা মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, যদি ইষ্টবিয়োগ-জনিত শোকে একান্ত অভিভূত হইতে হয়, তাহা হইলে সকলেরই নাড়ী ক্ষীণ অথবা একবারে স্পন্দনহীনা হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনও মৃত্যুচিহ্ন মনে করা যায় না। কেন না শুশ্রূষাদি দ্বারা ঐসকল কারণ অপনীত হইলে নাড়ী আবার সতেজ হইয়া উঠে। কেবল পৌষ মাঘ মাসের ঘোর শীত বলিয়া কোন কথা নাই, এইরূপ ঘটনা সকল সময়েই হইতে পারে।

পতিতঃ সন্ধিতঃ ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
শাম্যতে বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্ ॥

উচ্চ স্থানাদি হইতে পতন, ভগ্নাস্থি প্রভৃতির সন্ধান, অতীসার, অতিশয় স্ত্রীসঙ্গম জন্য অথবা যক্ষ্মাদি রোগ জন্য শুক্রধাতুর ক্ষয় হইলে যদি নাড়ীস্পন্দনহীনা হয়, তবে তাহাকেও মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এইরূপ ঘটনা শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই হইতে পারে।

অজীর্ণে বাতরোগে চ ব্যায়ামে মৈথুনে শ্রমে।
তপ্তাঙ্গে চাগমাক্রান্তে নাড্যব্যক্তা ন মৃত্যুকৃৎ ॥

অজীর্ণ, বাতরোগ, ব্যায়াম, মৈথুন-জন্য পরিশ্রম, অতিশয় রৌদ্র বা

অগ্নিসন্তাপ, জল হিমাদি দ্বারা অঙ্গ সমূহের অতিশয় শৈত্য ইত্যাদি কারণেও নাড়ী নিস্পন্দ হইতে পারে। ইহাও মৃত্যুর কারণ নহে। এই সকলের মধ্যে কেবল শেষোক্ত ঘটনাটীই শীতকালে হইয়া থাকে।

বালানামতিমূঢ়ানাং মূকানামপি দেহিনাম্।
উন্মত্তানামভিন্যাস-প্রমূঢ়-মনসামপি ॥
ব্যস্তং সমস্তং দ্বন্দ্বঞ্চ দোষরূপবিশেষতঃ।
শাম্যতে বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্ ॥

দুগ্ধজীবী বালক, মূক, মূর্চ্ছিত, উন্মত্ত এবং অভিচার ও অভিশাপাদি দ্বারা প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই অস্থির ভাবে কাল যাপন করে। তাহাদিগের মনের স্থিরতা, কর্ম্মের স্থিরতা, বাক্যের স্থিরতা এবং অঙ্গসঞ্চালনের কোনও স্থিরতা থাকে না। তজ্জন্য তাহাদিগের নাড়ীর গতিও সর্ব্বদা বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কখনও এক দোষ, কখন দুই দোষ, কখনও বা ত্রিদোষেরই আধিক্য লক্ষিত হয়। কোন সময় নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চলা, কখনও বা একবারেই নিস্পন্দা, আবার কোন কোন সময় থাকিয়া থাকিয়াও স্পন্দিতা হইতে থাকে। এই সকল সান্নিপাতিক অবস্থা দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগের জীবননাশের আশঙ্কা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন আরও কতগুলি অবস্থা আছে, তাহাতে নাড়ী একবারে স্পন্দনহীনা বা সন্নিপাতধর্ম্মিনী হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া তৎসমুদায় মৃত্যুচিহ্ন-জ্ঞাপক মনে করা উচিত নহে। নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারা মৃত্যুকাল নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ এই সকল বর্জ্জিত অবস্থা সুন্দররূপ অবগত হইতে হয়। তাহার পর পরীক্ষাকালেও একযোগে অনেকগুলি অবস্থা মনোমধ্যে সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা নিতান্ত দুরূহ। পূর্ব্বতন ঋষিদিগকেও অনেক সময় ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে হইত। সেই সকল ঋষিবর্গ অপেক্ষা আমরা আরও ক্ষীণবুদ্ধি এবং অদূরদর্শী সুতরাং পদে পদেই আমাদিগের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এই এই জন্যই পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে "কণ্ঠাগত প্রাণপর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।"

আর্য্যগণ চিকিৎসা বিদ্যার চরম উন্নতি করিয়াছেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ডাক্তারী

বিদ্যা অপেক্ষা অধিক উন্নত এবং অভ্রান্ত, এই সত্য কথা বলিতে আমি ত্রুটী করিব না। ইহাতে ডাক্তারগণ সন্তুষ্টই হউন আর বিরক্তই হউন, হইতে পারেন। এক্ষণে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইতেছে। তাহাতে হৃদয় যে নাড়ীর মূল নহে, উহা রক্তের মূল, তৎসমুদায় প্রদর্শন করা যাইবে। যাঁহারা নাড়ীপরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা যে হৃদয়ের ক্রিয়া এবং রক্তসঞ্চালনের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই, তাহা কখনই হইতে পারে না। ১৬০০ শত খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ডাক্তার হার্‌ভিসাহেব উহা আবিষ্কার করিয়াছেন, কি লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে যোগশাস্ত্র-বিশারদ ভগবান্ দত্তাত্রেয় এবং গৌতম প্রভৃতি ঋষিবর্গ প্রচার করিয়াছেন, তাহা সেই সময় বলা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ
জলপাইগুড়ী, দীনাবাজার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রকৃতপক্ষে শরীর ও মনকে নিরাপদ ও সম্যক্ সুস্থ রাখার জন্য পৃথিবীর অন্য সকল জাতি অপেক্ষা আর্য্য-ঋষিগণই যে অধিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে কথা এখন বিলাতী এম্ ডি ওয়ালারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং অন্য পরে কা কথা ?

চি, স, সম্পাদক।

মৃত্যুবৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জীবন রক্ষার উপায়।

নিউইয়র্ক নগরের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম্ টি, লস্ক্ M.D. সাহেবের মত।

(On Life-saving methods in Still-birhs.)

মৃতবৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার সাধারণ চিকিৎসা প্রণালী :—বায়ুনলী পরিষ্কার করিয়া দিবে, মেড্যুলার উত্তেজনা পুনঃ স্থাপিত করিবে, হৃদ্‌পিণ্ডের আকুঞ্চন ক্রিয়ার বল বৃদ্ধি পক্ষে চেষ্টা করিবে, হৃদ্ পিণ্ড ও বক্ষঃকোটরস্থ শোণিতবাহী সকলের রক্তাধিক্যের সংযমন করিবে।

শিশুর পৈশিকবল অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই উপদেশগুলি সহজে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়; অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর মুখবিবরস্থ ও গলাভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মা

বাহির করিয়া দিবে। নাসাপথ রুদ্ধ থাকিলে মুখে মুখ দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে। সামান্যরূপ আঘাত দ্বারা বা চিম্‌টি কাটিয়া শিশুকে কাঁদাইবে। পুনঃ পুনঃ উষ্ণ ও শীতল জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার উত্তেজনা পক্ষে চেষ্টা করিবে। এই পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রণালী সকলেরই বিদিত কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, শিশুর শরীরের চর্ম্ম ধূসর বর্ণ প্রাপ্ত, হৃদ্ পিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও জীবন কেবলমাত্র কিয়ৎ সময় জন্য রক্ষিত হইয়াছিল, পরে বিষাক্ত শোণিত সঞ্চালন বশতঃ শিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই সাংঘাতিক অবস্থা ফুস্‌ফুসের অসম্পূর্ণ প্রসারণ ও ইহার কোন অংশের রক্তাধিক্যবশতঃ হইয়া থাকে, এই অবস্থা প্রতিষেধ পক্ষে (Schultze) সল্‌জ্ সাহেবের আদিষ্ট প্রকরণের তুল্য আর দ্বিতীয় নাই।

সল্‌জ্ সাহেবের আদিষ্ট প্রকরণ :—চিকিৎসক এরূপভাবে শিশুকে ধরিবেন, যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটী এণ্টিরিয়র্ থোরাসিক্ ওয়ালের (সম্মুখ বক্ষঃ প্রাচীরের) উপর, তর্জ্জনী অঙ্গুলি (ইন্‌ডেক্স ফিঙ্গার) কক্ষপ্রদেশে (এক্‌জিলা) এবং অপর অঙ্গুলিগুলি বক্ষঃপ্রাচীরের পশ্চাৎদিকে ডায়াগোন্যালি স্থাপিত হইবে। তৎপরে চিকিৎসকের উভয় হাঁটুর মধ্যে উভয় হস্ত ধৃত অবস্থায় মস্তক সম্মুখদিকে করিয়া শিশুকে ধরিয়া তুলিবে। এই অবস্থায় পেক্‌টোরাল্ পেশী দ্বারা ঊর্দ্ধাংশের পর্শুকাস্থিগুলি ঊর্দ্ধদিকে ও উদর-প্রাচীরের পেশী দ্বারা নিম্নাংশের পর্শুকাস্থিগুলি নিম্নদিকে আকর্ষিত হয় এবং যকৃতের ভারে ডায়াফ্রাম্ পেশী নিম্নদিকে ঝুলিয়া আইসে। এইরূপ হওয়ায় বক্ষের ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত হয় ও শিশু শ্বাস গ্রহণ করে। তৎপরে সমতলে না আসা পর্য্যন্ত শিশুকে ঊর্দ্ধদিকে তুলিবে। এবম্প্রকারে তুলিতে শিশুর লম্বার স্পাইন্যাল্ প্রদেশের ফ্লেক্‌সন্ কার্য্য হয়, মস্তক নিচুদিকে যায় এবং সমস্ত শরীরের ভার চিকিৎসকের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে না আসা পর্য্যন্ত নিম্নাশাখাদ্বয় তাঁহার দিকে আসিতে থাকিবে। এমতে বক্ষঃ ও উদর সবেগে সঞ্চাপিত হয়, ডায়াফাম্ পেশী ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে এবং শিশু শ্বাস ত্যাগ করে এবং বায়ুনলীতে যদি কোন পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে বহির্গত হইয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় উত্তোলিত করিয়া শিশুকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিলে শিশু শ্বাস গ্রহণ করে, কারণ ইহাতে বক্ষঃ প্রসারিত হয় ও ডায়াফ্রাম্ নিম্নদিকে আইসে।

উল্লিখিত উপায়ে কেবল যে ফুস্‌ফুসের সংশোধন হয় তাহা নহে, শ্বাস

গ্রহণ কালে বায়ুনলী দ্বারা কোন পদার্থ ফুস্‌ফুসে নীত হইলে তাহা বহিষ্কৃত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় আর একটী অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সংসাধিত হয়, যেহেতু বক্ষঃগহ্বরস্থ সমস্ত যন্ত্রাদির সংকোচন বশতঃ পরিপূরিত শোণিত-বাহী শিরা সকলের শোণিত অপসারিত হইয়া সমূহ উপকার দর্শে। ঊর্দ্ধ-দিকে উত্তোলিত হইলে যেমত প্রশ্বাস কার্য্য হয়, অমনি হৃদ্‌পিণ্ডের বাম কোটর হইতে শোণিত এওয়ার্টা অভিমুখে বাধিত হয় এবং দক্ষিণ কর্ণ হইতে দক্ষিণ কোটরে যায়। বাম কোটর খালি হইয়া বাম কর্ণস্থ শোণিতের জন্য স্থান হয় এবং পল্‌মনারি শিরা হইতে শোণিত প্রত্যাগত হইতে দেয়। দক্ষিণ কোটর হইতে অবশিষ্ট শোণিত ডক্‌টস্ আর্টিরিওসস্‌দিয়া এওর্টায় যায়। শরীর উত্তোলনের সময়ে শ্বাস গ্রহণ কালে পেরিফিরাল্ ভেমল্ অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের বহিঃস্থ শিরা সকল হইতে শোণিত বক্ষঃগহ্বরস্থ শিরা সকলে যায়। এই শোণিত সাধারণতঃ শৈরিক; যেহেতু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কবাটগুলি এওয়ার্টা হইতে শোণিত পুনঃ প্রত্যাগত হইতে দেয় না। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কার্য্য জন্য শিশুশরীর উত্তোলিত হওয়া হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থাপিত হয়। হৃদ্‌গহ্বর মধ্যে শোণিতের গতি হওয়ায় হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় এবং ধামনিক প্রসারণ বর্দ্ধিত হয়।

গভীর শ্বাসকষ্ট কালে, পৈশিক বলক্ষয় হইলে হৃদ্‌স্পদন কদাচিৎ অনুভূত হয়, এমত অবস্থায় উল্লিখিত প্রকরণগুলি অতি মৃদুভাবে করিতে হইবে, নচেৎ সহসা হৃদ্‌পিণ্ড উত্তেজিত হইলে অচিরাৎ হৃদ্‌স্পদন লোপ পাইবে।

একটী টেবিল বা সমতল স্থলে শিশুকে উষ্ণ বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করাইবে। শিশুর মুখবিবরের এবং নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক পদার্থাদি পরিষ্কার করিয়া, অতি সাবধানে চিকিৎসকের বাম হস্তের অঙ্গুলির পার্শ্ব দিয়া লেরিংসের ভিতর দিয়া ট্রেকিয়ার ভিতরে একটী ৮ নম্বরের ইল্যাষ্টিক্ ক্যাথিটার প্রবিষ্ট করাইবেন ও যে সকল পদার্থ শিশু শ্বাস গ্রহণ অভ্যন্তরে গিয়াছিল, ক্যাথিটারে মুখসংযোগ-পূর্ব্বক তাহা চুষিয়া বাহির করিয়া লইবেন। ইহাতে অবশ্য সময় লাগে এবং নলটী পুনঃপুনঃ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইতি-মধ্যে সময়ে সময়ে নল দ্বারা বায়ুনলীতে ফুঁ দিতে হইবে। এমতে ক্রমে ক্রমে শোণিতে অক্‌সিজেন প্রাপ্ত হয় ও ফুস্‌ফুসের শ্বাস প্রশ্বস-কার্য্য দ্বারা মেড্যুলার উত্তেজনা পুনঃস্থাপনা অনুভূত হয়। তৎপরে সিল্ ভেষ্টার সাহে-

বের ব্যবস্থাপিত প্রকরণ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে বায়ুকোষ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয়। এই সময়ে শিশুর জিহ্বাটী বহির্দ্দিকে টানিয়া রাখিতে হইবে। শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শ্রুত হইবামাত্র তাহাকে উষ্ণ জলে রাখিতে এবং মুখমণ্ডলে শীতল জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে শিশুর শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে আনয়ন করিবে।

গভীর শ্বাসকষ্ট জন্মিলে চিকিৎসক কদাচ ব্যস্ত হইবে না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সতর্ক ভাবে এবং স্থিরচিত্তে প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিবেন। কখন কখন হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে আরম্ভ হওয়ার পরে হঠাৎ বন্ধ হয়, তখন পুনরায় ক্যাথিটার্ প্রয়োগ দ্বারা ফুৎকারপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

প্রসবান্তে শোণিতস্রাবের কারণ ও চিকিৎসা।

(On the causes and treatmont of Potrtune Hemorrhage)

সটা (Schauta) সাহেব প্রসবান্তে শোণিতস্রাবের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসক ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন যে, জরায়ুর দৌর্ব্বল্য-বশতঃ রোগ জন্মিয়াছে, তদ্ব্যতীতও অন্যান্য কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যথাঃ— জরায়ু-পেশী সকলের জরায়ু-মুখ সংকোচন ও রোধ করিবার ক্ষমতাভাব; জরায়ুর শোণিত বাহী শিরা সকলের প্রসারণ, অপকৃষ্টতা ও এরিথোমা প্রভৃতি রোগ প্লাসেণ্টার (ফুলের) আংশিক অবরোধ; জননেন্দ্রিয়ের বিদারণ; প্রসবকালে ভেরিকোজ্ ভেইন্ সকলের বিদারণ; জরায়ুর নিম্নাশের বিদারণ; মাইওমেটা এবং কার্সিনোমেটা প্রভৃতি অর্ব্বুদ বর্ত্তমান থাকিলে প্রসবকালে তাহার বিদারণ ইত্যাদি। এই সকল অবস্থায় প্রধান চিকিৎসা এই, যে, প্লাসেণ্টা এরূপভাবে বহিষ্কৃত করিতে হইবে যে, তাহাতে জরায়ুর শিথিলতা বা শোণিতস্রাব না ঘটে। সটা সাহেব বলেন যে, প্রসবান্তে অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে প্লসেণ্টা বহিষ্করণ-পক্ষে চেষ্টা করা উচিত নহে, এবং দুই বা তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজন মতে তৎপরে হস্ত দ্বারা ইহা বহিষ্কৃত করিবে। ফুল

বহিষ্করণ পক্ষে ক্রেডি উপায়ই প্রশস্ত। জরায়ুর দৌর্ব্বল্য-বশতঃ শোণিতস্রাবে উষ্ণজল বা এতৎসহ কোনরূপ এণ্টিস্পেটিক্ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জরায়ু ধৌত করিয়া দিবে, কিন্তু বাইক্লোরাইড্ অব্ মার্করি এণ্টিস্পেটিক রূপে এরূপ অবস্থায় প্রযুজ্য নহে। আর্গটিনের অধঃত্বচ্ প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। জরায়ু মধ্যে কোনরূপ রক্তরোধক বস্তুর স্থানিক প্রয়োগ ঘৃণার্হ। আইওডোফরম্ গজ্ লুটিরূপে প্রয়োগ করিয়া কেহই উপকার প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেবল সটার্ সাহেব উপকার পাইয়াছেন কহেন। অবিরামরূপে ও অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে, জরায়ু মধ্যে প্লাসেণ্টার্ স্থান হইতে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত শোণিতবাহী শিরা হইতে শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে, কক্ সাহেবের আদিষ্ট উপায় বিশেষ কার্য্যকরী। কক্স্ সাহেবের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জরায়ু উল্টাইয়া ফেলিয়া সার্ভিক্সের নিকট একটী ইল্যাষ্টিক্ বন্ধনী প্রয়োগ করিবে এবং আইওডোফরম্ গজ্ লুটিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ছয় ঘণ্টা পরে ইল্যাষ্টিক্ ব্যাণ্ড খুলিয়া জরায়ুকে পূর্ব্বাবস্থায় রাখা যাইতে পারে। প্লাসেণ্টার কোন অংশ সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে, সেই অংশ বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিলেই শোণিতস্রাব বন্ধ হইবে। জননেন্দ্রিয়ের কোন অংশ ছিন্ন হইয়া শোণিতস্রাব হইতে থাকিলে তাহা সেলাই করিয়া বা বন্ধনী প্রয়োগ করিয়া বা লুটির দ্বারা তাহা রোধ করা যায়। শোণিতক্ষয়-বশতঃ নীরক্ততায় সজল লাবণিক দ্রব (Saline Solution diluted) প্রয়োগ সমধিক উপকারী। সটার সাহেব একটি রোগীর পরিচয়ে বলিয়াছিলেন ল্যাপরোটমী অস্ত্রকার্য্যের পর অত্যন্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে, ইহার চারি ঘণ্টা পরে পুনরায় উদর-গহ্বর উন্মুক্ত করিয়া সংযত শোণিত ও বিশুদ্ধ শোণিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই শোণিতস্রাব ও আশঙ্কিত এনিমিয়া রোগ স্যালাইন্ ট্রান্স্ফ্যুসন্ দ্বারা সত্বরে প্রশমিত হইয়াছিল। চিকিৎসা-দর্শন।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

উপরোক্ত উভয়প্রবন্ধেই অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, অতএব আশা করি যে, পাঠকগণ এসকল প্রয়োজনীয় কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

চি, স, সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথিক মতে

ঔষধের গুণ।

সেলিনিয়ম। Selenium

চূর্ণাকারে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, যকৃতের পুরাতন পীড়া।

ডাঃ নির্ডাহ অনেক প্রমেহ রোগী আরোগ্য করিয়াছেন, যাহাদিগের হরিদ্রা বর্ণের ঘন প্রচুর পরিমাণে প্রমেহ স্রাব হইয়াছিল, এবং তিনি আরও বলেন যাহারা পূর্ব্বে গুটীমালা কিম্বা ফুস্ফুসের পীড়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ধ্বজভঙ্গ রোগের পক্ষেও এ ঔষধ উৎকৃষ্ট।

মস্তক। জড়তা বোধ, আহার অন্তে মস্তক কম্পন ও মূর্চ্ছা, বমন প্রত্যহ বৈকালে অথবা চা, লিমনেট ও মদ্য পানান্তে শিরঃপীড়া, সম্মুখ ও পশ্চাৎ মস্তকে চাপ বোধ।

চক্ষু। অক্ষি কোঠরে বেদনা, শিরঃপীড়ার সহিত চক্ষুর তারিতে চাপবোধ, চক্ষের চুল পতন।

নাসিকা। বেদনা, নাসিকার মধ্য পর্দ্দায় ক্ষত বোধ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় থাবা থাবা হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা মিশ্রিত সর্দ্দি নির্গত হয়, জ্বর।

দন্ত। দন্তশূল, ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তে বেদনা, বহির্বায়ুতে, ঠাণ্ডা জলে ও পান আহার অন্তে বেদনার শান্তি।

জিহ্বা। প্রাতে পুরু ও সাদা শ্লেষ্মা যুক্ত, বেদনা।

মল। শক্ত, কঠিন দাস্তের সঙ্গে রক্ত ও শ্লেষ্মা নির্গত, মলদ্বারে যন্ত্রনা বোধ।

মূত্র। প্রস্রাব অন্তে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ, রাত্রে পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ, কালচে রং প্রস্রাব। সন্ধ্যার সময় লাল বর্ণ মূত্র।

ডাঃ উল্ফ বলেন টাইফস জ্বরের পর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

স্যাম্বুকস্। Sambcus.

বল্কল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

প্রতিশয় ঘর্ম্ম, শিশুদিগের কাশী, শ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ কর সর্দ্দি, জ্বর, ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত, নাসারন্ধ্র শুষ্ক, প্রসবের পরে দুর্ব্বল কর ঘর্ম্ম, সমস্ত শরীর কম্প, লিখিবার সময় হাত কাঁপে,। শোথ।

মন। অস্থির।

মস্তক। জড়তা, মস্তকের সম্মুখে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা।

চক্ষু। চক্ষুর কনিকা সঙ্কুচিত ও ক্ষণ কাল পরে প্রসারিত।

নাসিকা। চাপ বোধ, যেন শ্লেষ্মা দ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

উদর গহ্বর। ছিমটী কাটার ন্যায় ও জ্বালা যুক্ত বেদনা, আক্ষেপক বেদনা।

মুখমণ্ডল।— নিলাভাযুক্ত কিম্বা রক্তাভাযুক্ত, মলিন।

হাতপা।—ভারি বোধ, হুলবেদনাবৎ অথবা টেনে ধরার ন্যায় বেদনা।

মূত্র। সর্ব্বদা প্রস্রাবের ইচ্ছা, উজ্জল হরিদ্রা বর্ণের প্রস্রাব।

জয়নগর, } শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
এল, এইচ, এম, এস্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রবন্ধ লেখকের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে জ্ঞান কতদূর পাকা, যদিও আমরা তাহা কিছুমাত্র অবগত নহি, তবে তিনি যে খুব্ কাঁচা লেখক, ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এরূপ কাঁচা লেখা চিকিসা-সম্মিলনীতে স্থান পাওয়ারও সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতএব ভবিষ্যতে আর এরূপ প্রবন্ধ অপ্রকাশ্য।

চি, স, সম্পাদক।

হোমিওপ্যাথিক মতে

দন্তশূল।

TOOTH-ACHE.

দন্তশূল একটী কষ্টদায়ক রোগ। এই পীড়া হইলে রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অনেক কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে;—দন্তক্ষয়, দন্তভাঙ্গা, পেটের পীড়া, হটাৎ ঠাণ্ডা অথবা গরম লাগিয়া, বাত, পারদসেবন, স্নায়বিক পীড়া ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই পীড়া জন্মাইলে দন্ত মূলে কন্‌কনানি, ঝন্‌ঝননি, বেদনা, অতিশয় শিরঃপীড়া ইত্যাদি অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

দন্তশূল হইলে প্রথমে প্লাণ্টেগো ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে। ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তের গোড়াতে প্রদাহ হইলে মার্ক্—সল ৩ য় ক্রম দিবে। যদি দন্তমূল ফুলিয়া প্রদাহ হয়, তবে এপিস ৩ য় ক্রম মার্ক্—সলের সঙ্গে পর্য্যায়, ক্রমে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে। আহার কালীন দন্তমূলে কেলাই-কার্ব্ব দিবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে ক্যাল—কার্ব্ব ৬ য় ক্রম দিবে। গরমে রোগ বৃদ্ধি হইলে ক্যামোমিলা ৬ য় ক্রম ব্যবস্থা করিবে। গর্ভাবস্থায় এই রোগ হইলে ক্যাল—কার্ব্ব ৬য় ক্রম ও সিপিয়া ৬ য় ক্রম ব্যবহার করিবে, শয়ন কালীন অসহ্য বেদনা হইলে ম্যাগ্নেসিয়া—কার্ব্ব ৬ য় ক্রম ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে।

একোনাইট।— অসহ্য বেদনা, স্নায়বিয় উত্তেজনা, মস্তকে রক্তাধিক্য, জ্বর, ১+৬ ক্রম।

এই ঔষধের অমিশ্র আরক (মাদারটিংক্চার) তুলায় ভিজাইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত দন্তে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রনা নিবারণ হয়।

বেলেডোনা।—আহার অন্তে, বৈকালে, দন্তস্পর্শ করিলে ও ঠাণ্ডা লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি, শিরঃপীড়া, অতিশয় দন্তশূল, মুখে লালা উঠে, দন্তমাড়ী স্ফীত, জ্বর, পিপাসা, ৬।৩০ ক্রম

ক্যামোমিলা।— রাত্রে অসহ্য বেদনা, শিরঃপীড়া, দন্তমূলে চিড়িক মারিয়া উঠে, গরমে ও ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, দন্তনড়া, গণ্ডস্থল লালবর্ণ ও গরম বোধ, ৬।১২ ক্রম।

মার্কুরিয়স-সল।—সমস্ত মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কে বেদনা; ছিঁড়েফেলার ন্যায় বেদনা, আহার অন্তে বেদনার বৃদ্ধি, দন্তমাড়ী স্ফীত, ঘর্ম্ম, মুখে লালা স্রাব, ৩।৬ ক্রম।

পালসেটীলা।— দন্তমূলের বেদনার দরুণ কর্ণে, মস্তকে, মুখে ও চক্ষে বেদনা, অস্থির বেদনা, সন্ধ্যাকালে ও গরম গৃহে বেদনার বৃদ্ধি, সূচ বেদনার ন্যায় বেদনা। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় ও রজঃবন্ধ অথবা সল্প রজঃ অবস্থায় দন্তরোগ হইলে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ উপকার হয় ৬।১২ ক্রম।

নক্সভমিকা।—কোষ্ঠ বদ্ধ, দন্তমাড়ীতে টাটানি, দন্তমাড়ী স্ফীত, রোগী খিটখিটে, ৬।৩০ ক্রম।

ষ্টেফাইসেগ্রিয়া।— ঠাণ্ডায় বেদনার বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রাপ্তদন্ত, সকল দন্তে বেদনা, চিড়িক মারিয়া উঠে, কন্‌কনানি, মুখ ও হাত পা শীতল, ঘর্ম্ম, স্নায়বিয় বেদনা, ৬।১২ ক্রম।

ব্রায়ওনিয়া। খোচানে বেদনা, রাত্রে ও গরমে বেদনার বৃদ্ধি, পিপাসা, কোষ্ঠ বদ্ধ, রোগী খিটখিটে, নিস্তেজ, বেদনা নড়িয়া বেড়ায় ৬।৩০। ক্রম।

জয়নগর। } শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
এল, এইচ, এম, এস্।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

ষত্বাদি-বর্ণ-জ্ঞান-বর্জ্জিত লেখক মহাশয়ের এ প্রবন্ধটীও এবারে চিকিৎসা সম্মিলনীতে স্থান পাইল! কিন্তু আর নহে। তবে এই দন্তশূল সম্বন্ধে একটী কথা কিন্তু এস্থলে না তুলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অনেক দিন হইতে অনেক বড় বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহাশয়ের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, "যেমন দন্তশূলই হউক না কেন, হোমিওপ্যাথি মতে এক বিন্দু ঔষধ সেবনে তৎক্ষণাৎ আরাম হইতেই হইবে" বলা বাহুল্য প্রায় ৩।৪ বৎসর

পূর্ব্বে আমার এক দিন ভয়ানক দন্তশূল আরম্ভ হয়, কোন ঔষধেই কিছু হয় না। তার পর আমি ক্রমান্বয়ে খুব বড় নামজাদা ডাক্তার তিন জনের নিকট কিছু গমন করি, শেষটা ৪র্থ নামজাদা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মহাশয়ের নিকট যাওয়াতেই তিনি একটু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানটা চিরিয়া একটু এলোপ্যাথি ক্লোরফরম্ লাগাইয়া আরাম করিয়া দেন। ইহার অধিক আর কি বলিব?

চি, স, সম্পাদক।

চিকিৎসা-ব্যবসায়।

চিকিৎসা-ব্যবসায় পূর্ব্বে একমাত্র বৈদ্যজাতির ভিতর আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র এদেশে প্রচলিত হইবার পর হইতে প্রায় সকল জাতীয় লোকেই এই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসা ব্যবসায়ী দেখা যায়। ১ম শিক্ষিত ডাক্তার, ২য় শিক্ষিত কবিরাজ ও ৩য় হাতুড়ে কবিরাজ এবং ডাক্তার। নানাকারণে শেষ শ্রেণীর সংখ্যা এদেশে অধিক। বিশেষতঃ মফঃস্বলে কত রোগী যে এই সকল অব্যবসায়ী মুর্খদের হস্তে প্রাণ হারায়, তাহা বলা যায় না। মানুষ সহজেই অপরের উপর বিশ্বাস করে। বিশেষতঃ যখন কেহ দীর্ঘকাল পীড়াতে ভুগিতে ভুগিতে নিজের সাহস ও মনের বল হারান, তখন তিনি সহজেই ইহাদের হস্তের শীকার হইয়া ধরা পড়েন। ইহাদের জাল সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই বিস্তৃত। শিক্ষিত চিকিৎসক বলিলেন, কোন রোগ আরোগ্য হইবার আশা অল্প; ইহারা তখনই আসিয়া বলিবে অমুক সময় এতজন রোগীর এই রোগ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সকলেই তাহাদের ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে। চিকিৎসক বলিলেন, কোন একটি রোগে অস্ত্র চিকিৎসা আবশ্যক; ইহারা তখনই বলিতে লাগিল, বিনা অস্ত্র চিকিৎসায় শত শত রোগী ইহাদের হস্তে এই রোগ হইতে আরোগ্য হইতেছে। পুরাতন দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্যাধি ও অস্ত্র চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যাধি ইহাদের শীকারের সুযোগ করিয়া দেয়। এমন রোগ নাই, যাহা তাহাদের হাতে আরোগ্য না হইয়াছে অথবা হইতে না পারে। সুচিকিৎসকের অসাক্ষাতে নিন্দা ও

আক্রমণ ইহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। শত সহস্র অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক ইহাদের দালাল। ইহাদের দোকানের সম্মুখে কত বিজ্ঞাপন ঝুলিতে থাকে কে তাহার সংখ্যা করিবে? নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের সংখ্যা শিক্ষিত চিকিৎসকদিগের সংখ্যার শতগুণ। এ পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের ইংরাজী ক্লাস হইতে প্রায় নয় শত ভারতীয় যুবক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কটক, ঢাকা ও শিয়াদহের মেডিকেল স্কুল হইতেও প্রায় ২০০০ চিকিৎসক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এই হাতুড়েদের সংখ্যা ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। চিকিৎসা ব্যবসায় যেমনই দায়িত্বপূর্ণ, ইহারাও তেমনই সকল প্রকার দায়িত্বের উপর পদাঘাত করিয়া প্রবঞ্চনা ও মুর্খতা দ্বারা জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহারা যে কেবল চিকিৎসকদিগের শত্রু, তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত সমাজের শত্রু এবং সভ্যতার শত্রু। যত শীঘ্র সমস্ত সমাজের বল ইহাদের দমনের জন্য প্রযুক্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রেজিষ্ট্রেশন থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা College of Surgeons বা College of Physicians ইত্যাদি সমিতির পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি ভিন্ন কেহ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়, কিন্তু এ দেশে রাজশক্তি আজিও মুর্খ হাতুড়েগণকে দমন করিতে অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। আশা করা যায় অল্প কাল মধ্যে ইহার সুব্যবস্থা হইবে।

আমাদের শাস্ত্র মতে চিকিৎসকের অন্যান্য গুণের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলিও থাকা আবশ্যক, যথা—

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশোদৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণ চতুষ্টয়ম্॥

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতে বহুদর্শিতা, দক্ষতা ও নির্ম্মল ভাবে পবিত্রতা রক্ষা করাই চিকিৎসকের চারি প্রকার গুণ।

মৈত্রী কারুণ্যমার্ত্তেষু শক্যে প্রীতিরাপেক্ষণং।
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবৃত্তিশ্চতুর্বিধেঃ॥

রোগীর প্রতি মিত্রভাব ও দয়া, সমর্থ ব্যক্তির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন, প্রকৃতিস্থ প্রাণীদিগের প্রতি উপেক্ষা, এই বৈদ্যের চারি প্রকার বৃত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের আদর্শ চিকিৎসক হওয়া আরও কঠিন। মহাত্মা

মেথু আর্ণল্ড কোন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রধান ফল হৃদয়ের কোমলতা (Sweetness) এবং জ্ঞান (Light)। আমাদের ব্যবসায়ে এতদুই বস্তুর প্রত্যেকের অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক এই দুই জিনিষের কোন আদর্শই চিকিৎসকের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চ হইতে পারে না। প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞান কি প্রকারের হওয়া আবশ্যক, তাহা দেখা যাউক। মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান শত্রু মৃত্যু, তাহার অগণ্য রোগরূপী সৈন্য সামন্ত লইয়া আমাদের সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। পৃথিবীর যত বিষ তাহা, আমাদের অস্ত্র শস্ত্র। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞান আমাদের প্রধান বল। এরূপ অবস্থায় আমাদের কত কৌশল, কত চেষ্টা ও কত চিন্তা শক্তির বিকাশের প্রয়োজন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শত সহস্র লোকের শরীর, মন, প্রাণ, সুখ, সম্পদ, শান্তি, ধন, মান, সম্ভ্রম আমাদের উপর নির্ভর করে। এ সকল স্থলে আমরা যদি অজ্ঞানতার জন্য তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে না পারি, তবে আমরা তাহাদের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে অপরাধী। আমি যতদূর জানি, ততদূর চেষ্টা করিয়াছি বলিলে আমাদের দায়িত্বের শেষ হইল না—যদি এই সময়ে চিকিৎসকসমাজে আমার যাহা জানা আছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান প্রচলিত থাকে, তবে আমার তাহা জানা উচিত। লোকে আশা করে, আমরা অনেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিব। আমরা যখন লোকের সর্ব্বস্ব লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকি, তখন এ আশা অন্যায় বলিতে পারি না। আমরা যাহাতে এই আশার উপযুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য আমাদের দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া চেষ্টা করা উচিত।

এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগে জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি কিন্তু এস্থলে কিছু বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজিকালি পাশ্চাত্য জগৎ এই জ্ঞানগৌরবে বিভূষিত হইয়া সমস্ত জগতকে পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে। আজি কত ভিরকো, কত কক্, কত ফ্লেজার, কত ব্রাউণলিকার্ড আজীবন কঠোর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, মানবজাতির রোগ শোকের ভার কামাইতেছেন। স্বয়ং প্রকৃতি-অনুসন্ধিৎসু পুত্রগণের প্রবলা সাধনার সম্মুখে নিজ হৃদয় খুলিয়া তন্নিহিত গূঢ়

সত্য সকল অবাধে বিতরণ করিতেছেন। তাড়িত প্রভৃতি প্রবল প্রাকৃতিক বল, সাধনার কাছে ধরা দিয়া মানবের রোগনিবারণে ও সুশ্রুষায় নিযুক্ত হইয়াছে। দিনের পর দিন নূতন নূতন আবিষ্কার আমাদের রোগ দমন ও রোগ নিবারণের পথ প্রশস্ত করিতেছে।

এই সাধনার আজ্ঞায় অস্ত্রচিকিৎসাকালে মানবের চৈতন্য তাহাকে যন্ত্রণা দিবার ভয়ে সরিয়া দাঁড়ায়, পচনক্রিয়া ক্ষতাদি হইতে দূরে পলায়ন করে; এবং বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র চিকিৎসার পর ক্ষতাদি ২১ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। ইহারই বলে শত সহস্র রোগ চিরদিনের বাসস্থান ছাড়িয়া দূরে যাইয়া সরিয়া দাড়ায়। এমন সুসময়ে যদি কেবল আমাদের অলসতায় আমরা নিজেদের ও সমাজের ক্ষতি করি, তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা অপরাধী কে আছে? দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিতে হইবে। তবে আমরা সংসারের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব।

কিন্তু যদিও চিকিৎসকের পক্ষে জ্ঞান একটি নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়, তথাপি এ সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্বের সীমা আছে। কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে ও কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ হৃদয়ের কোমলতার (Sweetness) অভাব চিকিৎসকের পক্ষে কখনই ক্ষমাযোগ্য নহে। মানবের দুর্দ্দশা দূর করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ জন্য চিকিৎসক যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন; কত যত্ন, কত আয়াস, কত পরিশ্রম করিতে পারেন; কত প্রেম, কত সহানুভূতি, কত দয়া অনুভব করিতে পারেন, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। একদিকে যেমন প্রভূত জ্ঞানের আবশ্যক, অপর দিকে তেমনই অহেতুকী কোমলতার নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যবহারজীবি, পূর্ত্তজীবি প্রভৃতি লোকদিগের ব্যবসায়ের ন্যায় চিকিৎসা ব্যবসায় কেবল অর্থোপার্জ্জনের অন্যতম উপায় নহে। মানবের দুর্গতি দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য। যত্ন, পরিশ্রম, সহানুভূতি ও বিদ্যা দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে ধনসম্পদ প্রভৃতি ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে পারে। কিন্তু যে মূঢ় এ সকল ছাড়িয়া কেবল স্বার্থের দাস হইয়া কোন প্রকারে অর্থের পূজা আরম্ভ করে, চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তবে প্রকৃত চিকিৎসকের যে পরিমাণ জ্ঞান, সেই পরিমাণে

হৃদয়ের কোমলতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ এ সংসারে এ দুইটি জিনিষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সত্যের সেবক জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি সংসারকে যত ভালবাসিতে পারে, এত আর কে পারে?

চিকিৎসকের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, আজকাল পাশ্চাত্য জ্ঞান তাহাই বলেন।

সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংগ্রাম করিতে হয়। যদি এই জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে জীবন, নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়। আমাদের সংগ্রাম প্রধানতঃ রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি জীবের চিরশত্রুগণের সহিত। কিন্তু সে সংগ্রামে আমাদের অনেক আশার স্থল আছে। তাহাতে আমাদের বল দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ব্যায়ামের ন্যায় এই সংগ্রাম দিন দিন আমাদিগকে বাঁচিবার অধিক উপযুক্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আমাদের আরও কতকগুলি শত্রু আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান মূর্খ হাতুড়ে চিকিৎসকগণ। ইহাদের সহিত সংগ্রামেও জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল ও সহায়। আমরা যতই আমাদের জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তৃত করিতে পারিব, ততই ইহারা পলায়ন করিবে।

* * * *

বাঙ্গালা দেশের লোকসংখ্যা ৭।০ কোটী, তন্মধ্যে দুই তিনি সহস্র শিক্ষিত চিকিৎসক সমুদ্রে বারিবিন্দুর ন্যায়। কাজেই এত হাতুড়ের প্রাদুর্ভাব। এই জন্যই আমরা স্কুল মাষ্টার ডাক্তার, কেরাণী ডাক্তার, গোমস্তা ডাক্তার, নিষ্কর্ম্মা ডাক্তার, ঘরামি ডাক্তার, প্রভৃতি মহাত্মাগণের হস্তে চিকিৎসা বিভ্রাটের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়া ব্যথিত হই। ডাক্তার না হইলে ত চলে না, কাজেই ভাল চিকিৎসক না পাইলে যাহার তাহার আশ্রয় লইতে হয়। মেডিকেলকালেজ ও তিনটি মেডিকেল স্কুল এই অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থ

* * * * *

* আমাদের আশা হয়, কলিকাতা মেডিকেল স্কুল কালে বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে শত শত সুশিক্ষিত চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া—আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা দূর করিতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন। এই ভাবে আমরা হাতুড়ে নামক অদ্ভূত জীব দিগের ডাক্তারি বৃত্তি ছাড়াইতে সমর্থ হইব। কিন্তু যত দিন না আমরা উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসককে শিক্ষা দিতে

পারিতেছি, ততদিন তাহাদের কিছু করিতে পারিব না। লোকে কথায় বলে প্রকৃতিরঙ্গমন নিয়মই না যে কোন স্থান খালি থাকে; আজ একজনকে তাড়াইলে কালি তাহার স্থলে আর একজন আসিয়া বসিবে।

এক উপায় গেল এই। কিন্তু শত্রু না হউক, শত্রুতা নিপাতের আর এক অতি প্রশস্ত উপায় আছে। রোম রাজ্য যখন অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল— যখন দিন দিন নূতন নূতন জাতির গলায় অধীনতার রজ্জু পরাইয়া সেনাপতিগণ রোমের পদতলে উপহার দিতে ছিলেন, তখন সেই দেশের দূরদৃষ্টি রাজনীতিবিৎ শাসনকর্ত্তা এক অতি সুন্দর ও উদরনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে নীতি এই—যে যাহারা শত্রুরূপে বশীকৃত হইত, তাহাদিগকে "রোমীয় নাগরিক" (Roman Citizen) এই নাম দেওয়া হইত। ইহার অর্থ এই যে, বিজিত হইবার পরও তাহারা রোমানদিগের সকল প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইত। তাহাতে তাহারা বিজিত হইয়াছে বলিয়া আর মনোবেদনা পাইত না। এইরূপে পর আসিয়া ঘরের লোক হইয়া যাইত। রোম রাজ্য যে এতদিন ধরিয়া এত বিস্তৃত হইয়া জগতের সমৃদ্ধি উপভোগ করিয়াছিল, তাহার একটী প্রধান কারণ এই, উদারনীতির অবলম্বন। আমাদের সহিত আজ কাল কোন কোন চিকিৎসা-ব্যবসায়ের এই সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যায় যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ের সহিত আমাদের ব্যবসায়ের কতক পরিমাণে এইরূপ শত্রুতা আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় নিদান মানা, বায়ুপিত্ত কফ প্রভৃতি দোষকে রোগের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা, আমাদের এ যুগে আর সম্ভব নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাল না থাকিলে ও অথবা লোপ পাইলেও, আয়ুর্ব্বেদের কার্য্যকরী ভাগ দ্বারা অনেক সময় উপকার হইতে দেখিতেছি। এইরূপ স্থলে আমরা অনেক ঔষধ, তৈল, ইত্যাদি আমাদের করিয়া লইতে পারি। বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদের চিকিৎসার সহিত অঙ্গীভূত হইতে পারে। তাহাতে আমাদের ও অনেক উপকার হয়, ও দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র পুনর্ব্বার পরিপুষ্ট কলেবর হইতে পারে। আমি জানি, এরূপ মিলনের পথে অনেক বিঘ্ন। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের বলবৃদ্ধি ও চরমোন্নতি ব্যতীত অপর কোন ফলই ফলিতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ের চরমোন্নতি সম্বন্ধে,

পারিপার্শ্বিক অবস্থাবলি কি পরিমাণে সহায়তা করিতেছে। যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে জ্ঞানের উচ্চ আদর্শ লাভ করা, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য জ্ঞানালোচনার সুযোগের প্রয়োজন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সে সুযোগ এই বিজিত দেশে আমাদের পক্ষে বিরল। যে সকল পদে থাকিলে আমরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত জ্ঞানালোচনা করিতে পারি, সে সকল পদে উঠিবার দ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ। বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র চিকিৎসা, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতি কোন আবশ্যকীয় বিষয়েরই ভার আমাদের হস্তে নয়। এরূপস্থলে আমাদের নিজের চেষ্টায় যদি আমরা উন্নতি করিবার সুযোগ গঠন করিয়া লইতে না পারি, তবে চিরকালই আমাদিগের এই মধ্যবিৎ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইবে।

* * * * *

* * আমাদের সভাপতি মহাশয় চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও কার্য্যকালে তাঁহাকে কখন কখন কোন কোন নবাগত গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা আমাদেরই দেশীয় রোগীর চক্ষুর ছানি তুলাইয়া লইতে হয়।

* * * * *

* কলিকাতায় যদি এই প্রথা অবলম্বিত হয়, তবে কত উপকার হয়। ফল কথা, যত দিন না দেশীয় চিকিৎসকদিগের হস্তে কোন কোন বড় চিকিৎসালয়ের ভার পড়ে, তত দিন স্পেন্সার ওয়েল্‌স স্যার হেন্‌রি টমসন্ বার্ণস্ প্রভৃতি মহাত্মাদের ন্যায় লোক কখন ও আমাদের মধ্যে জন্মিতে পারিবে না। ততদিন এই মধ্যবিৎ অবস্থায়ই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কে এ সংসারে থাকিতে পারে? আমাদের এই নিরাশার অন্ধকারের মধ্যেও আশার ক্ষীণ আলোক আছে। আপাততঃ কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ও অদূর ভবিষ্যৎ গর্ভেনিহিত বিদ্যাসাগর চিকিৎসালয় আমাদের আশা স্থল। এখানে আমাদের অনেক চিকিৎসক বন্ধু নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবেন।

লোকে কথায় বলে রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। আমাদেরও এই নিতান্ত সামান্য নিরাড়ম্বর আরম্ভ। ভবিষ্যতে এখানে কি আমরা কোন সুফলের আশা করিতে পারি না? ঈশ্বরের কৃপায় কি হইতে পারে বা কি

হইবে তা কে জানে? কত আলোচ্য বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে; সুযোগ পাইলে এই সকল বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলে কত সুফল ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

আর একটী কথা বলিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদিগের একটী নাম হইয়াছে এলোপ্যাথ, বাহিরের লোকে আমাদিগকে ঐ নামেই ডাকে। আমার বোধ হয়, এরূপ নামে আমাদিগের অভিহিত করিবার কোন কারণই নাই।

আমরা কোন একটী বিশেষ অনুমান সিদ্ধান্তকে চিকিৎসার ভিত্তি বলিয় মনে করি না। আমাদের এরূপ আর অনেক মত আছে। তবে কেন কেবল আমাদের একটি মত লইয়াই আমাদের নাম দেওয়া হইবে।

বাস্তবিক ভবিষ্যতের চিকিৎসা বিদ্যার একটি অতি সুন্দর রূপক আমার মানসপটে সময় সময় দেখিতে পাই। বোধ হয়, ইহা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ-স্বরূপ। এক দিকে সহস্র সহস্র মূল দেশ দেশান্তর হইতে সকল প্রকার বিজ্ঞানের রস লইয়া এই বৃক্ষকে পোষণ করিতেছে। অপর দিকে সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া জগতের রস সকলকে আশ্রয় দিতেছে। ঐ সকল শাখা প্রশাখা নানা জাতীয় ফল পুষ্পে সুশোভিত। প্রত্যেক শাখার নিম্নে কত কত সাধক ঐ সকল ফল পুষ্প আহরণ করিয়া ও তাহাদিগকে উপভোগ করিয়া অমর হইতেছেন এবং জগতের শত সহস্র হতভাগ্যের কত উপকারই সাধন করিতেছেন। এই বিশ্বব্যাপী বৃক্ষের নিকট এ মত ও মত নাই; সুসভ্য জার্ম্মান জাতির আবিষ্কৃত সত্য হইতে অসভ্য এস্কুইমো জাতির আবিষ্কৃত সত্য পর্য্যন্ত সকল সত্য—সকল সুফল সে বৃক্ষে আছে। এটি এলোপ্যাথি, ওটি হাকিমি, ওটি কবিরাজী ইত্যাদি প্রভেদ চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে। চিরোজ্জ্বল সত্য-সূর্য্য অবিরাম তাহার উপর কিরণ বিতরণ করিতেছে। আহা! এই বৃক্ষের তলায় কত শ্রান্ত প্রাণ, কত অশান্ত প্রাণ শান্তি লাভ করিবে। জগদীশ্বরই জানেন কবে আমাদের আশা কার্য্যে পরিণত হইবে।

কলিকাতা } ডাক্তার শ্রীনীলরতন সরকার, এম্, এ, এম্, ডি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এম, এ, এম, ডি, ডাক্তার নীলরতন বাবু গত সংখ্যকভিষক্‌দর্পণে "বঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যা" এবং "চিকিৎসা-ব্যবসায়" নামক দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটী অতি বিস্তৃত জন্য সম্মিলনীতে স্থান পাইল না। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা আদরের সহিত পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

উচ্চ উচ্চ উপাধিমালায়-বিভূষিত উচ্চ-হৃদয় ডাক্তার নীলরতন বাবুর প্রবন্ধ দুইটী যে যথার্থই বেশ গভীর চিন্তা প্রসূত, সে বিষয়ে আমরা আদৌ অস্বীকার করিতে পারিব না। কেবল তাহাই নহে; এহেন ইংরাজী বিদ্যার ও ইংরাজী চিকিসার চরমসীমায় আরোহণ করিয়াও যে তিনি মাতৃভাষায় দখল রাখিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমরা আরও সুখী হইলাম। ফলতঃ প্রবন্ধ দ্বয়ের কি ভাষাগত, কি সারবত্তা বিষয়ে অথবা কি চিন্তাশীলতা সম্বন্ধে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আনন্দিত হইতে হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত আনন্দেও আমাদের এ পোড়া চক্ষু হইতে আমরা বিষাদের কালিমা ঘুচাইতে পারিলাম না। তিনি যে অজ্ঞতা-জন্য হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুমাত্র দুঃখিত নাই। তবে তাঁহার একটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা এস্থলে কিঞ্চিৎ না বলিয়া পারিতেছি না। নীলরতন বাবুর নেহাৎই ইচ্ছা যে, বঙ্গে সাত কোটী লোকের মধ্যে এপর্য্যন্ত যে ২।৩ হাজার ডাক্তার জন্মিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে। সুতরাং গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় যাহাতে ডাক্তারের দল বিচরণ করেন, এই তাঁহার ইচ্ছা, তাহা হইলেই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

ভগবান্ তাঁহার এই সাধুসংকল্প কার্য্যে পরিণত করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে কিনা, একটা অতি সত্য কথা এই যে, এ অন্নবস্ত্রহীন পোড়া দেশে ভেতো ও শাকপাতাড়খেগো বাঙ্গালীর মধ্যে ডাক্তারের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ডাক্তারী ঔষধের যত অধিক প্রচলন বাড়িবে, নানাবিধ মতে দেশের সর্ব্বনাশের সংখ্যা যে ততই বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে কিন্তু আর বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। কেন যে সংশয় নাই, সে কথা স্বদেশ-প্রেমিক জ্ঞানবান্ পাঠক, ধীরচিত্তে বিচার করিয়া লন্, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চি, স, সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাস ও কাসাদিরোগে তৈল প্রয়োগের কথা তুলিয়া নানা প্রকার চন্দনাদি তৈলের উল্লেখ করিয়াছি। আর একই চন্দনাদি তৈল নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া দেশের কবিরাজকুল যে একমাত্র ভাণ্ড হইতে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন,সে কথা বলিতেও ত্রুটী করি নাই এবং সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ও যে, আমার কথার সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, তজ্জন্য ও বিশেষ রূপ আহ্লাদিত হইয়াছি। সুতরাং প্রাণ-খুলিয়া এখন অন্যান্য তৈল পাকের বিষয় ক্রমশঃ লিখিতেছি।

যে চন্দনাদি তৈলের কথা গতবারে লিখিয়াছি, তাহার ব্যবহার প্রণালী আমি অবগত নহি। অতএব আমরা নিরন্তর যে বৃহচ্চন্দনাদি তৈলের ব্যবহার করিয়া থাকি, নিম্নে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

যক্ষ্মা ও কাসরোগে বৃহচ্চন্দনাদি তৈল।

উৎকৃষ্ট কৃষ্ণতিলের তৈল /৮ আটসের ওজনে লইয়া যথাবিধি কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর তৈলের বর্ণ ও গন্ধাদি রীতিমত জন্মিলে মূর্চ্ছাদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল হইতে ভালরূপে ছাকিয়া নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্য দ্বারা পাক করিবেক। যথা—শ্বেতচন্দন, বালা, পদ্মনখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ দেবদারু শটী, ছোটএলাচি, খট্টাসি, নাগকেশর, তেজপাতা, শিলাজতু, মুরামাংসী কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মুথা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, লতাকস্তুরী লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা, নালুকা এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত মোট দুই সের ওজনে লইয়া একত্রে উত্তম রূপে কুট্টিত করিয়া পরিমাণ মত জলের সহিত তৈলপাক করিবেক। অনন্তর কিঞ্চিৎ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া তদবস্থায় কয়েক দিন রাখিয়া দিবে, তারপর কল্কদ্রব্য সহ তৈলটী একটু পচিয়া আসিলে কল্কদ্রব্য গুলি তৈল হইতেছাকিয়া ফেলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত কাথাদির সহিত পাক করিবে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অন্যান্য তৈল পাকের সময় এরূপ ভাবে অর্থাৎ কাথাদি পাকের সময় কল্কদ্রব্য

তৈল হইতে উঠাইবার উপদেশ না দিয়া এবারে কল্কদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়ার তাৎপর্য্য কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য কাথ পাকের সময় সে উপদেশ থাকিলেও লাক্ষার কাথ ও দধির মাত সহ তৈল পাকের সময় কল্কদ্রব্য তৈলে থাকিলে পাক করা অসুবিধাহেতুই এস্থলে কল্কদ্রব্য অগ্রেই তুলিয়া ফেলা উচিত।

যাহা হউক, তৈল হইতে কল্কদ্রব্য গুলি ফেলিয়া দিয়া প্রথমতঃ লাক্ষার কাথের সহিত তৈলপাক করিবেক। যথা—উৎকৃষ্ট লাক্ষা (লা) /৪ চারি সের ওজনে লইয়া একখানি গামছার ন্যায় নূতন বস্ত্রে খুব্ ঢিলে করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবেক। অনন্তর /৮ আট সের শেষ থাকিতে নামাইয়া সেই কাথের সহিত তৈলপাক করিবেক। তারপর দধির মাত ৩২ সের দিয়া পাক করিবেক। অনন্তর গন্ধপাক দিয়া তৈলের পাক শেষ করিবেক।

বলা বাহুল্য যে, ইহাই আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহৃত চন্দনাদি তৈল। চন্দনাদিই বল, আর সার চন্দনাদিই বল, বৃহচ্চন্দনাদিই বল, আর মহামহা-চন্দনাদিই বল, আমাদের এই একই চন্দনাদি তৈলই কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে অসংখ্য নাম ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ শাস্ত্রে চন্দনাদি তৈলের নানাবিধ পার্থক্য থাকিলেও আমরা কিন্তু এস্থলে শাস্ত্রের ধার তত ধারি না। সুতরাং সমস্ত প্রাণের কথাই এ স্থলে খোলসা করিয়া লিখিলাম। আশা করি, অসত্য-প্রিয় পাঠক ক্ষমা করিবেন।

চন্দনাদি তৈলের গুণ প্রকৃতই অসংখ্য।

রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা অর্থাৎ ক্ষয়কাস ও কাসাদি রোগের নানাবিধ কষ্টকর উপসর্গে যথার্থ পক্ষেই চন্দনাদি তৈল দ্বারা অসাধারণ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

রক্তপিত্তের দাহ, যক্ষ্মা রোগীর আভ্যন্তরিক জ্বালা, কাস রোগীর বুকে বেদনা ও সর্দ্দি বসার জন্য ভয়ানক যন্ত্রণা ইত্যাদির পক্ষে চন্দনাদি তৈল বাস্তবিকই ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং এহেন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ চন্দনাদি তৈলের গুণের বিষয় আর অধিক কি লিখিব? তথাপি সংক্ষেপে

এই মাত্র এস্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে একজন রক্তপিত্ত ও কাসগ্রস্ত ব্যক্তির এমন বিজাতীয় দাহ উপস্থিত হয় যে, তিনি তজ্জন্য ক্রমাগত ভাল ভাল এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের নিকট ২ মাস কাল ঔষধাদি ব্যবহার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে কিছুমাত্রও উপকার দর্শে না। অনন্তর পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সেই রোগী উপরোক্ত চন্দনাদি তৈল মাখিয়া ৪।৫ দিনের মধ্যেই সেই সুদুঃসহ জ্বালা হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান। অতএব ইহাপেক্ষা আর গুণের কথা কি উল্লেখ করিব?

উপরে চন্দনাদি তৈলের সম্বন্ধে ঐ রূপ লিখিলাম বলিয়া সর্ব্বপ্রকার চন্দনাদি তৈলেই যে এক প্রকার, তাহা কিন্তু বলিতেছি না। প্রস্তুতের পার্থক্য থাকিলেও আমরা কিন্তু তদনুসারে চলিল না। পরন্তু বাসাচন্দনাদি নামক তৈলটী পূর্ব্বোক্ত তৈল হইতে পৃথক প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশের কবিরাজ মহাশয়েরাও বাসাচন্দনাদি নামক তৈলটী স্বতন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ঐ নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরাও কিন্তু তাহাই করি, অতএব আগামী বারে বাসাচন্দনাদি তৈলের বিষয়ই পাঠক গণকে উপহার দিব।

ক্রমশঃ—

কলিকাতা } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেন গুপ্ত।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কবিরাজ মহাশয়ের সরল ভাবে লিখিত তৈল প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী পাঠ করিয়া প্রকৃতই আনন্দিত হইতে হয়। চি, স, সম্পাদক,

---

দৃষ্টফল ঔষধ ও চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৯) ক্রিমিশূল ও ক্রিমির ঔষধ।

(ক) তিতলাউর বিচি ১টী ও পলাশের বিচি ৪টী একত্রে আল্‌তার জলে বাটিয়া আন্দাজ এক ছটাক জল ৩ দিবস পর্য্যন্ত খাইবেক। ইহাতে ক্রিমিশূল ও ক্রিমি রোগ আরোগ্য হয়। শাক ও অম্বল বারণ।

(খ) আলকুশী বৃক্ষ ও মূলের ক্বাথ ওলাউঠা রোগে বিশেষ উপকারী। মিছরির উষ্ণরসে আলকুশীর ছিমি ডুবাইয়া ঐ রস ছুরি দিয়া চাঁচিয়া লইবেক। প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় খাইলে পেটের ক্রিমি মরিয়া নির্গত হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

(গ) দাড়িম বৃক্ষের শিকড়ের ছাল ১ তোলা, বিড়ঙ্গ অর্দ্ধ তোলা জলের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি অন্ত্রের মধ্যে মরিয়া বাহির হয়।

বিড়ঙ্গ চূর্ণ ॥০ তোলা জলের সহিত অথবা ২ তোলার ক্বাথ মধুর সহিত পান করাইবে। খেজুর পাতার কিম্বা অঙ্কুরের রস, পালিদা পাতা বা ঘেঁটুপাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় সেবনীয়।

আনারসের কোঁক ছেঁচারস আধ ছটাক ও চিনি সিকি ভরি একত্রে ভক্ষণ করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। চূণের জল ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত সেবনীয়।

(২০) উপদংশ বা পারা জনিত ক্ষতের মহোপকারী ঘৃত।

বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত——অর্দ্ধ পোয়া।

তুঁতিয়া——২ ভরি।

মুদ্রাশঙ্খ——১ ভরি।

একটি অব্যবহৃত ও অপরিষ্কৃত (অর্থাৎ যাহা, অনেক দিন মার্জ্জিত না হওয়াতে কলঙ্কিত হইয়াপড়িয়াছে)পিতলের পাত্রে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘৃত ঢালিয়া জ্বালে চড়াইবে, ওদিকে তুঁতিয়া ও মুদ্রাশঙ্খ পৃথক পৃথক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। পরে ঘৃতে ফেনা মরিয়া গেলে উহাতে গোটা কতক নিমপাতা ফেলিবে ও যখন দেখা যাইবে যে পাতা গুলি অল্প অল্প ভর্জ্জিত হইয়াছে, সেই সময় চূর্ণীকৃত তুঁতিয়া অল্প অল্প করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ মিশাইয়া ১টী কাঁচা এক মুখ থেঁতো করা নিমের কাটী দ্বারা উত্তম রূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে ও কেবল ঘৃত টুকু অপরাপর দ্রব্য গুলি হইতে পৃথক করিয়া বা পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছেঁকিয়া লইবে। বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যেন নিমপাতা গুলি ঘৃতে চুঁইয়া না যায়। এই ঘৃত, উপদংশ পারা জনিত বা যে কোন ঘায়ে পুরাতন তুলা করিয়া দিবসে ২।১ বার লাগাইলে অতি সত্বর বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় আরোগ্য হইবে, এমন কি লিঙ্গের ক্ষত মাংস বিশীর্ণ ও ক্রিমি ভক্ষিত হইলেও অচিরে আরোগ্য হয় এরূপ দেখা

গিয়াছে। ঘৃত লাগাইবার পূর্ব্বে ক্ষত গুলি নিম্ব পত্র সিদ্ধ জলে উত্তম রূপে ধৌত করা উচিত। আর যদি উপদংশ বিষ বা পারা জন্য সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বাহির হয়, বা ঐ বিষ দেহে আছে এমন বোধ হয়, তাহা হইলে আবার ঐ ঘৃত ১টী চণক পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় দুগ্ধের সরের ভিতর পুরিয়া খাইতে হইবে। সময়ে সময়ে ঐ ঘৃত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় রূপেই এক কালীন ব্যবহৃত হয়।

(২১) বাতের মহৌষধ।

টারপিন তৈল——অর্দ্ধ ছটাক।
এরণ্ড তৈল (Castor oil)——অর্দ্ধ ছটাক।
মেটে তৈল——অর্দ্ধ ছটাক।
পিপারমিণ্ট (Oil of Peppermin)——২০ ফোঁটা।
সৈন্ধব লবণ——১।০ ওজন।
কর্পূর——৷৷৵০ ওজন।

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। সৈন্ধব লবণ উত্তম রূপে পেষণ করিয়া মিশাইবে। পরে উত্তম রূপে নাড়িয়া নাড়িয়া বেদনা স্থানে দিবসে ২।৩ বার মালিশ করিলে অতি প্রবল বাতব্যাধিও শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ক্রমশঃ—

বাগবাজার
কলিকাতা
} শ্রীশরচ্চন্দ্র নিয়োগী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

এ সকল ঔষধের উপযোগিতা ও সম্পূর্ণ উপকারিতা বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণরূপই আস্থা আছে।

চি, স, সম্পাদক।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

(সম্পাদকীয়)

শূল ও অম্লশূল রোগের পক্ষে শঙ্খভস্ম মহৌষধ।

দেশীয় মণিকাঞ্চনকে পদাঘাত করিয়া আমরা যে বিদেশীয় কাঁচরাশিকে প্রতিনিয়তই সাদরে আলিঙ্গন করি, তাহা শতসহস্র রকমেই প্রতিপন্ন করা

যাইতে পারে। সকলেই জানেন যে, শূল বা অম্লজন্য শূল রোগের আশু-শান্তির পক্ষে বিলাতি সোডার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। সোডার এইরূপ গুণের পক্ষপাতী হইয়াই কেহ শূল বেদনায় আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সোডা গুলিতেছেন ও ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিতেছেন, কেহবা আবার অসুবিধা বিবেচনায়, সোডার বোতলই দিবারাত্রে ২।১০ টা পান করিতেছেন! এইত ব্যাপার। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, সেই সেই স্থলে আমাদের দেশী শঙ্খভস্মের ন্যায় অব্যর্থ ঔষধ আর কিছুই নাই। যেমন কোন ভীষণতর বেদনাই ধরুক না, কতকটা শঙ্খভস্মের চূর্ণ তৎক্ষণাৎ গরম জল দিয়া ২।৩ বার পান করিবামাত্রই বেদনার শান্তি হইবেই হইবে। অনেক দর্শন-জন্য জ্ঞানেই আমরা আজ বৈদ্যক শঙ্খভস্মের এই অসীম গুণের কথা লিখিলাম, আশা করি, সোডাপ্রিয় ব্যক্তিগণ একবার শঙ্খভস্ম ব্যবহার ও উক্ত উভয় ঔষধের পরস্পর তুলনা করিয়া দেশীয় ঔষধের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবেন। এস্থলে শঙ্খভস্ম শব্দেই শঙ্খের গেঁড় বুঝিতে হইবে। কলিকাতার নূতন বাজারে শাঁক বিক্রেতাগণের নিকট যথেষ্ট পাওয়া যায়। মূল্য অতি শস্তা! প্রথমে গেঁড়গুলি টক্ লেবু বা তেঁতুলের জলের সহিত ভিজাইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পোড়াইলেই হইবেক। তারপর চূর্ণ করিয়া একটা শিশিতে রাখিতে হইবে। মাত্রা এই চূর্ণ প্রতিবারে ৵০ ৶০ ।০ ।৵০ বা ৷৷০ আনা বা তদপেক্ষাও অধিক দেওয়া যাইতে পারে। দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এই চূর্ণই নানাবিধ শূলরোগে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করিয়া ইহাদ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

সম্পাদক।

প্রত্যক্ষ ফল প্রদ-মুষ্টি যোগ।

জ্বরাধিকার।

৭। * জেলাপ (জুলাফা) ৬ রতি, কলম্বা ৫ রতি, কালাদানা ৩ রতি, শুঁট ৩ রতি, রেউচিনি ৫ রতি, নাটার বিচির শাঁস ৩ রতি, (স্থান বিশেষ নাটার পরিবর্ত্তে কুইনাইনও ব্যবহার হয়) গাছসালসা ৫ রতি, মোট আট

দফা দ্রব্য চূর্ণাবস্থায় মিশাইয়া এক দিনের ঔষধ অর্থাৎ দুইটি পুরিয়া প্রস্তুত করিবে, প্রাতে ও বৈকালে বিজ্বরাবস্থায় সেবনে বহুদিনের প্রাচীন বা কঠিন অথবা কুইনাইনের আবদ্ধ জ্বরাদি ও কোষ্ঠবদ্ধ যুক্ত স্বাস্থ্য ভঙ্গ অবস্থাদি এক সপ্তাহ সেবনে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার বিশেষ নিয়ম এই যে, রোগী সমুদয় কার্য্যেই গরম জল ব্যতীত কাঁচাজল স্পর্শ করিতে পারিবেন না। উদরাময় সত্বে সেবন নিষেধ।—

৮। * কালাদানা, সালসা, ফলস্বা, রেউচিনি, জেলাফা, ছোট হরিতকী শুঁট, সালম মিছরী, নাটার বিচির শাঁস (বা কুইনাইন) নিমছাল, গুলঞ্চ, এই একাদশ প্রকার দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেক ১৷৷০ রতি ওজনে লইয়া দুইটি পুরিয়া করিতে হইবে, প্রত্যেক পুরিয়া একরতি এবং বৈকালের পুরিয়ায় অর্দ্ধ রতি সল্ট্ মিশাইয়া সেবন করিলে কুইনাইনের আবদ্ধ জ্বর ; প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি উৎকট রোগ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে, উদরাময় সত্বে নিষেধ।—

৯। * শ্বেত মাথালের মূলের ছাল ।০ আনা, অপামার্গের মূলের ছাল ।০ আনা, কনক ধূতুরার মূলের ছাল ।০ আনা, লাল কুঁচের মূলের ছাল ।০ আনা, দুর্ব্বা মূল ।০ আনা, বিছাতির মূলের ছাল ।০ আনা, ঝাঁপা টুপরের মূলের ছাল ।০ আনা, গুলঞ্চ ।০ আনা, ক্ষেৎপাপড়ার মূল ।০ আনা, বিণ্যার মূল ।০ আনা, সাদা কুঁচের মূলের ছাল ।০ আনা, এই একাদশ প্রকার দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করতঃ বাসকের মূলের ছাল চূর্ণ /৷৷০ সের সহ সুন্দর রূপে মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। প্রতি দিনের জন্য ৪ রতি হিসাবে ৭ দিনে ২৮ রতি ঔষধ ঐ চূর্ণ সমষ্ট হইতে গ্রহণ করিয়া উহাতে জায়ফল চূর্ণ ।৵০ আনা মিশাইয়া সাত ভাগে বিভক্ত করতঃ প্রত্যহ প্রাতে জল পোরা হুঁকাতে তামাকের ন্যায় ধূম পান করিবে অতি প্রাচীন পালা, দৌকালিন, জড়িভূত দুরারোগ্য জ্বর নিশ্চই আরোগ্য হইবে। সপ্তাহ সেবনে উপকার হইলে সকল রোগই আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

১০। * রেউচিনি, জেলাফা, শুঁট, মহরি, প্রত্যেক ২ রতি ; যষ্টিমধু, সাসাফ্রাস্, সালসা, তোপচিনি, দারুচিনি প্রত্যেক এক রতি ; কুইনাইন ও হিরাকস প্রত্যেক সিকি রতি ; সকল দ্রব্য বিচূর্ণাবস্থায় সুন্দর রূপে মিশ্রিত করিয়া এক পুরিয়া এইরূপ যত গুলি প্রয়োজন পুরিয়া প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ দুইবার সেবনীয়। জ্বর না থাকাবস্থায় ঘৃত ও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর পথ্য সহ সেবনে

বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ইহা সেবনে কঠিন, দুরারোগ্য, প্রাচীন, যে কোন রকম জীর্ণ জ্বর সত্বর আরোগ্য হয়।

১১। * গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, দেবদারু, ধনে প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা লইয়া কাথ প্রস্তুত করতঃ সেবনে কম্প এবং বেদনা যুক্ত তীব্র জ্বর নাশ হয়।

১২। * বকপুষ্পের পাতা চূর্ণ দৈনিক ।০ আনা মাত্রায় সেবনে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্টক হয়।

১৩। * নির্গুণ্ডীর মূল হস্তে বন্ধন করিলে নবিরাম জ্বর আরাম হয়।

১৪। * রক্ত পলাশের মূল কোটি দেশে বা বাম হস্তে বন্ধন করিলে পালা জ্বর নিবারণ হয়।

১৫। * অপামার্গের মূল কোটি দেশে বা দক্ষিণ হস্তে বন্ধনে পালা ত্রাহিক পক্ষান্তর বা মাসান্তর যে কোন রকম পর্য্যায় জ্বর অথবা ভূত প্রেতাদি-সম্ভূত জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়! রবিবার জ্বরের দিবস ঔষধ ধারণ ব্যবস্থা।

১৬। * ঝাঁটীর মূল কর্ণে বন্ধন করিলে দুরারোগ্য জ্বর বিনষ্ট হয়। ঝাঁটীর দ্বিতীয় নাম সহদেব।

১৭। * বৃহতীর মূল মস্তকে বন্ধন করিলে উৎকট জ্বর আরাম হয়।

১৮। * বাড়িয়ালের মূল মস্তকে বন্ধন করিলে মহা জ্বর নষ্ট হয়।

১৯। * আদা ও বাসকের রস সমভাগে লইয়া মধুর সহিত তিন দিন সেবনে ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়।

২০। * শনিবারে লাঙ্গল মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক পর দিন প্রাতে অর্থাৎ রবিবারের পালার দিবস শয্যায় থাকিতে উক্ত মৃত্তিকায় তিলক অষ্টাঙ্গে ধারণ করিলে তীব্র ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়।

২১। * ছাতিমের ছাল চূর্ণ /০ এক আনা মাত্রায় বিজ্বরে সেবনে কুইনাইনাবদ্ধ জ্বর বা দূষিত জ্বর আরোগ্য হয়।

২২। * দেবদারু, শুঁট, ধনে, কণ্ঠিকারী, ও বৃহতী প্রত্যেক ৩৬ রতি, জল /৷৷০ সের, শেষ আদপোয়া অর্থাৎ কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনে সান্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়।

২৩। * লাজমণ্ড (খৈমণ্ড) সমভাগে গো মূত্রের সহিত প্রাতঃকালে সেবনেও সান্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

২৪। * শ্লেষ্মা সংযুক্ত জ্বরের পার্শ্ব বেদনায় মাদারের বিচির সহিত সম-

ভাগে আদা পেষিয়া উষ্ণ করত: বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে আশ্চর্য্য উপকার হয়। মাদারকে স্থান ভেদে পালেতেমাদার বা পালিমাদারও বলে।

পুঁটিয়া
রাজসাহী } ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

উপরোক্ত মুষ্টিযোগ ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের অপরিচিত হইলেও উহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। চি, স, সম্পাদক,

---

পদ্য পাঁচন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৪। পঞ্চমূলাদি পাঁচন।

শালপানী, কণ্টিকারী, গোখুর, বৃহতী,
চাকুলে, বেড়েলামূল, শুঁট, আকনিদি,
গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, মুতা,
বেলশুঁট, গন্ধবালা, তাহাতে চিরতা,
রক্তঅতিসার, বমি, শূল, শ্বাস, কাশ,
উৎকট জ্বরাদি পীড়া, শীঘ্রকরে নাশ,

১৫। কুটজাদি পাঁচন।

দাড়িম্ব ফলের ছাল, ধাইফুল, মুতা,
কুড়চীর ছাল, বালা, আকনিদি লতা,
বেলশুঁঠ, লোধ আর ও রক্তচন্দন,
এই দিয়া যথা বিধি করিবে পাঁচন,
তাহাতে প্রক্ষেপ মধু দিয়া কর পান,
নাশিবে আমের পীড়া পেটকামড়ান,

ক্রমশঃ—

পুঁটিয়া
রাজসাহী } ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।